মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ, মে, ১৯৯৮

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়

১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ
প্রথম প্রচ্ছদের ছবি—শ্রীপ্রকাশ কর্মকার,
'প্রতিক্ষণ'-এর শ্রী প্রিয়ব্রত দেবের সৌজন্যে
চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি— শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রী সমীর সেনগুপ্ত'র সৌজন্যে

প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মুদ্রণে
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

কবি-পত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়কে,
'কবি ও কাঙাল'কে যিনি রেখেছিলেন
'আশ্রয়ের তদারকি ঘেরা ঘরে'॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রী অবন্তী কুমার সান্যাল

শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী

শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রী কৃষ্ণ ধর

শ্রী অমিতাভ দাশগুপ্ত

শ্রী প্রকাশ কর্মকার

শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়

শ্রী শম্ভুলাল বসাক

শ্রী সমীর সেনগুপ্ত

শ্রী দেবকুমার বসু

শ্রী প্রিয়ব্রত দেব

শ্রী হিমাচল চক্রবর্তী

শ্রী বিশ্বনাথ রায়

শ্রী কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রী দেবজিৎ ভট্টাচার্য

শ্রী অমল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রী মুকুল গুহ

এবং

শ্রীমতী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

জীবনানন্দ-উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিবৃত্তে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে সর্বাধিক আলোচিত, বিতর্কিত ও বর্ণময় কবি-ব্যক্তিত্ব। সদ্য-অতিক্রান্ত বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৯৫-এর ২৩ মার্চ শান্তিনিকেতনে অতিথি-অধ্যাপকরূপে কর্মরত অবস্থায় তাঁর অকাল প্রয়াণের আগে পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন ও অনিঃশেষ কবিতাচর্চায় শক্তি ছিলেন এক স্বতঃস্ফূর্ত, কিংবদন্তী চরিত্র। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়, প্রসঙ্গ, প্রকরণ ও নন্দন ভাবনার বর্তমান আলোচনায় সেই প্রবাদ প্রতিম কবি-ব্যক্তিত্বের একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-বৃত্তান্তের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য উপস্থাপিত করেছি যা থেকে শক্তির কবিতায় জীবন ও সৃজনের বহুস্তর অন্তর্বয়নের চিত্রটি বুঝতে সুবিধা হয়। শক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে কিছুতেই কবিতার মূল্যায়ন করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শক্তির কবিতার প্রধান ও পুনরাবৃত্ত বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি, যথা প্রেম, প্রকৃতি ও পর্যটন, জীবন ও মৃত্যু, সময়-সমকাল-মানুষ আলাদা আলাদা পর্বে আলোচিত হয়েছে, যাতে করে তাঁর চারদশকব্যাপী কাব্যসৃজনের দীর্ঘ গতিপথটি যথাসম্ভব চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়াও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও সংসর্গের নানা প্রসঙ্গ, কোনো এক ঈশ্বরের কথা, অরণ্যবাসের বিচিত্র খুঁটিনাটি বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে যা নিয়ে আরও বিশদ ও গভীর আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনার বিষয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রকরণ তথা নির্ম্মাণের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি। এই অধ্যায়ভুক্ত পাঁচটি পর্বে শক্তির শব্দপ্রকরণ, চিত্রকল্প-প্রতীক-অলঙ্কার প্রয়োগের অভিনবত্ব, রূপরীতির বৈচিত্র্য, ছন্দ-প্রকরণ ও বিবিধ প্রকরণ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। পাঠবস্তুর বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ ভাষ্যের মধ্য দিয়ে আপাত-বোহেমিয়ান কবির প্রকরণমনস্কতার ধরনটি পাঠকদের কাছে উন্মোচিত করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নন্দনভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা যা কবিতার নির্মাণ, তার শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে শক্তির ভাবনা ও প্রয়াসের কিছু আন্দাজ দেবে পাঠককে।

পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায়ে শক্তির কবিতার প্রধান সূত্র বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে পঞ্চাশের অপরাপর উল্লেখযোগ্য কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনায় শক্তির অবস্থান ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্যই এই প্রয়াস আগামী দিনে তাঁর আরও ব্যাপক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের আরম্ভ মাত্র।

'পরিশিষ্ট' অংশে পরীক্ষামূলকভাবে শক্তির দুটি অত্যন্ত পরিচিত কবিতার নিবিড় পাঠ উপস্থাপিত করা হয়েছে, চিহ্নবিজ্ঞান ও আঙ্গিকবাদের বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসারে। কবিতার আলোচনা ও ব্যাখ্যায় এ' ধরনের প্রচেষ্টা আরও বেশি করে হবে এই প্রত্যাশায়।

১৯৬১-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য** থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত **সকলে প্রত্যেকে একা** (১৯৯৯) পর্যন্ত শক্তির কবিতাসঙ্কলনগুলি এবং **অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়** (১৯৯০) শিরোনামে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থবদ্ধ রচনা সমূহ তাদের প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমে আলোচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। এই বিপুল সংখ্যক কবিতার রচনার প্রকৃত কালানুক্রম নির্ণয় এক দুরূহ ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য সন্দেহ নেই। তবে এই আলোচনা-গ্রন্থে সে কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়াস করা হয় নি। এ যাবৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কম বেশি আড়াই হাজার কবিতার বাইরেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা-সঙ্কলনে ছড়িয়ে রয়েছে শক্তির আরও অনেক রচনা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সম্পাদনা ও সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত কবিবন্ধু শ্রী সমীর সেনগুপ্ত এরকম শ'পাঁচেক কবিতা ইতিমধ্যেই প্রকাশের অপেক্ষায় সাজিয়ে রেখেছেন। পাণ্ডুলিপির কপি রাখা ও তার সযত্ন সংরক্ষণ শক্তির স্বভাবে ছিলো না। সে কারণে আরও অনেক রচনা হয়তো সংগ্রাহকের নাগালের বাইরে থেকে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে শক্তির এইসব রচনা পাঠক সাধারণের গোচরে এলে হয়তো বা তাঁর কবিতা সম্পর্কে আরও বিচিত্র ও বিস্তৃত ধারণা হবে আমাদের।

কয়েক হাজার মৌলিক কবিতার পাশাপাশি ভারতীয় ও অ-ভারতীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক প্রধান কবির রচনা অনুবাদ করেছিলেন শক্তি। কখনো একা, কখনো সঙ্গে মুকুল গুহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আয়ান রশীদের মতো কাউকে নিয়ে। কবিতা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ, অনুরাগ ও শৃঙ্খলার এ আর এক অসামান্য অধ্যায়। এই গ্রন্থে শক্তির অনুবাদ কবিতার কর্মকাণ্ড আলোচিত হয় নি, কারণ তা স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট অভিনিবেশ দাবী করে। শক্তির উপন্যাস ও ছোটগল্প, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ছোটদের জন্য লেখা ছড়া ইত্যাদিও বাদ পড়েছে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনায়। কোনো একটি বইয়ের দুই মলাটের মাঝখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর সমগ্রে ধরা এক প্রায়-অসম্ভব প্রকল্প।

পঁচিশ বছর আগে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রাবস্থায় কিছুটা কবিতা লেখার টানে এবং তার চাইতে অনেক বেশি ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিলো। কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়ির একতলার ছোটো ঘরে কাছ থেকে দেখেছিলাম সর্বতোভাবে কবি সেই আশ্চর্য মানুষটিকে। তার আগে এবং পরেও তিনি আমার অন্যতম প্রিয় কবি। শান্তিনিকেতনে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পরে তাই তাঁর কবিতা বিষয়ে সাধ্যমতো কিছু লিখতে চেয়েছি যা বর্তমান গ্রন্থের আকার নিয়েছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম আপনজন ও অনুরাগী গবেষক অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী আমার এই প্রয়াসের সর্বস্তরে আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কবি ও লেখক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কবি-পত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু মূল্যবান ছবি ও অন্য উপকরণ দিয়ে বইটির সৌন্দর্য ও মূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন। বইটি তাঁকে উৎসর্গ করে আমি তাঁর সস্নেহ সহযোগিতার ঋণ স্বীকার করেছি মাত্র।

আমাকে বিশেষভাব সহযোগিতা করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দুই অকৃত্রিম বন্ধু শ্রী শম্ভুলাল বসাক এবং শ্রী সমীর সেনগুপ্ত। তাঁদের কাছেও আমার অশেষ ঋণ।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত শ্রী প্রকাশ কর্মকারের আঁকা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্কেচটি শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন 'প্রতিক্ষণ'-এর শ্রী প্রিয়ব্রত দেব। চতুর্থ প্রচ্ছদে শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন শ্রী সমীর সেনগুপ্ত। এঁদের সকলের আগ্রহ ও শুভেচ্ছা আমার অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি বিশেষভাবে ঋণী আরও অনেকের কাছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করবো অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, শক্তির প্রিয় বন্ধু কবি শ্রী অমিতাভ দাশগুপ্ত, শ্রী দেবকুমার বসু, অধ্যাপক অবন্তী কুমার সান্যাল, কবি ও অধ্যাপক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ, অধ্যাপক মানস চৌধুরী, অধ্যাপক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তরুণ রায়, অধ্যাপক সুহাস বিশ্বাস ও অধ্যাপক প্রীতিরঞ্জন মিত্র'র নাম। গ্রন্থপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট নানা ব্যাপারে আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতা জুগিয়েছেন সহধর্মিনী সোমা চট্টোপাধ্যায় এবং পুত্র শ্রীমান অর্ক। তাদের কথাও বাদ পড়া উচিত হবে না।

পরিশেষে স্মরণ করবো 'রত্নাবলী'র শ্রী সুনীল ভট্টাচার্য ও শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ শ্রম ও আগ্রহের কথা। এছাড়া প্রচ্ছদ বিন্যাস, অলঙ্করণ, মুদ্রণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যাঁরা যত্নবান ছিলেন তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবে যদি এই গ্রন্থের পারিপাট্যে কোনো ত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে তবে তার দায় আমারই।

এই প্রয়াসের মূল্যায়নের দায়িত্ব সবিনয়ে অর্পণ করলাম সুধী পাঠক ও বিদ্বজ্জনের ওপর।

বিনীত

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

কথামুখ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কাব্য বিষয়ে রচিত হয়েছে এক বিস্তৃত গবেষণাগ্রন্থ। সে সম্পর্কে আমাকে কিছু মন্তব্য লিখতে হবে। এটা আমার কাছে যেন একটা নির্মম কৌতুকের মতন। স্পষ্ট মনে পড়ে, শক্তি অনেকবার হাসতে হাসতে স্বাতীকে বলেছে, সে অন্তত আশি-পঁচাশি বছর বাঁচবে। তার অনেক আগেই আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বাধ্য হয়েই তাকে আমার সম্পর্কে দু' চার কথা বলতে হবে। আমার কাছে সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হতো। শক্তি সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলেই সে জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়। তার সহসা অকাল প্রস্থান আমি এখনো মেনে নিতে পারি নি।

কোনো একটি পত্রিকায় শক্তির কবিতা সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণমূলক গম্ভীর ধরনের আলোচনা প্রকাশিত হলে সে সহাস্যে আমাকে বলেছিল, উঠতি বয়েসে কোনো কোনো নির্জন দুপুরে খেলাচ্ছলে যে-সব কবিতা লিখেছি, তা নিয়ে ডক্টরেটরা মাথা ঘামিয়ে প্রবন্ধ লিখছে! তখন কি আর এসব ভেবেছি আমরা? হ্যাঁ, খেলাচ্ছলেই শুরু হয়েছিল। যে-সময় রবীন্দ্র পরবর্তী প্রধান কবিরা সকলেই জীবিত এবং সৃষ্টিশীল, তখনই শক্তি তরুণ লেখকদের দলে যোগ দেয় এবং অচিরেই কবিতার সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্বে সে প্রথম সারিতে চলে আসে। এবং তার অভ্যুত্থান অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। তবে, শক্তির রোমাঞ্চকর বোহেমিয়ান জীবন-যাপনের নানান সত্য ও কিছু কিছু অতিরঞ্জিত কাহিনী যুক্ত হয় তার জনপ্রিয়তার সঙ্গে এবং অনেক সময় তার কবিতার চেয়ে এইসব কাহিনীই প্রাধান্য পায়। তার মৃত্যুর পরেও স্মৃতিকথামূলক রচনাই বেশি প্রকাশিত হয়েছে এবং তা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ শক্তির কবিতা থেকে তার জীবনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কোনোক্রমেই। তবে, তার জীবন কাহিনী সব জানা হয়ে গেলেও তার কবিতা থেকে যাবে চিররহস্যময়। এবং

তার জীবনযাপনের নানান রোমাঞ্চকর কাহিনীর অন্তরালে যে রয়েছে কবিতা রচনার প্রস্তুতি পর্ব, তার শব্দ জ্ঞান, তার আঙ্গিকের সূক্ষ্মতা, এসব অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। বহিরঙ্গে যার এত দুরন্তপনা, শব্দ নির্মাণের সময় সে যেন ধ্যানমগ্ন। যার মুখের ভাষা হাট বাজারের মানুষের মতন, সেও কিন্তু ব্যাকরণ ও প্রকরণ চর্চা করেছে গভীর অভিনিবেশে। এই সর্বাঙ্গীণ পরিচয় না জানলে শক্তির কবিতার সঠিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। অনতিদীর্ঘজীবনে তার রচনা বহুমুখী এবং বাংলা কবিতাকে সে কতখানি এবং কতদিক দিয়ে ঋণী করেছে, তার বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন আমি অনুভব করেছি।

ঠিক সেই কাজটিই করেছেন কুন্তল চট্টোপাধ্যায়। শক্তির সমস্ত রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মতন বিপুল পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন। এতে শক্তির জীবনী অংশ সংক্ষিপ্ত, প্রায় উচ্ছ্বাস বর্জিত, রচনাগুলির মধ্য থেকেই খুঁজে বার করা হয়েছে তার শক্তিমত্তা ও যথার্থ পরিচয়। অতীত কালের কবিদের তুলনায় সমসাময়িক কোনো কবিকে নিয়ে আলোচনা অনেক কঠিন এবং ঝুঁকিবহুল, কবি ও গবেষকদের সম্পর্ক সম্বন্ধে জীবনানন্দ দাশের মারাত্মক কবিতা আমাদের সবসময়ই মনে পড়ে, তবু কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমার মনে হলো, তিনি মাংস-কৃমি খোঁটার দিকে যান নি, শক্তির প্রকরণ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের চর্চা করছেন বটে, কিন্তু কাব্যের সৌরভ হারায়নি কোথাও। শুধু শক্তির বন্ধু হিসেবে নয়, তার কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক হিসেবেও আমি এই গ্রন্থকারকে সাধুবাদ জানাই।

সূচীপত্র

বিষয় *পৃষ্ঠা*

বুকের গ্রহণ-লাগা চাঁদ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সম্পাদকীয়-র বদলে ছাপা হয়েছিলো শক্তির অকৃত্রিম বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্তর এই কবিতাটি।

তোমার মুখের অংশ লেগে আছে গ্রহণের চাঁদে।
ধলভূমগড়ের পাথরে
সূর্যাস্ত দেখেছে রক্ত, কার রক্ত?
কালজানি নদীর শিয়রে
মুণ্ডারি বালিকা বলে : একদিন এখানেও ছিল।
ছিল নাকি?—হেসে ওঠে পাঞ্চেতের ভারী ডার্জ,
ইকো দেয় বেথুয়াডহরি,
এ-সব কথাকে ঠোনা মেরে
নীচের পৃথিবী থেকে উপরের পৃথিবীতে উড়ে
তোমার মুখের মাংস সেঁটে আছে গ্রহণের চাঁদে।

প্রতারক হাতছানি শেষে
কমলাপুলিতে গিয়ে দেখি
শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে ভোরবেলা পাঁচটা পঁয়ত্রিশে।
আমিও জিগজ্যাগ্ ছুটে অলৌকিক জেট্ চেপে
নাগাইসারি-কে ছুঁয়ে নেমে পড়ি সামসিং পাহাড়ে
যেখানে ছেড়েছে ঝর্ণা লাল মাছ আর খোলা চুল
সে উপত্যকায় বাষ্প-স্নান শেষে
চলে আসি ভুটান বর্ডার,
সেখানে নিরাশ হয়ে
হলদিবাড়ি রোড বেয়ে খরস্রোতা তিস্তার মতন
ক্রমাগত ছুটি আর নামি,
তোমাকে পেতেই হবে—
মাথার টবের মধ্যে কে পুঁতেছে এত পাগলামি?

মৃত্যু তো নেয় না কোনো দান,
এখন তোমার কোনো নেগেটিভ নেই,
প্রাকৃত কুঠার দিয়ে আশাতীত নিপুণতা দিয়ে
তোমার শরীর থেকে কেটে নেওয়া হয়ে গেছে ছায়া,
তবু তুমি কি বাজাও আসঙ্গের কোষে কোষে
শিরার টানেল বেয়ে তীব্র সাইরেন,
বাজে-ঝড়ে-বিস্ফোরণে
চণ্ড ব্লিজার্ডের ক্রোধে
হাঁকো—আছি, সবখানে আছি,
শমী-র গহনে অগ্নি
মাংসের ভিতরে কীট
আত্মার নিহিতে কানামাছি
যেরকম বসে থাকে
　　　　গোপন সন্ত্রাসে প্রতিবাদে।

প্রধান মায়াবী তুমি, এতো পারো
　　　　তবু কেন কিছুতেই লুকোতে পারো না
তোমার অন্তিম অশ্রু বাষ্প হয়ে মিশে আছে
　　　　বুকের গ্রহণ-লাগা চাঁদে।

সবগুলি চিঠি প্রিয় বন্ধু
শম্ভুলাল বসাক (বিটু) কে
বিভিন্ন সময়ে লেখা।

Dr. Shambhulal Basak
9 Ariff Road.
Ultadanga
Calcutta 4.
W. Bengal

সবগুলি চিঠি প্রিয় বন্ধু
শম্ভুলাল বসাক (বিটু) কে
বিভিন্ন সময়ে লেখা।

পোস্ট কার্ড
POST CARD

Dr. Shambhulal Basak
9 Ariff Road, Ultadanga
Calcutta-4.

'সখী সংবাদ' পত্রিকা :
এই সূত্রে মীনাক্ষীর
সঙ্গে পরিচয়

১৫ আগস্ট'-র ছবি
১৯৬৭

আয়ান রশীদ,
শামসুর রাহমানের
সঙ্গে

জীবনানন্দ দাশের জন্মদিনে
কবিতা পড়ছেন নন্দনে

কৃত্তিবাসের সভা :
সুনীল, শরৎ ও শঙ্কর
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

সুনীল, শক্তি

তিতি ও
তাতারের সঙ্গে
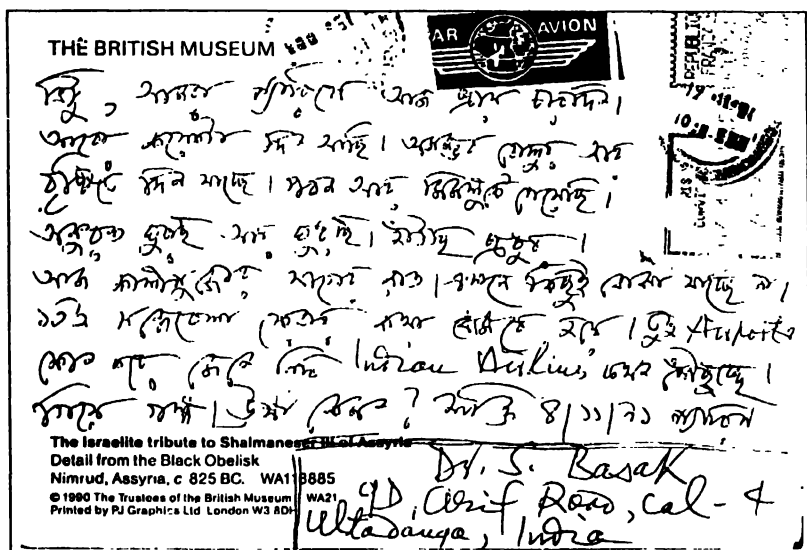
৪/১১/৯১ প্যারিস থেকে বন্ধু শম্ভুলাল (বিটু) কে লেখা।
চিঠিতে যে পবন-মিমলুর কথা আছে তাবা প্রায়ই শক্তির বাড়িতে এসে বাউল গান গাইতো।
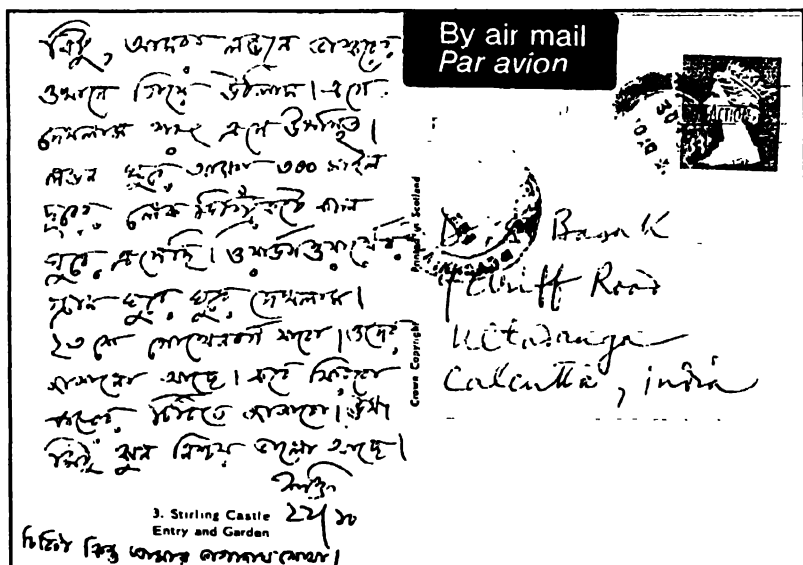
সুইডেনে কবি-সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন শক্তি। সেই সূত্রে লন্ডনে। দীর্ঘদিনের বন্ধু ড. শম্ভুলাল বসাক (বিটু) কে এই চিঠি সেখান থেকেই ২২/১০/৯১-এ। চিঠিতে এসেছে সুনীল-শক্তির লন্ডন প্রবাসী বন্ধু ভাস্কর দত্তের কথা, কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিটু-উষার ছেলে ও মেয়ে মিঠু-ঝুনের কথা। নজরে পড়ার মতো চিঠির শেষে লেখা বাক্যটি। মীনাক্ষীর লেখা। বহু চিঠির আড়ালেই এমন তাগাদা ছিলো।

চাইবাসা

অমিতাভ দাশগুপ্তর সঙ্গে

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী কন্যা তিতিকে
এইভাবে কারক-বিভক্তি
শিখিয়েছিলেন শক্তি।

বেকবাগানের বাড়িতে

পূর্বাঙ্গনায় কবির প্রথম স্মরণসভায়

আকাদেমী পুরস্কারের পর সুনীল দত্তের ক্যামেরায় : কর্নেল বিশ্বাস রোডে

এইসব চিঠিপত্র, ছবি ও অন্যান্য উপকরণ কবি-পত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধু ড শম্ভুলাল বসাকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

কবিজীবনকথা

'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম'

'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'—রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তিতে কবির ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সৃজনকর্মের মধ্যে যে পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে তা' সকল কবির ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না। অনেক সময়ই জীবনযাপনের ব্যতিক্রমী বর্ণময়তায় একজন কবি তাঁর জীবিতকালেই পাঠকদের কাছে হয়ে ওঠেন এক কিংবদন্তি চরিত্র, যেমন শার্ল বোদ্‌লেয়ার কিম্বা রাইনের মারিয়া রিল্‌কে। অনেক সময় কবির নিজের জীবনই হয়ে ওঠে তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। এক অকপট সারল্যে, আত্মকথনের এক অ-লজ্জ ভঙ্গি তে কবি তাঁর ক্রমবিকাশের ছবিটি মেলে ধরেন পাঠকদের কাছে। স্বীকারোক্তির আশ্চর্য সাহস ও অসঙ্কুচিত আন্তরিকতায় তিনি তাঁর জীবনযাপনের নানা ঘটনা ও প্রসঙ্গ, অভিজ্ঞতার নানা কৌতূহলী উন্মোচন ছড়িয়ে দেন তাঁর কবিতায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই শ্রেণীভুক্ত একজন কবি, যাঁর সম্পর্কে বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত : 'এতগুলো বছর ধরে শক্তি ওর জীবনটাকেই মিশিয়ে দিয়েছে কবিতার মধ্যে।'[১] প্রসঙ্গত কবি-ভাষ্যকার শঙ্খ ঘোষের মন্তব্যও বিশেষভাবে স্মর্তব্য :

"আত্মজীবন ছড়িয়ে দেবার এই ভঙ্গিটা শক্তির কবিতায় আদ্যন্ত ছড়িয়ে আছে বলে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের বেড়ে ওঠার গোটা ছবিটাই আমাদের চেনা হয়ে যায়। টুকরো টুকরো কয়েকটি গদ্য, অথবা উপন্যাস নামের কয়েকটি বই যদি না-ও থাকত তাঁর, কবিতারই থেকে পুরো সেই ছবি বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হত না যেন।"[২] মূলত রোমান্টিক আত্মময়তা, আত্মজৈবনিক ও স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার একজন আধুনিক প্রতিনিধিরূপে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ও অন্যান্য রচনার সূতিকাগৃহ তাঁর বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবনের দিকে তাকানো তাই জরুরি।

জয়নগর-মজিলপুর রেলপথে 'দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম'[৩] বহড়ুতে ১৯৩৩-এর ২৫ নভেম্বর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম, তাঁর দাদামশাইদের পুরোনো শরিকি বাড়ির 'সার্বজনীন আঁতুড় ঘরে কোনো।'[৪] বামানাথ ও কমলা চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি পুত্র-কন্যার মধ্যে শক্তি ছিলেন মধ্যম। বামানাথ কলকাতায় সামান্য কাজ করতেন। শক্তির বয়ানে 'বাবা ছিলেন টুলো পণ্ডিত'। তাঁদের আদি বাড়ি হুগলির খানাকুলের কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর 'বাবাদের টোল' ছিলো বিখ্যাত। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পিতৃকুলের সকলেই মারা গেলে বাবা বিয়ে করে চলে গিয়েছিলেন বহড়ুতে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচতে।[৫] শক্তির সাত বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন। শক্তির জন্ম তথা তাঁর শৈশব ও কৈশোর সবই অতিবাহিত হয়েছে মাতামহ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে, প্রথমে শরিকি বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারে, পরে 'একান্নবর্তী পরিবার ফেটে চৌচির'[৬] হয়ে গেলে, বহড়ু স্টেশন সংলগ্ন দাদামশাইয়ের নতুন তৈরি করা

'মৃণালিনী কুটির'-এ : ''বাগানঘেরা একতলা বাড়ী। উঠানে কুয়োতলা, পিছনে নিমতলায় শান-বাঁধানো খিড়কীর পুকুর। 'মৃণালিনী কুটির'-এ বাসিন্দা বলতে দুই শিশু, আমার দাদাভাই (শক্তি), আমি, আমার ন'পিসিমা (শক্তির মাসীমা) এবং আমাদের দাদু বহড়ু স্কুলের মাস্টার মশাই সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়।''[৭]

শৈশবে পিতৃহীন শক্তির অভিভাবক তাঁর মাতামহ ছিলেন শিক্ষক ও হোমিও চিকিৎসক। তাঁর মা ও ছোটভাই যখন কলকাতায় মামার বাড়িতেতখন দাদামশাই শক্তিকে রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে বহড়ুতে, যে বহড়ুর গ্রামীণ পরিবেশে, গাছ-পালা, বাগান-পুকুরের সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে শক্তি বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাঁর কবিতার যে নিবিড় সম্পর্ক সে কথা একটি সাক্ষাৎকারে কবি নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন : 'ছোটবেলায় একা একা গ্রামে কাটিয়েছি—কিছুটা কল্পনাবিলাসী ছিলাম—আমার কবিতায় সেই গ্রামীণ একটা পরিবেশ তাই সহজলভ্য।'[৮] কবির ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায়, তাঁর আত্মজৈবনিক নানা টুকরো গদ্যে, বন্ধু ও ভাষ্যকারদের নানা পর্যবেক্ষণে তাঁর আবাল্যলালিত পল্লী-নিসর্গ ও গৃহস্থালির খুঁটিনাটি ছবির কথা বারবার পাই। বহড়ুতে তাঁর দাদামশাইয়ের বাড়ির লাগোয়া ভুঞ্জুবাবুদের বাড়ির দুর্গামণ্ডপ, 'বিরোৎ বিরোৎ বাগান আর পুকুর', তাদের কাছারিবাড়ির বাগানে বাতাবিলেবুর বল নিয়ে খেলা, আমলকিতলা, পুকুরপাড়ভর্তি মাছরাঙার গর্ত, দোলমঞ্চ, ইস্টিশান—'পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধু এক পাড়া-গাঁ'[৯]—এ সবই আবাল্য তাঁর জীবন-স্মৃতির স্থায়ী চিত্রিত ছায়া। বহড়ুর প্রকৃতি, গাছগাছালি, আকাশ, পুকুর, বৃষ্টি—এ সবই যে শক্তিকে ভীষণ প্রভাবিত করেছিলো এবং সেসব শৈশবস্মৃতি হানা দিয়েছে সর্বদা তাঁর গদ্যে, পদ্যে, শুধু 'কুয়োতলা' উপন্যাসেই নয়, সে কথা উল্লেখ করেছেন শক্তির মামাতো ভাই অমল গঙ্গোপাধ্যায়।[১০]

পাঁচ বছর বয়সে বাড়িতে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে হাতেখড়ি হয়েছিলো শক্তির, তালপাতায় খাগের কলমে : 'ছোটবেলায় দাদামশায়ের বাড়িতে টুলো পণ্ডিত এসে থাকতেন। তিনি আমাদের ভাইবোনদের সবাইকে পড়াতেন।'[১১] শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃকুলের ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত ছিলো টোলকেন্দ্রিক শিক্ষা, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের চর্চা। বহড়ুতে দাদামশাইয়ের বাড়িতেও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন শক্তি টোলের পণ্ডিতের কাছে। এছাড়া বালক বয়সেই দাদামশাইয়ের কণ্ঠে 'গীতা'র আবৃত্তি মুগ্ধ করেছিলো তাঁকে। শক্তির কবিতায় নাগরিক জীবনের নানা সংশয়, বিভ্রান্তি ও ভাঙচুরের মধ্যেও আস্তিকতা ও ঈশ্বরবোধের যে একটি ভিত্তিভূমির সন্ধান মেলে তার অন্তরালে তাঁর বাল্যকালের এই পরিমণ্ডলটি হয়তো অনেকাংশে দায়ী। শক্তির কবিতায় শব্দমনস্কতা, বিশেষত: তৎসম, অলঙ্কারমণ্ডিত, ঝঙ্কারময় শব্দসমূহের কুশলী প্রয়োগের আড়ালে তাঁর এই সংস্কৃত শিক্ষার অভিজ্ঞতা কাজ করেছিলো এমন ধারণা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। ধারাপাত ও উপক্রমণিকার প্রাথমিক পাঠ শেষে দশ বছরের বালক শক্তি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয়ে। এরও আগে ১৯৪০-এ বাবার মৃত্যুতে বালক শক্তির চোখে প্রথম ধরা পড়েছিলো মৃত্যুর এক অমোঘ, নির্মম দৃশ্য। তাঁর স্মৃতিচারণায় শক্তি সেই মৃত্যুবোধের কথা লিখেছিলেন—''বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না—শুধু যেখানে ঐ বড়ুর বিশ্বজাঙ্গালে তাকে পুড়িয়ে এসেছিলো এক শিশু—সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমি পার হতে পারিনি কোনোদিন'।[১২] শ্মশান, চিতাকাঠ, মানুষের অবশ্যম্ভাবী কৃষ্ণরূপ ও করাল পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছিলো যে বালক, উত্তরকালে তাঁর অসংখ্য কবিতায় শ্মশান, চিতা ও মৃত্যুর

প্রসঙ্গ ও চিত্রকল্প বারবার এসেছে। শক্তির স্বীকৃত প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'যম' প্রসঙ্গে তিনি নিজেই কৃষ্ণরূপময়ী মৃত্যুর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা লিখেছিলেন—'যম কালো, আমার প্রণয়িনী, তিনিও কালো। যম সকলের মৃত্যুর, আমার তিনি, আমার মৃত্যুর। এই ব্যাপার।'[১৩] মৃত্যুর এই কালো রূপের স্মৃতিকে আশ্রয় করেই আবার গড়ে উঠেছিলো শক্তির এক ঈশ্বরবোধ—'আমার নিজস্ব সেই ঈশ্বর আমার মৃত বাবার ঘোর কালো মূর্তি। জগন্নাথদেবের মতন অসহ্য সুন্দর তিনি। দুটি হাত কাঁধের কাছ থেকে পরিহার করা হয়েছে। দুটি চোখ দিগন্তবিস্তৃত। কাজ নেই। শুধু চোখ মেলে দেখা। তাঁরই নাম প্রকৃত অবলোকিতেশ্বর।'[১৪]

বাবার মৃত্যু ও দাদামশাইদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙেচুরে যাবার পর বালক শক্তি তার আট থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত ছিলো রেল লাইনের ধারে দাদামশাইয়ের নতুন বাড়ি 'মৃণালিনী কুটিরে'। আর্থিক দুঃসময় ও মানসিক বিপর্যয়ের সেই দিনগুলিতে দাদামশাই তাঁর স্নেহাবেষ্টনে ঘিরে রেখেছিলেন পিতৃহীন দৌহিত্রকে। ১৯৪৮-এ কলকাতা চলে যাবার আগে পর্যন্ত এই নতুন বাড়ির পরিবেশে বালক শক্তি কিভাবে বড়ো হয়েছিলেন একদিকে নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সাহচর্যে এবং অন্যদিকে দাদামশাইয়ের সংসার ও অদূরের রেলস্টেশনের কর্মব্যস্ত জীবনের প্রভাবে, তারই বৃত্তান্ত শক্তির আত্মজৈবনিক আখ্যান 'কুয়োতলা'-য় এক বালকের অন্তর্জীবনের ইতিহাস হিসেবে বিধৃত হয়েছে। এই সময়ে বালক শক্তি যেভাবে দেখেছিলেন তাঁর মাতামহকে, পারিবারিক শোক-দুঃখ-বিপর্যয়ের মধ্যেও এক 'চিরন্তন সন্ন্যাসী'রূপে, তা শক্তিকে দিয়েছিলো উদাসীনতার শিক্ষা। দাদামশাইয়ের স্নেহময় অভিভাবকত্বের মধ্যেও অন্তরের এক ভিন্নতর চেতনায় 'ক্রমাগতই বেঁকেচুরে' যাচ্ছিলো যে বালকটি, সে তার শৈশবের স্মৃতি থেকে তার দাদামশাই সম্পর্কে উদ্ধার করেছে এমন এক মূল্যবান উপলব্ধি যা তার নিজের জীবন ও রচনা সম্পর্কেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য—'সারাজীবনটাই মনে হয়, খুব একা ছিলেন তিনি। আমিও অজ্ঞাতে ঐ একা থাকার দীক্ষা নিয়ে থাকতে পারি।'[১৫]

দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর এবং ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জেরে বহড়ুর বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় পনেরো বছরের শক্তিকে চলে আসতে হয় কলকাতার বাগবাজারে ৬০ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে মাতুল ভবানী গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে, যেখানে থাকতেন তাঁর মা ও ছোট ভাই। পাড়াগাঁয়ের যে ছেলেটি 'রেললাইন ধরে ঝুলন্ত চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে' দৌড়তো, কিম্বা ভয় পেত যদি প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে সাঁতার কাটতে কাটতে ঠিক মাঝখানে কোনো এক ডুবো মন্দিরে পা লেগে তলিয়ে যায়, যে এক-আধবার দাদুর হাত ধরে শিয়ালদা স্টেশনে এবং সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি চেপে গিয়েছিলো মহানগরের অন্দরে, তার এবার স্থায়ী ঠিকানা হল 'হাঁ করে' থাকা বিশাল কলকাতা শহর, তাও আবার দাঙ্গা-পরবর্তী, সদ্য-স্বাধীন দেশের ক্ষুৎপীড়িত সময়কালে। এই কলকাতার সম্পর্কে শক্তির নিজেরই মন্তব্য, 'তার ক্ষিদে সাংঘাতিক'।[১৬]

বাগবাজারের মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন শক্তি ১৯৪৮-এ। এ যেন এক পুনরারম্ভ ; শক্তির স্বভাবসিদ্ধ মন্তব্যে—'এই কলকাতা যখন আমাকে খেলো তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। বাগবাজারের কাশিমবাজার পলিটেকনিক।'[১৭] গ্রামের বাড়িতে প্রাকৃতিক সংসর্গের নির্জনতায় এতগুলো বছর কাটিয়েছিলো যে বালক সে যেন সহসা নাগরিক জীবনের ভিড়ে এক স্বতন্ত্র জীবনযাপনের স্বাদ পেতে থাকলো। একা একা থাকা থেকে রেহাই

পেতে যেন অনেকের সঙ্গে জড়ানো। স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক হরিপদ কুশারীর প্রভাবে মার্কস্‌বাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন শক্তি এই অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায়। তাঁরই সাহায্যে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই শক্তি তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন, শোভাবাজার লোকাল কমিটিতে। এই সময় পার্টির তাত্ত্বিক আলোচনার ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ছিলো তাঁর ; শুনতেন জলি কাউল, মনিকুন্তলা সেন, সুনীল মুনশি, বিদ্যা মুনশি, রমেন ব্যানার্জি প্রমুখের আলোচনা। এই সময়ই গ্যালিফ স্ট্রিটে ট্রাম ডিপোর কর্মীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও নেমেছিলেন তিনি। এছাড়া হাতে-লেখা একটি পত্রিকা 'নবোদয়' বার করেছিলেন।[১৮] এককথায় এ ছিলো এক দ্রুত পটপরিবর্তনের সময়-সন্ধি। নবম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় ১৯৪৯-এ বাগবাজারের বাড়ির দোতলায় তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শক্তি শুরু করেছিলেন প্রগতি পাঠাগার। বার করেছিলেন হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রগতি', পরে যার নাম পাল্টে হলো 'নবোদয়'। এই সময়ই শক্তি প্রথম স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামটি ব্যবহার করেন।[১৯]

ছোটবেলা থেকেই শক্তি ছিলেন ভালো ছাত্র। লেখাপড়ায় ছিলো 'সমূহ টান'। শিক্ষকদের ভরসা ছিলো, মামারও আশা ছিলো, 'ছেলে বড়ো হবে, মাতব্বর হবে, বাড়ির নাম রাখবে'। কিন্তু কলকাতায় এক নিজস্ব জীবনযাপনের টানে ক্রমাগত যেন ভেসে যেতে থাকলেন। মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে গাঁটছড়া শিথিল হতে সময় লাগলো না। আরম্ভ হয়েছিলো যেমন সবেগে, বিচ্ছেদ হলো তেমনই দ্রুত। কবিতায় যেমন কোনো মতাদর্শ বা তত্ত্বকে সেভাবে কখনো আমল দিতে চান নি, জীবনেও তেমনি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অনুভবকে কোনো দল ও মতের আনুগত্য ও শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখার সহিষ্ণুতা তাঁর ছিলো না। নিজেকে কেমন যেন 'অসামাজিক' বলে মনে করতে শুরু করলেন ; ছাড়লেন কমিউনিস্ট পার্টি ; রাজনীতির নানা সঙ্কীর্ণতায় ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে না পেরে ছাড়লেন বিশ্বমানবকল্যাণের সুউচ্চ ব্রত। বয়ঃসন্ধির অতি গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে মার্কসবাদী রাজনৈতিক ভাবনা ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর স্বল্পমেয়াদী সংযোগ ও তা' থেকে সরে আসার এই ব্যাপারটি শক্তির কবিতার সামগ্রিক মূল্যায়নে একটি বিশেষ মাত্রা হিসেবে চিহ্নিত হবে। ১৯৫৫-তে তাঁর কলেজ জীবনের শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির যে সদস্যপদ তাঁর ছিলো, ক্রমেই অনিয়মিত জীবনযাপনের অস্থিরতায় যে রাজনীতি সম্পর্কে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বীতরাগ, সেই রাজনীতির সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক ছেদ ১৯৫৮-য়।[২০] এই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তার থেকে দূরত্ব শক্তির বহু কবিতাকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। এই সূত্রে কবির আত্মজৈবনিক রচনা থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে—"রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐ বয়সেই জড়িয়ে গেলাম। একা থাকার অপরূপ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই, মনে হয়। কিছু বুঝি না, কিচ্ছু জানি না। বোঝানো হলো, রাতারাতি স্বাধীন দেশ স্বাধীনতর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি—ধনী দরিদ্র থাকবে না, সম্পদের সমবণ্টন হবে। স্বর্গের একটা গোলকধাম-মার্কা ছবি আমাদের বালকদের স্বপ্নের দোর গোড়ায় লটকে দেওয়া হলো। বলছি না গুরুদেবরা ইচ্ছে করেই দিয়েছিলেন। ভুল বুঝে এমনটা বুঝিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের দোষ নেই। মনে হয় কিছুকাল স্বর্গ খুঁজতেই কাটলো—সেই সঙ্গে সামাজিক মানুষের গা ক্ষতবিক্ষত। ফেরার পথ থাকে না, তবু ফিরতে হলো। আবার সেই হলুদ পাকা কুঁচো-করা ঘাড় মুখ গুঁজে স্বার্থ গোছানো। ইস্কুল ডিঙিয়ে কলেজে।"[২১] 'স্বকাল'-এর জুন ১৯৮০ সংখ্যায় একটি ব্যক্তিগত নিবন্ধে এ বিষয়ে আরো বলেছিলেন :

"কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়েছি। ওঁরা খুব তেড়ে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন বলেই হয়তো বা। তাছাড়া তখন আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, আমি অসামাজিক। ফলত সমাজ নামক বিশ্বমানবকল্যাণের ধর্ম আমার দ্বারা হবে না। নোংরা রাজনীতিকে ঘেন্না করতে শিখেছিলাম।"

১৯৫১-তে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে শক্তি প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন মির্জাপুরের সিটি কলেজে কমার্স পড়বেন বলে। মাতুলের প্রতিশ্রুতি ছিলো যে তাঁর মুদ্রণ-ব্যবসায় হিসেবপত্র দেখাশোনার কাজ দেবেন তিনি শক্তিকে। মাস তিনেকের মধ্যে কমার্স পড়া ছেড়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ. ক্লাসে। আই. এ. পরীক্ষায় ভালো ফল করার সুবাদে পঁচিশ টাকা বৃত্তিও পান। অতঃপর অর্থনীতিতে সাম্মানিক পড়া স্থির হয় ; তাবপর ইংরেজি ও সবশেষে বাংলা অনার্সের ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা চলতে থাকে প্রেসিডেন্সিতে। কিন্তু অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে 'ডিসকলেজিয়েট' হয়ে আর বি. এ. পরীক্ষায় বসা হলো না।[২২] পরে কবি-অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ আগ্রহ ও আহ্বানে মাত্র এক সেমেস্টারের জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের শিক্ষার্থীরূপে যোগ দিয়েও শেষ পর্যন্ত সে পাঠক্রমও পরিত্যাগ করেন।[২৩] ছাত্র হিসেবে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন হলেও কোনো নির্দিষ্ট পঠন-পাঠন-শৃঙ্খলার মধ্যে ধাতস্থ হবার গরজ তাঁর মোটেই ছিলো না। যাদবপুরে নব-প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বুদ্ধদেব বসু স্কলারশিপের আশ্বাসসহ ডেকে নিয়েছিলেন শক্তিকে। স্যাক্সবি ফার্মারের চাকরি ছেড়ে শক্তি গিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের আমন্ত্রণে। পাঠক্রমে ছিলো ব্লেক, বোদলেয়ার, রিল্‌কে, ইয়েটস, কাফ্‌কা—কিন্তু যথাপূর্ব ভালো লাগলো না। ছেড়ে দিলেন প্রায় বিনা কারণেই। ১৯৬০-এ বহিরাগত (এক্‌স্‌টারনাল) পরীক্ষার্থী হিসেবে পাশ কোর্সে স্নাতক ডিগ্রিটি অর্জন করেছিলেন শক্তি। এ সবই যেন তাঁর প্রবাদপ্রতিম স্বেচ্ছাচারী জীবনের ইঙ্গিতবহ।

ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষায় ভালো ফল করার খুশিতে সবান্ধব ব্রিস্টল বারে মদ্যপান করেছিলেন শক্তি। এই মদ্যাসক্তিই চার দশকের বেশী সময় ধরে শক্তির কিংবদন্তি জীবনের কেন্দ্রীয় উদ্দীপনা তথা উপজীব্য যেন। তিনি বারবারই বলেছেন কিভাবে মদ্য তাঁকে টেনে এনেছে পদ্যের কাছে। তাঁর কবিতার ভাষাতে বলতে গেলে এই 'গরল'ই ক্রমে ক্রমে তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে 'প্রকৃত পানীয়' ; তাঁকে অভ্যস্ত করে তুলেছে মধ্যবিত্তের যাবতীয় ব্যাকরণ-ভণ্ডুল করা এক লাগামছাড়া জীবনযাপনে। এই বোহেমিয়ানা, স্বেচ্ছাচারিতা বাদ দিয়ে শক্তির কবিতার কোনো সমীক্ষা তাই সম্ভবপর নয়।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢোকার পর থেকেই (১৯৫১-৫২) শক্তির গদ্য ও পদ্য লেখালিখির সূত্রপাত। এই সময় বাগবাজারের গোপীমোহন দত্ত লেনের বহ্নিশিখা সঙ্ঘের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো 'বহ্নিশিখা' নামে একটি পত্রিকা, ছাপা হয়েছিলো তাঁর মাতুলের লরেল প্রেস থেকে, যার আট সদস্যের পরিচালন-সমিতির অন্যতম ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এই পত্রিকার ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৫১)-য় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বনামে একটি কবিতা 'অস্ফুট যৌবনাকে' ও স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দরের ছদ্মনামে অন্য একটি কবিতা 'পথের ধারের কোন মেয়েকে' মুদ্রিত হয়েছিলো। এই স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামে কিছু গদ্যও লিখেছিলেন শক্তি। যদিও শক্তি নিজে একাধিকবার বলেছেন যে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যম' শীর্ষক সনেটটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা, দেখা যাচ্ছে যে চৈত্র, ১৩৬২-তে প্রকাশিত ঐ কবিতাটিরও বেশ কিছুদিন আগে কবিতা রচনায় তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু

করেছিলেন।[২৪] তবে 'বহ্নিশিখা' পর্বের রচনাগুলির কথা তিনি যে উল্লেখ করেননি, তা কি নিছক স্মৃতিবিভ্রমের কারণে, নাকি সদ্য-কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়ঃক্রমের এই হাত-পাকানোর লেখাগুলিকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন? 'দেশ' পত্রিকার ৯ সেপ্টেম্বর '৯৫ সংখ্যায় জনৈক পত্রলেখকের লেখা চিঠি ও তাতে ছাপা দুটি কবিতা (**বিশাখাপত্তন্ আর নাবিকের নীল চোখ এবং চিঠি পেতে ভাল লাগে**) থেকে জানা যাচ্ছে যে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত 'ঐকতান' পত্রিকার ১ম ও ৫ম সংকলনে (১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালে) শক্তির কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের জানা ছিলো যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখকজীবন শুরু করেছিলেন গদ্যকার হিসেবে এবং তাঁর কবিতা লেখার সিদ্ধান্ত নিছকই অকস্মাৎ, কোন একটি আড্ডায় একটি বিতর্কে উত্তেজিত হয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ষষ্ঠ সংকলনে (১৩৬২) স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামে শক্তি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বর্গী এলো দেশে' নামে একটি ছড়ার বইয়ের সমালোচনা লেখেন। সেই সমালোচনার সূত্রে বিতর্ক দেখা দিলে জেদের বশে তিনি লিখে ফেলেন 'যম'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় সেটি ছাপতে স্বীকৃত হওয়ায় সেই উত্তেজনায় লেখা হয় 'সুবর্ণরেখার জন্ম' আর 'জরাসন্ধ'।[২৫] শক্তির নিজের স্মৃতিলিখনকে প্রামাণিক বলে ধরলে এবং শক্তির বেহিসেবী জীবনের নাটকীয় বর্ণাঢ্যতার কথা ভাবলে, তাঁর কবিতার এমন আকস্মিক জন্মই বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তাঁর 'বহ্নিশিখা' পর্বের বিস্মৃতপ্রায় রচনাগুলি তেমন আকস্মিকতার রহস্যকে যেন নাকচ করে দেয়। মনে হয়, অন্যান্য অনেক কবিদের মতো শক্তিও তাঁর কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সে কবিতা লেখার প্রয়াসে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন।

শক্তির স্মৃতিলিখনে আছে এই স্বীকারোক্তি—'প্রেসিডেন্‌সি কলেজের দিনগুলো স্মৃতি থেকে সরানো যায় না, কিছুতেই।'[২৬] যে আড্ডা-বন্ধুত্ব-সাহচর্যকে আশ্রয় করে শক্তি ও পঞ্চাশ দশকের অন্যান্য কবি-লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের সৃজনভূমিটি আলোড়িত করে তুলেছিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান সেক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় ছিলো না। ভালো ছাত্র হিসেবে অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার গড়ে তোলার বদলে শক্তির সময় কাটতো রাজনীতিতে, আড্ডায়, গদ্যলেখায়—"তখন নামকোয়াস্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলেজ থেকে কলেজের বাইরে ঘোরাফেরাই অধিক। ছাত্র মন্দ ছিলাম না, আজ মনে পড়ে, কিন্তু ছাত্রগত গুণ আমার শেষ দিকে ঘুচে এসেছিলো। তাও কম্‌লি ছাড়ে নি, পরীক্ষা দিতে বসেছি, উঠে এসেছি, বাড়ী থেকে পালিয়ে লুকিয়ে থেকেছি।"[২৭] এই সময়পর্বে তাঁর সহপাঠী ও সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন শিশির দাস, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রমে সে বৃত্তটি আরো বড়ো হতে হতে দীপক মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। এই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীনই শক্তি নির্বাচিত হয়েছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক পদে। নিয়মিত ক্লাস করার পরিবর্তে তাঁর সময় কাটতো অনিশ্চিতভাবে, কমিউনিস্ট পার্টির কাজে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে, যুব উৎসবে, বসন্ত কেবিন, দেশবন্ধু পার্ক কিম্বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৃন্দাবন পাল লেনের বাসার আড্ডায়। কবিতার প্রতি ভালোবাসা ও কৌতূহল জাগ্রত হতে শুরু করেছিলো এই সময়েই। পড়েছিলেন প্রিয় কবি রিল্‌কের 'ডুইনো এলেজিস' ও 'দি রিমেন্‌স অব কাউন্ট সি. ডবলু'। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর প্রজন্মের সৃজনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুটি ছিলো প্রবাদপ্রতিম 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা, যার আত্মপ্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬০-এ। 'কৃত্তিবাস'-এর আবির্ভাবলগ্নে শক্তি তরুণ কবিদের এই উদ্যমের সহযাত্রী ছিলেন

না। তখন সম্ভবত শক্তির অভিপ্রায় ছিলো গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার নাম নিয়ে গদ্য লেখার প্রাথমিক পর্বে তখন শক্তি মশগুল। 'কুয়োতলা' নামে লিখলেন একটি ছোটগল্প। ভাইজাগের ডলফিন নোজের ওপর একটি গল্প লিখেছিলেন ছদ্মনামে, আনন্দবাজার পত্রিকায়। অবশ্য অচিরেই 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো ; লিখতে শুরু করেছিলেন টুকরো গদ্য। মোটামুটি এই সময় থেকেই (১৯৫৬-৫৭) দু-চার পাতা করে লিখছিলেন তাঁর 'পাড়াগাঁর স্মৃতি' নিয়ে এক আত্মজৈবনিক উপন্যাসধর্মী আখ্যান, *কুয়োতলা*[২৮], যেটি তাঁর ঐ নামেরই ছোটগল্পের এক পরিবর্ধিত রূপ ; প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬১-তে। ততদিনে অবশ্য বেরিয়ে গেছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*। আর ততদিনে গদ্যলেখক হিসেবে খ্যাতিলাভের প্রত্যাশা ছেড়ে শক্তি আত্মসমর্পণ করেছেন কবিতার কাছে এক নিরঙ্কুশ ভালোবাসায়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের সূত্রপাত ১৯৫৬-য়[২৯], স্যাক্স্‌বি ফার্মার কোম্পানির শিক্ষানবীশ রূপে। মা ও ভাইয়ের সঙ্গে চলে এসেছিলেন উল্টোডাঙ্গার অধর দাস লেনের দরিদ্রপল্লীতে। কিন্তু চাকরিতে তাঁর মন বসছিলো না, প্রায়ই আপন খেয়ালে উধাও হয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতার বাইরে। অচিরেই পাট চোকালেন কোম্পানির চাকরির ; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায়—'স্যাকসবি ফারমার না ঐ ধরনের কী যেন একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিল শক্তি, ধার করা প্যান্ট-কোট পরে অফিস যাওয়া-আসা শুরু করেছিল সবে মাত্র, একদিন সে সেই পোশাক খুলে ফেলে বলল, দূর ছাই! আমাদের মধ্যে শক্তিই প্রথম বা একমাত্র পোশাক খুলেছে।'[৩০] ছকে-বাঁধা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে অগ্রাহ্য করে এক বাধা-বন্ধন-অনুশাসন মুক্ত সদা-ভ্রাম্যমাণ জীবনের পথে চলতে চেয়েছিলেন শক্তি আমৃত্যু। 'দূর ছাই' বলে পোশাক খুলে ফেলা তারই সংকেত।

এই সময়ই ৪ নং অধর দাস লেনের 'বস্তির মতন ঘরে', হ্যারিকেনের আলোয় শেষ করেছিলেন 'কুয়োতলা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। উল্টোডাঙার বিজলিবাতিহীন একটি ঘরে অন্ধকারে বসে আত্মজৈবনিক আখ্যান রচনার এই মানসিকতা সম্বন্ধে শক্তির নিজের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উন্মোচক— 'এক ধরনের অন্ধকার আমায় নিজের মধ্যে ডুবতে সাহায্য করে সব সময়। আলোর মধ্যে আমার অস্বস্তি হয়। একটু কালো করে নিতে হয়।'[৩১] মাঝে মাঝে যেতেন বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবনের সান্ধ্য আড্ডায়। তাঁরই আমন্ত্রণে পড়তে গেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। প্রেসিডেন্সির মতো সেখানকার পড়াশোনাও মাঝপথে পরিত্যক্ত হলো। অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন— '... পড়াশুনো করে, ডিগ্রি তকমা ছিনিয়ে নিয়ে আমার কিছু হবার নয়'।[৩২] কবিতা লেখা, আড্ডা ও মদ্যপান, এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো পাহাড় জঙ্গলে, এসবই ছিলো শক্তির এই সময়কার দিনলিপি। তার বহুখ্যাত চাইবাসা পর্ব, যা তাঁর কবিতারও একটি স্মরণীয় মাইল-ফলক, তার আরম্ভ মোটামুটি এই পঞ্চাশ দশকের শেষেই। ১৯৫৯-এর শেষে শক্তির চাইবাসা পর্বের শুরু। এক দূরপাল্লার ট্রেনে সদ্য-পরিচিত সমীর রায়চৌধুরীর সহযাত্রী হয়েছিলেন শক্তি। পরে শক্তির সন্ধানে চাইবাসায় হাজির হয়েছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যেখানে শক্তি আশ্রয় নিয়েছিলেন সমীরের 'খাপরা-চালের বাসাবাড়ি'তে। শক্তি ও তাঁর বান্ধবদের রোমাঞ্চকর এই জীবনপর্ব নিয়ে সন্দীপন লিখেছিলেন 'জঙ্গলের দিনরাত্রি।'[৩৩] সুনীলের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তেও চার উদভ্রান্ত যুবকের এলোমেলো দিনযাপনের কথা এসেছিলো। পাটনার ছেলে সমীর রায়চৌধুরী ছিলেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু। দেশবন্ধু পার্কের আড্ডায় শক্তির পরিচয় হয়েছিলো সমীরের সঙ্গে। সে ছিলো চাইবাসায় কর্মরত ; ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ ফিশারিজ (*সূত্র : সন্দীপনের জঙ্গলের দিনরাত্রি*)। প্রেম ও প্রকৃতির যুগল বন্ধনে এক উদভ্রান্ত বিষণ্নতায় এই সময় থেকেই চাইবাসা, হেসাডি, ডাল্টনগঞ্জে শক্তি ও তাঁর বান্ধবদের যে আশ্চর্য অনির্দেশ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা তাই জড়িয়ে ছিলো তাঁর কবিতার অজস্র অনুপম চলচ্ছবির অন্তরালে। শক্তির আত্মকথনে পাই : "এই চাইবাসা আর তার চতুস্পার্শ্ব নিয়ে আমার নিজের অনেকানেক পদ্য আছে। বস্তুত প্রথম পদ্যের বই হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য থেকে যার শুরু, এখনো তার শেষ হয়নি। এই কিছুদিন আগে, সতেরো বছর পরে হঠাৎ আমার প্রিয় শহর চাইবাসায় পৌঁছে যাই।"[৩৪] অন্যত্র একটি স্মরণিকায় রয়েছে এরই সমর্থন : '... চাইবাসা শক্তির উন্মেষভূমি। পাথরের বুকে যে শৈবাল থেকে শক্তির বুকের মধ্যে কবিতার উন্মেষ সেই শৈবাল পাহাড়ের জায়গীরদার ছিল তখন সমীর রায়চৌধুরী ..'[৩৫]

১৯৬১-তে শক্তি যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা শহরতলীর হিন্দুস্থান মোটরস-এর কারখানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্টস্ ম্যানেজারের যথেষ্ট লোভনীয় পদে। সে ছিলো বেশ ভারী চাকরি, বেশ কেতাদুরস্ত সাহেবি ব্যাপার। শক্তির নিজের কথাতে— 'গেটের কাছে পৌঁছে পকেট থেকে টপাস করে একটা রংচঙে কণ্ঠলেংটি বের করে গলায় বাঁধা। দম বন্ধ হতে-হতে কাজ। স্টেনোকে ডিকটেশান দেওয়া! ... দামী কাজ। হারালে বিপদ। তাই মুখ বুঁজে গলবস্ত্র হওয়া, আবার গেট থেকে বেরিয়ে সটান পকেটে। এইভাবে চলছিলো তো। ... চলে যাচ্ছিলো। কোম্পানির ক্যান্টিনে চার দফার লাঞ্চ। ভোর সাতটায় বাড়ি থেকে বেরুই, রাত নটা নাগাদ অপিস থেকে ছুটি। তারপর ডাইনে-বাঁয়ে করে রাত দুপুরে বাড়ি। উল্টোডাঙার কাঠের টলমলে ব্রিজ।'[৩৬] এই সুশৃঙ্খল সময়শাসিত স্বচ্ছল শ্রমে শক্তির পক্ষে যথারীতি আটকে পড়া সম্ভব হয় নি। কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার সময় কাঠের ব্রিজের ওপর তিনি দেখতেন ঠিক তাঁরই মতো এক নিষ্কর্মা শিয়রচাঁদা পাগলকে যার নির্জন আলস্য তাঁকে আক্রমণ করতো। মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি বছর দেড়েকের মাথায়।

কবিতা রচনার প্রাথমিক পর্বে শক্তি তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন সদ্যপ্রয়াত কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি। স্বীকার করেছিলেন আনন্দ বাগচীর কাছ থেকে পাওয়া কবিতায় 'ছবি গঠনের ব্যাপারে আধুনিক রোমান্টিকতার শিক্ষা অথবা আধুনিক কবিতার ওজন'। প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়র সতীর্থ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা থেকে 'ছন্দ, বাক্-চাতুর্য ও আপাততরল বাংলাভাষা' শিক্ষার বিষয়েও তিনি ছিলেন অকপট।[৩৭] এইসব স্বীকারোক্তি, অগ্রজ কবিদের কাছ থেকে ঐতিহ্যের এই স্বীকরণ সম্পর্কে শক্তি-সুহৃদ সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—'সচেতনভাবে শক্তি যদি বলে থাকে সে আনন্দ কি অলোকরঞ্জনের কাছে অনেক কিছু শিখেছে, শিখেছে জীবনানন্দের কাছে, তবে সে প্রভাব বিপরীতের সঙ্গে বিপরীতের প্রভাব। সংস্কৃত ও ইংরিজির মাধ্যমে কতো কবিকে যে সে আত্মসাৎ করেছে তার ঠিক নেই, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠাবান অনুবাদক কখনোই নয় সে, সে-সবই রূপান্তর, তার নিজেরই শব্দজাদুতে সেখানে সব সময়ই সে উপস্থিত।'[৩৮]

১৯৬২-তে কলকাতায় এসেছিলেন আমেরিকার 'বিট' কবি অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ ও তাঁর সমকামী বন্ধু পিটার অরলোভস্কি। 'কৃত্তিবাস'-এর তরুণ ও বোহেমিয়ান কবিদের সঙ্গে

গিন্‌স্‌বার্গ-অরলোভস্কির সাহচর্যে সূচিত হয়েছিলো 'হাংরি জেনারেশন' নামে এক প্রথাবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলন। তাঁদের বেপরোয়া ও উন্মত্ত জীবনযাপনের প্রভাবে গিন্‌স্‌বার্গ-অরলোভস্কি 'কৃত্তিবাসী' কবিদের যার-পর-নাই প্রভাবিত করলেন। হাংরি আন্দোলনের দুই প্রধান পাণ্ডা মলয় ও সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে অন্যান্যদের পাশাপাশি শক্তিও চলে এলেন এই নতুন কবিসম্প্রদায়ের 'সর্বগ্রাসী ক্ষুধার' উচ্চনাদে। 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলনের এই সূচনাপর্বে শক্তির সহযোগী ছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও উৎপল কুমার বসু। অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' পত্রিকাতে এই বছরই প্রকাশিত দুটি সনেট ('ক্ষুৎকাতর, যৌনকাতর নয়') হাংরি আন্দোলনে শক্তির সক্রিয় ভূমিকার সাক্ষ্য বহন করেছিলো। লিখেছিলেন হাংরি প্রজন্ম নিয়ে একটি ঝাঁঝালো গদ্য। হাংরি-আন্দোলন অবশ্য ছিলো নেহাতই স্বল্পায়ু; অশ্লীলতার অভিযোগে সমীর ও মলয় রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার হন ; বছর দুয়েকের মধ্যেই এ আলোড়ন ক্রমে স্তিমিত হয়ে যায়। শক্তিও এ আন্দোলন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

১৯৬২-৬৩ সালে শক্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ এলোমেলো জীবনচর্যা ও জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে খুলেছিলেন টিউটোরিয়াল হোম, বিজ্ঞাপন সংস্থায় করেছিলেন ফ্রি-ল্যান্স কাজ, পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরেছিলেন নিবিড় ভালোবাসার টানে। সহচর কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ ছিলো শক্তি, সুনীল, দীপক মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 'কৃত্তিবাসী'দের বাউণ্ডুলে জীবনের বোহেমিয়ানার সর্বাধিক স্মরণযোগ্য কালপর্ব।[৩৯] বন্ধু চিত্রশিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে শক্তি একটি টিউটোরিয়াল হোম খুলেছিলেন এবং শিক্ষক হিসেবে কদরও হয়েছিলো তাঁর। ১৯৫৯-এ ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমের হ্যারিসন রোড শাখায় ইংরেজির শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন শক্তি। ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রিয় 'এস-সি' বেশ কিছুদিন টিউটোরিয়ালেরই একটি ঘরে তক্তপোষে রাত কাটাতেন। ফ্রি-ল্যান্স কপি-রাইটারের কাজও করেছিলেন ক্ল্যারিয়ন বিজ্ঞাপন সংস্থায়। কোনো একটি কাজেও যথারীতি স্থির থাকতে পারেননি। মদ্য, পদ্য, অরণ্য-পাহাড়ের দুর্মর আকর্ষণে তাড়িত হয়েছেন। কোনো বিশেষ দায়-দায়িত্ব, নিয়ম-নীতির ঘেরাটোপে কখনো স্বস্তি পান নি।

হঠাৎ হঠাৎ বিনা নোটিসে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, ঘুরে বেড়ানো পাহাড়ে-জঙ্গলে, মদ্য ও পদ্যের এক চাঞ্চল্যকর স্বেচ্ছাচারিতা সেই চাইবাসা পর্ব থেকে শক্তির জীবন ও সৃজনকর্মের সঙ্গে ওতোপ্রোতো। চাইবাসার মতো তাঁর জীবনবৃত্তান্তের আর এক উল্লেখযোগ্য কালপর্ব ষাট দশকের গোড়া থেকে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং সহ পাহাড়-নদী-অরণ্যময় উত্তরবঙ্গ চষে বেড়ানো। 'সব পেয়ে সব হারানোর ভালোবাসা' ছিলো চাইবাসা ; নাগরিক গার্হস্থ্য ছেড়ে প্রকৃতির সঙ্গে সুনিবিড় এক হঠকারী স্বতঃস্ফূর্ততায় দিনযাপন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়-নদীর আমন্ত্রণ ছিলো তারই এক সম্প্রসারিত রূপ। জলপাইগুড়িতে বন্ধু অধ্যাপক অমিতাভ দাশগুপ্তর বাড়িতে আর দার্জিলিংয়ে প্রেসিডেন্সির সহপাঠী নিত্যপ্রিয় ঘোষের আশ্রয়ে ছিলেন শক্তি। জলপাইগুড়িতে অমিতাভর কাঠের ঘরে বসে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন শক্তি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এখানেই একদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা বসে লিখে ফেলেছিলেন তাঁর উত্তরবঙ্গ পর্যটনের এলোমেলো সুখ-দুঃখ অভিজ্ঞতা নিয়ে এক দীর্ঘ কবিতা **অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে**। অনর্গল কবিতা লেখা ও হৈ-হৈ করে চষে ফেলা সমগ্র ডুয়ার্স, চাইবাসার পর জলপাইগুড়ি ছিলো শক্তির প্রমত্ত জীবনচর্যার আর এক মাইল ফলক।[৪০] যেখানেই পাহাড়-টিলা কিম্বা নদী-সমুদ্র-অরণ্য সেখানেই

পড়েছে শক্তির পদচ্ছাপ—জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সের কথা আছে অমিতাভ দাশগুপ্তর লেখায়।[৪১] দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন শক্তি লিখতেন গদ্য; রূপচাঁদ পক্ষী ছদ্মনামে ভ্রমণকাহিনী ; সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায়, পনের-কুড়ি টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।

শক্তির প্রথম কবিতার বই *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* প্রকাশিত হয়েছিলো 'গ্রন্থজগৎ' থেকে (ফাল্গুন, ১৩৬৭), দেবকুমার বসুর সস্নেহ আগ্রহে। দেবকুমারের সঙ্গে শক্তির আলাপ হয় ১৯৫৫-য়। এর প্রায় বছর দুয়েক বাদে শক্তি তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন দেবকুমারকে। প্রথমে বইয়ের নাম ভাবা হয়েছিলো 'নিকষিত হেম' ; পরে বদলে রাখা হলো 'কেলাসিত স্ফটিক'; সবশেষে বর্তমান শিরোনাম 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'। শক্তির স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালিপনা, লুকোচুরি, নানা কাটাকুটির কারণে বহু বিলম্বিত হয়েছিলো তাঁর প্রথম বইয়ের প্রকাশ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে অশুদ্ধি সংশোধন অংশে একটি পাদটীকায় শক্তি নিজের কবিতাকে প্রথম 'পদ্য' আখ্যা দিয়েছিলেন—"খেলনা-নাম্নী পদ্যের 'কি নীল খোলে না যার'-এর জায়গায় 'কি নীল খোলে না দ্বার' হবে।" 'বীক্ষণ' প্রকাশভবন থেকে বেরিয়েছিলো শক্তির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* (আশ্বিন ১৩৭২, অক্টোবর ১৯৬৫)। 'কৃত্তিবাস'-এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মৃণাল দেব ছিলেন 'বীক্ষণ'-এর কর্ণধার। এখান থেকেই ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে প্রকাশিত হলো শক্তির পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় এক ফর্মার কবিতার কাগজ, 'কবিতা সাপ্তাহিকী', দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের চিত্রিত প্রচ্ছদে। শুধু কবিতা ও কবিতার আলোচনা নিয়ে যে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করা সম্ভব এমন প্রত্যয় শক্তির ছিলো ষাট দশকের আলোড়িত সময়পর্বে। এখানেও তিনি একক ও অনন্য। এপ্রিল ১৯৬৬ পর্যন্ত এই সাপ্তাহিকীর পনোরোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬৭-র ১৫ই আগস্ট শক্তি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শ্রীমতী মীনাক্ষী বিশ্বাসের সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী মীনাক্ষীর সঙ্গে শক্তির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শক্তির বন্ধু, এবং মীনাক্ষীরও, রুচিরা শ্যাম ; কফি হাউসের টেবিলে, বিয়ের প্রায় বছর তিনেক আগে। মীনাক্ষী, রুচিরা ও তাদের কয়েকজন বান্ধবী 'সখী সংবাদ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; সেই সূত্রেই এই আলাপ। অবশ্য এর আগেই 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের সম্পর্কে, বিশেষত 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'র কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে, মীনাক্ষীর ঔৎসুক্য ছিলো যথেষ্টই। ষাট দশকের মধ্যযামে, জঙ্গল-পাহাড়-নৈশ কলকাতা তল্লাস করে বেড়ানো তরুণ প্রমত্ত কবিকূলশিরোমণি শক্তি তখন এক আশ্চর্য রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব। শক্তি-মীনাক্ষীর এই পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, মেলামেশা, ঘোরাফেরা—সার্কুলার রোডের কবরখানায়, কেঁদুলির বাউল-মেলায় কিম্বা ডায়মণ্ডহার্বারে, বেশিরভাগ সময়ই অনেকে মিলে দলবেঁধে। ইতোমধ্যে শক্তি তাঁর ছদ্মনামে রচিত ও প্রকাশিত *লুসি আর্মানীর হৃদয়রহস্য* নামের বইটি মীনাক্ষীকে উৎসর্গ করেছিলেন 'যার মুখের কথায় এই পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছি সেই মুখরা মীনাক্ষী বিশ্বাসের করকমলে।'[৪২] অবশেষে আইনমোতাবেক বিয়ে, রেজিস্ট্রি করে। মাস দেড়েক বাদে, ১৯৬৭-রই ৪ঠা অক্টোবর, হলো সামাজিক বা আনুষ্ঠানিক বিয়ে। তাতে সম্প্রদান হয়নি ; তবে শক্তির অনুরোধমতো রুচিরা চতুর্থী হোম ও সপ্তপদীগমনের সময় বিয়ের মন্ত্রগুলি বাংলায় তর্জমা করে দিয়েছিলেন যাতে সেগুলি মীনাক্ষী বুঝতে পারে ও গাঁথা হয়ে যায় তার মনে।[৪৩]

প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের কবি, ধর্ম ও জিরাফ, আসক্তি ও বৈরাগ্য দুদিকেই থাকা কবি ও কাঙাল শক্তি এভাবেই প্রবেশ করেছিলেন সংসার-গার্হস্থ্যে। জীবন ও জীবিকার নানা ভাঙচুর ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৫ বেঁচে থেকেছে শক্তি, মীনাক্ষী ও তাদের দুই সন্তানের সংসার। কবিতা-পাগল ও জীবনযাপনে আপাদমস্তক বোহেমিয়ান, 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা'র মাত্রাছাড়া বাউণ্ডুলেপনা সত্ত্বেও মীনাক্ষী তাঁর নিবিড় ভালোবাসা ও মমত্বে রক্ষা করেছেন তাঁর স্বামী, পুত্র-কন্যা, গার্হস্থ্যকে। স্বামী ও পিতার ভূমিকায় কর্তব্যপালনে অনেক সময় সচেতন না থাকলেও, মদ্য-পদ্য-পর্যটনের নেশায় মাতাল স্বেচ্ছাচারিতায় পারিবারিক দায়িত্বে অমনোযোগী হলেও, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসায় শক্তি কখনো স্বেচ্ছায় কোনো ফাঁক রাখেননি। একটি চিঠিতে রুচিরাকে বলেছিলেন হঠাৎ 'ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাবার লোভ'-এর কথা। তাঁর সংশয় ছিলো 'এভাবে সহজ মানুষের মতন ঘরসংসার' করতে পারবেন কিনা[৪৪], কিন্তু মীনাক্ষীর 'লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত' মুখখানি দেখে ষাট দশকের সেই আত্মহাহাকার ও অস্থিরতার মধ্যেও তিনি সংবরণ করতে পারেন নি ভালোবাসার লোভ, যে লোভ শক্তির কবিতায় এক করুণ, সুন্দর, রোমাঞ্চকর আকুতি হয়ে বেজেছে সর্বদা : 'ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো'। শক্তি-মীনাক্ষীর ভালোবাসা ও দাম্পত্য, তাঁদের ছেলে ও মেয়ে তাতার আর বাবুইয়ের কথা শক্তির বহু কবিতার আড়ালে উঁকি মেরে গেছে। স্বভাবের এক নিহিত অস্থিরতায় যন্ত্রণা পেয়েছেন ও দিয়েছেন, ব্যক্ত করেছেন আক্ষেপ ও আর্তি ; তবু দাম্পত্য-নির্ভরতা ও অপত্যস্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে, লণ্ডভণ্ড করে, চলে যেতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে আনন্দ বাগচীর মন্তব্য বিশেষ প্রাসঙ্গিক :

"... এখানে ভয়হীন ভারহীন এক ভালোবাসার কথাও বলতে হয়। তার কথা, যার হাতে তাল তালফেরতা। যে কোথাও থিতু হতে জানে না, নোঙর মানে না, তারও বুঝি শেকড় চাই। কচুরি পানার মতো ভাসমান শেকড়। মীনাক্ষীর সংসার ছিল তার বারে বারে ফিরে আসার ঘর। নিশ্চিন্ত, অকপট, অকপাটি। অনেক ঝুঁকি নিয়েই তাকে তরে বর্তে দিয়েছিল মীনাক্ষী। বাইরের জগতের সঙ্গে ভেতরের সমতা এনে দিয়েছিল। শক্তিকে ভাসিয়ে রেখেছিল, ভেসে যেতে দেয়নি।"[৪৫] যে মৃত্যুকে যৌবনে খেলাচ্ছলে স্মরণ করেছেন বারবার, সেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে হতে তাকে সরিয়ে রাখতে, ফিরিয়ে দিতে, চেয়েছেন। 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো' খাবার ইচ্ছা উদ্বেল করেছে তাঁকে।

মীনাক্ষীকে বিয়ে করার সময় শক্তি অধর দাস লেনের বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন বেহালার ব্রাহ্ম সমাজ রোডের বাড়িতে। গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে আসা এবং ঘন ঘন বাসা বদল, উত্তর থেকে দক্ষিণে, এও যেন সেই বদলে যাওয়া, চলতে থাকা। আরো অনেক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের মতো এই বাসাবদলের প্রসঙ্গটিও শক্তির বিভিন্ন সময়ের কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। 'গ্রন্থজগৎ' থেকে ১৩৭৩-এর আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়েছিলো *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে*। পরের বছর একই সময় বেরোলো *সোনার মাছি খুন করেছি*। প্রকাশক ছিলো 'ভারবি'। এই প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শক্তির কবিতার বই প্রকাশিত হলো। উল্লেখযোগ্য যে এই বইটির কবিতাগুলি বাছাই করা ও এর নামকরণ, দুটি দায়িত্বই পালন করেছিলেন শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়। ভারবি প্রকাশনে কাজ করার সূত্রে শক্তি একটি মূল্যবান উদ্যোগ নিয়েছিলেন—বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র একটি সিরিজ বার করার।

গ্রাহক হলে কিস্তিতে কেনা যাবে এমন শর্তে বিশিষ্ট কবিদের রচনাকে আরো বেশী করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এ কাজে শক্তি ছিলেন, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই পথিকৃৎ।

১৯৭০-এ শক্তি চট্টোপাধ্যায় যোগ দিলেন আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীতে। অনেক চাকরি ছেড়ে, কখনো আংশিক কখনো পূর্ণ বেকারত্বের দীর্ঘ সময়পর্ব শেষে, শক্তি প্রবেশ করলেন তাঁর প্রায় পঁচিশ বছরের, দীর্ঘতম কর্মজীবনে। আচার-ব্যবহার-ভাবনায় যে শক্তি ও তাঁর কৃত্তিবাসী বন্ধুরা সামাজিক যাবতীয় নিয়ম, নীতি, অনুশাসন লঙ্ঘন করে এক অতি-বিতর্কিত 'অ্যান্টি এস্ট্যাবলিশমেন্ট' ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা সকলেই প্রায় প্রবিষ্ট হলেন এই মহানগরের সর্বাধিক প্রভাবশালী সংবাদ ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানে। 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর বহু উদীয়মান কবি-লেখকদের মতোই শক্তিকে আনন্দবাজারে ঢোকানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ।

কবি ও লেখকরূপে উপার্জনের স্থায়িত্ব পেয়েছিলেন শক্তি এই আনন্দবাজারে। এই পত্রিকারই রবিবাসরীয় বিভাগে ছাপা 'বিশাখাপত্তনের রাওসাহেব' গল্পের জন্য পনেরো টাকা সম্মানদক্ষিণা পেয়েছিলেন শক্তি, সম্ভবত ১৯৫৫ সালে। সেই প্রথম লেখার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া। এর দু'বছর বাদে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর কবিতা 'পারিপার্শ্বিক' ছাপা হলে পেয়েছিলেন দশ টাকা। কবিতা লিখে তাঁর প্রথম দক্ষিণা পাওয়া। আনন্দবাজারে চাকরিতে প্রবেশের বছরেই (১৯৭০) শক্তি পেলেন পিতৃত্বের স্বাদ। কন্যা তিতির জন্ম ঐ বছরে। বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় বিয়ের পরে মীনাক্ষীকে নিয়ে জলপাইগুড়িতে আমিতাভর বাড়িতে গিয়েছিলেন শক্তি। সেখান থেকেই মীনাক্ষীকে নিয়ে একদিন দুপুরে শক্তি ভুটানে গিয়েছিলেন তিতি নদী দেখাতে। এই নদীর নামেই পরে মেয়ে বাবুইয়ের ভালো নাম দিয়েছিলেন তিতি।[৪৬] বন্ধু শান্তি লাহিড়ীর একটি লেখা থেকে জানা যায় যে এর আগের বছরই একটি 'ভ্রূণ নিকাশের দায়িত্বকে ও শিশুহত্যার দায় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল'।[৪৭] সেই দুঃখ থেকেই মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করত ; কখনো বা কান্নায় ভেঙে পড়ত শক্তি। বিবাহিত জীবনে ভ্রূণ নিষ্কাষণ নিছকই সাধারণ ঘটনা হলেও শক্তির এই আচরণ থেকে অনুমান করা যায় আবেগপ্রবণ শক্তির ভেতরে কিছু পুরোনো মূল্যবোধ ছিলো অত্যন্ত প্রবল। এই যন্ত্রণাঘন সংবেদন, এক ধরনের প্রাচীনত্ব, শক্তির কবিতাতেও বারবার আরোপ করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

এই মহানগরীর তথা বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার সূত্রে আনন্দবাজার-দেশ-আনন্দমেলার পাতায় প্রায় নিয়মিত কবিতা, ছড়া, ভ্রমণকাহিনী ও টুকরো গদ্য লিখেছিলেন শক্তি ; বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কারও তাঁকে দিয়েছিলো প্রতিষ্ঠা ও কৌলীন্য—১৯৭২-এ ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, ১৯৭৫-এ সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার, ১৯৮৩ তে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৯৪ সালে সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গঙ্গাধর মেহের পুরস্কার। আনন্দবাজারে তাঁর অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে অফিসের কাজে শক্তির মন ছিলো না এমন ধারণা ঠিক নয়। শ্রীচৌধুরী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 'সাপ্তাহিক আনন্দমেলা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে শক্তির মুনশিয়ানার কথা। অফিসে আসা যাওয়ার ব্যাপারে সময়নিষ্ঠ ছিলেন না শক্তি, কিন্তু তাঁর নির্দিষ্ট কাজ দ্রুত ও চমকপ্রদ দক্ষতায় শেষ করতে পারতেন।[৪৮] এরই পাশাপাশি শক্তির অপর এক সহকর্মী শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ভিন্ন মন্তব্য করেছেন—'আমরা

একসময় একসঙ্গে আনন্দবাজার সংবাদ বিভাগে কাজ করেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম হত। কাজের লোক সে ছিল না। সময় বেঁধে তাঁকে দিয়ে কাজ করানোও যেত না।'[৪৯] এ রকম পাশাপাশি অভিমত থেকে যে পরস্পর বিপরীত চিত্র পাওয়া যাচ্ছে সেই বৈপরীত্যই সম্ভবত শক্তির ব্যক্তিজীবনের উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া প্রমত্ততা ও কবি হিসেবে তাঁর সৃজনী-শৃঙ্খলার বিপরীতমুখিতায় লক্ষণীয়।

নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তির প্রতি এক ধরনের পার্থিব আকর্ষণ না থাকলে পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা কঠিন। আকৈশোর বেনিয়ম ও ভ্রূক্ষেপহীন জীবনযাপন, নেশাগ্রস্ততা, জঙ্গল ও পাহাড়ে নির্বিচার পর্যটন, তুমুল ও অবিরল বন্ধু-সংসর্গ—এ সবের মধ্যে দিয়ে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর যৌবনেই হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি, পত্রিকার অফিসে তাঁকে খুব সচেতন ও নিয়মানুবর্তীরূপে পাওয়া যাবে এমন আশা করাই যায় না। ক্রমাগত পেশা ও বাসাবদল করতে থাকা শক্তি যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর একটানা সাংবাদিকতার বৃত্তিতে রত ছিলেন তাই বরং কিছুটা বিস্ময়ের। বাউণ্ডুলে আরণ্যক জীবনের ভ্রাম্যমাণতা ও নাগরিক কর্মবৃত্তের পৌনঃপুনিক নিয়মনিষ্ঠা, এ দুয়ের মাঝে দোলায়িত হতে হতে হয়তো শক্তি নোঙরের প্রয়োজন পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। আনন্দবাজারের কর্মজীবনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও সর্বদা মধুর সম্পর্ক ছিলো না শক্তির। মদ্যপান ও শৃঙ্খলাহীনতা ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিলো। প্রসঙ্গত শক্তির দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ, চিত্রশিল্পী শ্রী প্রকাশ কর্মকারের একটি লেখা থেকে সেই অন্য কারণের কিছু আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে—"ওর রাজনৈতিক চেতনাও খুব শক্ত। যা ঠিক করে সেটাতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অভীক সরকার আনন্দবাজার স্ট্রাইকের সময় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সই করতে বলল। ও বলল, 'আমি সই করব না। কারণ, যে লিফ্‌ট্‌ম্যান আমাকে নিচে নিয়ে যায়, ধার দেয়, তাদের বিরুদ্ধে সই করতে রাজি নই।' এটা ওর যুক্তি, কিন্তু আসলে স্ট্রং কমিট্‌মেন্ট ছিল।"[৫০] তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বাউণ্ডুলেপনা ও রুটিন কাজে নিষ্ঠাপ্রদর্শনে অনীহা ছাড়াও সম্ভবত এই দায়বদ্ধতার কারণেই ঠিক ষাট বছরের মাথাতেই আনন্দবাজার থেকে অবসর নিতে হয়েছিলো শক্তিকে।

মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপ ও অন্তরঙ্গতার পর্বেই শক্তি লিখেছিলেন *সোনার মাছি খুন করেছি* (আষাঢ়, ১৩৭৪)-র কবিতাগুলি। আনন্দবাজারে যোগদানের আগেই বেরোল *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* (ফাল্গুন, ১৩৭৫)। এরপর সত্তর দশকে একে একে প্রকাশিত হতে থাকলো *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (বৈশাখ, ১৩৭৭), *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি* (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮), *প্রভু নষ্ট হয়ে যাই* (শ্রাবণ, ১৩৭৯), *সুখে আছি* (বৈশাখ, ১৩৮১), *ঈশ্বর থাকেন জলে* (বৈশাখ, ১৩৮২), *অস্ত্রের গৌরবহীন একা* (বৈশাখ, ১৩৮২), *জ্বলন্ত রুমাল* (বৈশাখ, ১৩৮২), *ছিন্নবিচ্ছিন্ন* (আশ্বিন, ১৩৮২), *সুন্দর এখানে একা নয়* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩), *আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল* (ডিসেম্বর, ১৯৭৬), *কবিতার তুলো ওড়ে* (মার্চ, ১৯৭৭), *হেমন্ত যেখানে থাকে* (এপ্রিল, ১৯৭৭), *পাতাল থেকে ডাকছি* (মে, ১৯৭৭), *এই আমি যে পাথরে* (আগস্ট ১৯৭৭), *পরশুরামের কুঠার* (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮), উড়ন্ত *সিংহাসন* (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮), *মানুষ বড়ো কাঁদছে* (অগাস্ট, ১৯৭৮), *ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি* (অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫) এবং *ভাত নেই, পাথর রয়েছে* (আষাঢ়, ১৩৮৬)। একটি দশকের কালপর্বে এতগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া অবশ্যই এই অতিপ্রজ, কবিতাগতপ্রাণ সৃজনী-ব্যক্তিত্বের শ্রম ও শিল্পের ধারাবাহিকতার এক

বিস্ময়কর উদাহরণ। পূর্ববর্তী দশকে শক্তির একক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছিলো পাঁচ ; এছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে লিখেছিলেন একটি ত্রয়ী কাব্যসংকলন *তিন তরঙ্গ* (অগ্রহায়ণ, ১৩৭২)।

এই শহর কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে বারবার বাসাবদল করেছেন শক্তি, যেন মহানগর কোনো এক ভবঘুরে বেদুইনের তাঁবু। ১৯৭১-এর মার্চে বেহালা ছেড়ে বন্ডেল রোডের ভাড়া বাড়িতে; ১৯৭৭-এ পার্ক সার্কাস অঞ্চলে কর্নেল বিশ্বাস রোডে। অবশেষে ১৯৮৯-তে স্থায়ী ঠিকানা হলো বেলেঘাটার 'পূর্বাঙ্গনা' আবাসন প্রকল্প ; ৫, রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন। দেরিতে হলেও মীনাক্ষী ও পুত্র-কন্যাকে নিয়ে গড়ে ওঠা এক স্থায়ী ভালোবাসার গার্হস্থ্য। বন্ধু বিকাশ বিশ্বাসকে নতুন বাড়িটা দেখাতে দেখাতে এমনটাই যেন বোঝাতে চাইছিলেন শক্তি,—'বল বিকাশ, আমারও শেষটায় বাড়ি হল। সবই কিন্তু ওই মীনাক্ষীর জন্য।'[৫১]

লেখক-জীবনের প্রারম্ভে 'স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার' ছদ্মনামে এবং তার পরেও স্বনামে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন শক্তি। ১৯৬১-তে *কুয়োতলা* প্রকাশিত হবার পর আরো সাতটি উপন্যাস তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে—*আমি চলে যাচ্ছি, অবনী বাড়ি আছো, হাই সোসাইটি, হৃদয়পুর, কিন্নর কিন্নরী, দাঁড়াবার জায়গা* এবং *বিবি কাহিনী*। তবু কবিতা, অথবা তাঁর নিজের কথায় 'পদ্য', শক্তির একমাত্র ভালোবাসা, তাঁর সহজাত। আশি ও নব্বই দশকে যথাপূর্ব ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হয়েছে শক্তির একের পর এক কাব্যগ্রন্থ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ; ছোট ও বড়দের জন্যে দুটি ছড়াসংকলন হিসেবে ধরলে সর্বমোট বাইশটি, চোদ্দ বছরের সময়পর্বে। ১৯৮৩-তে পেয়েছেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* (মার্চ, ১৯৮২) গ্রন্থের জন্য। *ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে* (জানুয়ারি, ১৯৯১) ভূষিত হয়েছে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে ১৯৯৫-তে। এছাড়া পাঠকদের হাতে এসেছে *আমাকে দাও কোল* (মার্চ, ১৯৮০), *আমি চলে যেতে পারি* (চৈত্র, ১৩৮৬), *মন্ত্রের মতন আছি স্থির* (বৈশাখ, ১৩৮৭), *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল* (শ্রাবণ, ১৩৮৭), *আমি একা বড়ো একা* (বৈশাখ, ১৩৮৮), *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ* (মাঘ, ১৩৮৮), *পুণ্যিপুকুর পুষ্করিণী* (বইমেলা, ১৯৮২), *কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে* (বইমেলা, ১৯৮৩), *কক্সবাজারে সন্ধ্যা* (বইমেলা, ১৯৮৪), *একপাত্র সুধা* (বইমেলা, ১৯৮৪), ও *চিরপ্রণম্য অগ্নি* (বইমেলা, ১৯৮৫), *মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয়* (ভাদ্র, ১৩৯২), *সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার* (আগস্ট, ১৯৮৬), *এই তো মর্মরমূর্তি* (জানুয়ারি, ১৯৮৭), *বিষের মধ্যে সমস্ত শোক* (বৈশাখ, ১৩৯৪), *আমাকে জাগাও* (বইমেলা, ১৯৮৯), *পাতালে টেনেছে আজ* (জুলাই, ১৯৯১), *জঙ্গল বিষাদে আছে* (জানুয়ারি ১৯৯৪), *বড়োর ছড়া* (নভেম্বর, ১৯৯৪)

পাশ্চাত্যের অগ্রজ কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য কবি রিল্‌কের কবিতার প্রতি শক্তির আগ্রহের কথা আগেই বলা হয়েছে। মুকুল গুহর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রিল্‌কের *দুইনো এলেজি* অনুবাদ করেছিলেন শক্তি ; প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৭৯-র বৈশাখে। অপর এক জার্মান কবি *হাইনের প্রেমের কবিতার* অনুবাদ সংকলন বেরোয় আষাঢ় ১৩৮৬-তে। ছাত্রাবস্থায় বাম রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিতির সূত্রেই হয়তো রিল্‌কে ও হাইনের পাশাপাশি স্পেনীয় কবি লোরকা, চিলির নোবেল পুরস্কারজয়ী কম্যুনিস্ট কবি নেরুদা ও রাশিয়ার বিপ্লবী, ফিউচারিস্ট কবি মায়াকভ্‌স্কির কবিতার অনুবাদে উৎসাহিত হয়েছিলেন শক্তি। এছাড়াও প্রকাশ করেছিলেন একশ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের কবিতার এক অনবদ্য সংকলন, মুকুল গুহকে সঙ্গী করে। পাশ্চাত্যের

মতো প্রাচ্যের কবিতার প্রতিও শক্তির অনুরাগ ছিলো ; সে অনুরাগ তিনি প্রমাণ করেছিলেন বহু সার্থক অনুবাদে। *ওমর খৈয়ামের রুবাই, গালিবের কবিতা* (আয়ান রশিদ খানকে সঙ্গে নিয়ে), কালিদাসের *মেঘদূত* ও *কুমারসম্ভব কাব্য* শক্তির সার্থক অনুবাদকর্মের কয়েকটি নিদর্শন, লোরকা, নেরুদা, হাইনে, রিলকে, মায়াকভ্স্কি ও নিগ্রো কবিদের অনুবাদের পাশাপাশি। এছাড়া ইংরেজ কবি ব্লেকের কবিতার তর্জমাতেও হাত দিয়েছিলেন, যদিও সে কাজ খুব বেশি দূর এগোয় নি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন আপাত-স্বেচ্ছাচারী বোহেমিয়ান কবি শুধু নিজেই অজস্র কবিতা লিখেছেন কোনো এক মিউজের প্রভাবে, আপন সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায়, তা নয়; কবিতা ছাড়াও, গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণমূলক রচনা বাদ দিলেও, তাঁর অনুবাদের যে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য তাতে এক পরিশ্রমী ও প্রতিভাধর অনুবাদকের শৃঙ্খলা ও সাফল্য সহজেই গোচরে আসে। বোঝা যায় তাঁর জীবন-যাপনের বাহ্যিক শৃঙ্খলাহীনতার অন্তরালে ছিলো এক শিল্পীর সৃষ্টিশৃঙ্খলা, যাকে শক্তি নিজেই বলেছিলেন 'ইনার ডিসিপ্লিন'।[৫২]

কবিতা যদি শক্তির জীবনের এক ও অকৃত্রিম ভালোবাসা বলে গণ্য হয় তাহলে সে জীবনের আর এক অপ্রতিরোধ্য টান ভ্রমণের নেশা। মহানগর ও তার অলিগলিতে, কাছে-দূরে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরেছেন শক্তি একা অথবা সবান্ধবে। তাঁর কবিতায় যেমন, তেমনি তাঁর জীবনেও শক্তি ছিলেন এক অনন্ত যাত্রার চিরপথিক। *হেমন্তের অরণ্যে পোস্টম্যান* গ্রন্থের 'একটানা এক জীবন' কবিতায় তিনি গড্ডল-প্রবাহে কেবল ভাসতে থাকা জীবন থেকে স্পষ্টতই অব্যাহতি পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—'জলের ওপর ভাসতে ভাসতে অর্ধেক জীবন খরচ হয়ে গেলো/বাকিটা ডুবেই থাকবো/ ... আমি এক চুমুকে ডুবে যাবো/ দেখি না কী হয়?/ কিছুই না হলে দেশভ্রমণ আমার রোখে কে?/ সবার জন্যে তো আর একটানা একজীবন হয় না!' এক সদা-ভ্রাম্যমাণ সত্তার চঞ্চলতা, চলমান পথিকের বিস্তৃত, বিমুগ্ধ জীবনবোধ তাঁর কবিতার শব্দ চিত্রকল্প-ছন্দে বারবার উৎকীর্ণ হয়েছে। তাঁর পদ্য ও মদ্যের প্রতি প্রবল আসক্তিরই পরিপূরক যেন তাঁর এই অসম্ভব ভ্রমণ-আকাঙ্ক্ষা।

শক্তির চাইবাসা-হেসাডির দীর্ঘ, বেহিসেবী ভ্রমণবৃত্তান্তের কথা, দার্জিলিংয়ে বন্ধু নিত্যপ্রিয় ঘোষ এবং জলপাইগুড়িতে বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্তের আশ্রয়ে থেকে উত্তরবঙ্গ ও ডুয়ার্সের বন-পাহাড় চষে ফেলার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কফি হাউসের আড্ডায় বন্ধুরা মিলে শক্তিরা চলে যেতেন রাতের শেষ ট্রেনে ক্যানিংয়ের মাছের বাজারে, মাতলা নদীর পাড়ে। আবার কখনো বা চড়ুইভাতি করতে বাদু কিম্বা দলবেঁধে বসিরহাটে ইচ্ছামতীর ধারে। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র একটি কবিতায় শক্তি লিখেছিলেন 'বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় হাওয়া বাইরে থেকে আসছে'। ষাট দশকের এইসব বেরিয়ে পড়া সেই বাইরের টানে। তাঁর প্রথম যৌবন থেকে আমৃত্যু, শক্তি বারবার নিরুদ্দিষ্ট হতে চেয়েছেন বাংলা, বিহার, ওড়িশার আনাচে-কানাচে ; পাহাড়-জঙ্গল তাঁকে টেনেছে এক অমোঘ টানে; কখনো বা দূর মধ্যপ্রদেশের অভয়ারণ্যে— 'ভালোবেসেছিলেন তিনি মানুষকে, মানুষের ঘর-গেরস্থালিকে, ভালোবেসেছিলেন তিনি সংসারছুট অরণ্য প্রান্তর সমুদ্র পাহাড়, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতি।'[৫৪] তাঁর মতো এত ব্যাপক ভ্রমণ, এমন স্বেচ্ছাচারী নেশাগ্রস্ত প্রব্রজ্যায় বন, পাহাড়, নদী আর মনুষ্যসঙ্গ ও সংসর্গের তল্লাস করে অন্য কোনো বাঙালি কবি ফিরেছেন বলে মনে হয় না। শক্তির এই প্রব্রজ্যার অফুরন্ত চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে তাঁর কবিতায়, গদ্যে, স্মৃতিলিখনে।

তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে শক্তি লিখেছেন কিশোর সংকলন, যেমন শিমলিপাল জঙ্গলের বাঘিনী খৈরীকে নিয়ে *খৈরী আমার খৈরী*, বান্ধবগড় জঙ্গলের হাতির মাহুত নায়ারকে নিয়ে *হাতি ধরিয়ে নায়ার* ইত্যাদি। এসবেরও আগে লিখেছেন ভ্রমণসহায়িকা *উইক এণ্ড টুরিস্ট গাইড*। শক্তির ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার আর এক নিদর্শন তাঁর *জঙ্গলে পাহাড়ে*।

যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি কবিতায়, শক্তি ভীষণ পর্যটনময়। কলকাতার কাছে-পিঠে ঝাড়গ্রাম কিম্বা বোলপুর, অথবা আর একটু দূরবর্তী চাইবাসা, ম্যাক্লাস্কিগঞ্জ, নয়তো অনেকটা দূরের বান্ধবগড়, কান্‌হাকিসলী, আচানকমাড়, অমরকণ্টক— সর্বত্রই এ পর্যটক ঘুরে বেড়িয়েছেন স্বভাব-ভবঘুরের এক আত্মমগ্ন অথচ সঙ্গলিপ্সু তাড়নায়। শক্তির কবিতা ও অন্যান্য রচনার পর্যালোচনায় তাঁর এই ভ্রমণলিপ্সার বিষয়টি নিছক বাহ্যিকভাবে দেখলে তাই ভুল হবে। এক নিরন্তর প্রব্রজ্যায় যেন এই কবি। শক্তির মামাতো ভাই অমল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—'প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করার পরই সম্ভবত শক্তির রোজনামচায় পরিবর্তন এলো। এই সময় থেকেই রাতে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পিছনে লোহার সিঁড়ি দিয়ে বাড়ী ফেরা শুরু হল...।'[৫৫] সেই থেকে শক্তির জীবনযাপনে সদর দরজার চাইতে পিছনের খিড়কি যেন এক ব্যতিক্রমী সংযোগের প্রতীকী পন্থা হয়ে থেকে গেছে।

বহড়ু থেকে কলকাতা মহানগরে পদার্পণের পর থেকেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা সংসর্গের সূত্রে শক্তি সাধারণ আটপৌরে জীবনের রোজনামচা ভেঙেচুরে ক্রমেই আসক্ত হয়েছিলেন এক তুমুল বেহিসেবী জীবনযাপনে। মদ্যপান, কবিতার নানা আড্ডা, ঘর ছেড়ে যখন-তখন নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, প্রথাগত সামাজিকতার যাবতীয় প্রত্যাশাগুলিকে ছত্রখান করে দিয়ে ষাটের দশকে শক্তি ও তাঁর বান্ধবেরা হয়ে উঠেছিলেন বেপরোয়া, বাধাবন্ধনহীন। ধারাবাহিক নিয়ম লঙ্ঘনের নেশা এঁদের অনেককেই করে তুলেছিলো স্বল্পায়ু। শক্তিও তাঁর মধ্যবয়সেই শারীরিক, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগতে শুরু করেছিলেন। সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে একাধিকবার গুরুতর অসুস্থতার কারণে তাঁকে বন্দী থাকতে হয়েছে হাসপাতালে, রোগশয্যায়। স্ত্রী মীনাক্ষীর সতর্ক ও তৎপর পরিচর্যায় সচল ও সক্রিয় থেকেছেন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনারত অবস্থায় মৃত্যুর সময় পর্যন্ত। মীনাক্ষীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার পরের বছরই লিখেছিলেন, 'কাল থেকে এত মদ আর খাবো না ভগবান—কোনোদিনও নয়',[৫৬] তবু মদ ছাড়া থাকতে পারেননি ; বারবার নিজে থেকে করা সংকল্প, চিকিৎসকের সাবধানবানী ভেসে গেছে স্বভাব-স্বতঃস্ফূর্ততার এক করুণ তাড়নায়। শক্তির ভেতরেই এমন এক বেপরোয়া বাউণ্ডুলেপনা ছিলো যে মধ্যবিত্তের ছক-বাঁধা নিপাট গার্হস্থ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো। বন্ধু প্রকাশ কর্মকার শক্তির সম্পর্কে স্মৃতিলিখনে এই ভেতরকার অস্থির বোহেমিয়ানাকেই বলেছেন 'ম্যালিগন্যান্সি', যার সঙ্গে শক্তির কবিতার বিষয় ও প্রকরণের যোগাযোগ নিরূপিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং কবিতা ও ছবির পাশাপাশি চর্চার মধ্যে দিয়ে শক্তিকে সঠিকই দেখেছিলেন প্রকাশ—'ও একটু অন্যভাবে বাঁচতে চাইত। পাগলামিটা জীবনের মতোই ওর কাছে। অনেকের কাছে এসব পাগলামিটা শিল্পী সাজার চেষ্টা, একটা স্টান্ট। সেসব ওর মধ্যে নেই। ও যা করে তা সত্যি ও চায়। ... ও বিয়ে করেছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে—তার প্রতি কর্তব্য—সেটা পালন করতে আমি সুস্থভাবে কখনো দেখিনি শক্তিকে। আর মানুষের

সঙ্গে সার্বিকভাবে মেলামেশার জন্য যে আলাদা প্রস্তুতি, সেটাও ওর মধ্যে নেই। ওর কতগুলো ব্যাপারে খুব নিজের মত করে চলার ইচ্ছে আছে।'[৫৭]

১৯৭৫ অর্থাৎ যে বছর শক্তি আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন সে বছরই জন্ম হয়েছিলো পুত্র তাতারের। পুত্র-কন্যা-শাশুড়ীকে নিয়ে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হতো কবি-পত্নী মীনাক্ষীকে। তার ওপর ছিলো জন্ম-বোহেমিয়ান কবিকে ন্যূনতম পারিবারিক শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখার দুরূহ কাজটি। তবু কবি স্বয়ং এবং তাঁর বন্ধু-পরিজনেরা বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মীনাক্ষীর প্রতি। তাঁকে ছাড়া শক্তি হয়তো বা ষাটের কোঠাতেও প্রবিষ্ট হতে পারতেন না। তাঁর 'এপিটাফ' তো কবি লিখেই ফেলেছিলেন সাতচল্লিশ বছর বয়সে। শক্তির সমাধিলিপি-উত্তর বছরগুলি বলতে গেলে পত্নী মীনাক্ষীরই বহুমূল্য দান। আশির গোড়ার দিক থেকে শক্তির ভেতরে লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো এক ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত, একটা যেন সমাহিত ভাব, উদ্দাম স্বেচ্ছাচারের লাগাম টেনে পারিবারিক জীবনে স্থিতি অর্জনের চেষ্টা। *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* (মার্চ, ১৯৮২)-র সেই পংক্তিটির কথা ভাবলে এই পরিবর্তনের লক্ষণ তাঁর কবিতাতেও ফুটে উঠেছিলো—'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো'। অপত্য-স্নেহ, প্রিয়জনের ওপর নির্ভরতায়, শক্তির জীবন যেন একটু একটু করে মোড় নিচ্ছিলো, যার পরিণত প্রকাশ 'পূর্বাঙ্গনা'র বাড়ী ও তার পরিবেশে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'উচ্ছ্বাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্যে লেখা কবিতাটিতেও শক্তির এই শান্ত প্রার্থনার সুরটি বেজেছিলো 'মালবিকা হাতে হাত রাখো, আমি/বহুদূর যাবো।/তোমার সাহায্য বিনা এ-বয়সে হাঁটতে পারি না,/চলতে ফিরতে কষ্ট হয় মালবিকা/হাতে হাত রাখো।'[৫৮]

বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাদ দিলে দেশের বাইরে শক্তির যাওয়া ১৯৯১-এ। সুইডেনের কবি সম্মেলনে, সস্ত্রীক। সেই সূত্রে লণ্ডন ও প্যারিস। ১৯৯৪-এ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে অবসর নিয়ে উপদেষ্টারূপে যোগ দিয়েছিলেন শক্তি 'বিনোদন বিচিত্রা' নামের একটি পত্রিকায়। কর্মজীবনের এই পুনরারম্ভের সঙ্গে সত্বর যুক্ত হলো আর এক নতুন মাত্রা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'অতিথি অধ্যাপক' রূপে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংযোগ ও ভাববিনিময়। শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীর অতিথিশালায় শক্তির সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী মীনাক্ষী, অথবা মীনাক্ষী কলকাতায় চলে এলে কন্যা তিতি। অতিথিশালায় তাঁর পাশের ঘরেই থাকতেন আর এক 'অতিথি অধ্যাপক' ও শক্তির 'কৃত্তিবাসী' বন্ধু কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৯৫-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীতে তিন মাসের মেয়াদে যোগ দিয়েছিলেন শক্তি। দারুণ উৎসাহে, নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শেখাতে শুরু করেছিলেন কিভাবে কবিতা পড়তে হয়, লিখতে হয়, ভালোবাসতে হয় কবিতাকে। বিশ্বকবির স্মৃতি ও কর্মবিজড়িত শান্তিনিকেতনে এক নতুন ও অভিনব অধ্যায় লেখা শুরু হয়েছিলো কবিতা-পাঠ, আলোচনা, গানে, আড্ডায়। কলকাতায় ফেরার পরিকল্পনা ছিলো ২৮শে মার্চ। কিন্তু তার ঠিক পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ভোরে যেন প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে গেলো ভয়ানকভাবে। তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, চিকিৎসার কোনো সুযোগ না দিয়েই প্রয়াত হলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকবির প্রিয় বাসভূমে, যার সম্বন্ধে মৃত্যুর আগের দিনই একটি ভিডিও ছবিতে মন্তব্য করেছিলেন শক্তি—'শান্তিনিকেতনে শান্তি বড্ড বেশি, সঙ্ঘাত নেই, সঙ্ঘাত না থাকলে কবিতা হয় না।'[৫৯]

সম্ভবত 'সঙ্ঘাত' বলতে শক্তি ঠিক প্রচলিত সামাজিক বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কিম্বা ঘাত-প্রতিঘাত বোঝাতে চান নি। বরং কবির নিজের ভেতরে যে টানা-পোড়েন ও সংঘর্ষ চলতে থাকে নিজের সঙ্গে, তার কথাই বলেছেন। এ সেই 'সঙ্ঘাত' যা মধ্যরাতের স্তব্ধতা ভেঙে দেয় যখন অবনীর ঘরের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ওঠে। প্রকাশ কর্মকার যাকে বলেছিলেন অস্থিরতা, 'ম্যালিগন্যান্সি', তাকেই বলা যায় কবির ভেতরকার এই সঙ্ঘাতের বোধ। এ কোনো বৈরিতা নয় ; বরং এক 'ভালোবাসার ঝগড়া'। নচেৎ যে আধুনিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্র-কবিতার, অথচ রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান ছিলো যাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও একান্ত আশ্রয়, সেই কবি প্রয়াত হলেন রবীন্দ্রনাথেরই শান্তিনিকেতনে, কর্মরত অবস্থায়। 'কৃত্তিবাসী' আধুনিকতার খেয়ালিপনায় কখনো কখনো রবীন্দ্ররচনা সম্পর্কে আক্রমণসূচক মত প্রকাশ করলেও শক্তির রবীন্দ্র বিরোধিতার কোনো গভীর ও গুরুতর মাত্রা ছিলো বলে মনে হয় না। আর তাঁর দরাজ গলায় গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বারবার স্মরণ করেছেন তাঁর বন্ধু ও পরিচিত যাঁরা। রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম' পর্যায়ের কয়েকটি গান ছিলো তাঁর বিশেষ প্রিয়—'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছো', 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা', 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ' [মৃত্যুর ঠিক আগেই তোলা এক তথ্যচিত্রে এই গানটি গাইতে গাইতে শান্তিনিকেতনের পায়ে চলা পথ ধরে আপন আবেগে চলতে দেখা গিয়েছিলো শক্তিকে] 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে', 'বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে', 'আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন' ইত্যাদি।[৬০]

উনিশে মার্চ, '৯৫ শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনে একটি কবিতাপাঠের আসরে শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন শক্তি। তাঁর জীবনের সেই শেষ কবিতার বৈঠকে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে একটির পর একটি পড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর কবিতা; তাঁর পঠিত কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে শিহরণ সৃষ্টি করেছিলো 'আমাকে জাগাও', বিষ-ঘুম থেকে জাগরণের এক সমূহ প্রার্থনায় ব্যাকুল সেই পংক্তিগুলি তিনি আবৃত্তি করেছিলেন তীব্র আবেগে—'সেগুনমঞ্জরী হাতে ধাক্কা দাও, জাগাও আমাকে/ আমি আছি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে/ আমি আছি সর্পদষ্ট, জাগাও আমাকে/ বৈরানে সন্ন্যাসে আছি, জাগাও আমাকে/ আমি জাগবো না, আমি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে...।' ঠিক এর চার দিন পরই কবি অতিক্রম করে গেলেন জীবন ও জাগরণের সীমান্তচৌকি। তাঁকে জাগানো আর সম্ভব ছিলো না, যদিও তাঁর নতুন ভূমিকায় শান্তিনিকেতনে তার স্বল্পমেয়াদী বসবাসের দিনগুলিতে শক্তি ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-আবাসিকদের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন জাগরণের এক ঈপ্সা—"... তিনি আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর এই প্রথম আশ্রমের একজন কবি শান্তিনিকেতনকে এমনভাবে জাগাতে পেরেছিলেন।"[৬১]

সূত্রনির্দেশ :

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'শক্তির কবিতা', কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ২০।
২. শঙ্খ ঘোষ, 'এই শহরের রাখাল', দেশ, ২০ মে ১৯৯৫, পৃ. ৩১।
৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'এই সব পদ্য', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ববাণী, ১৯৭৬, পৃ. ৭।
৪. তদেব।
৫. সাহিত্যসেতু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, জুলাই '৯৫, পৃ. ১২১।
৬. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'এই সব পদ্য', কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৭।
৭. অমল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমাদের দাদাভাই', স্মৃতি স্মারক, নভেম্বর '৯৫, পৃ. ২২।
৮. 'অন্যমনে', জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, পুনর্মুদ্রিত 'কবিতীর্থ', জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৬৩।
৯. শক্তি চট্টোঃ, 'এই সব পদ্য', পৃ. ৯।
১০. অমল গঙ্গোপাধ্যায়, স্মৃতি স্মারক, পৃ. ২৩।
১১. সাহিত্যসেতু, জুলাই '৯৫, পৃ. ১২২।
১২. শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'এই সব পদ্য', কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৯।
১৩. 'গদ্যের গার্হস্থ্য', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩. পুনর্মুদ্রিত কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২ পৃ. ৭৭।
১৪. তদেব।
১৫. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'এই সব পদ্য', কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ৯।
১৬. তদেব, পৃ. ১০।
১৭. তদেব।
১৮. বর্তমান অধ্যায়ের বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 'বিনোদন বিচিত্রা'র শক্তি চট্টোঃ স্মরণসংখ্যা (১৮ এপ্রিল ১৯৯৫) টিতে সমীর সেনগুপ্ত সংকলিত 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীপঞ্জী' (পৃ. ৭৬-৭৮) থেকে।
১৯. সূত্র : অমল গঙ্গোপাধ্যায়, স্মৃতিস্মারক, পৃ. ২৫।
২০. যুবমানস, এপ্রিল-মে, ৯৫, পৃ. ১৪ ; দেশ, ২৯ জুলাই, ৯৫, পৃ. ১১৪।
২১. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'এই সব পদ্য', কাব্যসংগ্রহ পৃ. ১০।
২২. প্রভাত কুমার দাস, 'শক্তি চট্টোঃ-র গদ্য : তাঁর পদ্যেরই সাঁকো', কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ ৩৩।
২৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'বাঁচার ঘব কবিতার ঘরানা', আজকাল, ৯ এপ্রিল, '৯৫।
২৪. দ্রষ্টব্য, 'বিস্মৃত দুটি কবিতা', দেশ, ২০মে ১৯৯৫, পৃ. ৬২-৬৪।
২৫. শক্তি চট্টোঃ, 'এই সব পদ্য', কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১১।
২৬. তদেব পৃ. ১০।
২৭. স্বকাল, জুন ১৯৮০, পুনর্মুদ্রিত, কবিতীর্থ. জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৮০।
২৮. 'অন্যমনে', জুলাই-সেপ্টে. ১৯৬৯, পুনর্মুদ্রিত 'কবিতীর্থ', জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৬৩। শক্তি চট্টোঃ 'এই সব পদ্য', কাব্যসংগ্রহ, পৃ ১১। [*অন্যত্র এই রচনাব সময়কাল হিসেবে শক্তি ১৯৫৫/৫৬-র উল্লেখ করেছেন।*]
২৯. সূত্র : সমীর সেনগুপ্ত. 'শক্তি চট্টোঃ-র জীবনীপঞ্জী', 'বিনোদন বিচিত্রা', ১৮ এপ্রিল, ৯৫, পৃ. ৭৭।
৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'খেলাচ্ছলে দিনগুলি', সানন্দা, ১৪ এপ্রিল ৯৫, পৃ. ৮৬।
৩১. 'গদ্যের গার্হস্থ্যে', কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৭১।
৩২. তদেব।
৩৩. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস, ২৫ সংকলন, ১৯৬৮। উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, অক্টো. '৯৫, পৃ. ২৭।
৩৪. 'গদ্যের গার্হস্থ্যে' কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৭৪।

৩৫. এলিজি, শান্তি লাহিড়ী, হাওয়া ৪৯, শারদ ১৪০২ পৃ. ১১৫।
৩৬. 'গদ্যের গার্হস্থ্যে', কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৭১।
৩৭. 'কবিতার প্রতি সমীহ', (আ. ১৯৬২) পুনর্মুদ্রিত, 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৮।
৩৮. 'অচেনা, কিন্তু চেনা চিরতরে', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, পরিচয়, এপ্রিল, ১৪০২, পৃ. ১১৮।
৩৯. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ক্ষতিহীন কামনায় বসন্তে হেমন্তে ভেসে যাই', দেশ, ২০ মে, ১৯৯৫, পৃ. ৪৩।
৪০. এখানে দেওয়া সমস্ত তথ্য শ্রী অমিতাভ দাশগুপ্তর স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'পাঁজর পুড়িয়ে বসে আছি' থেকে নেওয়া। সূত্র ঃ আজকাল, রবিবাসর, ২৬ মার্চ, ১৯৯৫।
৪১. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৭ ; উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, অক্টোবর '৯৫, পৃ. ২৮।
৪২ দেশ, ২০মে '৯৫, পৃ. ৫৪।
৪৩. রুচিরা শ্যাম, 'কবি ও কাঙাল', দেশ, ২০ মে '৯৫, পৃ. ৫১-৫৭।
৪৪. রুচিরা শ্যাম, 'শক্তি মীনাক্ষী : অন্নপূর্ণার সংসার', বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল ৯৫, পৃ. ৫-৭।
৪৫. 'সেই শক্তি, এই শক্তি', বিনোদন বিচিত্রা, ৫ মে, ১৯৯৫, পৃ. ৬১।
৪৬. সমরজিৎ কর ও ইনা সেনগুপ্ত (সম্পা.) শক্তির কাছাকাছি, দে'জ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫'।
৪৭. শান্তি লাহিড়ী, 'এলিজি', হাওয়া ৪৯, শারদ, ১৪০২, পৃ. ১১৩।
৪৮. অমিতাভ চৌধুরী, 'দীপ্তিমান শক্তিমান', বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল '৯৫, পৃ. ১১।
৪৯. তদেব, পৃ. ৩২।
৫০. প্রকাশ কর্মকার, 'আমার বন্ধু শক্তি..' কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ২৮।
৫১. বিকাশ বিশ্বাস, 'সে চলে গেল বহুদূর', উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস. অক্টোবর, '৯৫, পৃ ৫৫।
৫২. শান্তি সিংহ, 'শক্তিদার ইনাব ডিসিপ্লিন', সাহিত্যসেতু, শক্তি চট্টোঃ সংখ্যা, পৃ. ১৩১।
৫৩. সূত্র : শম্ভুলাল বসাক, 'শক্তির সঙ্গে ভ্রমণ', সাহিত্যসেতু, শক্তি চট্টোঃ সংখ্যা, জুলাই '৯৫।
৫৪. শঙ্খ ঘোষ রচিত ও পঠিত শোকলিপি, বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল '৯৫, পৃ. ১।
৫৫. অমল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমাদের দাদাভাই', 'স্মৃতি স্মারক', পৃ. ২৬।
৫৬. সমীর সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জানুঃ '৯০, পৃ. ৩৪৮।
৫৭. প্রকাশ কর্মকার, 'আমার বন্ধু শক্তি' ... , কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ২৪-২৬।
৫৮. উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, অক্টোবর '৯৫, পৃ. ৫৫।
৫৯. মনসিজ মজুমদার, আজকাল, রবিবাসর, ২৬ নভেম্বর '৯৫।
৬০. সূত্র : শক্তির কাছাকাছি (সমরজিৎ কর ও ইনা সেনগুপ্ত সম্পাদিত), দে'জ, ১৯৯৬।
৬১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'কবি ও অধ্যাপক', স্মৃতি স্মারক, ২৬ নভে. '৯৫, পৃ. ১৫-১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিতার বিষয় প্রসঙ্গ

'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক সংগ্রহের ভূমিকায় কবিবন্ধু সমীর সেনগুপ্ত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—'শক্তির কবিতার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ তার বিষয়হীনতা। কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে। বুঝতে পারি না তিনি ঠিক কী বলতে চান।'[১] একথা হয়তো ঠিক যে শক্তির অনেক কবিতাতে বিষয়ের স্পষ্টতা নেই ; অনেক কবিতারই ভাববস্তু সরলীকরণের অতীত। তবে সে কথা তো সকল কবি বা প্রায় সকল কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর বিষয়হীনতা যদি কোনো কবির ধারাবাহিক প্রবণতা বলে মনে হয় তাহলে বলা যেতে পারে, বিষয়হীনতাই তাঁর বিষয়। দীর্ঘ চার দশক ধরে শক্তি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির বহু বর্ণময় বিশ্বে প্রেম, নারী, নিসর্গ, মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে অজস্র কবিতায় সৃষ্টি করেছেন জীবনযাত্রীর এক আবেগময় আশ্চর্য ভুবন। নানা বিষয় এবং হয়তো বা বিষয়হীনতাকে আশ্রয় করে বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ ছুঁয়ে শক্তি ক্রমাগত সন্ধান করেছেন জীবনরহস্যের বহুস্তর অতলতার।

এই অধ্যায়ে শক্তির কাব্যরচনার বিভিন্ন সময়পর্বে বারবার ব্যবহৃত বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'বিষয়' ও 'প্রসঙ্গে'র মধ্যে পার্থক্য হলো অনেকটা 'Subject' ও 'Content'-এর মধ্যেকার পার্থক্য। এমন কি আপাত-বিষয়হীন কবিতার ভেতরেও কিছু অন্তর্বস্তু লুকিয়ে থাকে। শক্তির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রকাশকালের অনুক্রমে এখানে তার প্রধান ও পুনরাবৃত্ত বিষয়-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে নির্বাচিত কবিতাবলীর পাঠবস্তুর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। এইসব বিষয়-প্রসঙ্গ ছাড়াও শক্তির কবিতায় এসেছে বন্ধুত্ব, প্রিয় বান্ধবদের নানা উল্লেখ, আড্ডা, মদ্যপান ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এসেছে কলকাতার নাগরিক জীবনযাপনের ছবি, কোনো এক ঈশ্বরের কথা, ভয় ও ভালোবাসার কত না চিহ্ন।

প্রেম

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

"প্রেম" শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় চল্লিশ বছর ব্যাপী কবিতা রচনার অন্যতম প্রধান ও পুনরাবৃত্ত বিষয়। বলা যায় তাঁর আবেগ-অনুরাগের ভরকেন্দ্র। এক বা একাধিক প্রিয় নারীকে উদ্দেশ করে প্রথাগত প্রেমের কবিতা শক্তি যে খুব বেশি লিখেছেন এমন নয় এবং সে কারণে তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য প্রেমের কবিতা ঠিক প্রথাগত অর্থে ব্যক্তিগত প্রেম বা অনুরাগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতি, নির্জনতা, মৃত্যুবোধ ইত্যাদি বারবার মিশে গেছে।

শক্তির প্রেমের কবিতায় দেখি এক প্রচ্ছন্ন, আতুর, মৃদু-উচ্চারিত ব্যাকুলতা ; দেখি একমাত্রিক একান্ত নিবেদনের পরিবর্তে বহুমাত্রিক স্তরভেদ, বিমূর্ততার গূঢ় ব্যঞ্জনা। শক্তির প্রেমের

কবিতা কমনীয়, কাব্যময়, মায়াবী, স্বগতোক্তির মতো নির্জনতামণ্ডিত, অন্তরচারী। এ কবিতায় এক স্মৃতিবিধুর অতীত অবিরত ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে বর্তমানকে ; বাস্তবের সঙ্গে মিশে যায় পরাবাস্তবতা ; উপমার স্বাতন্ত্র্যে, ছন্দের আশ্চর্য দোলায় আন্তরিক উচ্চারণের শরীরে লেগে থাকে রহস্যমায়ার জাদুস্পর্শ। দেহজ কামনা তথা প্যাশনের তীব্র নেশা শক্তির প্রেমের কবিতায় মেলে কদাচিৎ। যখন মেলে তখন তা আসে স্মৃতিচারণার পথ ধরে, আর সে কারণে প্রেমের কবিতার সর্বাঙ্গে খেলা করে এক লাবণ্য-কুহক।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য (ফাল্গুন, ১৩৬৭)।* এক গভীর অথচ অনুচ্চকিত আবেগের স্বগত-সম্ভাষণ এ সংকলনের শিরোনামে ; একদিকে 'প্রেম' ও অন্যদিকে 'নৈঃশব্দ্য'র মধ্যে যেন এক বিরোধাভাস। বন্ধু কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থনাম সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রেমের কবিতার আবার কী রকম নাম হবে?[২] এক আর্ত অভিমান, এক অস্থির শঙ্কা, বিযুক্তির বেদনাবোধ ও প্রাত্যহিক জীবন-বাস্তবের নানা অকপট স্বীকারোক্তি এ গ্রন্থে 'প্রেম'কে এক বহুকৌণিক জটিলতায় লগ্ন করে রেখেছে। নিছক ব্যক্তিগত ও আত্মসর্বস্ব প্রেমবাসনা নিয়ে প্রথাগত প্রেমের কবিতা যে শক্তি লিখবেন না, *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র অভিমানী ও বিরহ-পীড়িত কবিতাগুলি তার পূর্বাভাস বহন করছে। তরুণ কবির প্রেমের ভাবনায় মৃত্যু ও বিপন্নতার নানা চলচ্ছবি বারবার এসেছে। বিশ্বাসভঙ্গ, বিচ্ছেদ ও আসন্ন অবসানের আক্ষেপ করুণ বিষণ্নতার আলিম্পন এঁকে গেছে ভালোবাসার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায়। এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ব্যবহৃত শার্ল বোদ্‌লেয়ারের "স্তোত্র" কবিতার বুদ্ধদেব বসু-কৃত তর্জমার দুটি চরণ প্রেমের কবিতার এ সংকলনকে দিয়েছিলো স্বতন্ত্র এক মাত্রা।

প্রথম কবিতা **খেলনা**-র প্রথম পংক্তিতেই আর্তি, পেয়ে হারানোর বিষণ্নতা, স্মৃতিমেদুরতা: 'পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু, যেন বাল্যে খুব দূর দেশে'। এক আত্মিক বিষাদ, স্বপ্ন-ভঙ্গের গোপন অশ্রুপাত দ্বিতীয় রচনা **প্রতিকৃতি**-তেও ; শেষ পংক্তিটি তো আর্তচৈতন্যের এক আর্দ্র স্বীকারোক্তি—'দুঃখের মুকুর তুমি অন্ধকারে আমার সান্ত্বনা'।এ কবিতায় বেদনাবিধুর আত্মগোপনচারী কবির নিভৃত বিষাদের এক জীবনানন্দীয় বলয়। **কারনেশন**-ও বিরহবেদনার ছায়ামণ্ডিত— 'প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো/তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন।/কতদিন তার মুখও দেখিনি, চেনা পদপাত পিছল অলক কালো/ও-ফুলের কথা বোলো না কাউকে বুড়ো মালঞ্চ'। এই বিরহের নির্জন অনুভব ও অন্তর্লীনতা, শ্রীশঙ্খ ঘোষের ভাষায় 'বিষণ্ন একাকিত্বে ভরা এক ভালোবাসার রোমান্টিক প্রবাহ,'[৩] শক্তির প্রেমের কবিতার প্লুতস্বর।

নাগরিক মধ্যবিত্তের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় ব্যাকরণ-শৃঙ্খলাকে ভণ্ডুল করে এমন এক স্বেচ্ছাচারী, উদাসী যাত্রীর চলমানতাকে বেছে নিয়েছিলেন শক্তি যে ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা তাঁর পক্ষে খুব বেশী লেখা সম্ভব হয় নি, অন্তত এই প্রাথমিক পর্বে। কোনও বিশেষ নারী তথা মানসী প্রতিমাকে উদ্দেশ করে কিছু কবিতা তিনি লিখেছিলেন পরিণত বয়সে। আসলে মানুষ ও প্রকৃতির উন্মুক্ত, উদার, সতত চলমান প্রবাহ ও তার বহুবর্ণময়তায় এমন নিবিড়ভাবে লিপ্ত থেকেছেন শক্তি যে আনন্দ ও বেদনা, বাসনা ও বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা ও অভিমান, সব মিলেমিশে গেছে। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যে* তাই এক জীবনরসিক. প্রকৃতিমগ্ন, অথচ আর্ত, বিষণ্ন প্রেমিকের নিবিড় আত্মকথন বাণীবদ্ধ হয়েছে 'আবেগার্ত সিনট্যাক্সের অপরূপ উৎকেন্দ্রিকতায়'।[৪]

নিয়তি শীর্ষক কবিতাটির প্রথম স্তবককে কবি যখন উচ্চারণ করেন—'বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে। হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, পায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর।/যা-কিছু ধূলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরনো/তাকে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে মনে মনে', তখন বুঝি যে এঁরা প্রথাগত অর্থে পরস্পর মশগুল প্রেমিক-প্রেমিকা নন। দুজনের দুটি ভিন্ন পথে যাওয়া, বয়োবৃদ্ধির প্রসঙ্গ, নারীর 'নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি', 'রূপসী মুখের ভাঁজে হায়নীল প্রবাসী কৌতুক', 'নিরালা বিষাদ'কে 'সুগন্ধি বনফুলে' ঢাকার চেষ্টা ইত্যাদি এ কবিতাকে দেয় জটিল অর্থময়তা ; ধারালো ব্যঙ্গে যে দুরূহতা হয়ে ওঠে এক ত্রস্ত প্রেমিকের সত্য-ভাষণ।

শক্তির প্রেমের কবিতায় বিরহ ও বিচ্ছেদের দুঃখ ও অভিমান বেজেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো নৈরাশ্য বা তিক্ততা তার মাধুর্যকে নষ্ট করে নি। **পরস্ত্রী** কবিতার এই পংক্তিগুলিতে যেন এক অভিমানী কিশোর তার পূর্বপরিচিতার বাহ্য রূপান্তর দেখছে সকাতর বিস্ময়ে—'যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো/যাবো না আর ঘরে/সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না/ধরে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না/বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো/কখন যেন পরে।' প্রেমের এ এক হার্দ্য, অভিমানী উচ্চারণ: 'কিশোর-প্রেমের আহত অভিমানকে আবেগ-ঘন এক আর্তির সঙ্গে কবি-কল্পনার ব্যাপ্তি মিশিয়ে যেভাবে কবি প্রকাশ করেছেন প্রথম কবিতা-সংকলনেই, তাতে দেখি তাঁর নিজস্ব ভাষাভঙ্গির অনবদ্য স্বাক্ষর।'[৫]

শক্তির প্রথম দিকের প্রায় সব প্রেমের কবিতাই একপাক্ষিক, পারস্পরিক সম-বিনিময়ের নয়; প্রাপ্তির নয়, হারানোর ; পরিপূর্ণতার নয়, বেদনার। বয়ঃসন্ধিকালের স্মৃতি ও তার বিষাদের স্বগত জিজ্ঞাসায় পরিকীর্ণ। **যৌবন থেকে বামে** কবিতায় যে শুষ্কতার ইঙ্গিত তারই ঈষৎ পরিবর্তিত স্বর **চতুরঙ্গে** কবিতাটিতে :

(১) হাওয়া, আমার কমলকুলায় ভালোবাসার শুকালো ফুলরাশি,/যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি। (**যৌবন থেকে বামে**)

(২) রমনী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কি। (**চতুরঙ্গে**)

তবে এ বিরহবেদনায় হাহাকার তেমন প্রবল হয়ে ওঠে না ; বরং বেজে ওঠে এক বাউল বৈরাগীর রোমান্টিক বিষণ্ণতার গুঞ্জরণ। এই বৈরাগ্য হতাশা নয় ; তাঁর প্রেমের কবিতায় শক্তি অনেক সংশয় ও অপ্রাপ্তি সত্ত্বেও অসঙ্কোচ সমর্পণ ও মুগ্ধতার কথা বলে ওঠেন, যেমন আলেখ্য-র শেষ স্তবকটি— 'ফোটে না কেন রামধনুর মঞ্জুলতা অনন্য এই মুখে/গরিষ্ঠ এক স্ফটিক জ্বলে ভয় রেখো না, না-হয় নিলে দান/ভ্রান্ত বহির্দুর্গরেখা সামান্য ফুল দাও হে পরাঙ্মুখে/ক্ষণিক মৃদু দৃষ্টিপাতমালায় করি মুগ্ধতম স্নান।' এই বাউলমনা কবির রোমান্টিব কল্পনায় প্রেম ও প্রকৃতি মিলেমিশে যায় 'ঝর্না'র প্রতীকে— 'সারঙ্গ যদি ঝর্না ফোটাই তুমি আসবে কি তুমি আসবে কি (**ঝর্না**)।' ভালোবাসা ঝর্না তৈরি করেছিলো ; এখন ভালোবাসা তাকে নদীরূপ দিচ্ছে ; আর সেই অতি-ভৌগোলিক নদীকে দেখে 'শাদা গাছগুলি' অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ছায়ার কারুকাজ ছুঁড়ে দিচ্ছে। কবিতার শেষাংশে ঝর্না হয়ে ওঠে এক ছলনাময়ী নারীর প্রতীক, যে প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করে না। তবু কবি ভালোবাসা পেতে ব্যাকুল—'ও ঝর্না ওগো ঝর্না তাহাকে ভালোবাসবে কি ভালোবাসবে কি।'[৬]

মৃত্যুর প্রচ্ছায়া, শ্মশান-চিতার আগুন ও ভস্মের ছবি প্রেম ও প্রীতির স্মৃতিপটটি বিধুর করে রাখে কখনো কখনো, যেমন **ভ্রান্তি** কবিতাটিতে— 'তোমায় কিছু দিয়েছিলাম প্রীতির ছায়াতলে/ নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে......চমৎকার বারুণীগীতি আছো তো সখা ভালো?/ বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে।' এও জীবনানন্দের কবিতার ভাষায় 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো'। আবেগের স্থূল আতিশয্য উদাসী পথিকের স্বগতকথনে থাকে না, থাকে এক সহজ আন্তরিক উন্মুখতা—'ভালোবাসার তেমন আকাশ পাই না কেন ভালোবাসার তেমন আকাশ' **(সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী)**। অনুরূপ শান্ত আকুতি, নিভৃত প্রার্থনা, নির্জন নিবেদনের কল্পরম্যতা ফুটে উঠেছে এ সংকলনের আরও অনেক কবিতায় :

(১) তুমি যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই/ তুমি যেমন, অপার জ্যোৎস্না ঝরিয়ে যেতে পারো! চারিদিকের ক্ষেতখামার ঝর্না হ'য়ে যায়/ তুমি যেমন তেমনই ঠিক, এই তো চলে যাই.... **(নিমন্ত্রণ)**

(২) তোমার রুগ্ন মুখের 'পরে ছড়িয়ে আলোছায়া/আমি কখন চ'লে যাবো ভুলেও ভাবি নি তা; তোমার ম্লান বুকের পরে ছড়িয়ে ছিলো ছায়া/আধেক বেলা, এলানো চুল আমার হাতে পাতা। **(আড়াল)**

(৩) হে আমার শেফালিতলার ফুল, হে রাঙা বালক চলো যাই—/চিরকাল ব'সে থাকি, শুয়ে থাকি তোমার ভিতরে,/....... হে ফুল শেফালিফুল, হে নির্বেদ, তুমি যেন প্রেম। **(তুমি যেন প্রেম)**

(৪) দেবতা, সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে। **(পাবো প্রেম কান পেতে রেখে)**

(৫) কোথা ব'সে ছিলে? যাবার সময় দেখছি শুধুই/ঝরছে পাতার শিখর গলানো কার এলোচুল।/অবসাদ আর নামে না আমার সঙ্গে থেকে,/ছুটে কি তুলিলে শালবন, ঘনবন্ধন চারিধারে? **(অন্ধকার শালবন)**

(৬) রাগের কথা হয় নি তোমায় বলা/ কেবল চেয়ে অমল মুখপানে/তিরস্কার নিভেছে মৃদুদীপ/ কোথয় হায় চলছি, কেবা জানে। **(রাগের কথা)**

(৭) জানি এত কাছে আছো বামনেত্র দ্যাখে না দক্ষিণ/অথবা গোচর ছায়া দেখিবে না প্রতিচ্ছায়াভার/ তা ব'লে কি নাই নাই, প্রেম, বৃক্ষ গ্রাস করো মোরে। **(দেবতার গ্রাস)**

(৮) নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো তোমার কাছে মেলে ধরতে/ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় যাবো। **(নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো)**

(৯) হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভার,/তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে/স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়/সহিতে পারি না, হে সখি, অচল মনে। **(ছায়ামারীচের বনে)**

(১০) সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো/ /অমুক মাসে, বছরে দশবার!/তুমি আমায় বললে, এসো নাকো/জীবনভর কাজের ক্ষতি করে। **(মিনতি মুখচ্ছবি)**।

(১১) এখানে, তার ছন্নছাড়া ব্যথাকাতর বুকের কাছে/অল্প হলেও জায়গা আছে। **(অল্প হলেও জায়গা আছে)**

উচ্ছ্বাস ও মাদকতার বদলে বিষণ্ণ আত্মমগ্নতা, সোচ্চার আত্মঘোষণার বদলে এক নমনীয় আবেগ-আকুতির রণন নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলিতে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে শক্তির প্রেমের কবিতা প্রকৃতিপ্রেমেরও কবিতা : ঝর্না, ফুল, লতা, পাতা, বৃক্ষ, নদী, ছায়াঘন বনানীর এক পরিব্যাপ্ত, সুনিবিড় প্রেক্ষিতে লগ্ন হয়ে আছে প্রিয় নারী, বিষাদের স্পর্শমাখা অনুপম

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য কাব্যগ্রন্থের উপক্রমদর্শিকা সূক্তিটি—'প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার'—কবি নির্বাচন করেছিলেন বোদ্‌লেয়ারের 'Hymne' কবিতার বুদ্ধদেব বসু কৃত তর্জমা থেকে। 'Les Fleur du Mal'-এর নাগরিক কবি বোদ্‌লেয়ারের কবিতা, তাঁর প্রিয় কবি ও পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে বাহিত হয়ে, আকৃষ্ট করেছিলো শক্তিকে। যদিও এই 'হিম' বা স্তোত্রের লক্ষ্য ছিলেন মাদাম সাবাতিয়ে যিনি যৌনসর্বস্বতা থেকে উর্ধ্বায়িত করেছিলেন বোদ্‌লেয়ারকে, বোদ্‌লেয়ারের রচনায়, বিশেষত প্রেয়সী দ্যুভালকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলিতে, অবৈধ প্রেম ও জ্বালাময়ী রিরংসার চিত্র মোটেই অপ্রতুল নয়। বোদ্‌লেয়ারের কবিতার সেই নিষিদ্ধ, নারকী সৌন্দর্যের প্রিয়তমা, কামনার সেই দহন-সংবেগ শক্তির প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের রোমান্টিক স্মৃতিমেদুরতার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চার করেছিলো মর্বিডিটি ও জুগুপ্সার কিছু কিছু চোরাস্রোত। তাঁর বাল্যপ্রেমিকাকে এইভাবে ফিরিয়ে দিয়ে—'তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে' (**নিয়তি**)—শক্তি যখন বললেন, 'শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ', তখনই বোদ্‌লেয়ারীয় নাগরিক পঙ্কিলতার প্রসঙ্গসূত্রে শক্তির কাব্যে 'শেফালিতলার রাঙা বালকে'র স্মৃতিময় গ্রামগীতির জায়গায় 'বারুণীগীতি'র উন্মত্ত প্রণোদনা সূচিত হলো। বিকার ও বিতৃষ্ণা, যৌন সংসর্গের কদর্য জুগুপ্সা বোদ্‌লেয়ার ও বুদ্ধদেব বাহিত হয়ে এলো : 'গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মুত ফুল রক্তপাত/...... যোনির মাঢ়ির খিল হাট করা বেহায়া পাংশুতা.... (**জন্ম এবং পুরুষ**)। লম্পটের 'স্খলিত বা ছিন্নভিন্ন গান' শোনালেন প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে, নদীর পর্বতশীর্ষ থেকে অবতরণের দৃশ্যরূপটি মনে হলো 'বেশ্যার মতন শাদা উচ্ছ্বসিত ফোলা উরু বেঁকে', স-রভস আহ্বান জানালেন, 'লেহন-চুম্বন-যুদ্ধে এসো' (**হে গান হে নৈঋত**)। **স্বকৃত আলেখ্য** কবিতার ক্ষুৎকাতরতার দিনলিপিতে যৌন সম্ভোগ বাসনার তামসিক প্রণোদনা এইভাবে ব্যক্ত হলো : 'ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল/দেহের বিহ্বল স্মৃত, কত দূরে সুন্দরী আমার/পুচ্ছে উগ্র অলক্তক, টানো মোরে যৌন-ক্ষেত্রে, মূলে!' বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো ও ভেরলেইনের কথা এ কবিতায় দেহসর্বস্বতার এই ক্লিন্ন বাতাবরণের প্ররোচক উৎসটি নিরূপণে আমাদের সাহায্য করে। বোদলেয়ার ও তাঁর পরবর্তী ফরাসি কবিকুলের জীবন ও কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের ভাষান্তর, বাল্য ও কৈশোরের গ্রামজীবনের থেকে এসে কলকাতা মহানগরীর পৃথুল অস্থিরতার আবর্তে ঘুরপাক, এক উদ্দাম বেপরোয়া জীবনযাপনের দীক্ষা—এসব কিছু মিলিয়ে দেখলে আমরা *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র নমনীয়, স্মৃতিমধুর 'সনাতনী কৈশোরক প্রেমকবিতার'[৭] ফাঁকে ফাঁকে ইতঃস্তত প্রক্ষিপ্ত এ জাতীয় পংক্তির উপস্থিতির ব্যাখ্যা খুঁজে পাবো :

(১) আমাদের সিক্ত গান আহ্লাদিত জিহ্বা চাটে কূপ/অমৃত বা পারা, গাদ, ফেনায়িত আরণ্যক রজঃ,/উন্মত্ত আগুন ঢেলে ভাসাও সমাজমূল দূরে। (**হে গান হে নৈঋত**)

(২) এ কী জ্বালা হলো প্রভু স্পষ্ট করো তীক্ষ্ণ সূর্যতারা/সামান্য স্তনের উষ্ণে তৃপ্তি পাবে অদ্ভুত বৃদ্ধেরা। (**দ্বিধাহীন**)

(৩) উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল মৃত। (**ঐ**)

স্মৃতিবাহিত বাল্য ও কৈশোর, প্রেম ও প্রকৃতির মোহমুগ্ধতা আর তার বিপরীত মেরুতে নাগরিক প্রমত্ত বাসনার এই যৌবনলিপ্সা আলোচ্য কাব্যে প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের পাশাপাশি উদ্দামতা, ক্লৈব্য, রিরংসার উৎকেন্দ্রিক ক্ষেত্রভূমিটি দেখিয়েছে পাঠককে। কিংবা বলা যায় যে

প্রেম ও প্রকৃতির স্মৃতিময় সৌন্দর্যের নির্জনতা আলোড়িত হয়েছে বোদ্‌লেয়ারীয় ক্লেদাক্ততা ও নারকীয় অভিজ্ঞতার পাপবোধ ও বিপন্নতায়। আবার সেই পাপ ও আর্ত চৈতন্যের দহন-পীড়ন থেকে ত্রাণ ও উদ্ধারের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, যে উদ্ধারের সংকেত ছিলো উৎসর্গপত্রের বোদ্‌লেয়ারীয় চরণযুগলে। প্রেম, প্রকৃতি, অস্তিত্ব, ঈশ্বর, নরক, পাপ, পরিত্রাণ—ইত্যাদি বিষয়কে অনুভূতির এমন তীব্রতায়, এমন বাচনিক ইঙ্গিতময়তায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত সংকলনে বাংলা ভাষার আর কোনো কবি ধারণে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না।

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য-র গ্রন্থনামে প্রেম ও নিভৃতির যে হার্দ্য আত্মমগ্নতার ইঙ্গিত, বিরহ ও অপ্রাপ্তির বেদনার মধ্যেও মধুর স্মৃতি ও প্রীতিময় অনুভবের যে অনুচ্চার গুঞ্জরণ, তাই শক্তির দ্বিতীয় কাব্যসংকলন *ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো* (আশ্বিন, ১৩৭২)-র কবিতাগুলিতে মর্মরিত। প্রেম ও প্রকৃতি এ সংকলনের মূল উপজীব্য। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র কবিতাগুলির নিবিড় পাঠ থেকে সাধারণভাবে এ'কথা বলা চলে যে একান্ত আত্মসর্বস্ব কিংবা ভোগবাদী কামনা-বাসনার উদগ্রতা শক্তির কবিতায় নেই। নর-নারীর মিলনের উচ্ছলতা, যৌনতা, শরীর-কামনার সংরাগ তাঁর প্রেমের কবিতায় অনুপস্থিত। নাগরিক জীবনের বহুমাত্রিক ও জটিল দাবদাহে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর দেহ ও মনের সংযোগ ও আসক্তির সরবতা, বিচ্ছেদ ও বিরহজনিত ক্ষোভ বা তিক্ততার পরিবর্তে এক শান্ত আকুতি, আবেগের নমনীয়তা, হৃদয়াবেগের সুরভি তাঁর কবিতাগুলিকে দিয়েছে এক নান্দনিক মাধুর্য। প্রাত্যহিক জীবন-বাস্তবতায় লগ্ন কবির হৃদয় ; কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের অভিমানাহত আর্তি তাতে রণিত হলেও চিত্তবৈকল্যের সর্বনাশা সংকেত কোথাও বাজে না।

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো-র কবিতাগুলিতেও দেখি প্রেমের এক আত্মকথনধর্মী নম্র উচ্চারণ—অন্তর্মুখী, রোমান্টিক বিষণ্ণতার স্পর্শে মায়াময়, স্মৃতিমেদুর, আবেগের পেলবতায় মণ্ডিত। ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা অথবা কোনো রক্তমাংসের নারী তার অবয়বী রূপে সেভাবে জেগে ওঠে না। যেমন ধরা যাক প্রেম কবিতাটি। এক স্বীকারোক্তিমূলক শান্ত উচ্চারণ। প্রেম এ' কবিতায় হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী এক নিভৃত মধুর অনুভব—'তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে/তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।' তবু এই গভীর সংগোপনেও তার আছে দাহিকা শক্তি—' গোপন রাখলে থাকবে না আর বাইরে যাবে/পারলে হৃদয় দুর্বলতা দেশ জ্বালাবে।' একইরকম ভাবে শব্দ ও চিত্রকল্পের সহজ স্ফূর্তি ও ছন্দের সরল লাবণ্যে আমাদের ছুঁয়ে যাবে **যাকে চেয়েছিলাম তাকে** কবিতাটি। অপ্রাপ্তির বেদনা থাকলেও কবির আক্ষেপে ব্যর্থ প্রেমিকের হাহাকার বা আগ্রাসন কোনোটিই নেই। আত্মকরুণার একটি সুর কেবল বাজে খুব নীচু পর্দায়—'যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না/ যে-ঘাট ছাড়ে নৌকা তাতে গেলাম না/ কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি/ চোখ বুজলে প্রিয় কেবল তোমায় দেখি।/ ফুলগাছে জল দিলাম তাতে ধরেছে ফল/ যে-ঘরে পৌঁছুলাম দেখি ভাঙা আগল/...প্রিয়কে পথ দিয়েও বুঝি দিলাম না....।' **অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে** আর একটি উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক প্রেমের কবিতা, যাতে কবি-দৃষ্টির স্বপ্নঘোর পাঠককে প্রাত্যহিকতার পরিচিত বাস্তবকে ছাড়িয়ে, গৃহস্থালী-সংলগ্ন প্রকৃতিজগতের সীমা পেরিয়ে, নিয়ে যায় এক অতিলৌকিক, অতি-প্রাকৃত বিস্তৃতির রহস্যমণ্ডিত পরিসরে। সমস্ত রাত আকাশে নক্ষত্রদের পুড়ে যাওয়া, পাখা ঝরে যাওয়া বাতাসে, 'নক্ষত্রের তামাম উইল' ওলোট-পালট হয়ে পড়ে থাকা বাগানে ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কবি যেন

অলৌকিক, ফ্যান্টাসিধর্মী এক আবহের আলোড়ন বোঝাতে চেয়েছেন। পূর্বে উল্লেখিত কবিতাদুটিতে প্রেমের নিভৃত অভিজ্ঞতা ও অনুভব ছিলো এক ঘরোয়া প্রাকৃতিক আবহে। আলো ও ছায়া, লতা ও শাখা, নদী ও নৌকা, ফুল ও ফল ছিলো সে আবহের উপাদান-উপকরণ। এখানে কিন্তু কবি সেই লৌকিক গৃহস্থালী ছেড়ে তাঁর প্রিয় নারীটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান এক লোকোত্তর পর্যটনে, যদিও গৃহস্থালীর সহজ স্মারকগুলি সে পর্যটনে তিনি তাঁদের অপরিহার্য সহযাত্রী বলেই মনে করেন—'এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন/পৃথিবীর সমস্ত রঙিন/পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা/গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখী পাড়া ....। যদি কোনো পৃথিবীর কিশলয়ে বেসে থাকো ভালো/যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো/দেখে যেতে চেয়ে থাকো, তাহাদের ঘরের ভিতরে—/আমাকে যাবার আগে বলো তা-ও, নেবো সঙ্গে করে।' গভীর আকাঙ্ক্ষা ও মমত্বে কবি এখানে এক স্বপ্নরাজ্যের অভিলাষী। প্রেমের জগতটি এখানে সম্প্রসারণমুখী ; গাছপালা, আলো ও ফুলের সাহচর্যে তা ভীষণ মানবিক ; বিষণ্নতার লেশমাত্র নেই তাতে। রোমান্টিক দুরাকাঙ্ক্ষা ও ফ্যানটাসিধর্মিতায়, জীবনানন্দের অনুভব ও চিত্রকল্প শক্তির এ কবিতাকে এক ভিন্নতা দিয়েছে। পদ্যগন্ধী ক্রিয়াপদ ও সাধু সর্বনামের ব্যবহারে গড়ে তোলা এক জীবনানন্দীয় প্রত্নভাষারীতির আভাসে সেই রোমান্টিকতা যেন এক নমনীয় নির্জনতায় মণ্ডিত।

বিরহ ও দূরত্ব সত্ত্বেও পূর্বরাগের মধুর স্মৃতি অম্লান থেকেছে কবির মানসপটে। লেভেল ক্রসিংয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ট্রেনে কোনো এক জংশনে বাঁশি বাজার মুহূর্তে ভেসে উঠলো প্রীতিস্নিগ্ধ প্রিয় মুখচ্ছবি :

'মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে/বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে/লেভেল-ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন/এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন?' বুঝতে কষ্ট হয় না যে রেলপথের এ জংশন স্মৃতিপথেরও এক জংশন বটে। আর 'হার্ট ক্রেন' কি এখানে 'ট্রেন'-এর সঙ্গে মিলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত নিছক একটি ব্যক্তিনাম? তরুণ বয়সে আত্মঘাতী মার্কিন কবি হার্ট ক্রেনের নাম এখানে যেন ছন্দমিলের তাগিদকে ছাপিয়ে ওঠে, যেমনটা কবি স্বয়ং মনে করেছিলেন। একটি আলোচনাসভায় এবং *হেমন্তের অবণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যান্তর্গত **স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি** কবিতায় শক্তি এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন : '... ব্রুকলীন ব্রীজ/নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির/মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলাম/অথচ তুমি জানো সবই—আমাদের মিল-মিলন হবার নয়....।' এ বিতর্ক সরিয়ে রেখে এটুকু বলা চলে যে, সহজ অন্ত্যমিলের সাবেকী ছন্দরীতিতে প্রায় শিশুপাঠ্য ছড়ার মতো করে তাঁর স্মৃতিমধুর আবেগকে অভিব্যক্ত করেছিলেন শক্তি আলোচ্য **মনে পড়লো** কবিতাটিতে।

বিষাদ ও প্রেমস্মৃতির মাধুর্য মিশে এক আবেগঘন রোমান্টিকতায় স্পন্দমান বর্তমান সংকলনভুক্ত **চাবি** কবিতাটি। বিচ্ছেদ ও বিরহ এ কবিতার প্রণয়ীযুগলকে পৃথক করে রাখলেও প্রেমিকার 'প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি' প্রেমিকের কাছেই আছে। উভয়ের সম্পর্কের রহস্যরেশ একেবারেই মুছে যায়নি এবং প্রেমিক পুরুষটি এখনও মরমী ও উৎসুক। বিষণ্ন অথচ আবেগমধুর ভাষায় সে বলে—'চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে/রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—লিখিও, উহা ফিরত চাহো কিনা?/অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে/ তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো/লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?' প্রেমিকার এই বিরহ-মধুর স্মৃতি কি 'অবান্তর' হতে পারে? তার

তোরঙ্গের চাবিটি যদিও বা ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তার অশ্রুসজল উজ্জ্বল মুখচ্ছবিটি কখনো ফেরৎযোগ্য হতে পারে? শক্তি এ কবিতায় পাঠককে চমৎকৃত করেন 'লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা', এই পুনরাবৃত্ত পংক্তিটির আশ্চর্য সাধুরীতির দ্বারা। চলিত ভাষায় লেখা এ কবিতার অন্তিম দুটি স্তবক কেন শেষ হলো ব্যাকরণ-বহির্ভূত গুরুচণ্ডালে মিশে? পূর্বতন প্রেমের রোমান্টিক স্মৃতিচারণায় এমন জীবনানন্দীয় ঢংয়ে সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহার কবিতাটিকে এক অদ্ভুত লাবণ্য দিয়েছে। প্রেমের প্রত্ন-স্মৃতির উচ্চারণে এ যেন এক সচেতন প্রত্ন-ভাষারীতি।

শক্তির প্রথমদিকের প্রেমের কবিতা অধিকাংশই একমুখীন প্রেমের কবিতা ; আবেগময়, স্মৃতিমুখর স্বগতোক্তির মতো, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ানুভব, বাইরে থেকে ভেতরের দিকে আসা—'বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা/দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা/হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে/আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে/কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে/ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!' মেঘ-বৃষ্টি-উদ্ভিদের উপমা ও প্রতীকে গড়ে উঠেছে আবেগার্ত অনুভবের ভাষা।

রোমান্টিক প্রেমের বিরহ-বিধুরতার অনুষঙ্গে নির্জন নিসর্গ-রূপের বিন্যাস শক্তির কবিতায় বারবার নজরে পড়ে। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে যায়। যেমনভাবে মিশিয়ে ছিলেন কালিদাস কিংবা রবীন্দ্রনাথ কিংবা ঠিক তাঁর পূর্ববর্তী জীবনানন্দ। বিরহের বিষণ্ণতা চিত্রিত করতে প্রকৃতির উপাদান ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করলে বিষয়টি স্বচ্ছতা পাবে :

(১) বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো/কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল/নেই নিকটে—হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে/চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে/পোড়োবাড়ির স্মৃতি? আমার স্বপ্নে-মেশা দিনও?/চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন। **(যখন বৃষ্টি নামলো)**

(২) শ্রাবণের মেঘ কি মন্থর!/ তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর/ছলোছলো/যে-কথা বলোনি আগে, এ বছর সেই কথা বলো। **(এবার হয়েছে সন্ধ্যা)**

(৩) কাক ডাকে দুপুর রোদ্দুরে/ছায়া কি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে/শুয়ে থাকে, হিজলের ডাল/তোমাকে দেখি না কতকাল। **(সে)**

বর্ষাঋতু, বৃষ্টিপাত, আকাশ কালো করা মেঘরাশি—এ সবই প্রেমের বিরহ-বিধুরতার আবহটি নির্মাণ করেছে, কবিকে যোগান দিয়েছে তাঁর আবেগ-অনুভূতির প্রকাশোপযোগী শব্দবন্ধ ও চিত্রকল্প, টি. এস. এলিয়টের শব্দচয়নে 'objective correlatives'. ছোটবেলা থেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠা শক্তির কবিতায় মেঘমেদুর বর্ষার এইসব ছবি কালিদাসের কবিকল্পনার স্মৃতি বহন করে আনে। শ্রাবণের মন্থর মেঘের মতোই ছন্দের মন্দ দোলায় হৃদয়পুরের বিষাদের সান্দ্রতাকে ব্যক্ত করেছিলেন যে কবিতায় সেই **আনন্দভৈরবী** সতেজ ও সবুজ বর্ষার স্মৃতিচারণে বিষাদময় : 'আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি/এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা/উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল/আনন্দ ভৈরবী।' এ কবিতাতেও সাধু-চলিতের মেশামিশি; গোঠের রাখাল আর মোহন বাঁশির অনুষঙ্গে একদিকে যেমন পুরাণ-স্মৃতিবাহী এক প্রাচীন মায়াময় পরিবেশের ব্যঞ্জনা, তেমনি অন্যদিকে 'লাফ মেরে

ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি'র শাণিত আধুনিকতার প্রতিভাস। এ কবিতাতেও আর্ত হৃদয়ের অনুতাপ ও বেদনা; নিভৃত, স্মৃতিলাঞ্ছিত অন্তঃপুরে অভিমানী রক্তক্ষরণ : 'সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী/তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর/ সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি/আনখ সমুদ্দুর।' 'সেই ঘর' যে 'হৃদয়পুর' তা যখন আমরা জানতে পারি তখন ছবির এলিয়ে পড়া আর প্রেমের আনন্দভৈরবীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। শক্তির প্রেমের কবিতা এক গভীর নির্জন আত্মমগ্ন উচ্চারণ ; বিরহবেদনায় নিষিক্ত ; মিলনের প্রাপ্তিসুখ ও উল্লাস কিম্বা অপ্রাপ্তিজনিত দহন-জ্বালা তাতে নেই।

মনে কি তোমার, ঝাউয়ের ডাকে, জুলেখা ডব্‌সন, হৃদয়পুর—এগুলি সবই একমুখীন প্রেমের কবিতা। প্রেমিকা সর্বত্রই দূর পরবাসে। তার সঙ্গে একদা সাহচর্যের স্মৃতি কবিচিত্তে তরঙ্গ তোলে। সর্বত্রই সেই স্মৃতিচিত্রমালা ওতোপ্রোতো হয়ে থাকে অরণ্য ও নিসর্গের ইন্দ্রিয়বেদী নানা অনুপুঙ্খের সঙ্গে :

(১) গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম/ তোমায় ভালো/এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে-মেঘে -মেঘেই/দিন ফুরালো/এখন নিথর রাত্রিবেলা/জলের ধারে কেবলি হয় জলের খেলা/অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে/আমায় গভীর রাত্রে ডাকে/ও নিরুপম ও নিরুপম ও নিরুপম........ **(ঝাউয়ের ডাকে)**

(২) ঈশানকোণে অমনোযোগে/ মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে/দুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন/চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে/মনোস্থাপন করি ভিক্ষে/তোমার জন্য জুলেখা ডব্‌সন।

(জুলেখা ডব্‌সন)

'হৃদয়পুর' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় শব্দগুলির অন্যতম। উজ্জ্বল ও কল্লোলিত 'রাজধানী'র বদলে নিভৃত 'হৃদয়পুরে'র নানা জটিলতার অনুরণন তাঁর কবিতায়। বয়ঃসন্ধি ও প্রথম যৌবনের প্রেমের শিহরণ অতিক্রম করে, বিষাদ-প্রার্থনা-প্রত্যাশার আকুতি দূরে ঠেলে দিয়ে এখনও তিনি প্রাপ্তবয়স্কের সংরাগে উত্তীর্ণ হন নি ঠিকই, তবে এ কেবল মুগ্ধ নিবেদনের একমাত্রিক প্রেমের কবিতা নয় :

'তখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা/হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা/ডুবিয়াছিলো নদীর ধার আকাশে আধোলীন/সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন/কী কাজ তারে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে/সতর্কিত বন্ধদ্বার প্রহরা চারিভিতে/কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনো, এই বেলা/হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালো ছেলেখেলা?' **(হৃদয়পুর)**

সেই ছন্দের মন্দ-মধুর তরঙ্গদোলা ; সেই ক্রিয়াপদ, বিশেষ্য ও সর্বনামের সাধুরূপ ; সেই সহজ চলিত শব্দের সঙ্গে তৎসম ও প্রাচীন শব্দের মিশ্রণ ; সর্বোপরি কবিতার আবহে সেই আলো ও অন্ধকারের রহস্যময় খেলা। প্রতীক্ষা ও প্রত্যাহার, আসক্তি ও ঔদাসীন্য, স্মৃতিময় বিষাদ ও আত্মমগ্ন উচ্চারণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা মন ও মননের এক অপরূপ জগৎ।

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো-র বেশিরভাগ কবিতা শক্তি লিখেছিলেন হিজলিতে মাস তিনেকের অবস্থানকালে। সেখানে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্কুলে চাকরী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই কোয়ার্টারে ছিলেন শক্তি। সেখানেই 'প্রায় ঘোরের মধ্যে' লিখেছিলেন কবিতাগুলি।[৮]

'গ্রন্থজগৎ' থেকে আষাঢ় ১৩৭৩-এ প্রকাশিত হয়েছিলো শক্তির দীর্ঘতম কবিতা **অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে**। নদী-পাহাড়-জঙ্গলে বিস্তৃত এক আশ্চর্য, আদিম, অবিনাশী প্রকৃতি, যা ছিলো শক্তির চাইবাসা ও তার পরবর্তী সমগ্র উত্তরবঙ্গ পর্বে তাঁর পর্যটনময় জীবন ও কবিতার অমোঘ আকর্ষণ, **অনন্ত নক্ষত্রবীথি**..... তারই এক চমকপ্রদ কাব্য-বিবরণী। কবি-বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্তর জলপাইগুড়ির বাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা বসে লিখে ফেলেছিলেন শক্তি।[৯]

অরণ্য ও পর্বতের এক সর্বগ্রাসী টানে নেশার ঘোর-লাগা এক সঞ্চরণ-অভিলাষী খানাতল্লাশ করে বেড়িয়েছেন যে মায়াবী ভালোবাসার, স্থান থেকে স্থানান্তরে অনুভব করেছেন যেসব আনন্দ ও বেদনা, এ কবিতা সে সবেরই এক আবেগমণ্ডিত, সঙ্কেতময় অভিজ্ঞান; কবিতাটির শিরোনাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কীট্‌সের বিখ্যাত সনেট 'ব্রাইট স্টার'-এর কথা, এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যে কবিতায় প্রেমের চিরন্তনতার প্রতীক। শক্তির কবিতায় 'তুমি' তেমনি এক দূরবর্তী অথচ পরিব্যাপ্ত উজ্জ্বলতায় উৎকীর্ণ হয়ে থাকে আকাশ ও অরণ্যের অন্ধকারে। কল্পনার মিস্টিক জাদুস্পর্শে যেন কবির প্রেম ও প্রার্থনার নারী হয়ে যায় একঅপরূপ চিত্রকল্প— 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি' ; জঙ্গল ও আকাশের অন্ধকারে এক অনিঃশেষ রাহসিক সৌন্দর্য। জীবনানন্দের স্মৃতিবাহী এই গ্রন্থনামে যে রোমান্টিক দূরাকাঙক্ষা, নিমগ্নতা ও বিমূর্ত রহস্যের মায়াকুহক রয়েছে তাই শক্তির অধিকাংশ প্রেমের কবিতার কুললক্ষণ।

অবিরত চলতে থাকা, চলতে চলতে দেখতে থাকা এই কবি খেলার ছলে বলে ওঠেন— 'প্রতিটি মহল আমি ঘুরে দেখি—প্রতিটি পাথর/নখ দিয়ে তুলে দেখি—সিঁড়ি বেয়ে উঠি আর নামি/একতলায়, মনে হয়, আছো তুমি—তৎক্ষণাৎ নিচে/দৌড়ে গিয়ে ভাবি তুমি ওপরে উঠেছো ঘুর-পথে/পথ তো অনেক আছে—লুকোচুরি খেলার সময়/সেই পথ বেড়ে গিয়ে অজস্র-সহস্র হতে পারে।' এই মায়াবী লুকোচুরি, এই মৃদু চপল আতুর অন্তরচারিতা এক অনুপম আস্বাদ্যতায় যেন মন ভরিয়ে দেয়। স্থান থেকে স্থানান্তরে চলতে থাকা পর্যটকের মায়াময় দৃষ্টিতে, অরণ্য-পাহাড়-গার্হস্থ্যের নানা প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের স্মৃতিচারিতায় শক্তির কবিতায় নারী হয়ে ওঠে অপার্থিব, অন্ধকারের পরিমণ্ডলে এক দূরবর্তী আলোরেখা—'তুমিই নক্ষত্রবীথি—তাই শুদ্ধ তৃষ্ণার আঁধার/ তোমাকে না দেখা ভালো/তুরপুন হাতে, ভাবো তুমি,/কাছেই ইঁদারা খুঁড়বে— তুলবে জল অনন্তস্রোতসা।'

শক্তির সব প্রেমের কবিতাতেই ঘুরে ফিরে আসে মৃত্যুর কথা। ভালোবাসার সব স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিদায়ের সুর ; থাকে মৃত্যুর হাতছানি। এই মৃত্যুবোধ প্রেমচেতনাকে এক অপূর্ব মায়ায় বিধুর করে তোলে—'নিচের পৃথিবী থেকে ওপরের পৃথিবীতে চলে যেতে হবে/বিদায় নেবে না তুমি/বিদায়-মুহূর্তে ওড়ে অসংখ্য রুমাল/নিকটের শাখা থেকে দূরে বুঝি যাবে কিশলয়ে......।' স্মৃতিকাতর কিন্তু অদ্ভুত এক বিষাদময় প্রশান্তি শক্তির প্রেমের কবিতাকে জাদুস্পর্শ দেয়, যার চমৎকার উদাহরণ *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* গ্রন্থের **চাবি** কবিতাটি। **অনন্ত নক্ষত্রবীথি**.....'র এই চরণগুলিতেও সেই বিষণ্ণ স্মৃতিমেদুরতা—'পুরাতন বইগুলি রেখেছো কি ঘরে/আজো কি আমাকে মনে পড়ে/নির্দ্বিধায়?/হেমন্ত-সন্ধ্যায় গাছের শিথিল পাতা ওড়ে ঘূর্ণিঝড়ে/আজো কি আমাকে মনে পড়ে?' অনুরূপ বিষাদঘন আতুর জিজ্ঞাসা—'জীবনে পেয়েছি আমি ঢের/সে সব ছাড়াতে/ কতোবার যেতে হবে তোমার পাড়াতে?/চিঠিতে তোমার/ঠিকানা দাওনি, তাই বুঝে উঠা ভার/রয়েছো কোথায়/এখানে আকাশে মেঘ শীতের সন্ধ্যায়।'

'প্রেম যেন দেহে এসে না ঠেকে আমার এমন সংজ্ঞাই ছিলো'—এ রকম পংক্তি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না দেহজ বাসনার ঘূর্ণিপাকে জড়াতে চান না কবি। বাসনা যে একেবারে বর্জিত তা হয়তো নয়, তবে এ এক অদ্ভুত খেলার উল্টো প্রক্রিয়া—'বাসনার বল আমি গড়িয়ে দিয়েছি/সে যাবে অনেক দূর/ গোলপোস্ট হাতে নিয়ে ছুটেছি পিছনে তার পাগলের মতো/ আমার একারই খেলা শীত-গ্রীষ্মে, দিনে ও নিশীথে।'

জীবনানন্দের কবিতার দূরবর্তী মায়াবী নারীদের মতো শক্তির এ কাব্যে বারবার স্মৃতিবাহিত হয়ে আসে এমন এক কালপ্রতিমা যা বোধ ও অস্তিত্বের অতীত এক স্বপ্নচৈতন্যের উজ্জ্বল তটরেখা হয়ে জেগে থাকে— 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি—সমাধির দ্যোতনা তোমার বাহুতেও আছে/ মেঘেও পায় না টের —নীলিমার গভীর আরাম/আমাদের কাছে/ বোধ হয়— বোধের ওপারে/নিখিল তরণী ভেসে চলে একা মাঝিমাল্লাহীন/দিঙ্‌রেখা দুস্তর/অনন্ত নক্ষত্রবীথি—মধ্যে আছে তারই জন্মান্তর।'

সোনার মাছি খুন করেছি (আষাঢ় ১৩৭৪) গ্রন্থের কবিতাগুলিতেও সেই একই বিষয়সূচী: প্রেম, প্রকৃতি, পর্যটন, জীবন ও মৃত্যুর অমোঘ টানাপোড়েন। তবে দিনযাপনের বাস্তবতাকে ছাপিয়ে এ কাব্যে দেখা যাচ্ছে ফ্যানটাসির এক প্রতীকী জগৎ ; যা উদ্ভট, অ-লৌকিক, রহস্যময়, পরাবাস্তবতার লক্ষণাক্রান্ত। বিপন্নতা, সংশয় ও বিচ্ছিন্নতাবোধ উঁকি দিয়ে যাচ্ছে কবির বেপরোয়া পরিক্রমণের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে। ভাষার নানা বিচ্যুতি, উপমা ও চিত্রকল্পের বদল, প্রতীকী রীতির ব্যবহার, অতিকথন, পুনরুক্তি, ছন্দ ও ছন্দহীনতায় *সোনার মাছি খুন করেছি* শক্তির এক ব্যতিক্রমী স্বাদের কাব্য-সংকলন।

জীবন ও মৃত্যুর সমগ্র টানাপোড়েন, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বিস্তৃত পরিসরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের মন্ত্র এমনভাবে উচ্চারিত হয় যে তাঁর প্রেমকে সেই সমগ্রতা থেকে বিযুক্ত করে দেখা যায় না। আসক্তি ও বৈরাগ্য যে প্রেমের দুদিকের দুটি মুখ। জীবন ও মৃত্যুতে তারা সমানভাবে লগ্ন হয়ে থাকে। ধরা যাক্ **একদা এবং আমি**-র এই স্বীকারোক্তিমূলক পংক্তিগুলি, প্রচলিত রোমান্টিকতার উপমা ও চিত্রকল্প ছেড়ে যেখানে শক্তি অসঙ্কোচে আসক্তির কথা বলেন—'তুমি আছো, এঁটে আছো আমার শরীরের নানান জোড়ে/রক্তপিপাসু জোঁকের মতন/আছো আলোর ভিতরে কেরোসিনের ফিতের মতন আঠায় ভিজে/আছো যেমন ধুলোর ভিতর জীবাণু থাকে, জীবাণুর ভিতর প্রাণ....।' প্রতিটি উপমাতেই এক নিবিড় জৈব মিথোজীবিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত। 'সস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে' তিনি বন্দী নন ; অথচ তিনি স্বীকার করেন এক কঠোর বন্দীত্ব যা থেকে মুক্তিও তার কাম্য নয়—'বন্দী আমি তোমার আঁচলের গিঁঠে চাবির মতো, খুচরো পয়সার মতো,/বন্দী আমি তোমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে অলংকারের মতো, চুলের মতো,/তোমার শরীরের আবহাওয়ায় নির্জন জলের মতো, হাওয়ার মতো,/বাথরুমের সাবধানী দেয়ালের মতো/... আমি বন্দী, আমি বন্দী! —তুমি আমায় মুক্তি দিতে এসো না।' লক্ষণীয়, শক্তির প্রেমের কবিতায় এখন নারী শরীরের আবেদন, শরীর-সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হচ্ছে, যদিও তাতে যৌনতার কোনো স্থূল ভাবাবেগ নেই। আঁচলে বন্দী চাবি, খুচরো পয়সা, শরীরের ভাঁজে বন্দী অলংকার ও কেশগুচ্ছ থেকে যখন তিনি চলে যান 'তোমার শরীরের আবহাওয়ায় নির্জন' জল-হাওয়ার উপমাতে তখন কবির 'প্যাশন' নিছক শরীর-সান্নিধ্যের থেকে সূক্ষ্মতর ও মধুরতর এক সংরাগের আভাস এনে দেয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে কবি

যিনি সমুদ্র ও পাহাড়ের, প্রকৃতি ও বন্ধু-সংসর্গের এক বিশাল ও মুখর জীবনের প্রেক্ষিতে তাঁর প্রিয়-নারীর সঙ্গে অনিবার্য সাহচর্যে লিপ্ত হয়ে থাকার কথা বলেন তিনিই আবার মৃত্যুকে স্বীকার করে নেন ভাবালুতাবর্জিত এক দার্শনিক উদাসীনতায়—'মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি—মৃত্যু থেকে পার নেই,/যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে/বড়ো ফাঁদ ছোটো হবে, করতল-মুষ্টিতে এসে জমে যাবে/ভাগ্যরেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যু জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ ; মৃত্যু বেঁচে থাকারই অনিবার্য শর্ত। জীবন ও মৃত্যুর এই মিশ্র আলেখ্যর প্রেক্ষাপটে তাই শক্তির প্রেম-প্রকৃতি-পর্যটন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ও পুনরাবৃত্ত বিষয়গুলিকে যাচাই করে দেখতে হবে।

সোনার মাছি-র কবিতাগুলিতে শক্তি প্রতীকী রীতি বা আঙ্গিককে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রেই বক্তব্যবিষয়ের সুগম্যতার বদলে যেন একটি 'রূপ' বা 'ফর্ম' প্রধান হয়ে উঠতো। বোঝা যেত যে খুব আবিষ্ট হয়ে লিখছেন তিনি, যেন এক ঘোরের মধ্যে। ভাবগত ও শব্দার্থগত বিচ্যুতির কারণে একটি সর্বতোগ্রাহ্য, যুক্তিক্রমনিষ্ঠ বস্তু-অর্থ স্পষ্ট হতে পারছে না। এমনই একটি রচনা **পাখি আমার একলা পাখি**। এ কবিতাতেই প্রথম যৌন মিলনের কামনা প্রতীক ও চিত্রকল্পের আপাত অসংলগ্নতার আড়ালে নিশ্চিতভাবেই উঁকি দিচ্ছে—'স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়/বাদুড় তুমি একলা পড়ো,/আমি দাঁতেই কাটছি সুতো/ঢুকবো সমুদ্দুর-লেগুনে—নীল জলে লুটোচ্ছে মোহ/আধভেজা ফুল-সায়ার মতন, সেই সায়াতে জড়িয়ে আছে/জল, জেলি, লোভ, রক্ত আমার—/পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি।' রাত দুপুরে একটি সোনার মাছি মাড়িয়ে ফেলা কিম্বা একটি স্বাদু ফলের ওপর নিশাচর বাদুড়ের আগ্রাসী হামলা নিশ্চিতই যৌন-সংসর্গের প্রতীক, তবে এই পৌরুষের পরাকাষ্ঠায় শক্তি ইঙ্গিত করেন ক্লেদ ও মর্বিডিটির, খাঁচার মধ্যে দুটি পাখির বাসনা-পঙ্কিল বন্দীত্ব—'.....সারা জীবন খাঁচার মধ্যে বাসনা-কাঠি/ঘিরে রেখেছে ন্যাংটো শরীর—এদেশে কাপাস ফলে না/খাদ্য জলের নেই ব্যবসায়, তাই থুতু-পেচ্ছাপের ভক্ত/সব শরীরটা ঠুকরে খেয়েও দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা—/নোংরা পাখি, নোংরা পাখি— নোংরা-ঠোংরা দু-জন পাখি।' শহর থেকে দূরে পল্লীগ্রামের উন্মুক্ত ও অকপট পরিবেশে যাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল, মহানগরের খাঁচায়, আসক্তি-বাসনা-কাপট্যের ফাঁদে এখন তাঁর বন্দীত্বের অনুভব।

অনুরূপ একটি পরাবাস্তবতার লক্ষণযুক্ত প্রতীকী কবিতা **নীল ভালোবাসায়**। এখানে ফিরে এসেছে রাত দুপুরে একটি সোনার মাছি খুন করার প্রসঙ্গটি। পূর্বে উল্লেখিত কবিতাতে সমুদ্র-লেগুনের যে নীল জল যৌন ঈপ্সার বর্ণ-সঙ্কেত সূচিত করেছিল, সেই নীল রং এখানেও ভালবাসায় প্যাশনের তীব্রতাকে আভাসিত করছে। প্রেমের দেহজ কামনা-বাসনা-সংসর্গের দিকটি এ কবিতাতেও সোচ্চার—'.... ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি/দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি/এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী—সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না/খুন করে নীল ভালবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।' প্রেমের মধ্যে ভোগ ও সংসর্গের যে দিকটি রয়েছে তার আবর্তে জড়িয়ে পড়া, ডুবে যাওয়ার কথা পাই **বিষ পিঁপড়ে** কবিতাটিতে। নারীকে এখানে কবি দেখেছেন গাছের প্রতীকে, যেভাবে মানুষকে দেখা ছিল শক্তির প্রিয় ব্যসন—'সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম/আস্তে, যেমন জামরুলে,

ওই নীল ভিজোনো গাছের ছালে/ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুরুষ্টুবীজ/ক্ষেত ভরে যায় শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—/কারণ ছিল? কারণ আছে? তালসুপুরি গাছের কাছে/কারণ ছিল—কারণ আছে।' প্রেমের বাসনা ও দহনের দিকটি, আকাঙক্ষাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের নিষ্ঠুরাচরণের প্রবৃত্তি এক বেপরোয়া প্রেমিকের যৌনতাকে চিনিয়ে দিয়েছে। তবে এখানেও সেই নারী ও প্রকৃতির মেশামিশি; বীজ বপন ও ক্ষেতভরা শস্যের সম্ভারে যৌনমিলনের সার্থকতার ইঙ্গিত। কবিতাটিতে শেষ পর্যন্ত বিযুক্তি ও মোহভঙ্গের ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা ফুটে ওঠে। দেহ ও মনের কাঙ্ক্ষিত মিলনের মাঝে দ্বন্দ্ব জটিলতার দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়ায়—'ঐখানে গোপন ডুবুরি তোমার জলে স্নান করেছে।/সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে তোমার দেওয়া কুসুম-গন্ধ/হলুদ তোমার হলুদ, এই কি সারাজীবন সন্ধ্যাবেলার/সঙ্গ দেওয়া? ভবিষ্যতের ঘর-বাঁধা খড় খুঁজতে যাওয়া?/এই কি তোমার রাত পোহানো, পথিককে পথ দেখিয়ে আনা?/এই কি তোমার প্রতিচ্ছবি, যে ছিলো বুক ভরিয়ে, ব্যেপে—আপাদমাথা সারা শরীর—তাই শরীরে ছড়িয়ে দিলুম/সর্বনাশা বিষের জাদু.... ।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দুটি বিশেষ রং—নীল ও হলুদ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে *সোনার মাছি*-র প্রেম, প্রকৃতি, পর্যটনের কবিতাগুলিতে। সমুদ্র-লেগুনের জল নীল, ভালোবাসার রং নীল, জামরুলের ভিজে ছাল নীলবর্ণ, নীল শিফন ইত্যাদি। নীল সমুদ্রের গভীরতার রং, আকাশের অনন্ত বিস্তারের রং। আবার তা ফেনিল কামনার রং, বিষের রংও বটে। হলুদ পর্দা, হলুদ বাসনা, হলুদ নদী, পাতা ফল আর শস্যও হলুদ। আবার হলুদ তো বিষণ্নতা ও রুগ্নতার রং, হেমন্ত প্রকৃতিতে ঝরা পাতার রং। নীল ও হলুদ, এই দুটি রং শক্তির কবিতার মূল বিষয়—বাসনা ও বৈরাগ্য, আসক্তি ও বিযুক্তির দুর্মর টানাপোড়েনকে যেন ইঙ্গিত করছে।

সোনার মাছি-র প্রেম ও নারীসঙ্গ বিষয়ক কবিতাগুলিতে অনেক সময়ই এক ধরনের যৌন-কাতরতার ব্যাপার এসেছে যা এক প্রাপ্তযৌবন কবির বাসনা। তবে তাকে নিছক 'বাসনার বিকৃত মুখ'[১০] বলা বোধ হয় সঙ্গত হবে না কারণ এর সঙ্গে মিশে আছে এক খেয়ালী কৌতুকপরতা, আর এই সংকলনেরই অন্য অনেক রচনায় পাওয়া যাবে প্রেম ও নারী বিষয়ে রোমান্টিক আবেগ ও অনুভবের রহস্য ও সৌন্দর্যবোধ। প্রথমে যৌনাকাঙ্ক্ষার লক্ষণগুলি কিভাবে ধরা পড়েছে নীচের পদ্যাংশগুলি থেকে দেখা যাক :

(১) উপর থেকে নিচুতে চোখ কেনই বা যায় শকুনপাখির/চরিত্রে টান? কিংবা সত্যি দোষ ছিলো তার সজল আঁখির/বলতে পারো মাংসাশী জিভ অমৃত-আস্বাদী তৃণে/সুখের স্বর্গ পাচ্ছে খুঁজে? কোন্ নারী চরিত্র বিনে/খায় পর পুরুষের রক্ত?

(তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই)

(২) আমার যে সব লক্ষ্যগোচর তুমি আমায় এমনি ভাবো/শিখর থেকে নখ অবধি পারলে এক লহমায় খাবো—/যেমন খেতো বক-রাক্ষস, সাল-পুরোনো ম্যাজিকঅলা/আমার বুকের ওপর ভিজছে, তাই ভেজেনি বুকের তলা— **(এই বসন্তে বৃষ্টি হবে)**

(৩) বেশ করেছি আবোল-তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের/আধখানা খাই, আধলা রাখি—বুক ভরে বাস হাস্নুহানার/এই খেলাটি একলা আমার, তোর সেখানে খেলতে মানা।

(এই খেলাটি একলা আমার)

(৪) ঝরনার প্রান্তে হলো বনভোজন/টিলার ছায়ায় তোমার মলাট-হারা দেহে এসে জমেছিলো নুন। **(পুনর্বিবেচনা)**

(৫) যখন নার্সের বুকে হাসপাতালের রাত খুলে দেয় অবাধ বাদুড়। (ঐ)

(৬) মনীষার ভালোবাসা মাস্তুতের মতো ছিলো উঁচু/কামারপুকুরে গিয়ে একদিন মনীষাকে খুব আদর যতন প্রেম করা হলো। (ঐ)

(৭) মনীষার ভালোবাসা রাতের বাজার পেলো ব্যর্থ চীনদেশে। (ঐ)

নির্বাচিত এই পংক্তিগুলিতে নারীদেহের সংসর্গ বাসনা, প্রেমের ক্ষুৎপীড়ন যেমন আছে, তেমনি লক্ষণীয় যে আদর-সোহাগ, মিলন-চুম্বনের প্রসঙ্গ উপমা-চিত্রকল্পের উদ্ভটত্ব, বাসনা-সংরক্ত কবিমনের ক্ষোভ ও অপূর্ণতার ইঙ্গিতে এক ভিন্ন পরিমার্জনা পেয়েছে। ষাট দশকের হাংরি আন্দোলন ও অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের কবি-ব্যক্তিত্বের কিছু প্রচ্ছায়া এ জাতীয় ক্ষুৎকাতরতার আড়ালে হয়তো কাজ করে থাকবে। তবে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে বাসনা-বিকৃতির প্রতিচ্ছবি নেই; আছে এক চাপল্য ও প্রগল্‌ভতা, ইঙ্গিতধর্মিতা এবং বাস্তব জগতের সংশয় ও বিষণ্ণতার ছাপছোপ।

এ সবের পাশাপাশি এমন সব পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে যেখানে সংযত, ভাবুক কবির মায়াময় উচ্চারণ আমাদের স্পর্শ করে নমনীয় মাধুর্যে, যেখানে যৌনতা ও নারী দেহসংসর্গের অনুষঙ্গ নেই :

(১) তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারি নি জানতে/এই দেশে বসতি করে শান্তি শান্তি শান্তি/তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে। **(তোমার হাত)**

(২) এখন উঠে দাঁড়াও তোমায় দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে যাবো/যেমন বাতির চিবুক, যেমন পাতার শিশির শুকোয় রোদে....। **(এখন উঠে দাঁড়াও)**

(৩) আমাকে তুমি যত চিঠি লিখতে ভালোবাসার ভাষায়,/আমি সমস্ত এক পুরাতন সিন্দুকে রাখতাম তুলে।/দীর্ঘ জীবন আমাদের/অবশ্যই তার চেয়ে অল্প ছোটো ছিলো আমাদের ভালোবাসার কালাকাল। **(ভস্ম অবশেষ)**

(৪) আমাদের বাল্যকালের মোহভরা/ভালোবাসার উত্থানপতন ভাঙাচোরা ঘটেছিলো খুব/আমাদের সান্ত্বনা—কেউ কাউকে ভুলে যাইনি আজও/আমাদের সান্ত্বনা—এক সময় ভালোবাসা বলে পরাগ ফুলের ভিতরে জেগেছিলো/আমাদের সান্ত্বনা—একদিন নদীর তীরে বসে গান শোনাতে চেয়েছিলাম। **(পশ্চাদ্‌ভূমি)**

(৫) অনেকদিন তোমার চিঠির ভিতরের ভাষার বিস্ফোরণ দেখিনি আমি/অনেকদিন তোমার মুখের উপর নাক ঘসে-ঘসে তুলিনি সুগন্ধ/অনেকদিন তোমার বুকের উপর দুটি কলসে ঢেউ দিতে পারিনি আমি/অনেকদিন জলে ভাসাইনি আমি তোমার মুখ। (ঐ)

এসব উদাহরণে আগ্রাসনের লক্ষণ নেই ; আছে এক শান্তস্বভাব রোমান্টিক প্রেমিকের স্মৃতিময়, হার্দ্য অনুভব। শিশির, পরাগরেণু, পুষ্পগন্ধ ইত্যাদির অনুষঙ্গে ভালোবাসার ছেড়ে আসা স্মারক ও সংবেদনগুলিকে কবি ফিরে দেখেছেন এক আবেগ ও বেদনাঘন স্মৃতি-পর্যটনে। চপল বাসনার ক্ষুৎকাতরতা আর ভালোবাসার বেদনাময় স্মৃতি ও প্রার্থনা—এই দুই প্রতিমুখী টানে *সোনার মাছি*-র সবিস্ময় ও স্পন্দমান প্রেমের জগৎ।

অনন্ত নক্ষত্রবীথি...'র দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পংক্তিটি ছিলো এক সুপ্ত ইচ্ছার বার্তাবহ—'প্রতি ঘরে ঘরে যেতে ইচ্ছে করে পিওনের মতো প্রতিটি বুকের কাছে' ; *হেমন্তের অরণ্যে আমি*

পোস্টম্যান (ফাল্গুন, ১৩৭৫)-এ সেই ইচ্ছার পরিপূরণ, বাস্তব-অধিবাস্তবের এক আলো-আঁধারি জগতে—'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক/তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন/কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে/অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি...।'

কবি দিলীপ কুমার সেনের স্মৃতিতে রচিত, এই সংকলনভুক্ত **স্মরণিকা** নামক কবিতাটিতে একটি অদ্ভুত লোভনীয় পংক্তি যেন অকস্মাৎই তুলে ধরেছিলেন শক্তি—'পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই'। 'আমরণ প্রেম' বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু কেন 'শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই'? তবে কি 'বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে' ঘুরতে ঘুরতে একাকিত্বের মধ্যে কোনো ভয় দেখেছিলেন? 'অন্ধকার অবহেলা অন্ধকার বড়ো বেদনার' বলেই কি শয়নঘরের প্রতি কবির মুখ ফেরানো এখন? ষাট দশকের সীমান্তে এসে শক্তির কবিপ্রসৃতি মগ্নসত্তা কি বদলাচ্ছে? তিনি নিজে কিন্তু বদলেরই পক্ষে—'ধীরে ধীরে/যেভাবেই হোক/বদলে নেবো/বদলে বদলে নেবো' (**ধীরে ধীরে**)।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে শ্রীদিব্যেন্দু পালিত ১৩৮০-র 'দৈনিক কবিতা'র এক সংখ্যায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য উপস্থাপিত করেছিলেন তার একটি অংশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'জীবনানন্দের পর এবং এ পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই সম্ভবত একমাত্র বাঙালি কবি, **কবিতাকে যিনি ব্যবহার করেছেন অপরিশীলিত আত্মার অনুকরণে ; যাঁর অধিকাংশ রচনাই অন্ধকার চৈতন্যের কাব্যরূপ।**'[১১] '*হেমন্তের অরণ্যে....*'র কবিতাগুলিতে নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণার প্রচ্ছায়ায় ধূসরিত চেতনার অন্তরালে অবচেতন উঁকি দিয়ে গেছে। হঠাৎই যেন মানুষ তার একাকিত্ব দেখে ভয় পেয়েছে ; নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার তিমিরবিলাস থেকে সন্তর্পণে সরে আসতে চাইছে। 'হেমন্তের অরণ্যে' যেসব আশ্চর্য পোস্টম্যানদের দেখেছিলেন কবি 'অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা'য় তারা একেবারে অন্যরকম—'আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা/যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের হারিয়ে যেতে থাকে।' একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার তিমির যে আর বিলাসের সামগ্রী নয় তা কবি স্বীকার করেন অকপট আন্তরিকতায়—'আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি/ আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে/আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক/আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি/ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে।' এক প্রেমহীন, নিরুত্তাপ সময়ের বিষাদে সান্দ্র কবি-চৈতন্য তিমির বিলাসের লক্ষণ ও কারণগুলি সঠিক চিহ্নিত করে—'আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর/বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি/...অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি/অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের/অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের/অনেকদিন আবোলতাবোল শিশু দেখিনি আমরা।'

এই সংকলনভুক্ত প্রেমের কবিতায় বিযুক্তির বেদনা, আত্মগ্লানি, মর্মমূলে প্রোথিত নিঃসঙ্গতাবোধ কবিকে আর্ত ও বিষণ্ণ করে রেখেছে :

(১) কতো ক্রূর ভালোবাসার আকাঙক্ষা করেছিলাম আমি/যে সরোবরে ঘাট নেই—চেয়েছিলাম আমি সেই সরোবর/আকাশে ভেসে যেতে যেতে সরোবরে ঝ'রে যেতে হয়/লাফিয়ে পড়তে হয় ক্রমাগত/তেমন ক্রূর ভালোবাসার আশায় বন্দুক হাতে/নিদ্রিত হ'য়ে পড়েছিলাম আমি।

(আমায়, পথ থেকে পথে)

(২) তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখি/কুয়া কি কঠিন কালো জল নিয়ে একাকীর খেলা/খেলছে নিশ্চিন্তে....। **(তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে)**

(৩) তেইশ বছর বসন্ত আর ঘুরছে তেইশ কুকুর সঙ্গে/হৃদয় আমার হৃদয়, এখন উৎপীড়িত কোন্ ভ্রূ-ভঙ্গে?/ওলোট-পালোট অজানা পথ, চারদিকে নিবদ্ধ কাঁটায়/এই দেহ তো বন্দী যীশুর? চুম্বনে তাই ওষ্ঠ আঁটা/এবং সটান, নম্র আঁখির দৃষ্টিতে তার মুখটি পোড়ে..../এই বিদেশে ভাগ্য ঘোরে! **(তেইশ বসন্ত আর তেইশ কুকুর)**

স্মৃতি-বিস্মৃতির নানা চিহ্ন ও ছবি, বিরহ ও মৃত্যুর নানা কল্পচিত্র ফুটে উঠেছে সহজ কথ্যরীতির ঘরোয়া ভঙ্গিতে : (১) 'এত আলো, মেঘ এত, শেফালিতলা ভরে মখমলের মতো এত সনির্বন্ধ গাঁদাফুল/আমারও কাজে লাগলো না আজ/যেমন বিষণ্ণভাবে আমি/যেমন বিষণ্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করে ব্রাহ্মণ/তেমনভাবে আমার অল্পবিস্তর স্মৃতির সঙ্গে গা ঘষছিলাম আমি/মাঠের গাভী যেমন শিমূল গাছে, কিংবা বেড়াল যেমন মুঠিভরা থাবায়/তেমনভাবে তোমার স্মৃতিগুলি কররেখা আঁচ করার মতো/মুখের উপর তুলে ধরেছিলাম আমি' **(কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ)** এবং (২) 'তোমরা সকলেই তোমাদের আপনাপন কবরে শুয়ে রয়েছো/তোমার বোন চারুশীলা পরীক্ষার পর কবরে শুয়ে আমার কবিতা/কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে—/কোথায় ওর দিদির কথা, কোথায় বা ওর দিদির প্রতি তরুণ কবির প্রেম!' (ঐ)

স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট তুমি এই গ্রন্থের অন্যতম আত্মজৈবনিক প্রেমের কবিতা। ১৯৬৫-তে মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপের পর গোয়ালিয়র মনুমেন্টে তাঁর ও শক্তির ঘুরতে যাওয়ার কথা আমরা জেনেছি রুচিরা শ্যামের একটি স্মৃতিকথায়।[১২] তবু এ কবিতাতেও বিষাদ ও শঙ্কা— 'অথচ তুমি জানো সবই—আমাদের মিল-মিলন হবার নয়/তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো/আমার স্বপ্নের মধ্যে....।' নিছক ছাপোষা প্রেম ও গার্হস্থ্যের স্বেচ্ছাবন্দীত্বে এ কবির রুচি নেই। তাঁর প্রেমিক সত্তা ভবঘুরে পথিকের মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে অন্বেষণরত— 'তোমার হৃদয় থেকে বহিষ্কারের আদায় নিয়ে,/অন্য হৃদয়ে বসবো/কাক পক্ষীও টের পাবে না, পথিকের আবার বাস-বিষণ্ণতা কি?/যেখানে পথ সেখানেই পথিক/ ইতিমধ্যে পান্থশালায় রাত তো আর কম কাটে নি!' **(কোন্ পথে)**

যৌনতার স্থূল ভাবনাচিন্তা শক্তির প্রেমের কবিতায় কদাচিৎ মেলে। তবে জাগতিক মোহের আবর্তে যে আকাঙক্ষার ভাঙা-গড়া তাকে দার্শনিকতার আবরণে ঢেকে রাখতে চান নি শক্তি। স্বাভাবিক অ-লজ্জ ভঙ্গিতে তাই বলতে পারেন—'তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে/দেশ-গ্রাম নয়—সুদ্দু ঐ মেদিনী শব্দটা/নাম বদলে মাঝে-মাঝে 'মেদিনীদুপুর' করতেও ইচ্ছে হয়—/দুপুর, মানে দুখানা, দুখানা মানে দু বুক..." **(মজা হোক-ভারি মজা হোক)**। শারীরিক মিলনের আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছে অন্য একটি কবিতায়, কিন্তু এক রহস্যময় প্রতীকী ভাষায়—'আমি তোমার ঘরের সেই পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ/কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে/... তুমি বলেছিলে, যোগাযোগ তুলে নাও/কথা চালাচালি রদ করো,/ঠিক সেইটুকুই করেছি!/তবু, জ্যোৎস্নারাতে এক এক দিন এমন পাগলামি ভর করে/আমি আমার বাঁশের যোজনা পেতে/বসে থাকি অলক্ষ্যে তোমার..../তুমি টের পাবার আগেই আমি সাবধান।/আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ/কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে।' **(আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন)**

শক্তির এ কাব্যগ্রন্থের 'হেমন্তের অরণ্যে' জনৈক ডাকহরকরার এক আর্ত, বিষণ্ণ জগৎ, প্রেম ও প্রেমহীনতা, স্বপ্ন ও বাস্তব যেখানে মিলেমিশে যায় নানা জটিল অভিঘাতে। এখানে বহুদিন পর প্রেমিকাকে লেখা চিঠি যথাস্থানে বিলি না হয়ে ফিরে আসে প্রেরকের কাছে ('তোমায় লেখা চিঠি আমার দেড় বছর পরে ফিরেছে কাল') কিংবা দুটি চিঠির মাঝে সময়-ব্যবধান বাড়তে থাকে ('একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল')। এ জগতে রূপের আকর্ষণ আছে এবং বাইরের কাপট্যে তাকে অগ্রাহ্য করার ভণিতা করলেও কবির কাছে তা নিছক ভণ্ডামী। তাই তার খেদোক্তি—'অন্ধকার ট্যাক্সিতে একটা সবরমতী আশ্রম খোলা যায় না?' আবার গ্লানি-যন্ত্রণা-নিঃসঙ্গতার ভেতরে ভেতরে এখানেই তৈরি হতে থাকে পালাবদলের চিহ্নগুলি। 'যায় যায় বললেও, সব যায় না—কিছুটা থাকেই/যার নাম জীবন (**নাম জীবন**)।

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য গ্রন্থের অন্তত চারটি কবিতায় **জন্ম এবং পুরুষ, হে গান হে নৈঋত, স্বকৃত আলেখ্য ও দ্বিধাহীন**—নারীদেহ ও কামজ বাসনার সোচ্চার অভিপ্রকাশ ছিলো। *সোনার মাছি খুন করেছি*-র দুটি কবিতাতেও—**পাখি আমার একলা পাখি ও বিষ পিঁপড়ে**—যৌন কামনা ও মিলনেচ্ছার কিছুটা প্রতীকাশ্রয়ী অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। তথাপি শক্তির প্রথম পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে সামগ্রিকভাবে দেহসর্বস্বতা বা ক্ষুৎকাতরতার পরিবর্তে পাঠককে স্পর্শ করে প্রেমের এক হার্দ্য, নমনীয়, রোমান্টিক অনুভব। তবে শ্রীসমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* সংকলনের 'আদিরচনার' পর্বভুক্ত কবিতাগুলির দিকে তাকালে এমন অনেক পংক্তির সন্ধান মিলবে যেগুলিতে নারীদেহ, তার যৌন-আবেদন, নারী ও পুরুষের মিলনতৃষ্ণার প্রসঙ্গ ও চিত্রকল্প রয়েছে। অর্থাৎ শক্তির একেবারে প্রাথমিক শিক্ষানবিশি-পর্বের রচনাতে যৌনতা ও জৈবিক বাসনার তীব্রতা, মর্ষকামী বিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে, যেমনটা *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র বোদ্‌লেয়ারীয় কবিতাগুলিতে আমরা দেখেছি। *সোনার মাছি খুন করেছি*-তে যা প্রতীক ও পরাবাস্তবতার অন্তরালে কিছুটা আবৃত।

শক্তির আদিতম রচনাগুচ্ছ (আনুমানিক ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত রচিত) থেকে কয়েকটি নমুনা উদ্ধার করলে একেবারে প্রাথমিক পর্বে তাঁর কবিতায় যৌনতার বিষয়টির স্পষ্টীকরণ মিলবে:

(১) নিশ্চিন্ত চতুর মুদ্রা শরীরের সর্বত্র রেখেছো/অধরোষ্ঠ, স্তনচূড়, গুহানাভি, বাহুগর্ত, গণ্ড/নানাবিধ পরিচ্ছদ, নানা ভঙ্গি চক্ষুতে প্রমূর্চ্ছ/বিহ্বল শ্রীপক্ষী যাদু কামতৃপ্তি কোথায় প্রচণ্ড? **(উরু, আদিরচনা ক)**

(২) স্তনের চন্দনস্তূপ গলে যাবে মুখের গহ্বরে/অন্যবিধ চিহ্নগুলি রক্তাপ্লুত, উদগত মীনান্তক যোনিকূপ.....। (ঐ)

(৩) চতুর বসন্ত যারে নিপুণ ব্যাধের তীক্ষ্ম শর/একমুষ্ঠি শিবফুল পঞ্চদশী বালিকার যোনি/ লোভী কুকুরের জিহ্বা স্পর্শ করে তরল ত্রিকোণী/প্রস্রবণ মাখে মুখ সারারাত্রি দাঁতাল পাথর'। (পাপিষ্ঠ)

(৪) হরিৎ সে-চোখে জ্বলে হাওয়ার নির্জন দুটি হাত/.... যে তার একার ঘরে যোনিতে দুহাত ঢেকে শুয়ে। (সোনার পুতুল)

(৫) রমণী মর্ষণ করে নিজহস্তে স্তনদল তার। (ঐ)

(৬) ঘনিষ্ঠ হয়েছে নারী তার সঙ্গে অরণ্যের মিল/অস্পষ্ট চিলের মতো চোখদুটি, কোমল মৃণাল/ রেখেছে শরীর ঘিরে শোভাতুর কামার্ত পুরুষ/অনায়াস স্পর্শসুখে পুড়ে পায় অঙ্গারের হাল। **(দৃশ্যান্তরের ছলনা)**

(৭) বিবাহিত স্ত্রীও নয় কেবল যৌবনে জ্বলে এসে/বলেছিলো অঙ্গ ধরো তোমাকে মরেছি ভালোবেসে। **(সে ২)**

(৮) ক্রুদ্ধ দাঁত মেরে দাগড়া দাগড়া করে/স্তনের ভেলভেট বৃত্ত....। **(শিকার কাহিনী)**

(৯) ... স্তনভার আউরে ওঠে দংশনে/চুম্বনে রক্তময়/জিহ্বায় জিহ্বায় লাগে অম্লস্বাদ, লালচ, রম্য বন্দিত্বে বসুধা।... **(ঐ)**

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে উদ্ধৃত রচনাংশগুলি খুঁটিয়ে দেখলে এক তরুণ কবির হাতেখড়ি পর্বের বেশ কিছু লক্ষণ নজরে আসবে, নজরে আসবে ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে এক কবিযশোপ্রার্থীর দুরন্ত লড়াইয়ের নানা চিহ্ন ; ছন্দের প্রথাবদ্ধতা, শব্দ-চিত্রকল্পের প্রলোভন, বাসনার তীব্র সংরাগ ইত্যাদি অতিক্রম করে স্বতঃস্ফূর্তি যেন পুরো আয়ত্ত হচ্ছে না। তথাপি এইসব প্রাথমিক রচনায় নারীদেহের বর্ণনা, যৌন-মিলন তথা নারী-পুরুষের কামনার দহন সংকেতগুলি যেভাবে শারীরিক মাত্রা পেয়েছে, শক্তির 'গ্রন্থিত' ও পরিচিত প্রেমের কবিতাগুলিতে তেমনটা দেখা যায় না।

'আদিরচনা খ' পর্বভুক্ত কবিতাগুলিতেও (রচনাকাল : ১৯৫৫-৫৭) প্রেম, নারী ও যৌনতার বিষয়-প্রসঙ্গ কবির ভাবনার কেন্দ্রগত। বাল্য ও কৈশোরের সহজ পল্লীনিসর্গ ছেড়ে নাগরিক জীবনাবর্তে এসে পড়া এবং তজ্জনিত টানাপোড়েনের জটিলতার প্রেক্ষিতে বাসনা ও অনুভবের বর্ণমালা নানাভাবে বিন্যস্ত হয়েছিলো এইসব আদিরচনায়। কিছু নমুনা-পংক্তি উদ্ধার করলে এই বিন্যাসের একটি লেখচিত্র পাওয়া যেতে পারে ঃ

(১) **স্মৃতিবাহিত হয়ে আসা প্রিয় নারীর আশ্বাস-ইঙ্গিত** : 'আজো তুমি ডাকো আশ্রয়ে ডাকো আশ্রয়ে'। **(নানারঙের দিনগুলি)**

(২) **প্রেম-বন্ধনের বন্দীত্বে খেদ** : 'চতুর্দিক ঘিরে রেখেছো পাহাড়ে, চতুর্দিক/আমায় কোনো ফুলের বাগান চেনালে না/চতুর্দিক ঘিরে রাখলে অরণ্যে, চতুর্দিক/আমায় কোনো ভালোবাসায় মেলালে না।' **(সপত্নী)**

(৩) **সংসার-কামনার জতুগৃহ থেকে প্রিয় নারীকে আর্ত মিনতি** : 'সনির্বন্ধ অনুরোধ তুমি একবার এসে দ্যাখো/টলটল তৃষ্ণার সেতু পাঁর হচ্ছে কামুক সংসার।' **(দ্বিতীয় জন্ম)**

(৪) **মোহভঙ্গ ও বিদ্বেষের তিক্ততা** : 'কী পাবে, নারীর কাছে? তীব্র বিষ দুরন্ত গরম/কপট খেলার ঘোর, স্তিমিতি....।' **(অপ্রস্তুত রূপক)**

(৫) **দাম্পত্য-যৌনাচারের শ্রান্তি** : 'কখন একটি ভোরবেলায় ঝিলের কাছে গিয়েছিলাম/শীতের সময় বনের মধ্যে ঠাণ্ডা গন্ধ কোমল টানে/টানছে আমার সারা দামাল রাতের পরে/কিছুক্ষণের শ্রান্ত অবসর।' **(দুজন স্বামী স্ত্রী, তন্ময় ঝিল)**

(৬) **গৃহকোণে একান্তে প্রিয় নারীর সঙ্গে অনুচ্চ কথোপকথনের প্রস্তাব** : 'কেবল মৃদু ঘরের মধ্যে কথা বলবো, শোনো/তুমি মুখটি সরিয়ে আনো মুখের কাছে, ভিজে/কুয়োতলার মতো/ সে কি শস্তা মুখে ভীষণ হল্‌কা ঢাকা/ কেবল মৃদু মনের মধ্যে কথা বলবো, শোনো/এমন কথা পরস্পর বলিনি কোনোদিনও।' **(প্রিয় প্রসঙ্গ)**

(৭) **নগর-বৃত্তের সংকীর্ণতায় প্রেমের নির্জন উপাসনা :** 'উদাস আকাশ থেকে বহে আনি সংকীর্ণ শহরে/অনুক্ত নির্জন প্রেম তার নদী জপ করি তার উপকূল।' **(ভ্রমণকাহিনী ২)**

(৮) **দৈহিক মিলনের বাসনা অভিব্যক্ত পল্লী প্রকৃতির নিবিড় ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্পে :** 'তোমার যৌবন যখন গ্রাম, প্রেম কারুকরুণ নদী, তখন/আমি বিদ্ধ হতে পারি রোহিত মাছের মতো মসৃণ/মেয়ের শরীরে। ঘাটের পৈঠার পর ভিজে ভিজে/তেঁতুলপাতার মতো সুবাস, ভাঁটফুলের তীব্র গন্ধ, সরু সরু/আমলকি পাতা শিশিরের জলের মতো ঝরে পড়ে।/রাত্রিবাস পর, উলঙ্গ বুকে পিঠে, স্তনের/পর।' **(দৃশ্যান্তর)**

এইসব পংক্তির চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছোই শক্তির এই পর্বের কয়েকটি গদ্যকবিতায়—**পরভৃৎ, স্ব, তিন তরঙ্গ, তার** ইত্যাদি। নাগরিক জীবনের তামসিকতা, এক মাতাল করা আসঙ্গলিপ্সা এইসব কবিতায় আমাদের আলোড়িত, শিহরিত করে। আবার নারীদেহ ও আগ্রাসী যৌনাচারের অসঙ্কুচিত বিবরণ ও স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও এইসব কবিতাকে নিছক শৃঙ্গারসর্বস্ব ও অশোভন বলে মনে হয় না। নীচের উদ্ধৃতিগুলি থেকে যৌনতার এই কামনাজর্জর অথচ পুরাণ-প্রতিম রূপটির নান্দনিক নির্মাণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

(১) তখন রাত্রিকে ভয় হলো। গলি বেয়ে জমজমে অন্ধকারের শরীরে শরীর ঢাকতে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম বুকে, উদরে, মেরুদণ্ডে আর সুনীতির কাছে। ...তেঁতুলপাতার স্বাদে সিক্ত জিহ্বা, অধরে দগ্ধ তাম্রকূট, শরীরে রক্তের গর্জন আর সেই স্বৈরিণীর কাদার শরীর নগ্ন করি অল্পমূল্যের পালঙ্কের পর। ... দূরে শৌচকর্মের বারি, প্রতিষেধক আরক, স্তিমিত উজ্জ্বলতা আর সেই স্বৈরিণীর অসমতল শরীর নগ্ন করে ধরি দৃঢ় নিপুণ কলায়। আসন্ন গর্ভিনীর মতো অলস উরুযুগ ভেঙে মুড়ে রেখেছে উদরের পর, পৃথুল স্তন তার তীক্ষ্ণ, নাভিকন্দে তীব্র আতরের গন্ধ আর সে যেন এক আরণ্যক গুহার অন্ধকারমুগ্ধ চোখে আমাকে বিদ্ধ করে। কামনার সরীসৃপের কালো কুচকুচে মাথার পরে ঝিপি ঝিপি ঝিপি বর্ষণ ছড়ালো রক্তে আর তখন রাত্রিকে ভয় হলে মসৃণ নাভিসানুর পরে হাত রাখি, মুখ ডুবোই। **(পরভৃৎ)**

(২) বহুব্রীহি মাঠ তোমার শরীর। তার ক্ষেতে চয়ন করি তাপ, সুখ, স্বর, গন্ধ। অন্ধকার উরুর পর আমি কখনও মত্ত যুবক সমুদ্রের জোর। আঘাতে ধ্বংস করি শীল, সুনীতি, মসৃণ আমার অসহ্য সুখের আয়ুধে। মনে জানি ঘনভার অন্ধকার বোধের মতো এর নাম প্রেম।

অনবচ্ছিন্ন জাহ্নবীর দুতীরের দিনদুঃখিতের স্থির পরিচয়কে আমি কখনও প্রেম বলবো না।

(তিন তরঙ্গ)

(৩) তার স্তন উপাধান। সে তার অন্ধকারে স্থূল শরীর আমাকে ছুঁতে দিলো না। বিপুল বয়স মুছে মুছে কঠিন কর্কশ হয়েছে হাতের তালু, নাকের ত্বক, কপোল, যোনিরোম। বাহুর স্তব্ধ সংহত মাংস শিথিল হয়ে নেমেছে কটু গন্ধ তৈল মেখে। ...সারাদিন কাজের মেঘে মেঘে ঢেকে, নিজেকে, অন্ধকারে জীবনের শেষ নয় জেনে আমাকে তার শ্লথ শীতশিথিল শরীর ছুঁতে দিল না। তাই তার শূন্যভার অসুখে করুণার বর্ণ হিরন্ময় হলে তাকেও একদিন প্রেম বললাম।' **(তার)**

পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশায় বৃত যে নারী তার ভুক্ত রুগ্ন শরীরে ধারণ করে রেখেছে নাগরিক ক্লৈব্যের কলুষ, সেই নারীতে উপগত পুরুষের পিপাসা শব্দবোধের এমন রহস্য-রূপকে ধরেছেন শক্তি যে অসামাজিক ও অবাধ যৌনাচারকে ছাপিয়ে উঠেছে এক বিপন্নতা, করুণা। বোদ্‌লেয়ার কিম্বা এলিয়টের কবিতায় নাগরিক তমিস্রার শিকার এইসব নারীমূর্তির সাক্ষাৎ আমরা কিছু কম পাই নি।

প্রখ্যাত চিত্রকর ও শক্তির বিশেষ বন্ধু শ্রী প্রকাশ কর্মকার তাঁর একটি লেখায় শক্তির স্বভাব ও আচরণে এক ধরনের 'ম্যালিগন্যান্সি'র[১৩] কথা বলেছেন—এক ধরনের অস্থির, প্রথাবিরোধী, আপাত-অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ। এই 'ম্যালিগন্যান্সি' সম্ভবত সৃজনী প্রতিভার এক অনিবার্য ঝোঁক। প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের কবি হিসেবে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ, তাঁর আদিরচনাপর্বে রোমান্টিক প্রেমের নির্জনতা ভঙ্গ করে এই 'ম্যালিগন্যান্সি' এক অস্থির, ক্ষুৎকাতর, বিপন্ন কবি-মানসের পরিচয় বহন করে এনেছে। এই অস্থিরতা, বিপন্নতা, কখনো বা স্ব-বিরোধিতা শক্তির কবিতায় একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি-নির্ভর প্রতীক ও চিত্রকল্পে, স্পষ্টভাবে অনুভূত শব্দবিন্যাসে (felt words) যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাতে করে প্রথাগত অর্থে তাকে 'প্রেমের কবি' জাতীয় কোনো শিরোপা দেওয়া চলে না।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকেই 'প্রেম' শক্তির কবিতার অন্যতম মূল বিষয় ; নারী, প্রকৃতি, মৃত্যু ও মানুষের নানা প্রসঙ্গকে আশ্রয় করে প্রেম ও ভালোবাসার ছবিগুলি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় একেবারে শেষ পর্যন্ত। সত্তর দশকে তাঁর সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, সমসময় ও নাগরিক অস্তিত্বের নানা সংশয় ও বিপর্যয় যখন শক্তির কবিতায় ক্ষয়-ক্ষোভ-বেদনা-নৈরাশ্যের চিহ্নগুলি মুদ্রিত করেছে তখনও আমরা পেয়েছি প্রেমের বহু বিচিত্র অনুভব, উচ্চারণ ও আর্তি। আশির দশক থেকে তাঁর কবিতা রচনার শেষ দিন পর্যন্ত মৃত্যুর বিষণ্ণ ধূসর পটভূমিতে ভালোবাসার উজ্জ্বল উদ্ভাসের রেখাগুলি ফুটে উঠেছে শক্তির কবিতায়। 'ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো/যেদিকে দুচোখ যায়', বলেছিলেন যে কবি (৬৩ সংখ্যক, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*) তাঁর কাছে ভালোবাসা জীবনের প্রতি অনুরাগ-আকাঙক্ষার এক সঞ্জীবনী শক্তি—'একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—/দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে.../নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল...' (**একবার তুমি**, *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)। *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* (১৯৭২)-এর মতো সংকলনে, যেখানে মেধা ও চৈতন্যের গূঢ় স্তর থেকে উঠে এসেছে সংশয়, নিঃস্বতা, নিঃসঙ্গতার আর্তি, সেখানেও প্রেমের কথা বলেছেন শক্তি, যে প্রেম তীব্রভাবে লিপ্ত হয়ে থাকার এক আসক্তি—'মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে/চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে.../আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা/আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না' (**বাঘ**)। প্রিয় নারীটির আলো-আঁধারি প্রতিচ্ছবি দেখেছেন স্মৃতিমেদুরতার আবেগবিহ্বল মুহূর্তে— 'বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো/দুয়ার খুলে দেখিনি—ওই একটি পরমাদ ছিলো।/যখন তুমি দাঁড়াও এসে/আন্ধারে·রোদ্দুরে ভেসে/হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো' (**একটি পরমাদ**)। জীবন পথযাত্রীর কাছে ভালোবাসা তৃষ্ণা- নিবারক, কিন্তু ভালোবাসা তো নির্বিচারে সকল তৃষ্ণার্ত পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ করে না—'মনে হয়, ভালোবাসা নামে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে/অবাধে হয় না দেওয়া জল কোনো তৃষ্ণার্ত পথিকে।/নির্বাচন করে দেওয়া? দেওয়া হয় গুরুত্ব সমঝিয়ে?' (**ভালোবাসা নামে সেই প্রতিষ্ঠান**, *সুখে আছি*)। প্রেমের যৌনতার দিকটি একটু তির্যকভাবে চটুল ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন শক্তি **ঈশ্বর থাকেন জলে** (১৯৭৫)-এর **যৌন ছড়া** কবিতাটিতে—'ডোঙায় চড়বো-তুমি আমার সঙ্গে গেলে/কালকা মেলে/অনেক বগি/তুমি আমার তাল-ডোঙাটি, আমিই লগি।' মনীষা নাম্নী যে রমণীটির কথা ছিলো *সোনার মাছি খুন করেছি*-র কবিতায় তার প্রসঙ্গই ফিরে এসেছে

জ্বলন্ত রুমাল কাব্যের 'আমি' কবিতায়— 'মনীষার সব কাজ ছেলেবেলা থেকে আমি করে দিই/ সে পারে না কিছু/ সে মূঢ় নিসর্গে ঘুম, ঘুমের আলস্যে মুখ নিচু/আকাশের দিকে পিঠ করে শোয়, ভঙ্গি তার ভালো/তবুও আমায় দেখে এক রাত্রে ভীষণ চমকালো!/সে, মানে মনীষা, তার নগ্ন দেহে তখন বিদ্যুৎ/অনেক চিক্কুর দেয়, আমি মেঘ, বৃষ্টি-ভেজা ভূত!' নর-নারীর এই আবেগ-বিহ্বল সংসর্গের নাটকীয় চিত্ররূপে শারীরিক সংসর্গের উল্লেখ থাকলেও বাসনামদিরতার কোনো স্থূল চিহ্ন নজরে পড়ে না। মনীষার দেহজ বাসনা ও তার আবাল্য পরিচিত প্রেমিক পুরুষটির প্রতিক্রিয়া মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুতের প্রাকৃতিক উদ্বেলতার অনুষঙ্গে যৌনক্রিয়ার স্থূল সীমানা অতিক্রম করে যায়। শক্তির প্রেমের কবিতায় এক স্মৃতিকাতরতা কাজ করে যায়, কোনো এক অতিক্রান্ত অধ্যায় যেন হঠাৎ এসে তাড়িত করে বর্তমানকে ; আত্মকথনের চালে কবি আপ্লুত হন স্বীকারোক্তিতে— 'যখন আমার তৃষ্ণা পেতো, তার সরোবর জড়িয়ে ধরে/ঠোঁট দুটিকে কামড়ে খেতাম, পেতাম জিভের নিজস্ব বিষ/যখন ক্ষিদে, তখন খেতাম এক মুঠি চুল এক জোড়া ফল—/সমস্ত শরীরটা জুড়ে ঠুকরে ঠুকরে খাবার হদিশ' (**হঠাৎ কেন সঙ্গে নিলে?**)। শক্তির কবিতায় রোমান্টিক প্রেমের বিমুগ্ধতা ও স্মৃতিবিধুরতার মধ্যেও এসেছে দৈহিক সংসর্গ ও আসক্তির প্রসঙ্গ, যদিও এখানেও স্মৃতিতাড়িত প্রেমিকপুরুষের ভাষ্যে নারীদেহকে দেখা হয়েছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের প্রাকৃতিক ভাণ্ডারের চিত্রকল্পে ; যৌন-স্বেচ্ছাচারের উৎকেন্দ্রিকতা এই পংক্তিগুলির মর্মমূল নয়। আবার এরই পাশে জীবনানন্দীয় রোমান্টিক মগ্নতায় শক্তি বলেন এক শান্ত, সম্মোহক প্রেমের কথা—'মানুষের চেয়ে থাকা মানুষীর মুখের ভিতরে!' (**মানুষের চেয়ে থাকা**, *জ্বলন্ত রুমাল*)। অতি সংক্ষিপ্ত শতাধিক পদ্যাংশের সংকলন *ছিন্নবিচ্ছিন্ন* (অক্টোবর, ১৯৭৫) তে ভালোবাসাকে ঘিরে অনেক স্মৃতিলালিত স্বগতকথন, আর্ত অভিমান, প্রত্যাশা ও শুভেচ্ছার উচ্চারণ আছে :

(১) মনে হয় ভালোবাসা একদিন ছিল অসহজ/ আজ বাতাসের মতো বহুমুখী, মেঘের মতন/সতত সঞ্চরমান, যেন নদী স্রোতের সজলে/নিঃশ্বাসের মতো সুস্থ, সুন্দর মুখের মতো শুভ/মনে হয় ভালোবাসা এ-বয়সে সহজ হয়েছে।

(২) আমার কাছে আসতে বলো/একটু ভালোবাসতে বলো/বাহিরে নয় বাহিরে নয়/ভিতর-জলে ভাসতে বলো/আমায় ভালোবাসতে বলো/ভীষণ ভালোবাসতে বলো।

(৩) যখন উড়েছি আমি উড়ে যাই/তুমি ভালো থেকো/যখন খুঁড়েছি আমি খুঁড়ে যাই/তুমি ভালো থেকো/যখন পুড়েছি আমি পুড়ে যাই/তুমি ভালো থেকো।

(৪) হয়তো আজ যাবো, কাল যাবো/হয়তো ভিতরে পৌঁছাবো/তোমার ভিতরে পৌঁছাবো।

(৫) আমি যাকে ভালোবাসি, সে অন্তত গোপনে আমাকে/ মেরেছে সহস্রবার/কিন্তু, আমি মরিনি একাকী/দৃশ্যত নিস্তব্ধ হয়ে, তাকেও মুখর করে রাখি।

এই মৃদু, আন্তরিক, কাব্যময় উচ্চারণের মায়াবী নির্জনতাই শক্তির প্রেমের কবিতার প্রধান আকর্ষণ। শব্দের দুরূহতায় আশ্রয় না খুঁজে কবি বিষাদময় ব্যাকুলতায় সহজ অন্তরচারী স্বগতোক্তির মতো কথা বলেন—'পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?/পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো?/... এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে/আমার কাছে লুকিয়ে আছে তোমার জন্য ভালোবাসা'(**পাতাল থেকে ডাকছি**/*এই আমি যে পাথরে*)। এইসব নির্জনতাময়, আর্ত রোমান্টিক উচ্চারণে শরীর-

সংরাগের তীব্রতা টের পাওয়া যায় না। ভালোবাসা শক্তির কাছে কোনো তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা বা উচ্ছ্বাস নয়, ভালোবাসা তাঁর কাছে জীবন ও অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত ; সহজ, নিবিড়, আবার বেদনারও যেন—'ভালোবাসা তার কাছে গাছ ফুল পাতার মতন/স্বাভাবিক। ভালোবাসা ভূমি থেকে পাথরের মতো।/ভালোবাসা তার কাছে শিকড়ের মতো মাটি মাখা/শামুকের মতো থাকে সিঁড়ির রানাতে ঢেকে মুখ/ভালোবাসা তার কাছে গাছের পাতায় লাগা হাওয়া/ভালোবাসা তার কাছে ক্রমাগত ভীষণ অসুখ' (*ভালোবাসা, তার কাছে/ ভাত নেই পাথর রয়েছে*)। শক্তির কাছে ভালোবাসা কেবল সুখতৃপ্তিদায়ক অনুভব নয় ; জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অহরহ মিশে থাকার মতোই ভালোবাসার সুখবোধের সঙ্গে মিলে মিশে যায় বিরহকাতরতা, দুঃখের গোপন স্পর্শ— 'ভালোবেসে সুখ ছিলো, ভালোবেসে দুঃখ কি ছিলো না?' (**আমলকি তলা**/*আমি চলে যেতে পারি*)। 'এখন সময় নেই, খেলা গেছে, ভালোবাসা গেছে' (**মন্ত্রের মতন আছি স্থির**/*মন্ত্রের মতন...*) বলতে বলতে শক্তি যখন কষ্টকরভাবে ফিরে আসেন 'আশ্রয়ের তদারকি ঘেরা ঘরে,' তখন ভালোবাসা থেকে মুক্তি পাবার অভিমানে এক ভিন্ন ভালোবাসারই শরণাপন্ন হতে চান তিনি—'ভালোবাসা থেকে আমি মুক্তি চাই—তোমার-আমার/ভিতরের ব্রিজ ভেঙে দিতে চাই/পাল্লা সরিয়ে নিতে চাই—যাতে অতিকাল্পনিক আমাদের যোগাযোগ হয়ে পড়ে' (**ইসাবেলা**/*মন্ত্রের মতন....*)। শক্তির কবিতায় রোমান্টিক প্রেমের যে আতুর প্রচ্ছন্ন মৃদু উচ্চারিত ব্যাকুলতা অনায়াস উচ্চারণে ফুটে ওঠে তা এক পরম আস্বাদ্যতা এনে দেয়—'তোমার নীরবতার অপরাধে/এবার তোমায় ডাকতে আমার বাধে/তোমায় ডাকা হয়নি তোমার মতো/চঞ্চলতায় ভরা—/হৃদয় মাঝে আছো তেমন রূপে/দেহের ভিতর আছো তো রোমকূপে/হও না সঙ্গছাড়া' (**তোমায় ডাকা হয়নি**/*ঐ*)। যৌবন-বাউলের এলোমেলো পথ-পরিক্রমা সেরে কবি যখন ফেরেন সংসার বৃত্তে, তখন ভালোবাসার চঞ্চলতা নয়, এক শান্ত সমাহিত বিষাদময় জিজ্ঞাসা যেন তাঁকে অন্য এক উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়—'এখন তোমার স্তব্ধ বন্ধ-হওয়া সুন্দর দেহের/কঠিন সুষমা দেখি/ভয় হয়, সত্যি জেনেছি কি— /এই তুমি? সর্ব সংসারের/পরপারে-বসা তুমি, শান্ত, অশ্রুজল!/ তোমারই হৃদয় ছিলো একদিন পথিকের মতো সতত-চঞ্চল' (**তোমার হৃদয় ছিলো ...**/*অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল*)।

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো-(মার্চ, ১৯৮২) -র মৃত্যুবোধে আর্দ্র কবিতাগুলির পরতে পরতে এমনভাবে মিশে আছে ভালোবাসার অজস্র প্রিছুটান ও অনুষঙ্গ যে মনে হয় শক্তির কবিতায় মৃত্যু ও প্রেম দুই সহচরের মতো হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলে জীবনের দিগন্তরেখা পর্যন্ত। গরুমারা বাংলোর জঙ্গল-আবাসে 'দুজনের জন্যে এই স্বেচ্ছানির্বাসিত বনবাস'-এর নিভৃত নীরবতার কথা যেমন বলেন শক্তি, তেমনি শুনতে চান স্বস্তি, উদ্দীপনা আর গভীর সান্নিধ্যের অজস্র কথা—'ভালোবাসা কথা বলো, হোক না সে ছুঁচের মতন/নিষ্ঠুর, ন্যঞর্থ কথা, কথা বলো আমার ভিতরে/বৃষ্টির মতন কথা, বিদ্যুতের, শিকড়ের কথা' (**বলো, ভালোবাসো**)। ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে বারবার 'শিকড়'-এর উপমান ব্যবহার করেন শক্তি, নিজেকে কল্পনা করেন গাছের প্রতীকে, ভালোবাসা যার 'শিকড়' হয়ে সন্ধান করে জীবনরসের— 'ভালোবাসার শিকড় আমায় জড়িয়ে করে গাছটি/মাটির উপর দাঁড় করিয়ে, ছায়ায় কাছে আসছে/গভীর ভালোবাসছে আমায়, দারুণ ভালোবাসছে' (**ভালোবাসার শিকড়**)। ভালোবাসার সৌন্দর্যে সর্বদাই আবেগগভীরতার মাত্রা যোগ করে স্মৃতিবাহিত কোনো অনুষঙ্গ

—'নিশ্চিত নিভৃত দুঃখে ভেসে যাওয়া, নিরুদ্দেশ ভাসা/গোয়ালপাড়ার দিকে.../মনে পড়ে এখনো ঊর্মিলা?' (**ভালো থেকো**)। ভালোবাসা গড়ে তোলে আকাঙক্ষা, প্রতীক্ষার অভ্যাস ; প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত, দুঃসহ হয় ; তবু সেই দুঃসহতাও আত্মস্থ করে নেয় ভালোবাসা—'ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে/কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি/কেউ, ধীর পায়ে এসে, ত্রস্ত, একা একা/....গভীর গভীরতর রাত হয়ে এলো' (**ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো**)।

বার্ধক্য, জড়তা, আসন্ন মৃত্যুর পদশব্দ কবিকে যতই ত্রস্ত করুক, স্মৃতির অনুষঙ্গে ভালোবাসার সামর্থ্য তাঁকে বারবার ছুঁয়ে যায়—'আমার হাতে একদা ছিল কবুতরের স্তব।/...অনুভবের ভিতরে মাখা আরেক অনুভব।/...ঠোঁটে আমার একদা ছিল জোঁকের পরমায়ু।/...বরং রেখা, সমূহে একা, ফুটিয়ে তোলো তাকে' (**সমূহে একা রেখা**/*কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে*)। 'তিন শতাব্দীর পুরাতন' ভালোবাসার অমিত শক্তিতে বলীয়ান কবি বার্ধক্যের দুর্বলতা অগ্রাহ্য করে বলে ওঠেন—'একটি চুম্বনে তুমি প্রাসাদের ভিত খুঁড়ে ফেলো' (**একটি চুম্বনে**/*ঐ*)। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, উবুশ্রান্ত বৃষ্টিতে একাকার, কবি ফিরে আসেন ব্যাকুল অনুনয় নিয়ে তাঁর ফেলে যাওয়া গার্হস্থ্যের রুদ্ধ দ্বারে—'বন্ধ দরজার মুখ/ফিরে আসে শুধু হাহাকার—/খুলে দাও, অন্তত একবার,/...অন্তত কয়েকটি দিন/না হলে, কয়েকটি ঘণ্টা/সন্তানের দিকে চাইতে দাও,/কতোকাল ওদের দেখিনি!/...দয়াময়ি, দয়া করো।/অনেক করেছো!' (**ঘুমন্ত কপাট**/*ঐ*)। ভালোবাসার আকাঙক্ষায় যেন এক শান্ত-মধুর পবিত্রতা ফুটে ওঠে— 'ভালোবাসা দিয়ে তুমি মুড়ে রেখো মুখশ্রী মন্দির' (**মুখশ্রী, মন্দির**/*ঐ*)। জীবন ও মৃত্যুর দ্বৈরথের মতো ভালোবাসার মধ্যেও শক্তি খুঁজে পান এক দ্বিমুখী টান—'মনে রেখো, ভালোবাসা বাঁচায় ও মারে/একাধারে/বাঁচায় ও মারে' (**মনে রেখো, ভালোবাসা বাঁচায় ও মারে**/*ঐ*)। এই দ্বৈরথের দোলাচলে বিড়ম্বিত হয় কবিচিত্ত, উচ্চারণে ফুটে ওঠে আত্মকরুণা—'একটি চুম্বন দাও, হৃদয় জুড়াবো।/প্রকৃত চুম্বনে দাহ আরো বেড়ে যাবে/পুড়ে যাবে অধরোষ্ঠ, দুকূল ভাসাবে/লেলিহ আগুনে বানে, এ কী অভিলাষ?/তার চেয়ে থাকি আমি প্রকৃতির মতো/ওতপ্রোত, আমায় ছুঁয়ো না।/...অন্যথায় কষ্ট পাবে/পুড়ে হবে ছাই'(**অবসর এখানে মাঠ অবসর এখানে গাছপালা**/*ঐ*)।

শক্তির প্রেমের কবিতায় এক স্মৃতিবিধুরতা কাজ করে যায় ; স্মৃতিবাহিত নারীমুখ, তার সাহচর্য, ইচ্ছাপূরণের রোমান্টিক কল্পনায় কবিমনে উদ্বেলতা জাগায়—'আদরে আদরে তুমি আমায় উচ্ছন্ন/করবে বলে ফিরে এলে স্বপ্নের ভিতরে,/স্বপ্নের ভিতরে রক্তক্ষরণের মতো প্রেম সঙ্গে নিয়ে এলে/দুহাতে সমস্ত দেবে ভেবে আমি দুহাত পেতেছি/দুটি ঠোঁট দীর্ঘদিন বৃষ্টির ফোঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি বলে/দু ঠোঁট পেতেছি' (**দেখা দাও, হাত ধরো**/*কক্সবাজারে সন্ধ্যা*)। শক্তির শেষ কয়েক বছরে প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থগুলিতে নারীদেহ, যৌনাচার, কোনো বিশেষ নারীর প্রতি বিহ্বল আসক্তির প্রসঙ্গ বারবার নজরে আসে। শক্তির কবিতায় প্রেমের শারীরিক চাহিদা ও আবেদনের ব্যাপারটি আগে কখনো এতো ধারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্ত হয়নি। কয়েকটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করে আমরা এই প্রবণতার আন্দাজ পেতে পারি :

(১) রমণী ভারি কামকাতর, এলায়ে পড়ে আছে (**রমণী**/*এই তো মর্মর মূর্তি*)

(২) স্তনের বৃন্তের রোম নিয়ে জেগে থাকা সারারাত (**তপশ্চারিণী**/*ঐ*)

(৩) ভোরবেলা চুম্বনের শীত ওষ্ঠে লাগে/দুটি করতলে করে সে-মুখ স্থাপন/আবার চুম্বন করি সেই ওষ্ঠাধরে,/তখন উষ্ণতা পাই, শরীরে উন্মুখ/হয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়েরা/তখনি শালের/ভিতরের বুকের মধ্যে দুটি হাত রাখি (**কুয়াশায়**/*ঐ*)

(৪) তোমাকে সহস্র নামে ডেকেছি সন্ধ্যায়,/ধরেছি ও-মুখসাজ করতলে, চুম্বন করেছি,/সেই স্মৃতি মনে করে হয়েছি পাগল।/হয়েছি অশ্বের মতো তেজী আর স্বেদেও ডাগর,/ধরেছি তোমার দুটি স্তন এক কঠিন আবেগে (**কিশোরবেলার ঘুম**/*আমাকে জাগাও*)

(৫) কাঁকর লেগেছে স্তনে, মাথা ভর্তি কাঁকরের ফুল,/দুহাতে সরাই সব, তোমার স্বপ্নের মতো দেহ (**একাত্ম**/*ঐ*)

(৬) মালবিকা স্তন দাও, দুই স্তনে মাখামাখি করি (**প্রেম দিতে থাকো**/*জঙ্গল বিষাদে আছে*)

(৭) মালবীর কোলে মাথা, মাথা নিচু করি,/একটি চুম্বন দিই ওর *ঠোঁটে* এঁকে,/মেহগিনি-বাহু দিয়ে সুকণ্ঠ জড়াই,/স্তনদুধ চুঁইয়ে পড়ে মুখটি ভেজায়,/আমি স্তনে মুখ রাখি। (**জঙ্গলে এমন খেলা**/*ঐ*)

(৮) তোমার বুকের পাশে শুয়ে থাকবে বিপুল আক্রোশে,/স্তন দুটি শঙ্খনাদ করে উঠবে ঘুমন্ত কামড়ালে,/নাভিগর্ভে আঙুলের রক্ত ও প্রপাত পড়বে ঝরে—/এ-বয়েসে সব কাজ করতে পারি প্রেমে ও সম্মোহে (**তোমার সন্তান আমি দিয়ে যাবো**/*ঐ*)

(৯) কিশোরীর স্তন স্পর্শ করা মাত্র দেহ জ্বলে যায়,/এইসব অনুভূতি মরচে পড়ে ভোঁতা হয়ে ছিলো/আমার বৃদ্ধের মধ্যে (**সাতান্ন বছর পরে**/*ঐ*)

(১০) আমি এক কিশোরীর সঙ্গে আছি, করো না বঞ্চনা,/... আমি ঐ কিশোরীর সর্বাঙ্গ পোড়াবো!/... ভোগ করবো অশ্রুসিক্ত কপোল তাহার,/তীরন্দাজী দুটি স্তন, নাভির গোলাপ গন্ধ আর/জানি না কী করে খাবো ওষ্ঠাধর, আশ্চর্য মাতাল! (**শিকার করেছি**/*ঐ*)

এই সব পংক্তি থেকে মনে হয় বয়োবৃদ্ধি ও অসুস্থতাজনিত শারীরিক দুর্বলতা কবিকে তাড়িত করেছে অ-সমবয়সী প্রেম ও দেহ-সংসর্গের এক ফ্যানটাসি রচনার দিকে ; স্মৃতিমেদুর রোমান্টিক রহস্যসৃজনের পথ ছেড়ে শক্তি যেন কৈশোর ও বয়ঃসন্ধির তীব্র সংরাগ ফিরে পেতে চাইছেন। নিভৃত যৌনাচারের এক আদিম, উদ্দীপক রূপকথায়, দহন-আগ্রাসন-উন্মাদনা-মাদকতার এক বেপরোয়া প্রকল্পে। ইতোপূর্বে শক্তির 'অগ্রন্থিত' কবিতা সমূহের 'আদিরচনা' পর্বের বেশ কিছু কবিতায় নারীদেহ ও যৌনক্রিয়ার অকপট বিবরণ, এক ক্ষুৎকাতর অস্থিরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কবিতা রচনার অন্তিম পর্বে শক্তি যেন বৃত্তটি সম্পূর্ণ করলেন। এই সব স্বীকারোক্তির কোথাও কোথাও অবশ্যই নিম্নসীমা লঙঘনেব চিহ্ন রয়েছে, রয়েছে বাসনা-বিকারের ইঙ্গিত। বোদ্‌লেয়ার, বুদ্ধদেব বসু, গিন্‌স্‌বার্গ, হাংরি জেনারেশন ও ব্যক্তিগত বোহেমিয়ানায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কবিতায় এক প্রথা ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী, স্বেচ্ছাচারী প্রবণতা তো ছিলোই। আবার হয়তো বা ছিলো মাতৃস্তন্যের প্রতি বাল্যের তীব্র আসক্তির স্মৃতি। *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র ৮৭ সংখ্যক রচনার শুরুতে সেই আকুলতার পরিচয় ছিলো—'দাও, বক্ষ দাও, দুগ্ধ পান করি, বালক তোমার/আমি ছাড়া কেহ নাই।

মোটের ওপর বলা যায় যে শক্তির বেশিরভাগ প্রেমের কবিতা 'মনোলগ' বা একোক্তি, ডায়ালগধর্মী নয়। প্রেমিক পুরুষের বেদনা-বিরহ-আসক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। নারীর

আবেগ-অনুভব-মেধা-মনন-প্রত্যাশা, কিম্বা নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ তথা পারস্পরিক বিনিময় এইসব কবিতায় নেই। যে সব লেখায় নারী শরীরের যাবতীয় অনুপুঙ্খ নিয়ে দেহ সংসর্গের ফ্যানটাসি নির্মিত হয়েছে সেখানেও পুরুষপ্রাধান্যসর্বস্ব সমাজে নারীদেহ বিষয়ক অতিকথাবিলাসের প্রবণতাটি নজরে পড়ে। রোমান্টিক স্মৃতিমেদুরতা ও বিরহ কাতরতায় মণ্ডিত তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অন্তর্মুখী প্রেমের কবিতাগুলিতেও শক্তি বহুস্তরবিশিষ্ট সামাজিক জীবনের পাটপ্রেক্ষায় নারী-পুরুষের প্রেম সম্পর্কের জটিলতর, পূর্ণতর ব্যক্তিত্ববিকাশের সম্ভাবনা ও সঙ্কট বিষয়ে কোনও তাৎপর্য তুলে ধরেন নি।

জীবন ও মৃত্যুর মিশ্র আলেখ্য

এই মৃত্যুময় বেঁচে থাকা

কবি ও সমালোচক শঙ্খ ঘোষের চমকপ্রদ ভাষ্যে শক্তির কবিতা হলো 'জীবনের ভিতর দিয়ে মৃত্যুমোহনার দিকে যাত্রা।'[১৪] জীবন ও অস্তিত্বের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু ; তাই জীবন-উপলব্ধির সমগ্রতাকে ধরতে চাইলে মৃত্যুভাবনা সে সমগ্রতার বাইরে থাকতে পারে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, তাঁর দীর্ঘ চারদশকের জীবন পথ-পরিক্রমায়, এক পরিব্যাপ্ত মৃত্যুমনস্কতা তাঁর জীবনবোধকে বিস্ময়কর প্রগাঢ়তা দিয়েছে। জীবন-মৃত্যুর এমন 'মিশ্র আলেখ্য', আসক্তি ও উদাসীনতার এমন নির্ভুল একাগ্রতা জীবনানন্দের পরে বাংলা কবিতায় আর দেখি না।

সাধারণ্যে পরিচিত ও শক্তির কথামতো তাঁর প্রথম কবিতা **যম**, মৃত্যুদেবতার উদ্দেশে লেখা একটি সনেট— 'বিপ্রকর্ষ তমোময় তোমার অভিধা/সুজন দুর্জন বৃক্ষে তুমিই পরম/অগ্রদানী নামরূপ, লোকায়তে যম।[১৫] কবি হিসেবে তাঁর জন্মলগ্নেই যেন নিহিত ছিলো মৃত্যুবোধের বীজ, যেন জন্ম আর মৃত্যু, অস্তিত্বের এই দুই মেরুবিন্দু এক অলক্ষ্য রহস্যসূত্রে বাঁধা— 'In my beginning is my end.'[১৬] তুলনীয় তাঁর একটি 'অগ্রন্থিত' কবিতার এই পংক্তিগুলি :

হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে
একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে পৌছতে পারি পথ তো একটা নয়—/তবু সবগুলোই ঘুরেফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাঁধা/নদীর দুপ্রান্তেই কূল/একপ্রান্তে জনপদ অন্যপ্রান্ত জনশূন্য/দুদিকেই কূল, দুদিকেই এপার-ওপার, আসা-যাওয়া, টানাপোড়েন—/দুটো জন্মই লাগে/মনে-মনে কম করে দুটো জন্মই লাগে![১৭]

তাঁর 'প্রথম ও নিজের সবচেয়ে প্রিয়' কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র পাতায় পাতায় জীবনবোধের বহুবিচিত্র চিহ্ন ও অনুষঙ্গের পাশাপাশি ছড়ানো রয়েছে মৃত্যু ও বিপন্নতার অজস্র অনুভব। জীবন-মৃত্যুর এক অমোঘ, রহস্যময় যুগলবন্দী। ধরা যাক **জরাসন্ধ** কবিতার প্রথম পংক্তির সেই মর্মস্পর্শী, আর্ত অভিমান—'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে'। কোনো তরুণ কবির আত্মপ্রকাশ সংকলনে এমন কাতর বিহ্বলতায় জন্ম-প্রত্যাহারের জন্য অনুনয় আগে কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না। জননীর করুণ, স্নেহমণ্ডিত মুখচ্ছবিকে মনে করে পুত্রের এ এক ত্রস্ত, অভিমানী প্রশ্নোচ্চারণ : 'যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো

কৃপণ করুণ, তাকে/ তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি।/...আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন/তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি।'

মৃত্যুবোধের আর এক স্মরণীয় অভিজ্ঞান চতুরঙ্গে—'খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না/শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য/নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার/কিছু কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না'। এই মৃত্যুভাবনা আসলে জীবন সম্পর্কে এক সহজ রোমান্টিক মুগ্ধতাবোধেরই পরিচায়ক, এক জীবন-বাউলের প্রসন্ন ঔদাস্য ; মৃত্যুকে ঘিরে কোনো মর্বিডিটি'এ উচ্চারণে নেই। সুদীর্ঘ জীবনের উদ্বৃত্ত উপভোগের লোভে তিনি আসক্তি-জনিত যন্ত্রণার শিকার হতে চান না—'আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না/কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি?/অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি/ প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।' লক্ষণীয় যে কবি যতই মৃত্যুর কথা বলুন না কেন, মৃত্যুর বিয়োগ ভাবনায় এ পৃথিবী তাঁর কাছে ধূসর হয়ে যায়নি। তিনি 'অপরূপ পৃথিবী'র কথা বলেছেন, বলেছেন জীবন ও তার কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা—'শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য'। জীবন ও মৃত্যু এ কবিতায় পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। জনৈক ভাষ্যকারের মন্তব্যে বিষয়টির স্পষ্টীকরণ মেলে—'এমনও মনে হয়, মৃত্যুর কথা, অন্ধকারের কথা, বিরাগের কথা যখন তিনি বলেন, তখন যেন একটা অভিমানের সুরই বেজে ওঠে—তাঁর আসল জায়গা যে জীবনের, আলোর, ভালোবাসার তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। মানবিক অস্তিত্বের পরিণামে কিংবা জীবনের পরিসীমায় এবং পরতে পরতে মৃত্যুর অনিবার্যতাকে অস্বীকার করতে পারা যায় না বলেই এই অভিমান। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য লোভ একটুও কম নয়।'[১৮] শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে এক আলাপচারিতায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন—'মৃত্যু-চেতনা তার কবিতার বিশেষত্ব হতে পারে, মৃত্যু বাসনা তার কখনও ছিল না ..... আসলে সে মৃত্যুকে কবিতায় চ্যালেঞ্জ করেছে। মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আবার তার রহস্যময়তার প্রতি অপার কৌতুহল। কোনও কোনও সময় আবার সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। জীবনকে ভালোবেসে তার কবিতা।'[১৯]

শবযাত্রা, শ্মশান-চিতা, কাঠ, আগুন ইত্যাদি প্রসঙ্গ, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টির নানা চিত্রকল্প এসেছে শক্তির কবিতায়, একেবারে শুরু থেকেই। জীবন যাঁর নিজেরই শব্দবন্ধে 'মৃত্যুময় বেঁচে থাকা',[২০] তাঁর কবিতায় মৃত্যুবোধের এই ধারাবাহিক বিস্তার যোগ করেছে আর্তি, সংশয় ও ঔদাস্যের মরমী মাত্রা। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে দক্ষিণ চব্বিশপরগণার 'কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম বহড়ু'তে তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে শক্তি ব্যবহার করেছেন মৃতদেহ সৎকারের হিন্দু ধর্মীয় আচার বিচারগুলিকে। ধরা যাক, অন্তিম কৌতুক-এর প্রারম্ভিব পংক্তিগুলি। সহজ গদ্যে ব্যক্ত মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টির কল্পবাসনা—'কাঠগুলো শ্মশানে পুড়লে চিতা। কবে আমায় পোড়াবে/অমন রূপোলি স্রোতে। পুরুষেরা কখনও চণ্ডাল হয়। ভালো। রাশি-রাশি মহিলা, আমায় চিতার/উপর বেঁধে তোমরা উল্লাস কোরো সমস্ত রাত।' সাগ্নিক এক শ্মশান-চিতার ছবি ভাষা ও ছন্দের অনুপম শিল্পিত আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে ভ্রান্তি কবিতায়—'তোমায় কিছু দিয়েছিলাম প্রীতির ছায়াতলে/নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে...../চমৎকার বারুণীগীতি আছো তো সখা ভালো?/বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে।'

মৃত্যুর কথা, চিতাগ্নি ও দহনের কথা বারবার বললেও জীবন সম্পর্কে এক বিস্ময়কর মুগ্ধতা ছিলো তাঁর, যে মুগ্ধতাকে ঢেকে ফেলতে পারেনি বয়সী অভিজ্ঞতার বলিরেখা। 'প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক' গাইতে চান নি তিনি ; বরং অনভিজ্ঞতার প্রসারিত পৃথিবীতে মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন ফুটন্ত শস্যের শুদ্ধ, স্বাভাবিক পূর্ণতা। **শবযাত্রী সন্দিগ্ধ**-তে তাই জনৈক শবযাত্রী মৃত্যুর করাল কৃষ্ণদর্পণ থেকে যেন মুখ ফেরাতে চাইছে—'মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবো না।/খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া/কালরাতে যে সাতপহর গাওনা হ'লো...../কেউ ডেকেছে। কেন।/আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।.......'

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য-র পর *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*। কেন মৃত্যু নিয়ে এত অজস্র পংক্তি, অজস্র প্রতিমা, অজস্র উল্লেখ ছড়িয়ে আছে শক্তির কবিতায়? কেন মৃত্যু ও বিদায়ের বেদনায় নিষিক্ত তাঁর অসংখ্য রচনা? অথচ জীবনের প্রতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর প্রেম-প্রীতি-গার্হস্থ্যসুখের প্রতি তাঁর অনুরাগ তো অস্বীকার করার নয়। মৃত্যুর কথা যতবার বলেছেন তার চেয়ে জীবন ও ভালোবাসার কথা তো কিছু কম বলেন নি। আসলে শক্তির জীবন দৃষ্টি এক ভবঘুরে জীবন পথিকের, এক বাউল বৈরাগীর, যিনি মৃত্যুকে অনিবার্য পরিণাম তথা যবনিকা বলে মনে করলেও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ও অন্য অনেক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু[২১], দাদামশাইয়ের কাছে এক উদার, উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে সহায়ক হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। এই মানসিক প্রস্তুতিপর্বের কথা শক্তি নিজেই উল্লেখ করেছেন : 'ঠাকুর বিসর্জন, ভিড়ের জন্য আমাদের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিসর্জনের পরদিন আমরা গাড়ি করে বিভিন্ন মণ্ডপে যেতুম। কেন? না, মামার নির্দেশ ছিল এই, এত জাঁকজমকের মধ্যে যে ছিল, সে আব নেই। ছেলেদের এটা দেখা উচিত। তাহলে এই আমরা যখন যাবো, তখন ওরা র‍্যাশনালাইজ করবে, সবাই অমর নয়, দীর্ঘজীবী নয়, কেউ আগে, কেউ পরে—যাবে।'[২২] শক্তি তাই জানেন জীবন ও মৃত্যুর কি অপরূপ বোঝাপড়াই না মানব-অস্তিত্ব ; জীবনের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে মৃত্যু। মৃত্যুবোধ ব্যতিরেকে জীবনবোধেরই বা কী অর্থ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যুবোধ জীবন সম্পর্কে কোনও অনীহা বা বিতৃষ্ণা-প্রসূত একেবারেই নয়। জীবনযাপনের এক শিল্পিত আবহ তাঁকে আকর্ষণ করে, মানবীয় অস্তিত্বের বহুস্তরিত প্রক্রিয়াকে তিনি পরতে পরতে আস্বাদন করতে চান, পৌঁছতে চান প্রকৃত ভালোবাসার ভোবে। তাই তথাকথিত জীবনাচারের দিনপঞ্জীকে অতিক্রম করে এক মরমী অভিজ্ঞতা যেন তাঁকে ডাকে। মৃত্যু তাঁর কাছে জীবানাকাঙক্ষারই নামান্তর যেন—'জীবনের কোলে বসে মরণের এই অবসাদ/কবে শেষ হবে?' (**জীবনের কোলে বসে মরণের এই অবসাদ**) পথ চলতে থাকা বাউলকে তো এমন অবসাদগ্রস্ত হলে চলে না।

যথার্থ সৌন্দর্যের তৃষ্ণা, প্রেমের স্মার্ত অনুভব, প্রকৃতির রঙ-রূপের প্রতি নিবিড় আকাঙক্ষা, এ সবের প্রেক্ষিতেই শক্তির মৃত্যুমনস্কতার বিচার করা সঙ্গত বলে মনে হয়। মৃত্যু যেখানে বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত ; বিষণ্ণ একাকিত্বে যেখানে বিধুর হয়ে ওঠে পথিকের সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা—'আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি/এমন ছিলো না আষাঢ় শেষের বেলা' (**আনন্দ-ভৈরবী**), কিংবা 'আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী/ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি' (**অবনী বাড়ি আছো**)।

অনুরাগ ও বৈরাগ্য, প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ, প্রেমের অপাপবিদ্ধ মুগ্ধতার ভেতরে থরোথরো বিহ্বলতা ও আতুরতা শক্তির কবিতায় সৃষ্টি করে এক অপরূপ রহস্যময় চোরা টান ; যেন জীবন ও মৃত্যু দুদিকেই তাঁর বন্ধন, আবার দুদিকেই তাঁর মুক্তি[২৩]—'রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি/যখন তুমি চাইবে জানি/অনন্যোপায়—দিতেই হবে/অনুভবে/অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি' (**স্থায়ী**) কিংবা 'গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম/তোমায় ভালো/এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে-মেঘে-মেঘেই/দিন ফুরালো (**ঝাউয়ের ডাকে**)।

কল্পনা ও বাস্তবের এক অসমাধেয় দ্বন্দ্বই জীবন। 'পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাই' (**পারিপার্শ্বিক থেকে**) বললেও 'নিভন্ত লণ্ঠন/অস্তিত্ব সজাগ করে বারান্দার কোণ/বসে থাকে' (**কোন দিনই পাবে না আমাকে**)। মাঠের ধারে মিস্তিরির গড়া হলুদ বাড়ি হাত বদল হয়ে যায়, তবু ক্ষোভ মেটে না—'লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি/বদল করে দিলো না মিস্তিরি' (**হলুদবাড়ি**)। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের বিধিনিয়ম, সামাজিক নানা সংস্কার অগ্রাহ্য করে এক বাধা-বন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারী জীবনকে বেছে নেওয়ার মধ্যে যে শিহরণ, শক্তির কবিতাতেও তার অঢেল স্বীকারোক্তি আছে। যেমন **স্বেচ্ছা** কবিতাটিতে— 'সকাল থেকে আমার ইচ্ছে/এক ধরনের সাহস দিচ্ছে/উড়ে না যাই।' কিন্তু উড়তে চাইলে তো পুড়তেও হয়। বাসনা ও বাস্তবের পরস্পর-প্রতিমুখী টানে। চৈতন্য আক্রান্ত হয় অবসাদে, সংশয়ে—'কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়/অমৃতই বিষ!/মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ' (**আমি স্বেচ্ছাচারী**)। সমুদ্র-তরঙ্গে ভেসে আসা অসনাক্ত শবদেহ ঘিরে মানুষের কলরব শোনা যায়। মৃতের পরিচিতি ও বসতি নিয়ে ব্যক্ত হয় জিজ্ঞাসা। কিন্তু সমুদ্র-কল্লোলের অবাধ্য ধ্বনিময় অন্ধকার সে সব জিজ্ঞাসার তোয়াক্কা করে না। মৃত্যু যেন মানুষের সর্বগ্রাসী নিয়তি— "তীরে কি প্রচণ্ড কলরব/জলে ভেসে যায় কার শব/কোথা ছিলো বাড়ি?'/ রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী'।" (**আমি স্বেচ্ছাচারী**)

জীবন ও মৃত্যু, প্রেম-প্রকৃতি-পরিক্রমা, স্পৃহা-নিস্পৃহতা, সব যেন এক অদ্ভুত রহস্যময়তায় মিলেমিশে যায় শক্তির আলেখ্য-প্রবাহী কাব্যগ্রন্থ *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে*-র ছত্রে ছত্রে। এই গ্রন্থনামের আড়ালে যেমন জীবনানন্দের প্রচ্ছায়া, পর্যটনপ্রিয় এ কবির স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত-পরিবাহী আলেখ্যর পরতে পরতে তেমনি মৃত্যুর সকরুণ ছায়া পড়া জগতের বিষণ্ণতা। 'সারাবেলা বৃষ্টিতে বিষণ্ণ হয়ে এলো/কাঁটাঝোপ থেকে ডাক এলো কানে বিদায়মধুর', এভাবেই শুরু হয় জীবন-সংরক্ত অথচ বাউন্ডুলে পথিকের পরিক্রমা।

স্পৃহা ও নিস্পৃহতার এক মোহময় মিথোজীবিতা দেখি এ কাব্যে—"সেবার জ্যোৎস্নায় বাঁধ বাঁধা হলো খুব/বিলাস-ব্যসন হলো—বিজলির ভুম্ বেঁধে দেওয়া হলো গাছের অন্তরে/বলা হলো—'নিজেদের দ্যাখো'/বহুদিন এই দেশে তেমন যথার্থ আলো নেই/টর্চবাতি নেই— নেই আত্মসমীক্ষণ-কনেদেখা—/সৌন্দর্য-তৎপর বাঘ লাফ দেয় হরিণের পানে/হরিণ, মৃত্যুর ভাষ্য তৃণের সবুজে দেখেছিলো।" শেষ দুটি পংক্তিতে বিদ্যুৎ-চমকের মতো জীবন ও মৃত্যু এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়। এখানেও শক্তির নিসর্গপটে মৃত্যুবোধ চিতার দহনের চিত্রকল্পে ব্যক্ত হয়েছে; বসন্ত-প্রকৃতিতে ফুটে উঠেছে দহনের অগ্নিবলয়—'ফাল্গুনের শেষ/কাশে আগুন দিয়েছে কোনো লোক/তারার চিতার মতো সে সবই অসংখ্য আছে পড়ে।' প্লাবিত চন্দ্রিমার মধ্যে এসেছে ভস্মের ছোঁয়া—'ইন্দ্রিয়ে লেগেছে ছাই'; বাদুড় উড়েছে, ঘুরেছে 'রাতের লাটিম', কুয়াশায় পথ ঢেকে গেছে পথিকের। ভ্রাম্যমান পর্যটকের অভিজ্ঞতায় আলো-অন্ধকার, আনন্দ-বেদনা ক্রমাগত

মিলেমিশে গেছে। এক বিপন্নতার বেদনা এ জীবনালেখ্যকে দিয়েছে মরমী মাত্রা—'এবার বৃষ্টির আগে/প্রচ্ছন্ন ঈশাণে— মেঘ জাগে/নিরঙ্কুশ, যাবার সময়/পৃথিবী-ব্যাপক শুধু খেলা করে ক্ষয়'। বোঝা যায় 'খুবই সচেতন ভঙ্গিতে'[২৪] জীবনানন্দকে গ্রহণ করেছিলেন শক্তি।

জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে এতো নিবিড় পরিচয় ও মগ্নতা যে কবির তাঁর ভাবনায় বারবার মৃত্যু, চিতাগ্নি, বিরহ ও বিদায়ের বিষণ্ণতা এসেছে :

(১) মানুষ প্রকৃতি থেকে এভাবেই ছেঁকে নিতে চায়/শান্তি সারাৎসার কোষ্ঠ অনন্তের জীবনবেলার/শেষে দারুভূত হতে হয়।

(২) মানুষের বেঁচে থাকা—মানুষের শান্তি পাওয়া শুধু—মনে হয়/মারা গেলে?

(৩) 'মৃত্যুর স্বতন্ত্র দেশ!' ক্যানারি পাখিরা বলে যায়, বনে বনে, গাড়ি-বারান্দায়।

(৪) নিচের পৃথিবী থেকে ওপরের পৃথিবীতে চলে যেতে হবে/বিদায় নেবে না তুমি।

(৫) .... সে সবের ভিড়ে/নিজের সমাধি ভেবে যার কাছে ফিরে/সহাস্যে দাঁড়াই/সে বলে—'কফিন খালি নাই!'

(৬) তুমি ভালোবাসো তাই/আমি দীর্ঘদিন ঘুরে লোকের সমাজে/নিজেকে করেছি সঙ্ঘ-বান্ধব-বিহীন-/এরই নাম বিষণ্ণতা।

(৭) ...আজো মন চায়/ তেমন যেতেও ছুটে আনন্দের পানে—/এখন সমস্ত যাত্রা দুঃখের সন্ধানে!

(৮) ....হয়তো সময় কাছে এলো!/ হত্যায় চঞ্চল হলো ছুরি/সেগুন-অর্গানে বাজে বেলো/অমৃত্যু-মৃত্যুর লুকোচুরি—/তবু সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হয়ে আসে/তবু সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হয়ে আসে। জীবন-মৃত্যুর লুকোচুরি খেলার ফাঁকে আসন্ন সন্ধ্যার পুনরুক্তিমূলক উল্লেখে মৃত্যু-আগমনী বেজে ওঠে।

একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মৃত্যুভাবনা শক্তির পরবর্তী কাব্য *সোনার মাছি খুন করেছি*-র অন্যতম বিষয়। সঙ্কলনভুক্ত প্রথম রচনাটিতেই নিশীথ রাতের জনৈক টালমাটাল মদ্যপায়ীর আপাত-অসংলগ্ন স্বগতকথনে মৃত্যুর কথা, জীবন-মৃত্যুর এক কিম্ভূত সমাহারের ছবি—'সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান—ওলোটপালোট কঙ্কাল/কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু—সুতরাং/মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু/ আর কিছু নয়!' (**সে বড়ো সুখের সময় নয়.....**) অপ্রচলিত ও অকাব্যিক চিত্রকল্পে, কথ্য ভাষার সহজ রীতিতে, নিরাবেগ স্পষ্টতায় মৃত্যুকে দেখেছেন নির্বিকার দৃষ্টিনিক্ষেপে—'একদিন এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো একে একে খুলে যাবে,/ যেমন করে ফাঁস আল্‌গা হয়, কোমরের কষি খসে হয় আলুথালু/তেমন করে এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো আমার একে একে খুলে যাবে,/খুলে ছড়িয়ে পড়বে আমারই চতুর্দিকে—দেয়ালের ক্ষয়লাগা পলেস্তারার মতন (**একদা এবং আমি**)। ঐ একই কবিতায় মৃত্যুর অনিবার্যতাকে এক ভাবাবেগ-বর্জিত ঔদাস্যে স্বীকার করেছেন; মৃত্যুর হাত থেকে কোনো জীবিত প্রাণেরই রেহাই নেই—'মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি—মৃত্যু থেকে পার নেই,/যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে/বড়ো ফাঁদ ছোটো হবে, করতল-মুষ্টিতে এসে জমে যাবে/ভাগ্যরেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভীষণ পর্যটনময়; মহানগরের পথে-ঘাটে এবং অনেক বেশি করে জঙ্গলে পাহাড়ে তাঁর বেপরোয়া পরিব্রজ্যা। মৃত্যুও সেই ভ্রাম্যমাণ পথিকের নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে

দেখা— 'যেতে যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক/তখনই ছেড়ে যাওয়া সব/আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে/তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব/ হয়তো তুমি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না—শুধু যাওয়া' (**যেতে-যেতে**)। যাওয়ার এই অভ্যাস, তার প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি থাকলে মৃত্যু ভয়ঙ্কর পরিণাম বলে মনে হয় না। বরং শক্তি তো প্রায় খেলাচ্ছলেই মৃত্যুকে দেখেছেন কতোভাবে—'মৃত্যু, তুমি খাপছাড়া ইস্কুলের টিফিনের ছেলে/ কেউ কাছে কেউ দূরে/টিউকল, গোলপোস্ট, গোরস্থান, বাদুড়, দেবদারু/মৃত্যু, তুমি অঙ্গ ভঙ্গি/মৃত্যু, তুমি রাসবিহারীর ট্রামলাইন/মৃত্যু, তুমি মেয়েদের চুলে-ভরা নীল কাঁচপোকা/আমার বারোটা রোদ, আমার বারোটা ঘোর আঁধার!' (**উড়ন্ত সিংহাসন ১০**)। এই উদ্ধৃতির শেষ ছত্রে জীবন ও মৃত্যু, আলো ও অন্ধকার যেন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রেম ও প্রকৃতি, এ দুয়ের প্রতি যাঁর নাড়ীর টান সেই কবিকে স্বতন্ত্রভাবে মৃত্যুমনস্কতার কবি বলা অযথার্থ হবে। মৃত্যুর কথা তিনি বলেছেন বিস্তর, বলেছেন নৈঃশব্দ্য, একাকীত্ব, অন্ধকারের কথা ; তবু তাঁর তীব্র ইন্দ্রিয়বোধ জারিত হয়েছে প্রগাঢ় জীবনাসক্তিতে। মৃত্যুর কোনো ভয়-ভাবনা তাঁর যাত্রাপথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় নি। স্বগতকথনের সুরে বলেছেন—'যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে/এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়/ তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম/ যাত্রী তুমি—পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে/এই তো চাই' (**যেতে-যেতে**)। কবির দৃষ্টি এক সংস্কারমুক্ত, অকপট জীবনরসিকের।

সুদীর্ঘ, সুস্থিত, বৈচিত্র্যহীন সরলরৈখিক জীবন এ পর্যটকের অনাকাঙিক্ষত। তিনি ঝুঁকি নিতে আগ্রহী—'উঁচুনিচু খাড়াই পথের শেষ সীমানায় সঙ্গে যাবো' (**আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা**) ; তিনি ব্যাকরণ-শৃঙ্খলাকে ভেঙে পথ চলেন—'আমার উড়োনচণ্ডি চলা থমকে যাবে ভিজলে পাখা?' (**তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই**) ; তিনি ছাপোষা গৃহস্থের গণ্ডীবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বসন্ত-প্রকৃতির বর্ণ-দহনে আত্মাহুতি দিতে চান—'আয় বিদেশে বাস্তু করি—চাল-চুলো-চৌকাঠটা খুলে/নীল দিগন্তে ফুলের আগুন—সেই আগুন পোড়াচ্ছে কবে?' (**এই বসন্তে বৃষ্টি হবে**)। এক 'অফুরন্ত জীবনের দিকে', 'অফুরন্ত জীবনের প্রতি' এ কবির চলে যাওয়ার, বয়ে যাওয়ার ইচ্ছা।

প্রিয় বন্ধু, অগ্রজ কবি-লেখকদের স্মরণে বেশ কিছু শোককবিতা বা 'এলেজি' লিখেছিলেন শক্তি যার মধ্যে এই সংকলনভুক্ত **এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** এক অনবদ্য রচনা—'মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিয়ুস/তুমি জেঁনে গেলে সব/তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে-ভরা টব/লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে/ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে/ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে।' এ কবিতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ব্যক্তি-পরিচিতি নেই, নেই তাঁর প্রতি এলেজিলেখকের প্রথাসিদ্ধ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব মৃত্যু-ভাবনা, বা বলা যায় তাঁর জীবন-মৃত্যু বিষয়ক উপলব্ধি থেকেই এ রচনার উৎসার। জীবন ও মৃত্যুর লাবণ্য ও বেদনা এখানে মিলে মিশে গেছে—''তুমি নীলকণ্ঠ চারা পুঁতে দিয়ে বলেছিলে—'একে জল দাও/একে আর বিষণ্ন রেখো না/আমার মতন এ-ও খুঁজেছে বিছানা।'/....তুমি আছো দূর পরপারে/সেখানে কখন ট্রেন ছাড়ে?/ আছে টেলিফোন? /তোমাদের বাজার কেমন/ তোমাদের দোকান কেমন.....'' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাওয়াকে শক্তি দেখেছেন খুব তাৎপর্যময় হয়ে বেঁচে থাকা এক মানুষের বিদায় রূপে। শোকের

মধ্যেও জাগ্রত সেই অম্লান ভালোবাসার স্মৃতি। আত্মীয়-বন্ধু ও স্মরণীয় নানা ব্যক্তিত্বকে উপলক্ষ করে শক্তি এত বেশী শোককবিতা লিখেছিলেন যে তাঁর একটি স্বতন্ত্র এলেজি-সংকলনই প্রকাশিত হয়েছে।[২৫] কিন্তু মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা ও বেদনার কথা থাকলেও শক্তির এলেজিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে মৃত্যুর কবিতা নয় ; বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন তারই বেদনা-নিষিক্ত অনুভব। শক্তির কবিতায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে বারবার পথিক ও তার যাত্রার চিত্রকল্পে বোঝানো হয়েছে। এ পথিক রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই চলতে থাকে 'দুই হাতে কালের মন্দিরা' বাজিয়ে।

নারী ও শিশু, প্রেম ও অপত্যে পূর্ণ মানুষের ঘর-সংসার আর পথ থেকে অন্যপথে চলমান প্রাণের প্রবহমান ও বিস্তৃত প্রক্ষেপ, এ দুয়ের বৈপরীত্যে নিরন্তর পরিক্রমারত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্বেষণ করেছেন জীবনরহস্যের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই অন্বেষণই তো প্রকৃত অর্থে জীবন। 'পথ' শক্তির কবিতায় পুনরাবৃত্ত চিত্রকল্পগুলির অন্যতম ; চলমানতার বিস্তার, প্রাত্যহিকতার দুঃখ-বেদনা ভুলে এক মোহনার দিকে, অনন্ত ঐক্যের দিকে ভেসে চলার মাধ্যম যেন। **হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান**-এর **কোন পথে** কবিতার এই পংক্তিগুলিতে নদীর সমুদ্রসঙ্গমে উপনীত হওয়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে: ' একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার—/কোন্ পথে?/ কোন্ পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।/...আমরা যারা একবার বেরিয়ে এসেছি/তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।/পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে/নদী বেরিয়ে সমুদ্রে—/এই তো নিয়ম।/আমরা নিয়ম-মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে গিয়ে হাজির, নদী থেকে সমুদ্রে.......।'

ছাপোষা গৃহস্থের ভদ্রতা ও লৌকিকতার চাইতে ছিন্ন পোশাকে পথ-চল্‌তি বৈরাগীর আপনভোলা মেজাজেই মনের স্ফূর্তি ; মেলায়-পার্বণে মাঝে মধ্যে দু-এক পশলা দেখা-সাক্ষাৎ বড়জোর হতে পারে—' বেশ আছি, শব্দ ভুলে ন্যাংটো/ফুটো ইজেরে হাওয়া খেলছে..../সুতরাং, আসি/ চোত-বোশেখের মেলায় দেখা হবে, কবুল ক'রে/ চৌ-চম্পট দি—' (**অনেকগুলো শব্দের কাছে**)। এই পথিকের অভিজ্ঞতায় জীবনযাপনের চটুল মজাও যুক্ত হয়েছে কখনও কখনও— 'বহুকাল বাদে তোমাকে পেয়েছি, তোমায় পেয়ে আমাকেও পেয়েছি/....এসো, দুজনেই আঁধার-করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি/মজা হোক—ভারি মজা হোক একখানা/বিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক/ঐসব মন-খারাপ মজাদিঘি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠকিয়ে/ভীষণ মজা হোক' (**মজা হোক—ভারি মজা হোক**)।

বদলে যাওয়ার কথা, বারবার নানাভাবে নিজেকে বদলে নেওয়ার কথা এসেছে শক্তির কবিতায়। ঘরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে পথে নামলে, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে চলতে থাকলে বদলে যাওয়া কিম্বা নিজেকে বদলে নেওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। এই বদল শক্তির জীবনবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা—'ধীরে ধীরে/ যেভাবেই হোক/বদলে নেবো/বদলে বদলে নেবো (**ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক**)। এই বদলের টানে কখনো কবি সামাজিক মানুষের বচন ও ভঙ্গিসর্বস্বতা থেকে দূরে ভেসে যান নির্জন উদাসীনতায়, যদিও সে বদলও সম্পূর্ণ হয় না—'মানুষের কাছে যেতে আমার ভারি কষ্ট হয় আজ।/তার চেয়ে ভালো এই নিস্পৃহ বনানীর ভিতর অমল তৃণবাড়ি—/চোর-পুলিশ খেলার সময় আমিই চোর, আমিই পুলিশ!/....আমি ভারী একা এখানে!/জন-দরদ, পার্টি-মিটিং, বক্তৃতাও বহুকাল বন্ধ—/....আমি কেমন বদলে যেতে

বসেছি—/এক্কেবারেই বদলে যেতুম, যদি না সেদিন গভীর রাতে/শুনে ফেলতুম গাছের ভিতরে ঠাসা একদল তদন্তকারী/মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ফিসফাস আর গুলিবারুদের শব্দ!' **(মানুষের কাছে যেতে)**

পথ থেকে প্রান্তরে, নদী থেকে সাগর-সঙ্গমে এমন এক বহমানতার কথা বলেছেন শক্তি যাতে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ এলেও তা কোনও গভীর ও স্থায়ী বেদনা বা প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে নি। মৃত্যু ও মৃত্যুর নানা ভাবনা ও অনুষঙ্গ পথিকের পর্যটনলিপিতে বিষাদের প্রলেপ লাগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে কারণে পর্যটকের জীবনবোধের বিস্তার ব্যাহত হয় নি। বরং মৃত্যুভাবনা জীবনবাসনারই এক স্বাভাবিক ও অনিবার্য স্বতঃসিদ্ধরূপে গৃহীত হয়েছে। জীবনকে শক্তি দেখেছেন জন্ম ও মৃত্যুর দুটি প্রান্তবিন্দুর সংযোজক রেখা হিসেবে। যেখানে দুই প্রান্তবর্তী দুটি মুহূর্তই মানুষের নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাচনের অতীত, যেখানে তাদের মধ্যবর্তী সংযোজক অংশটিই প্রকৃত অস্তিত্বশীল—'গলির দুপাশে দুটি মুখোমুখি প্রাসাদ-বাতায়ন থেকে/দুই রঙের আলো এসে পড়েছে/মানুষের জন্মমৃত্যু কোনও অস্তিত্ব-নিরস্তিত্বেরই নয়' **(আমায়, পথ থেকে পথে)**।

মৃত্যু ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ তথা চিহ্নগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এসেছে ফ্যানটাসি কিংবা রূপক-প্রতীককে আশ্রয় করে, যেমন—

(১) কতোদিন সমাধি প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছি/টেলিফোন ক'রে তোমাদের সঙ্গে যোগাযাগ করবো ব'লে বেরিয়ে আর/নিজের সমাধি খুজে পাচ্ছি না.......। **(কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ)**

(২) কিছুক্ষণ আগে গ্রীস থেকে বেড়িয়ে ফিরলাম আমি/যারা যারা আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো/তাদের সকলের সমাধি আমি অন্ধকারে এসেছি দেখে/এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি। (ঐ)

(৩) যাক, যা বলছিলুম—বাড়ির কথা/ সেই আমি হঠাৎ বাড়িবদল ক'রে বসেছি/ ভেতরে-ভেতরে ইচ্ছে—এই নতুন-পাওয়া বাড়িতে আত্মহত্যার কাজটা সেরেই নোবো/পুরোনোর অনুনয়-বিনয় নেই, পিছুটান নেই/ সুতরাং, অবাধ মৃত্যু এখানে আমার রোখে কে? **(বাড়িবদল)**।

(৪) আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো—অনেকেই চেনে **(সমাধি ফলকের স্মৃতি)**।

বিষাদ ও রহস্যময়তার মিশ্রণ এইসব পংক্তিতে। হেমন্তের অরণ্যে পর্যটনরত কবির কল্পনায় জীবন ও মৃত্যুর অদ্ভুত হেঁয়ালী। *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* গ্রন্থে সংকলিত, ১৯৬২-তে লেখা একটি ছোট কবিতায় মৃত্যুভয় প্রসঙ্গে শক্তি লিখেছিলেন—'মৃত্যুরে পেয়েছি ভয়। মরে যাবো তোমাকেও ছেড়ে?/ একাকী, সমাজহীন। মানুষের করাঘাতে আর/উঠিব না জেগে, এ কী ঘুম, অলক্ষণ, এ কী ভার/ স্মৃতির, মৃত্যুর আগে, স্মৃতি কি বস্তুত যাবে ছেড়ে!/ তোমারে পেয়েছি ভয়, তুমিও তো মৃত্যুর পোশাক/ পরে নেবে...' **(মৃত্যু একা থাক)**। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকেই এই ভয়ের উদ্ভব। মৃত্যুপ্রসঙ্গ শক্তির কবিতায় বার বার ও বরাবর এসেছে। তাঁর কবিতা রচনার একেবারে সূচনাপর্ব থেকে শক্তি ষাট দশকের শেষ পর্যন্ত এক ধারাবাহিব শৃঙ্খলায় যেসব সনেট লিখেছিলেন ১৯৭০-এর মে মাসে সেগুলি গুচ্ছাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* শিরোনামে। এই গুচ্ছের **৯১ সংখ্যক কবিতায়** আমরা পড়ি মৃত্যু বিষয়ে শক্তির একান্ত উচ্চারণ—'মানুষের মৃত্যু হলে তার ঘরে সে থাকে না খালি/বাকি সকলেই থাকে—যাবার সময় নয় কারো/যাকে ডাকা হলো সে-ই যাবে'। মৃত্যু এক একক অবশ্যম্ভাবী

ঘটনা যা ব্যক্তিকে বিযুক্ত করে সমষ্টির সামূহিক জীবন থেকে। সময় বিনষ্ট করে মানুষের স্বপ্ন, ভালোবাসা ; 'মৃত্যু' তার প্রতিনিধি এবং সে অনিবার্য। তবু কবি তাঁর কবিতায় এক চির-সম্ভাবনার কথা শোনান—'আমি মৃত্যুর আপন বক্ষতল/তোমারে জীবিত-মৃত সর্বক্ষণ, বক্ষে ধরে রাখি' (**১৭ সংখ্যক কবিতা**)। সকল সৌন্দর্যের মর্মমূলে যেন থাকে মৃত্যুর বীজ; সুন্দরের শরীরে তাই সর্বদাই বিষাদের স্পর্শ লেগে থাকে—'সকল সুঠাম বৃক্ষে মৃত্যু ও স্তব্ধতা ঢাকা আছে' (**১৫ সংখ্যক কবিতা**)।

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই, সংকলনভুক্ত একটি শোককবিতায় জনৈক কবির মৃত্যুকে শক্তি দেখেছেন এইভাবে—*বিষণ্ণ বাঘের মতো অগ্নি এসে তার নীল ঝোপে*/কবিকে টেনেছে আজ (**তার মৃত্যু : নবেন্দুর স্মৃতি**)। মানুষখেকো বাঘের চকিত হানাদারির চিত্রকল্পে চিতাগ্নির কবিকে গ্রাস করার বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু বাঘের আগ্রাসনের মধ্যেও বিষণ্ণতার ছাপ রয়েছে। অন্য একটি কবিতায় মৃত্যুর ছবি এঁকেছেন শক্তি আরও অভিনব এক উপমার সাহায্যে 'মৃত্যু এসে দাঁড়াবে এখানে/ *পুলিশের মতো স্পষ্ট* (**মুহূর্তে শতাব্দী**)। প্রবল জীবনপ্রেমিক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্পর্কে ভয়ের পাশাপাশি নজরে পড়ে কিভাবে মৃত্যুকে খারিজ করে দেওয়া অসম্ভব বলে নিরুপায়তা ব্যক্ত করেন তিনি—'শ্মশানের কোনও দরজা নেই— তাহলে বন্ধ করে দিতুম/শ্মশানের নেই তালাচাবি—তাহলে হারিয়ে ফেলতুম' (**ঐ যে তিনি : সতীনাথ ভাদুড়ী স্মরণে**)। মৃত্যু তাঁর কাছে এক করুণ ও নিষ্ঠুর কিন্তু অনিবার্য বিনাশ যাকে তিনি আভাসিত করেন রূপকধর্মী উপমার সাহায্যে—'জীবনের কাছে আজ *মরণের কাঠুরে* এসেছে' (**আমাদের ঘর নাই—আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে**)। আবার কখনও সমস্ত কর্মোদ্যমের নিরর্থকতাজনিত একঘেয়েমি ও ক্লান্তি কবিকে জীবন-মৃত্যু নিয়ে অস্তিত্ব-দর্শনের এক ভিন্ন স্তরে নিয়ে যায়—' কী হবে জীবনে লিখে? এই কাব্য, এই হাতছানি/এই মনোরম, মগ্ন দীঘি.../ফাঁস থেকে ছাড়া পেয়ে *এই মৃত্যুময় বেঁচে থাকা?* (**মৃত্যুর অমূল চাপ মৃত্যুতেই আছে/** *সুখে আছি*)। *ঈশ্বর থাকেন জলে* গ্রন্থে সংকলিত, প্রিয় কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যর স্মরণে লেখা একটি এলেজিতে শক্তি মৃত মুখের পাষাণ-স্তব্ধতার কথা বলেন—'মৃত মুখ, তাকে আমি *কুয়োর জলের মতো স্তব্ধ মনে করি*' (**কবির মৃত্যু**)। কবিতার ফলবান সৃজনভূমি ছেড়ে কবির চলে যাওয়া, পরিপক্ক ফলের খসে পড়া মাটিতে, শক্তি ব্যক্ত করেন বেদনার সঘন অক্ষরে—'....কিন্তু সে-কবিও যান *হাতে গড়া শস্যক্ষেত্র ছেড়ে* একদিন/পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে।' মৃত্যুর অনিবার্যতা, জীবনের সীমা ছাড়িয়ে মৃত্যুর ব্যাপ্তি, মৃত্যুতে মানুষের ফিরে যাওয়া তার উৎসমুখে, এই সব ভাবনার মূল্যবান বিবৃতি পাই এই কাব্যগ্রন্থেরই অন্যত্র—'সমস্ত মানুষ, শুধু আসে ব'লে যেতে চায় ফিরে।/মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূমধ্য তিমিরে/লুকোতে চেয়েছে বলে আরও দীপ্যমান হয়ে ওঠে— /....*যে যায় সে দীর্ঘ যায়, থাকা মানে সীমাবদ্ধ থাকা*' (**যে যায় সে দীর্ঘ যায়**)। কখনও বা জীবনানন্দের কবিতার মতো 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' অনুসন্ধানের পন্থা হয়ে ওঠে মৃত্যু—'তাকে পেতে গেলে দীর্ঘ ঘুম চাই, হিম মৃত্যু চাই/ *রক্তের ভিতরে আছে, রক্তের ভিতরে কেউ আছে*' (**ঝর্না শুধু যাবে বলে**)।

শক্তির মধ্যে এমন এক সতত চলমান জীবন-সন্ধানী পথিক-সত্তা ছিলো যে মৃত্যু এসে তাঁর পরিক্রমায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবে এমন পরিণতি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই *অস্ত্রের গৌরবহীন একা*-র শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে লেখা কবিতাটির শিরোনাম দিয়েছিলেন

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি। মৃত্যু নিয়ে বড় বেশি সত্যি কথা লিখেছিলেন শক্তি— 'মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্যে তার শোক/পড়ে থাকে কিছুদিন, ব্যবহৃত জিনিশেরা থাকে/জামা ও কাপড় থাকে, ছেঁড়া সুতো তাও থেকে যায়,/হয়তো বা পা-দুখানি রাঙা হলে পদচ্ছাপ থাকে।' যে যায় সে ফেলে রেখে যায় জীবৎকালের কিছু এলোমেলো চিহ্ন মাত্র। সেইসব টুক্‌রো নিয়ে আংশিক, বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। অপসৃত মানুষটির 'সমগ্র' নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না, হতে পারে না। আমরা শিহরিত হই যখন আরও পড়ি—'দক্ষিণ-দুয়ারে এসে দাঁড়াবে নির্ঘাৎ/চতুর্দোলা নিয়ে যম—/অপমান লাগে...../মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি'। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ আসলে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা জীবনের প্রতি মমতা ও দায়বদ্ধতার এক অমোঘ অভিমান। মৃত্যুর ভিতরে এক ধ্যানস্থ তরুণ তপস্বীকে নির্বিকার ও নিস্পন্দ দেখতে পান শক্তি, যার এক দূরস্থিত জগৎ মানুষের প্রেম, প্রকৃতি ও বেদনার সঙ্গে সম্পর্করহিত। জন্মেরও আছে এক প্রতিস্পর্ধী তপস্যা যা মৃত্যুর অন্তরালপ্রিয় তপশ্চারণকে অগ্রাহ্য করে— 'মৃত্যুর যেমন আছে তপস্যার মতো ক্লান্তিহীন মনোস্থাপন/আছে ঠিকঠাক জন্মেরও তেমনি/জন্মের তপস্যা যেন রক্তের ভিতরে/গভীর গাভীর মতো পেটে কোনো/ভূমগুলে কোনো/মানুষের ভালোবাসা দিয়ে মোড়া/মূল্যবান কিছু—/জন্ম কোনও মৃত্যুকেই পরোয়া করে না' (**জন্ম কোনো মৃত্যুকেই**/*জ্বলন্ত রুমাল*)। জীবনের প্রতি প্রবল মমতা শক্তির কবিতার অন্যতম মূলমন্ত্র। তাই মৃত্যুর পরেও মানুষের ফিরে আসার কথা বলেন তিনি—'মানুষের কিছু কাজ বাকি থাকে, মৃত্যুর পরেও/তাকে ফিরে আসতে হয় বাসা খুঁজে মানুষের মতো' (**কিছু কাজ**/*সুন্দর এখানে একা নয়*)।

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল কাব্যগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো এমন পাঁচটি কবিতা যেগুলি এর আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত *যুগলবন্দী* (**আগস্ট, ১৯৭২**) সংকলনে স্থান পেয়েছিলো। এগুলির মধ্যে তিনটি রচনায় মৃত্যু-প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। *পদ্যসমগ্র* (৪)-এর সম্পাদক 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে জানিয়েছেন যে 'নকশালপন্থী আন্দোলন এবং সে-সময়ের কলকাতা শহরের অশান্ত উদ্বিগ্নতা'[২৬] এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু। আমরা অনুমান করতে পারি যে, একদা বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নকশালবাড়ির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই উত্তাল ও আগ্নেয় সময়ে মৃত্যু এক স্বতন্ত্র তাৎপর্যে ধরা পড়েছিল। হত্যা-সন্ত্রাস-ক্লান্তি-স্থবিরতা ইত্যাদির মধ্যে থেকে মৃত্যুকে শক্তি দেখেছিলেন যেন এক ইতিবাচক ব্যঞ্জনায় :

(১) বিমূঢ়তা থেকে ওঠে *মৃত্যুর মহান জাতিস্মর* (**মৃত্যুর মহান জাতিস্মর**)।

(২) অন্যেরা ঘুমায় আজ ক্লান্ত শুধুমাত্র *বেঁচে থেকে*/মৃত্যুর *দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারুবীথি* (**মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারুবীথি**)।

(৩) *দিন যাচ্ছে, যাবে/প্রকৃত কি যাচ্ছে দিন? থেমে নেই? স্থবিরতা নেই?/মৃত্যুর মহান আসে জীবনের তুচ্ছতার কাছে* (**এই মেঘ থেকে বৃষ্টি**)।

জীবন-স্পন্দনের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণেই অন্য কারোর চলে যাওয়ার দৃশ্য, ঘ্রাণ কবিকে সন্ত্রস্ত করে—'অগুরুর গন্ধ কেন? মেঘ কেন করিডর জুড়ে?/কেউ গেলো? কেউ চলে গেলো?' (**চলে যায়**/*মানুষ বড়ো কাঁদছে*)। আবার জড় ও জীবন্মৃত অস্তিত্বের বেদনায় তাঁর মনে হয় শুধুই বেঁচে থাকা অর্থহীন—'কত হলো? কতদিন হলো? এই/ বেঁচে থাকা, শুধু বেঁচে থাকা?' (**এই**

বেঁচে থাকা/*ঐ*)। এ সবের মধ্যেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান এই আশ্বাসে যে 'যার কাছে জীবনের মৃত্যুর মতন তীব্র ঘুণ/পুরোনো ক্রন্দন তার থামায় এবং যায় মরে/মরে যায়, আর না জাগাব জন্যে, নিশ্চিন্তে, বেঘোরে—/আমি সে মৃত্যুর পাতে ভোগ করি তুচ্ছ সিন্ধু-নুন!' (**সৈন্ধব**/*ঐ*)। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের **মানুষ যেভাবে কাঁদে** কবিতাটিতে মানুষের একাকিত্বের বোধ ও বেদনা তথা জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন বিষয়ে শক্তি যেন পৌঁছে যান এক অস্তিবাদী ভাষ্যে— 'তবুও মানুষ বাঁচে, মৃত্যু আছে বলে বেঁচে থাকে/মৃত্যু তো জীবন নয়, ধারাবাহিকতা নয় কোনও।/ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে/বাঁচে, বেঁচে থাকে—এই বাঁচতে হবে বলে থাকে বেঁচে/মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি?/একা থাকি, তবু একা থাকি।'

শক্তির কবিতায় কেবলই পাই 'যাত্রা'র কথা ; জন্ম থেকে জীবনের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর দিকে যাত্রা। মৃত্যু জীবনপথযাত্রীর অবশ্যম্ভাবী গন্তব্য। সে-কারণে মন প্রস্তুতি গ্রহণ করে মৃত্যুকে গ্রহণ করার, গ্রহণ করে জীবনেরই বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুর প্রতি কবির এক রহস্যময় রোমান্টিক আকর্ষণও আছে। তবে, মৃত্যুচেতনায় জারিত হয়েছে শক্তির জীবনবোধ ; মৃত্যুভয়ে মুছে গেছে জীবনের প্রতি ভালোবাসা—এমন কথা বলা যাবে না। *পরশুরামের কুঠার* গ্রন্থে আমরা জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তবিন্দুর সংযোজক যাত্রাপথের অবিরাম চলার বৃত্তান্ত শুনি—'মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা—/জন্ম আগে—মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ,/পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের/সেখানে মাইলপোস্ট নেই—নেই টেলিগ্রাফ-তার/মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ—পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের' (**তুমি আছো—ভিতের ওপরে আছে দেয়াল**)। মৃত্যু এখানে নিছক চিরসমাপ্তির শূন্যতা বহন করে আনে না ; জীবনপথযাত্রীর কাছে এ যেন এক রহস্যময় তীর্থযাত্রা। মৃত্যুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি, যাবার সময়ও মানুষ ও জীবনের প্রতি সহজ মমতা, শক্তির কবিতায় মৃত্যুচেতনাকে বস্তুত জীবনবোধেরই সূচক করে তোলে—'যাবার আগে বোঝা হালকা রাখাই রীতি/নইলে যে বাহকদেরই কষ্ট' (**দূরে ঐ যে বাড়িটা**/*পরশুরামের কুঠার*)। মৃত্যুকে একটি অনিবার্য ঘটনা বলে দেখেছেন শক্তি ; তা বলে মৃত্যুতেই জীবনের পূর্ণচ্ছেদ বলে মনে করেন নি ; ভীতিপ্রদ হলেও সুন্দর এক মৃত্যুর কথা বলেছেন—'মৃত্যুর কাছে আমার মৃত্যুর বিকল্প কিছু দেবার ইচ্ছে বহুকালের। বিকল্পে সে মৃত্যুর চেয়ে কঠিন আর ভয়ঙ্কর কিছু হবে। আমি যে মৃত্যুর কথা বলি— সেই মৃত, তথাকথিত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে। ভূত হয়ে নয়। বিভীষিকা হয়ে নয়। এও এক ধরনের সুন্দর।'[২৭]

মৃত্যু শক্তির কাছে কেবল জৈবিক বা শারীরিক পরিণাম রূপেই অর্থবহ নয়। একঘেয়ে জীবনযাপনের ক্লান্তি, ক্ষুন্নিবৃত্তি আর নিশ্চেতন ঘুম, জড়তা আর শৃঙ্খলার পৌনঃপুনিকতাও তাঁর কাছে মৃত্যুর নামান্তর। তাই পরিহাসের সুর ফুটে ওঠে— 'মানুষ কিভাবে মৃত হয়ে আছে, নিজেও জানে না!/নিজেও জানে না বলে মরে যায় বিবাহের পর/সন্তানের বিশ্বরূপ দেখার পরেও মানুষের/মৃত্যু হয়..' (**মানুষ কীভাবে মরে**/*ভাত নেই, পাথর রয়েছে*)। সকল রোমান্টিকদের মতো শক্তিও আকৃষ্ট হন মৃত্যুর রহস্যমণ্ডিত সৌন্দর্যের হাতছানিতে। তবু 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো'র পূর্বাভাস ধ্বনিত হয় তাঁর আত্মকথনে—'কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও/সকল সম্পর্ক' (**কেন?**/*ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি*)।

আশির দশকে শক্তির প্রথম সংকলন *আমাকে দাও কোল* (মার্চ, ১৯৮০), কাগজে বাঁধাই, সূচিপত্রহীন, ক্ষীণকায়, চোদ্দটি কবিতার এক প্রায়-অজ্ঞাত গ্রন্থ যার সবকটি রচনাই পরের বছর স্থান পেয়েছিলো *আমি একা বড়ো একা* কাব্য সংকলনে। বন্ধু পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ ও আটটি একবর্ণ লিনোকাট চিত্র-সমন্বিত *আমাকে দাও কোল* আয়তনে ও প্রকাশনাপটুত্বে অনুল্লেখ্য মনে হলেও এই কাব্য থেকে শক্তির কবিতা বাঁক নিয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে ; জীবনের প্রতি প্রবল ভালোবাসায় পথ চলতে চলতে, খুঁজতে খুঁজতে, করুণ আর্তিতে কবি যেখানে আশ্রয়-ভিখারী। প্রথমাবধি শক্তির কবিতায় বেজেছে জীবন-মৃত্যুর এক রহস্যময় যুগলবন্দী; জীবনের যাবতীয় মোহমুগ্ধতার ভেতরে নির্জনতা ও মৃত্যুর বিষণ্ণতা এক আলো-অন্ধকারের কারুকার্য রচনা করেছে। সেই মৃত্যুভাবনার অন্ধকার আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি থেকে ক্রমে ঘনীভূত ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে শক্তির শেষ পর্বের প্রায় সমস্ত রচনায়। শক্তির *পদ্যসমগ্র*-র সম্পাদকের গ্রন্থপরিচিতিজ্ঞাপক টীকায় এর সমর্থন মেলে—'শক্তির শেষের দিকের কবিতা যে-মৃত্যুভাবনায় নিয়ত তিমিরলিপ্ত সেই ভাবনা এখান থেকেই প্রত্যক্ষ হতে আরম্ভ করল।'[২৮] সংকলনভুক্ত প্রায় সব কটি কবিতাতেই এসেছে মৃত্যু, মার-খাওয়া বিধ্বস্ত মানুষ ও দহন-ভাঙনের নানা প্রসঙ্গ :

(১) জন্মদিনের মঞ্চে মৃত মুখের পাশে ফুল/ধূপের ধোঁয়া, শুনেছিলাম, সইতে পারতে না (**জন্মদিনের মঞ্চে মৃত**)।

(২) লোকটা কীসের আক্রোশে তার শরীর ভাঙছে/পথের ওপর সপাট পড়ছে রাত্রিদুপুর/... লোকটা যেন পাগল, দেহের আগল খুলে/ দাউ দাউ দাউ আগুন দেখায়. বজ্রপ্রপাত/এবং অন্ধিসন্ধিতে তার রক্ত ঝরে/অস্থিমজ্জা পুড়ছে যেন গন্ধমাদন! (**কারণ তো নেই, কারণ তো নেই**)

(৩) রাতদুপুরের শ্মশানচিতা আমাকে দাও কোল--/বলতে-বলতে টলমলিয়ে লোকটি ঢুকে পড়লো/যেখানে শোক চাপা এবং মাপা কথার ভিড়ে/ফুলগুলি সব ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে মালায় (**আমাকে দাও কোল**)।

(৪) সাড়ে ছয় হাতে দেহ জড়াবে নিশ্চয়/থান কাপড়ের গন্ধ আর জাগাবে না/মৃত্যু নয়, প্রসঙ্গত মূর্চ্ছা মনে হবে।/কিছু কাঠকুটো আমি উঠোনে রেখেছি/কাচের বয়মে আছে পুরাতন ঘৃত/তাহলে তো মূর্ছা নয়, মানুষটি মৃত (**মানুষটি মৃত**)।

আমি চলে যেতে পারি কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা **যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?** শক্তির এই পরিণত বয়সে জীবন-মৃত্যু ভাবনার চিহ্নস্বরূপ। কবিতাটি প্রায় দু'বছর বাদে প্রকাশিত একই নামের সংকলনে নাম-কবিতা হিসাব পুনর্মুদ্রিত হয় এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে :

'ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।/এত কালো মেখেছি দু হাতে এত কাল ধরে!/কখনো তোমার করে তোমাকে ভাবিনি।/এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে/চাঁদ ডাকে : আয় আয়/যেতে পারি/ যে-কোনোদিকেই আমি চলে যেতে পারি/কিন্তু, কেন যাবো?/সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো/যাবো/কিন্তু, এখনি যাবো না/তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো/একাকী যাবো না, অসময়ে।' এই কবিতার পুরুষ মানুষটি পারিবারিক জীবনে তৃপ্ত ও অনুবক্ত ; সন্তানের প্রতি অপত্য মমতায় সে মৃত্যুর অনিবার্য ডাকে সাড়া দিতে চায় না ; গৃহাশ্রম-তৃপ্তি অস্বীকার করে কোনো এক রহস্যময় বোধের তাড়নায় জীবনানন্দের **আট বছর আগের একদিন** কবিতার পুরুষটির মতো সে আত্মহননের পথ বেছে নেয় না। কোনো 'বিপন্ন বিস্ময়' তার 'অন্তর্গত

রক্তের ভিতরে' খেলা করে না। জীবনকে ভালোবেসে শক্তির গৃহস্থ পুরুষটি মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সন্তানের দিকে, মায়াময় মুগ্ধতায় চায় তার মুখচুম্বন করতে। বেঁচে থাকার আগ্রহে চাঁদ ও চিতাকাঠের নিশিডাক অগ্রাহ্য করে সে জীবনের সঙ্গে আরও কিছুকাল থেকে যেতে চায় মোহময় সংলগ্নতায়। জীবনানন্দের কবিতার নিঃসঙ্গ, বোধতাড়িত পুরুষটি বধূ ও শিশুকে ফেলে রেখে দড়ি হাতে অশ্বত্থ গাছের দিকে গিয়েছিলো। শক্তি-বর্ণিত পুরুষটি এত তাড়াতাড়ি জীবনকে ত্যাগ করতে চায় না। সময় হলে সে যাবে এবং তাও একাকী যাবে না, সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। শক্তি স্বভাবতই এখানে মৃত্যুকে দেখেছেন জীবনের স্নেহ-মমতা, দাম্পত্য-অপত্যের মায়ামোহ বিনাশী এক প্রলোভন রূপে। তাঁর প্রারম্ভিক পর্বের কবিতায় শক্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন পথে, সংসার-ধর্মে অনাগ্রহী যেন এক উদাসী পথিক, জীবনযাপনের পরতে পরতে যিনি অনুভব করেন মৃত্যুর এক চোরাটান। এখানে কিন্তু গৃহস্থের আসক্তিতে তিনি মৃত্যুর আহ্বান অগ্রাহ্য করতে চান। *আমি চলে যেতে পারি* কাব্যগ্রন্থের নামকরণে ও বেশ কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর অনিবার্য আসন্নতার ইঙ্গিত যেমন আছে, তেমনি মৃত্যুকে ঠেলে সরিয়ে আরও কিছুদিন জীবনকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার আকুলতাও নজরে পড়বে :

(১) ভেবে দ্যাখো, আর যাবে কিনা?/... বেঁচে, বুঝি জমে থাকা ভালো। (**যাবার সময়**)

(২) কেউ বলেছে, বাঁচার মতো বাঁচতে পারতো লোকটা, যদি/থামতে পারতো গলির মোড়ে, সড়ক অবদি যাওয়া কি ঠিক?/সতর্কতা শিক্ষণীয়ই, না হলে হয় অপঘাতে/মৃত্যু, মৃত্যু, সকালপ্রয়াণ। বেশ কিছুকাল বাঁচতে পারতো। (**আপন ছবি**)

(৩) মৃত মুখে যেভাবে হৈ হৈ হয়ে থাকে জীবিতের/সেইভাবে, ছুটে এলো মাছি।/বেঁচে আছি, কোনোমতে আছি (**এই সেই সিংভূম, যার জঙ্গলে পাহাড়ে**)।

জীবনের প্রতি আসক্তি ও উদাসীনতার যে দ্বৈরথ শক্তির কবিতায় ঘর ও বাহির, বন্ধন ও মুক্তির আশ্চর্য লীলাতরঙ্গ তৈরি করেছে আলোচ্য পর্বের সংকলনগুলিতেও তারই সমীক্ষণ ছড়ানো। *মন্ত্রের মতন আছি স্থির* গ্রন্থের নাম-কবিতায় ঘরে ফেরার কষ্ট, নিজেকে নষ্ট করে ফেলার যন্ত্রণা, শ্মশানচিতার স্বাগত-সংকেত, সন্তানদের জন্যে অনুতাপ, সবকিছু মিলেমিশে বাজে কবির মনোভূমিতে—'জীবনের উপরে ক্রোধ নিজেই জানি না/ সে কারণে কষ্ট বেশি, নষ্ট হতে কষ্ট বেশি লাগে/...স্বাগত জানায় দূর শ্মশানের ধোঁয়া/ক্রমশ পোড়ার গন্ধ../গঙ্গানদী, মন্ত্রপাঠ, চেলাকাঠ আর/পরম কর্তব্যরত সন্তানের মুখ.../কষ্ট, যা ওদেরি জন্যে, নষ্ট হয়ে গেলে/কষ্ট, যা ওদেরি জন্যে.... বড়ো অভিমান'। সংসারবিমুখ বোহেমিয়ানা থেকে মধ্যবয়স পেরোনো কবি যেন আসন্নসম্ভব মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে চাইছেন আত্মজের প্রতি মমতাময় কর্তব্যে। 'মৃত্যু' শক্তির কবিতায় জীবনের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলা এক অনুভব। তবু **এভাবেই যাবে?** কবিতার সম্বোধনহীন প্রশ্নে মনে হয় কবি 'মৃত্যুকে' নির্বিকারচিত্তে মেনে নেওয়ার ঔদাসীন্যে নিজেকে সমর্পণ করতে চান না—'সারাদিন কাজ ক'রে সন্ধ্যায় মৃত্যুর/ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে—/এভাবে কি দিন যাবে? এভাবে কি যাবে?' অনির্দিষ্ট কিছুর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে যে কবি তার সব পিছুটান হারাতে বসেছিলেন তাকে যেন কেউ প্রত্যাবর্তনের সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনায়—'শুধু প্রায় স্পষ্ট ঘূর্ণি, কথা বলে—/মৃত, দাগী তুমি/ পোড়া কাঠ ছুঁয়েছে কপাল.../ফিরে যাও/এখনো সময় আছে, ফিরে গেলে সুসময় পাবে' (**ফিরে গেলে সুসময়**)। তাঁর অন্যতম সহচর, অকালপ্রয়াত কবি যোগব্রত চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখা এই

সংকলনভুক্ত এলেজি **একা**-য় প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনা আর্ত অভিমান হয়ে বেজেছে ; 'মৃত্যু'-কে শক্তি দেখেছেন সুন্দর ও প্রাণময় জীবনের নাশকতার সন্তাপে—'সুন্দর, এখনি কেন চলে গেলে? বলেও গেলে না?' অগ্রজ, অনুজ ও সমকালীন অনেকের মৃত্যুতেই শক্তি তাঁর অন্যতম প্রিয় কাব্যরূপ 'এলেজি'র শরণাপন্ন হয়েছেন। কাছে ও দূরের কোনো মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই শক্তির কবিতার বাইরে থাকেনি। অগ্রজপ্রতিম কবিতাপ্রেমী সুরঞ্জন সরকারের স্মৃতিতে রচিত **প্রীতিভাজনেষু** শীর্ষক স্মরণ কবিতাটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল* কাব্যের এই রচনাটিতে কিন্তু 'মৃত্যু' সম্পর্কে ক্ষোভ কিংবা অভিমান কিছু নেই ; জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ও আশাহীনতা থেকে চিতাগ্নির কোলে আশ্রয়ের প্রত্যাশা আছে—"নদীতে অনেক স্রোত, এ-বয়সে তার সঙ্গে যোঝা খুবই শক্ত, দেহকূপে অবাধে ঢুকেছে/ঘুণ, কুরে কুরে খায়.../'যমেও নেয় না তাকে, আমাদের বুড়ী ঠাকুমাকে'/নেয়, দিতে পারলে নেয়, চিতা মাতৃমুখী...।" জীবন বিষয়ে এক নৈরাশ্য, অনারোগ্য বিনষ্টির এক বোধ কবিচিত্তে মৃত্যুভাবনা জাগিয়ে তোলে—'মারাত্মক বিষে আমি জর্জর জীবনে, মনে রেখো' (**মনে রেখো**)। সংসার-চতুষ্কোণ ছেড়ে স্রোতাবর্তে ভ্রাম্যমাণ চঞ্চল পথিককে এই পর্বে বারবার স্বীকার করতে হয়েছে গৃহাশ্রম ও প্রিয়জনবর্গের পিছুটান। গৃহস্থের স্বল্পপরিসর জীবনবৃত্তে বাঁধা পড়ার নিরুপায় আক্ষেপ সত্ত্বেও সেই মায়াবন্ধন ছিন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি—'মানুষের আপনার জন তাকে পিছু টেনে ধরে,/এগোতে দেয় না, শুধু কাছে রাখে কৃপণের মতো।/ভিখারির ভাঙা সানকি যেভাবে রেখেছে ভিখারিরা/সেইভাবে' (**মানুষের অক্ষমতা নিয়ে**/*আমি একা বড়ো একা*)। একদা-স্বেচ্ছাচারী, পথের নেশায় চঞ্চল কবি চিরপ্রণম্য অগ্নির তাপস্পর্শ পেতে পেতেও জীবনের আবেদন ব্যক্ত করেছেন চন্দনের প্রতীকে—'পায়ের নখর থেকে জ্বালিও না শিখর অবধি/আমি একা, বড়ো একা, চন্দনের গন্ধে উতরোল' (**আমি একা, বড়ো একা**/*ঐ*)। সময়ের গতানুগতিক বন্ধনের বন্দীত্ব যে শক্তি এর আগে বারবার অগ্রাহ্য করেছেন, ঘর ছেড়ে বারবার বেরিয়ে পড়েছেন পথে, সেই শক্তি এখন জীবনকে জড়াতে চান ঘনিষ্ঠ আশ্লেষে। মৃত্যু এখন নিষ্ঠুর বেদনার সংকেত হয়ে কবির মায়ায় জড়ানো জীবনসংরাগকে বিধুর ও পীড়িত করে—'একটি কাঠ জড়িয়ে চলছিলো/একা একা, আকুল হয়ে লোক।/তাহার জন্য ছিল আমার শোক...../আলতাপাড় জড়িয়ে শাদা থানে/আমায় যেতে হলোই অন্যখানে/নিয়তি বড় নিঠুর, কেড়ে নিলো/কাঠ জড়িয়ে লোকটি চলে গেলো।/—এখানে কাজ শেষ হয়েছে বুঝি!/কীসের কাজ? কেন বা এসেছিলো?' (**কীসের কাজ, কেন?**/*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের দায়-দায়িত্ব-অনুশাসন অস্বীকার করে এলোমেলো চলতে থাকা স্বেচ্ছাচারী শক্তি যেমন অপত্য, দাম্পত্য ও বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে বেঁচে থাকার মানবিক স্পৃহাটি ব্যক্ত করেছেন, তেমনই এক ধরনের যন্ত্রণাবোধ তাঁকে অস্থির করেছে। একবার মৃত্যুর ডাকে সাড়া না দিয়ে অসময়ে একাকী না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ; আবার উচ্চারণ করেছেন সময়ঘড়ির শাসন মেনে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি— 'যাবো, চলে যেতে হবে বলে, যাবো/ঘুণাক্ষর মিথ্যে নয়/যাবো/যেতে হলে যাবো' (**যাবো, যেতে হলে ঠিকই যাবো**/*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)। একে কি সহজ কথায় বলা যাবে স্ববিরোধিতা? মৃত্যুর কথা ভাবলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ, জীবিত থাকার ব্যাকুলতা তো বেড়ে যেতেই পারে। থেকে যাওয়ার বাসনা ও চলে যাওয়ার প্রস্তুতি, এ দুয়ের মধ্য দিয়েই কি কবির জীবনবোধ আরও মানবিক তীব্রতা পায় না? সন্তানের মুখচুম্বন

ফেলে রেখে তাঁকে যেতে হবেই, এ কঠোর সত্য জানেন বলেই তো কবি আরও কিছুদিন থেকে যেতে উৎসুক। আবার যেতে হবেই এবং সে যাত্রায় নিঃসঙ্গতাই নিয়তি, এ কথা ভেবে বলতে পারেন—'আমি যাবো সঙ্গে নিয়ে যাবো না কারুকে।/একা যাবো' (**দিনরাত**/*আমাকে জাগাও*)।

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো সংকলনের নাম কবিতাটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আলোচ্য সময়পর্বে শক্তির মানসভূমিতে যাওয়া ও না-যাওয়া, গৃহাশ্রম-তৃপ্তি ও জীবনবোধের অস্থিরতার টানাপোড়েন এই শিরোনামে আভাসিত। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ পুরুষটি যেমনভাবে বধূ ও শিশুনির্ভর গার্হস্থ্যের পিছুটান ফেলে রেখে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করে, শক্তি তাঁর উত্তম পুরুষে বর্ণিত স্বগত-সংলাপে তেমনভাবে গৃহাশ্রমকে ভেঙে চলে যেতে চান না ; বরং 'চাঁদ' ও 'চিতাকাঠ'-এর হাতছানি অস্বীকার করে পিতৃস্নেহে সন্তানের কাছে আরও ঘন হয়ে আসেন। বোঝা যায় যে শক্তির বোধের গভীরে এই ব্যক্তিসুখ নির্ভর গার্হস্থ্য শান্তি বিষয়ে কোনও প্রবল বিপন্ন জিজ্ঞাসা নেই যা তাঁকে জীবনানন্দের পুরুষটির মতো আত্মবিধ্বংসী নিয়তির অভিমুখে প্ররোচিত করতে পারে। সময়-নদীর করাল গ্রাসে ঘর-গেরস্থালি তছনছ হয়ে যাচ্ছে, এমন বিপর্যয়ের চেতনা তাঁর আছে ; কিন্তু জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তিতে তিনি পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, সবকিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার জটিল বিনাশী অভিমান তাঁর নেই— '....বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই/ শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলটপালটের /মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই' (**শুধু বাঁচতে চাই**/*যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*-এও অনুরূপ পরিত্রাণের প্রার্থনা উচ্চরিত হয়েছিলো—'ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই...' (**পরিত্রাণ চাই**)।

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো এবং তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে 'শুধু বাঁচতে চাওয়া'র এই আকুতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসার নানা উল্লেখ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে মৃত্যুচেতনায় করুণ ও আর্দ্র নানা অভিজ্ঞতা ও উচ্চারণ। পঞ্চাশের কোঠায় পা দেওয়ার আগেই শক্তি লিখে ফেলেছিলেন এক আত্ম-উন্মোচক মৃত্যুলিপি—'কিছুকাল সুখ ভোগ করে হলো *মানুষের মতো*/মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব' (**এপিটাফ**/*যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)। কবি ও কাঙাল এই মানুষটির জীবন-মৃত্যুর দোটানা বুঝতে উদ্ধৃত পদ্যাংশের 'মানুষের মতো' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 'মানুষের মতো' বলেই মানুষের মায়া ও শ্রমে গড়ে তোলা 'দালানকোঠা' ভেঙে মৃত্যুর 'অন্য ভুবনডাঙ্গায়' চলে যাওয়া তাঁর কাছে কষ্টকর মনে হয়—'হয়তো যাবো, এমনি করেই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবো/কষ্টে-গড়া দালানকোঠা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবো/বুক ফাটিয়ে সুখ ঘুচিয়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবো/কিন্তু, কোথায়? নিরুদ্দেশে? অন্য ভুবন ডাঙ্গায়?' (**বস্তুত সে হারে**/*কক্সবাজারে সন্ধ্যা*)। 'দালানকোঠা' ভেঙে এগোনো মানুষটির সঙ্গে দালানকোঠা গড়তে থাকা মানুষটির কথা হয় শক্তির কবিতায় ; গড়ার মানুষ নিবৃত্ত করতে চায় ভাঙার মানুষটিকে— 'কী আর এমন বয়েস তোমার?/মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বাহার,/....নিকটবর্তী শান্ত পাহাড়/এখন কী সেই যাবার সময়/—অলুক্ষুণে, যাবার সময়? (**এই বয়সে**/*এই তো মর্মরমূর্তি*)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শক্তি-সুহৃদ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ—'পরিণত বয়সে বিদেশ ঘুরে এসে শক্তি প্রায়ই বলত, এখন আমার বাঁচতে খুব ইচ্ছে হয়। যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব? এই কিন্তুটা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলতে শুরু করেছিল না, এখন যাব না, কিছুতেই যাব না' (**আনন্দবাজার পত্রিকা**,

২৩ মার্চ, ১৯৯৫)। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যসমগ্র*-র পঞ্চম খণ্ডের সম্পাদক কবিপত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও *চিরপ্রণম্য অগ্নি* কাব্যের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন : 'মৃত্যু কবিকে খুব সহজে স্পর্শ করতো, এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে খুব সাবলীলভাবে একটি কবিতা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিবেদন করে তিনি স্মৃতিতর্পণ করতেন।'[২৯] এই সংকলনে দুটি 'এলেজি' স্থান পেয়েছে। একটি (**অজিতেশ**) কবিতা নট ও নাট্যকার বন্ধু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবাসরে পড়া, ভালোবাসা ও বেদনায় প্রবলভাবে বেঁচে থাকা এক মানুষের প্রতি মরমী শ্রদ্ধার্ঘ—'গভীর তাৎপর্যময় হাসি হেসে তুমি জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর গাঁটছড়া বেঁধে দিলে/কেমন অনায়াসে।' জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর এই গাঁটছড়া শক্তির আপামর কবিতাচর্চার অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়। অন্য আর একটি শোককবিতা প্রয়াত বন্ধু অধ্যাপক করুণকুমার মিত্রকে উদ্দেশ করে লেখা—**একটি হরিণছানাই তুমি চাইতে পারো**। কবিপত্নীর মন্তব্যের সূত্রে বলা যায় মৃত্যুর স্পর্শ ছড়িয়ে আছে শক্তির এই সংকলনের প্রায় সর্বত্র। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম কবিতাটি ; যা মৃত্যুর কাছে, চিতাগ্নির অন্তিম দহনের কাছে এক আশ্চর্য আবেদন, জীবন-মরণের যাবতীয় কথা যেন তাতে ধরা পড়েছে—'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি/আমাকে পোড়াও।/প্রথমে পোড়াও ঐ পা দুটি যা চলচ্ছক্তিহীন,/তারপর যে-হাতে আজ প্রেম-পরিচ্ছন্নতা কিছু নেই।/....রক্ষা করো দুটি চোখ।/হয়তো তাদের/এখনো দেখার কিছু কিছু বাকি আছে।/অশ্রুপাত শেষ হলে নষ্ট করো আঁখি...।' শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতি, হৃদয়ের গ্লানি ও শূন্যতা, অবলম্বনের অভাব এমন এক বার্ধক্যের বোধ ও বিষণ্নতায় ম্লান করে দেয় জীবনের প্রাত্যহিকতাকে, যে চিতাগ্নি তার পবিত্র উজ্জ্বলতায় 'চিরপ্রণম্য' হয়ে ওঠে।

এই তো মর্মরমূর্তি-র অনেকগুলি কবিতাতেও রয়েছে প্রিয়জনের বিয়োগের বেদনা, মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া, বার্ধক্যের আগমনী সুর। পরিণত বয়সেও শক্তির ভেতরে সর্বদাই ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি, বালক বয়সের এক প্রতিমূর্তি। মৃত্যুকে তাই দেখেছেন বালকের মতো, বাল্যক্রীড়ার চিত্রকল্পে—'মৃত্যু যেন কানামাছি খেলে।/চোখবন্ধ ছেলেমেয়েদের খেলা এই ভুবনডাঙায়/কখনো আমাকে ছোঁয়, কখনো তোমাকে ছুঁয়ে দেয়।/... ভেতরে রয়েছে তারও প্রিয় ও অপ্রিয়, বেছে নেবে, বিদায় জানাবে' (**মৃত্যু যেন**)। বার্ধক্যজনিত শারীরিক ক্ষয় ও দুর্বলতার সংকেত পেয়েছেন কবি এবং অপেক্ষায় আছেন অন্তিম যাত্রারম্ভের—'গায়ের চামড়া হয়েছে লোল, মুখের ভাঁজে বলিরেখা, স্থবিরতার বাতাস্ বইছে দেহজোড়ের সমস্ত দিক—.../...সময় হয়ে আসছে এখন নদীর জলে ভেসে যাবার—/...পারাস্ত কই? সেই যেখানে কিছুক্ষণের শান্তি পাবো' (**পারান্ত কই?**)। মানুষ মৃত্যুর কাছে যায়, নাকি মৃত্যু আসে মানুষের কাছে—এমন একটি প্রশ্ন উঠে এসেছে অগ্রজপ্রতিম লেখক ও সহকর্মী সন্তোষকুমার ঘোষকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখে লেখা একটি এলেজিধর্মী কবিতায়—'কীভাবে মুহূর্তে মরছো, বিলাপ করছো না/হেসে হেসে বলছো, দ্যাখ্ জীবনে একবারই মৃত্যুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি!/ কে যে কার সন্নিকট বলাও মুশকিল...' (**অগ্রিম**)। বার্ধক্যের আগমনীতে বেজে ওঠা আসন্ন মৃত্যুর অনুভব—'কপাল জুড়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ফণা দুলছে,/খুলছে যতো শারীর জোড়...'—কবিদৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছে এক কল্পদৃশ্য—'ইশারা নয়, পাতালসিঁড়ি দুহাত নেড়ে ডাকছে' (**পাতাল সিঁড়ি**)।

দীর্ঘ রোগশয্যার বিষণ্ণতা ও মৃত্যুভাবনা ছড়িয়ে আছে *আমাকে জাগাও* সংকলনের অনেকগুলি কবিতায়। প্রথম রচনাটিতেই রয়েছে দহন, চিতাগ্নি ও জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা

মৃত্যুর প্রসঙ্গ ও অনুভব : 'তুমি গোটা জীবনে যা জ্বলতে পারতে আমিও জ্বলেছি।/জ্বলেছি বলেই আছি, জ্বলন্ত সংসারে এক স্তব,/স্তবের মতন আছি, মৃত্যুময় বহু অনুভব/ স্পর্শ করে, চিতা নম্র, তবুও তো চিতায় জ্বলেছি' (**হারায় না**)। জীবনের নানা ভাঙাচোরা, বহু বেদনার পর মৃত্যু যেন এক নিশ্চিন্ত সুখশয্যা—'সমাধিতে শোবে? শোও। বিছানাটি ভালো।/এমন বিছানা ছেড়ে উঠবে না কখনো/ভালোও লাগবে না উঠতে ছুটতে, শ্রান্ত হতে/সমাধিতে শোবে? শোও। বিছানাটি ভালো (**সমাধিতে শোবে?**)। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে শক্তি মৃত্যুকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন; ; জীবন-বিবিক্ত মৃত্যুকল্পনা তাঁর স্বভাব ও বাসনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়—'এইটুকু তো/জীবন, অতো দৌড়ঝাঁপে আলাদা কী পাবে?/জীবন ছাড়া, মৃত্যুকে পাবার জন্যে তাড়াহুড়োর কোনো/অর্থ হয় না' (**এইটুকু তো জীবন**)। সে কারণেই অসুস্থতার আচ্ছন্নতা, বিষ-ঘুমের ঘোর-লাগা জড়তা কাটিয়ে উচ্চারণ করেছেন জাগরণের গভীর, আবেগময় প্রার্থনা—'সেগুন মঞ্জরী হাতে ধাক্কা দাও, জাগাও আমাকে/আমি আছি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে..../...আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে/শুধু জাগরণ চাই, বারেক জীবন' (*আমাকে জাগাও*)।

এভাবেই তাঁর জীবন ও সৃজনের অন্তিম পর্বে শক্তির কবিতায় ঘর ও বাহির, সম্মোহন ও ঔদাসীন্য, প্রাপ্তি ও বির্সজন, প্রেম ও আর্তি ইত্যাকার যাবতীয় বৈপরীত্য তার আবেগ ও মননে অভিসারী হয়ে পড়ে জীবন ও মৃত্যুর এক গভীর দোটানাকে ঘিরে। তাঁর নম্র অনুনয়ে ধরা পড়ে ভালোবাসার নিরাময়ের প্রতি বিশ্বস্ততা—'ভালোবাসা কথা বলো, হোক না সে ছুঁচের মতন/নিষ্ঠুর, ন্যঞর্থ কথা, কথা বলো আমার ভিতরে/বৃষ্টির মতন কথা, বিদ্যুতের, শিকড়ের কথা—/বলো, ভালো আছো আর তোমার অসুখ সেরে গেছে/বলো, ভালোবাসো তাই তোমার অসুখ সেরে গেছে' (**বলো, ভালোবাসো**/*যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)। শারীরিক জড়তা, জড়বৎ পড়ে থাকার অকর্মণ্যতা কিছুই জীবনের প্রতি তাঁর বিনত প্রত্যাশা ও প্রার্থনাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না—'শুধুই রয়েছি পড়ে দুটি হাত পেতে— /যাবার আগেই কিছু পেতে হবে, জানি' (**শরীরের সার অঙ্গ**/*ও চিরপ্রণম্য অগ্নি*)। *বিষের মধ্যে সমস্ত শোক* গ্রন্থের নাম-কবিতায় আত্মজৈবনিক উন্মোচনের রীতিতে শক্তি যখন উজাড় করে দেন যাপিত জীবনের অসহায়তাকে, তখন তার মধ্যে থেকেই মৃত্যুবোধ জেগে ওঠে প্রশ্নমুদ্রায়—'এই মৃত্যু! আমি তো প্রত্যক্ষ দেখেছি—/...মৃত্যু, তা কি মৃত্যুতেই শেষ হয়? জানি না কোথায়?/কার রূঢ় অগ্নি থাকে, অগ্নিতে কি সমস্ত মেলায়?' এই সংকলনেরই অন্যত্র বার্ধক্যের গোধুলিভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনবাসনা ব্যক্ত করেন অকপটে— 'আত্মযন্ত্রণার মতো কষ্ট আর কিছুতেই নেই/ আমি পরিষ্কারভাবে বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আজো' (**সন্ধে হয়ে এলো**)। এই গোধুলিবেলায় এক ধরনের নিশ্চলতা, অলস ও উত্তাপহীন জীবনের শিথিলতা উপলব্ধি করেন ; মনে হয় সৃষ্টিশীলতাও স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়েছে—'জীবনযাপনে কিছু ঢিলেঢালা ভাব এসে গেছে।/চেতনার ক্ষিপ্র কাজ এখন তেমন ক্ষিপ্র নয়—/....গতরাতে শেষ করা পদ্যটির তুমুল উত্তাপ/এখন পারি না দিতে সভাঘরে, বিশিষ্ট শ্রোতাকে।/...সুতরাং ভালো নেই, পরিপার্শ্ব চাপ তৈরি করে—/যাবার সময় হলো, নেভার আগেই ভালো যাওয়া' (**যাবার সময় হলো**/*ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে*)। এভাবেই জীবন-মৃত্যুর দোটানায় শক্তি নেভার আগেই জ্বলে ওঠেন, রচনা করেন দ্বন্দ্বের শীলিত ভাষ্য—'সাতান্ন বছর ঘুম থেকে আজ কয়লা ও হিম/সরিয়েছি, বাঁচবো ব'লে একা ও অনেকে মিলে ব্যূহের

ভিতরে—/সে-ব্যূহ ফাটাতে জানি আমি আজ স্মার্ত বিস্ফোরক!' (**সাতান্ন বছর পরে**/*জঙ্গল বিষাদে আছে*)। সবশেষে, শক্তির কবিতায় জীবনবাসনা ও মৃত্যুবোধের বিস্ময়কর যুগলবন্দীর উদারহরণরূপে *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* গ্রন্থের **মৃত্যু** নামাঙ্কিত কবিতাটির বিষয়ে বিশেষভাবে দু-চারটি কথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাত পংক্তির এই কবিতাটিকে অত্যন্ত যথার্থভাবেই বলা হয়েছে—'জীবন ও মৃত্যুর চির বিবাহের সপ্তপদী যেন।'[৩০] কবিতার শুরুতেই শ্মশান-চিতার প্রসঙ্গ, মৃত্যুকে অবিচল ও প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার বিবৃতি—'পুড়ছিলো ঐ শ্মশান ভরে কাঠের রাশি/পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।' ঠিক এর পরের পংক্তিতেই এসে যায় এক নদীর কথা—'পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনও নদীর ধারে।' যে নদী জীবনপ্রবাহের প্রতীক তার তীর ঘেঁষেই তো জ্বলে শ্মশান-চিতার আগুন। কবির বাসনাবৃত্তেও সেই জীবন-নদীর ছবি ফুটে ওঠে। মৃত্যু আর চিতাগ্নির প্রতি আকর্ষণের কথা বলা মাত্রই যেন নদী আর জলের ধারা জীবনের প্রতীকরূপে কবিকে টান দেয় অন্যপ্রান্ত থেকে—'কারণ, একটা সময় আসে, আসতে পারে/যখন আগুন অসহ্য হয় নদীর ধারে এবং মড়া চাইতে পারে এক-কুষি জল!/মৃত্যু তখন হয় না সফল, হয় না সফল!' জীবনতৃষ্ণা এমন অদম্য হতে পারে যে শবদেহ চাইতে পারে 'এক কুষি জল', আর তার সেই পিপাসার নিবারণ না হলে মৃত্যুও অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ হয়ে যায়। এই কবিতাটি আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে শক্তির কবিতায় জীবন-সংরাগ এবং মৃত্যুবোধ মিলে যায় একটি সুর-প্রবাহে। রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দকে বাদ দিলে বাংলা ভাষার আর কোনো কবির কবিতায় জীবন-মৃত্যুর এই 'মিশ্র আলেখ্য', জীবনের প্রবল ও বর্ণময় প্রেক্ষিতে মৃত্যুবোধের এমন ব্যাপ্তি আমাদের গোচরে আসে না।

প্রকৃতি ও পর্যটন

আমাদের ঘর নাই, তাঁবু আছে অন্তরে বাহিরে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ক একান্ত আলাপচারিতায় শক্তি-সুহৃদ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে 'শক্তি মূলত প্রকৃতিপ্রেমের কবি'।[৩১] শক্তির স্মরণ-সভায় পঠিত কবি শঙ্খ ঘোষের শোকলিপিতে—'ভালোবেসেছিলেন তিনি সংসারছুট অরণ্য প্রান্তর সমুদ্র পাহাড়, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতি।'[৩২] এক স্বেচ্ছাশাসিত, রূপমুগ্ধ পর্যটকের নিবিড় ইন্দ্রিয়ময়তায়, এক আদিম বন্য ভালোবাসায় তাঁর নিকট ও দূরের প্রকৃতিকে অবিরত দেখেছেন শক্তি; তাঁর কবিতায় অরণ্য-প্রকৃতি যেন এক উদ্দাম প্রেরণার মতো, গতি ও অস্থিরতার তীব্র বয়নে তাঁর কবিতার মেদ-মজ্জায় প্রোথিত হয়ে গেছে। প্রকৃতি ও মানবচেতনার মধ্যে যে বৈরিতা কবিতা তথা শিল্পে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ বলে গণ্য হয়ে থাকে তার বদলে শক্তির কবিতায় অনেক বেশি করে দেখি মানুষ ও প্রকৃতির এক রহস্যময় ঘনিষ্ঠ সহবাস, প্রকৃতির জড়ত্বে এক আশ্চর্য মানব-স্পন্দন, তার আদিম সত্তার এক শরীরী অথচ অনুভবী চিত্রণ।

কলকাতা শহরে চলে আসার আগে শক্তি তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটিয়েছিলেন মাতামহের আশ্রয়ে, 'দক্ষিণ চবিশ পরগণার কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম' বহডুর গ্রামীণ পরিবেশে। গ্রামের সেই বাড়ি,

বাগান-পুকুর-খেত-খামার-গাছপালা ইত্যাদির স্মৃতি অম্লান থেকেছে তাঁর আবেগ ও চৈতন্যে। একটি আত্মজৈবনিক রচনায় স্বীকারও করেছিলেন যে, '....পরিপ্রেক্ষিত সুদ্ধু এক পাড়া গাঁ আমার মধ্যে চেপে বসেছে। তার থেকে পরিত্রাণ কখনো পাই নি।'[৩৩] কলকাতায় চলে আসার পর রুক্ষ নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে রেহাই পেতে যখন তখন নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন জঙ্গলে, পাহাড়ে— চাইবাসা, হেসাডি, ঝাড়গ্রাম, কিম্বা দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, নয়তো কান্‌হা, বান্ধবগড়ের আরণ্যক পরিমণ্ডলে, বৃক্ষ, নদী, পাথরের একান্ত সংসর্গে। পাহাড়-জঙ্গলের এই বিস্তৃত গভীর প্রকৃতিনিসর্গের মধ্যেই তিনি তল্লাস করেছেন তাঁর প্রিয় মুখগুলি, ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালোবাসা, কবিতার 'চমৎকার জলজ দর্পণে'।[৩৪]

জঙ্গলের প্রতি, গাছের প্রতি এক অদ্ভুত মরমী টান ছিল শক্তির ; গাছ হয়ে ওঠা, গাছেদের মধ্যে গাছ হয়ে থাকাই ছিলো তাঁর বাসনা। একটি অগ্রন্থিত গদ্যরচনায় সেই কথাই লিখেছিলেন 'পরশুরামের কুঠার' কাব্যের দুটি লাইন উদ্ধৃত করে—" 'তুমি যেন গাছ, যার ডাল এসে পড়েছে মাটিতে/ছায়া নিয়ে, মায়া নিয়ে, পরিচ্ছন্ন ফুল পাতা নিয়ে'। মানুষকে গাছ হিসাবে দেখা আমার প্রিয় ব্যসন। বিশেষত নিজেকে। আমার স্বভাবটা তাই। যেখানে যাই শিকড় নিই। ডালপালা বের হয়। লতাপুতা বাতাসে।"[৩৫] *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* থেকে শুরু করে *জঙ্গল বিষাদে আছে* পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিস্তৃত, বর্ণময় ভুবনখানি প্রকৃতির পরাগমাখা ; বৃক্ষময়, ছায়াঘন, তীব্র বনগন্ধী। বৃক্ষ, লতা, ফুল, নদী, বাগান, পুকুর ইত্যাদিকে অবলম্বন করে শক্তি তাঁর কবিতার পর কবিতায় গড়ে তুলেছেন প্রকৃতির এক শরীরী জগৎ, যাতে কখনো কখনো বাস্তবতার সঙ্গে মিশেছে পরাবাস্তবতার আবছায়া। উবুশ্রান্ত বৃষ্টি, হাওয়ার গর্জন, মেঘ ও বিদ্যুৎচমকের শিহরণে মূর্ত করতে চেয়েছেন প্রকৃতির আদিমতা, হিংস্রতা, গতি ও অস্থিরতাকে। আবার সেই প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন, পেয়েছেন, মানুষের শুশ্রূষার উপকরণ এক মায়াময় ভালোবাসা। তাঁর অসংখ্য কবিতার পংক্তির পর পংক্তিতে, তাদের শাব্দিক অবয়ব ও অন্তরাত্মায় প্রকৃতি জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতো বন্ধনে ; সমুদ্র, নদী, ঝর্না, পাথর, পাহাড়, গাছ, ফুল, শাখা, লতা-পাতা, চাঁদ, জ্যোছনা, জল, জঙ্গল, বৃষ্টি, হাওয়া, ঘাস, মাটি, আকাশ, রং, মেঘ, সন্ধ্যা, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি অজস্র চিহ্ন অবিরল ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি শুধু শব্দ হিসেবে নয় ; নিবিড় মমতায় ও ইন্দ্রিয় ঘনত্বে তারা গড়ে তুলেছে প্রাণময় আশ্রয়, কবির 'মনোমুকুরের মোহময় প্রতিফলন'।[৩৬] শক্তির বেশ কয়েকটি গ্রন্থনামেও প্রকৃতি-নিসর্গের চিহ্নগুলি এসেছে, যেমন, 'নৈঃশব্দ্য' (*হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*), 'জিরাফ' (*ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*), 'নক্ষত্রবীথি' (*অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে*), 'হেমন্তের অরণ্য' (*হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*), 'মাটির বাড়ি' (*পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি*), 'জল' (*ঈশ্বর থাকেন জলে*), 'পাথর' (*এই আমি যে পাথরে, ভাত নেই পাথর রয়েছে*), 'পুকুর' (*পুণ্যি পুকুর পুষ্করিণী*), 'সন্ধ্যা' (*কক্সবাজারে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার*) 'জঙ্গল' (*জঙ্গল বিষাদে আছে*) ইত্যাদি।

শক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র রোমান্টিক স্মৃতিমেদুরতার আত্মমগ্ন আবহে আবেগ-অনুভবের সঙ্কেত হয়ে ফুটে উঠেছে পল্লীনিসর্গের চিহ্নগুলি। ধরা যাক্ গাছের কথা ; তা সে ছোট গাছ কিম্বা দীর্ঘতর বৃক্ষেরা এ কাব্যের কবিতাগুলিতে বারবার এসেছে, রচনা করেছে প্রেম ও নির্জনতার হার্দ্য ও মায়াময় বিচরণভূমি :

(১) গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি? (ঝর্না)

(২) গাছের সব শিকড়ে চুলে পায়ে জড়ায় বাধা। (**অকর্মণ্য**)

(৩) বাগানের গাছটিও বাড়বে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে। (**অতিজীবিত**)

(৪) বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে ব'সে আছো দেবতা আমার। (**পাবো প্রেম কান পেতে রেখে**)

(৫) অনেক গাছের বার্তা ভুলে গেছি সময়-সঞ্চারে। (**প্রতিমূর্তি**)

(৬) যে-বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনব্যবহিত কর হ'তে/তোমাতেই ফিরে যায়....। (**দেবদূত**)

(৭) স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়। (**ছায়ামারীচের বনে**)

(৮) গাছের শাখা-প্রশাখায় বাঁধা দোলা। (**আজো উত্তর জানালা**)

(৯) .... প্রেম, বৃক্ষ গ্রাস করো মোরে। (**দেবতার গ্রাস**)

(১০) চক্ষু যেন গাছের তলার ছায়া। (**অবিশ্বাস্য**)

(১১) আবার তোমায় ভাঙবো, নীল নারিকেল গাছ হৃদয়ের। (**বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে**)

গাছের মধ্যে কবি আপন মুগ্ধতায় আরোপ করেছেন মানবিক আবেগ ও ভঙ্গি। বৃক্ষ ও বৃক্ষচ্ছায়া, তাদের ডাল-পালা, ফল-ফুল-পাতার বর্ণময় নিভৃত নিবিড় সান্নিধ্যে রচিত হয়েছে কবিহৃদয়ের একান্ত আনন্দ-বেদনার স্পর্শমাখা স্মৃতি-চিত্রমালা।

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য-র প্রকৃতি লোকালয়-সংলগ্ন পল্লীনিসর্গ ; কোনো দূরবর্তী, জনহীন অরণ্য-প্রান্তর নয়। সেখানে বাগানে কিম্বা টবের মাটিতে-ঝামায় গাছের বাড়বৃদ্ধি, লতা-পাতা, আলো-ছায়া, ফুল-ফল-শাখা-প্রশাখা-পল্লব, নদীর প্রবাহ, ঝর্নার নৃত্য-গীত, পুকুরের জলে হাঁস ও মাছেরা, হাওয়া-বৃষ্টি, সব মিলেমিশে যেন এক সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত গ্রামীণ গৃহস্থালি। সেই গৃহস্থালির সংসর্গেই মানুষ। পল্লীপ্রকৃতির অজস্র রূপ, বর্ণ, ঘ্রাণ, স্পর্শের সংবেদন ছড়ানো প্রেম-নৈঃশব্দ্যের এইসব কবিতায়। তবে সবক্ষেত্রেই তা প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রথাগত চিত্রণ নয়। **জরাসন্ধ** কবিতায় শক্তি যখন লেখেন—'পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশ গন্ধ সব/আমার অন্ধকার, অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুন মসলার পাত্র/হ'লো মা', তখন গৃহস্থের রান্নাঘরের ছবির পেছন থেকে যেসব গন্ধ নাকে এসে লাগে তার কোনটিই প্রথাগতভাবে সুগন্ধ বলে বিবেচিত হবে না, যদিও এসব কটু গন্ধও প্রকৃতিরই অংশ। এমনসব কটু ও জটিল গন্ধ অবচেতনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে মনোজগতের অতল রহস্যকে উন্মোচিত করতে সাহায্য করে। একজন সংবেদনশীল, অনুভূতি-প্রবণ মানুষের দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণে কেবলমাত্র যা কিছু মনোরম, সুরভিত, মধুর ও পেলব তাই ধরা পড়বে এমন নয়; যা কর্কশ, অসুন্দর, যা তথাকথিত সুগন্ধ নয়, তাও তাঁর ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করবে। বিশেষত আধুনিক কবির একটি কাজ হলো সৌন্দর্যের প্রথানুগ ধারণার নান্দনিক পুষ্পশৃঙ্খল বিঘ্নিত করে মানুষকে সংস্কারমুক্ত সংবেদন ও অনুভবের জগতে নিজের সংশয়-সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া। শক্তির কবিতায় প্রকৃতি সে কারণে কেবল ভূ-দৃশ্যের শব্দচিত্র নয় যা পাঠকের প্রথাগত সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করবে। ক্ষয় ও রুগ্নতা, বিপন্নতা ও নৈরাজ্যের অনুভবও তাঁর কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির চিত্রকল্পে পাঠককে শিহরিত করে :

(১) অন্ধকার তারার চোখ, আকাশ পোড়া সরা (**প্রত্যাবর্তিত**)।

(২) অন্ধকার পিতার চোখ, আকন্দের আঠা/চুঁইয়ে পড়ে মায়ের গালে. .. (**ঐ**)।

(৩) ও কি পিশাচ নদী দুলছে বাষ্পাকুল গলিত স্রোতাবর্ত (**সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী**)।

(৪) পুকুরে রক্তের সর পড়ে (**তির্যক**)।

(৫) এমন ছিলাম সকালবেলা থেকে/গভীর, মরা ভাঙা-মেঘের মতো? (**রাগের কথা**)।

(৬) পরাগের বিষে কাঁপি হলুদ বিষণ্ণ করজালে (**তুমি যেন ধর্ম**)।

(৭) হে নীলাকাশ গোপন ব্যাঘ্র... (**নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো**)।

(৮) স্তূপাকার বাসি ফুল, পচা গন্ধে ফুলেছে বাগান (**স্বকৃত আলেখ্য**)।

প্রসঙ্গত **জন্ম এবং পুরুষ** কবিতার প্রথম তিনটি পংক্তি স্মরণ করা যাক্ : 'আবার কে মাথা তোলে *ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ/* সাধ হয় মাথা তোলে *ফাঁসা মাথা একাকার মাথা/গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মুত ফুল রক্তপাত।*' ঐতিহ্যগতভাবে এবং বিশেষত রোমান্টিক কবি-কল্পনায় 'চাঁদ' শান্ত উজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু উদ্ধৃত পংক্তিমালায় ফুলে ফেঁপে ওঠা চাঁদের সেই প্রথাগত সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা থাকতে পারে না। এখানে কবির নিজস্ব ভাবনার প্রয়োজনে চাঁদ এসেছে বিকৃত, রাক্ষুসে রূপে, স্থূল কদর্যতার অনুষঙ্গে। প্রথাগতভাবে সুন্দর বস্তুতে অবক্ষয়, বিকৃতি ও মর্বিডিটির কলঙ্ককলা ছিলো শক্তির সময়কার কবিতার লক্ষণ। এডগার অ্যালান পো'র কবিতা ও নন্দনভাবনায় এ জাতীয় অসুন্দরের শিল্পতত্ত্বের সন্ধান মেলে। জীবনানন্দের কবিতাতেও এর অনেক নিদর্শন আছে। **তুমি যেন প্রেম** কবিতার একটি পংক্তিতেও চাঁদের প্রচলিত অর্থ বা ব্যবহারবিধি থেকে সরে এসেছেন শক্তি—'চাঁদের পাহারা বন্ধ ক'রে দিক গ্রন্থ-শিল্প-নারী'। চাঁদ ও চন্দ্রালোকের যে আবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে, নিয়ে যায় এমন এক জগতে সেখান থেকে ফেরাই দুষ্কর, সেই আবেশময় প্রভাবকে বানচাল করে দিক গ্রন্থ, শিল্প, নারী—কবির এ ভাবনা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার 'কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম' বহড়ুতে অতিবাহিত তাঁর বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি গুঞ্জরিত হয়েছে *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র কবিতাগুলিতে। পূর্বে উল্লেখিত আত্মজৈবনিক গদ্যে শক্তি বলেছিলেন, তাঁর মাতামহের বাড়ির সংলগ্ন 'দু-টো অন্ধকার বাগান', 'দুটো পুকুর', 'আটটা পুকুর পাড়' ইত্যাদির কথা। সেইসব বাগান আর মালঞ্চ, বিল আর পুকুর বারবার এসেছে কবিতায় ; পদ্ম, শালুক, সবুজ পানা, পুঁই, কুমড়োলতা, কলার থোড়, কুঁচ সাপ, নাল ডাঁটা, মুচি ডাব, শিউলি, সন্ধ্যামণি, মালতী, গোলাপ ইত্যাদি মিলে সেই 'পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধু পাড়া-গাঁ' বাস্তবিকই চেপে বসেছে তাঁর মনে। কবিতায় পল্লী প্রকৃতিকে এমন ব্যাপক ও উদ্দীপকভাবে ব্যবহার করা প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে শক্তি বলেছিলেন—"ছোটবেলায় একা একা গ্রামে কাটিয়েছি—কিছুটা কল্পনাবিলাসী ছিলাম—আমার কবিতায় সেই গ্রামীণ একটা পরিবেশ তাই সহজলভ্য.....। পাড়াগাঁয়ের ছবি, গ্রামের চিত্রকল্প—এইসব নিয়ে আমার কবিতা একটু 'গ্রাম্য', তাই না!"[৩৭]

প্রেম-নৈঃশব্দ্যের এই সংকলনে জেগে আছে নাগরিক শুষ্কতা ও ক্লান্তি থেকে দূরবর্তী এক সহজ, প্রাণ ও অনুভূতিময়, দূষণমুক্ত ভরপুর গ্রামের ছবি—তর্জা কাপ কবি, বিলেতবাতি ঝুলিয়ে সাতপহর গাওনা, ঝিলের বাঁকা পথে পঞ্চদশ কলসী, পুকুরের ধারে মেছো বক আর জলে পানকৌড়ির খেলা, রক্তের ফোঁটার মতো শোলপানা, আমরুলের পুঞ্জ পুঞ্জ নীল অম্লতা, কুন্দ-শিউলি-সন্ধ্যামণি, সেঁকুল কাঁটা, ডেঁয়ো পিঁপড়ে, মৃদঙ্গচন্দনের পুজোবাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মেঘ-রৌদ্র, আলো-ছায়া, গাছ-ফুল-নদী-শস্যের নিবিড় চিত্রপটের এক কোণে কবি জেগে আছেন যেন এক 'শালুক অনভিজাত'। দীঘল বাসি কাঁথার মতো জলায় পানকৌড়ি খেলা করে, আর

কবিও তার মতো ডুব দিতে চান—'আমারও চেতনা চায় ডুবে যেতে/মন্থর আত্মার মতো, অথবা কাঁথার মতো ছেঁড়া' (আমারও চেতনা চায়)। পল্লীপ্রকৃতির স্বাভাবিক সংস্পর্শে এক অকৃত্রিম প্রাকৃতিক জীবনে বেঁচে থাকার ও বেড়ে ওঠার সঙ্কল্প করেছেন তিনি—'নতুন হাত নিড়ুনি করবে এধার ও-ধার দু-চারটি ঘাস/পুঁই তুলবে, মাচা বাঁধবে, কুমড়োলতা.../আমি মানবো সাপটে ধরবো নতুন বাগান, নতুন গাছটি/ বেঁচে উঠবো সরস ঋজু রোদ্দুরে বৃষ্টিতে' (অতিজীবিত)। মহানগরের ব্যস্ত ও দ্রুতগামী জীবনের আয়োজন থেকে দূরে ফুল ও গাছের সাহচর্যে ও তাদের পরিচর্যায় যখন তাঁর দিন কাটবে—'কখন কুড়াই ফুল, গাছে জল ঢালি' (আজো উত্তর জানালা)।

তাঁর বাল্য ও কৈশোরের প্রকৃতি-খেলাঘর শক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থে ব্যাপক ও নিবিড়ভবে উপস্থিত স্মৃতিবাহিত অভিজ্ঞতা, অভিলাষে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে 'বাগান' আর 'পুকুর'-এর কথা। অন্তত পনেরটি কবিতায় এক বা একাধিকবার বাগানের প্রসঙ্গ এসেছে—ফুল ও ফলের বাগান, তাতে আলোছায়ার কারুকাজ, গাছে গাছে পাখি, বর্ণ ও গন্ধের এক ঘন আবহ, এ সবই যেন কবির বাল্য ও কৈশোরের মধুর স্মারক। বিশেষভাবে চমৎকৃত করে একটি অসামান্য পংক্তি—'স্মারক বাগানখানি গাছ হয়ে আমার ভিতরে' (পাবো প্রেম কান পেতে রেখে)। মানুষকে গাছ হিসেবে দেখা ছিল শক্তির 'প্রিয় ব্যসন' ; উদ্ধৃত পংক্তিটিতে তাঁর 'স্মারক বাগানখানি' কবির মনোভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেই 'প্রিয় ব্যসনে'। পুকুর বা অনুরূপ গ্রামীণ জলাশয়, যেমন, দীঘি, জলা, ঝিল, বিল ইত্যাদির কথা পাওয়া যায় কমপক্ষে সাতটি কবিতায়।

প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের এই কবিতাসংকলনে প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভব কিংবা প্রেমিকার সলজ্জ সৌন্দর্য বারবার প্রকৃতির নানা চিহ্নকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে, যেমন, যুবতীর উজ্জ্বল চোখের মতো একটা দিন, বা ইস্টিশান-মাস্টারের মেয়ের মতো একটি ভোর, বা সেই মুখখানি যা জলজ লতার মতো স্নিগ্ধ, যার ভ্রূলতা বর্ষার আর কেশদাম মুক্ত ঝর্নার মতো। আর গ্রামীণ প্রকৃতির নৈঃশব্দ্যের এক স্পর্শময় চিত্রলেখা পাই এইসব পংক্তিতে :

(১) কঞ্চির মাথায় একটি ঝিঁঝি বসে/বেলা যায়/তেরছা দূর তাজপুরের মাঠে (তির্যক)।

(২) একা-একাই তোমার বোনা গাছটি দেখবো ফুলটি দেখবো/বাগানে কোনও বড় গভীর ছায়ার তলায় ঘুমিয়ে পড়বো (অতিজীবিত)।

বহড়ুর সেই 'পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধু এক পাড়াগাঁ' *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র রচনাগুলিতে নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে, গ্রন্থটিকে করেছে স্মৃতিজর্জর। যেখান থেকে শক্তি গিয়েছিলেন মহানগরে সেখানেই ফিরে গেছেন, যেতে চেয়েছেন—'হে আমার শেফালিতলার ফুল, হে রাঙাবালক, চলো যাই—/চিরকাল বসে থাকি, শুয়ে থাকি তোমার ভিতরে' (তুমি যেন প্রেম)।

পর্যটনপ্রিয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও সর্বদা পাই পথ ও পথিকের চলার প্রসঙ্গ। ঘরের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে আলো-হাওয়ায় বেরিয়ে পড়া, চলতে থাকা আপন খেয়ালে। এই স্বতশ্চলতা শুধু শারীরিক নয়, দেহের সঙ্গে চলতে থাকে মনও, খুঁজতে থাকে, খুঁড়তে থাকে আবেগ-অনুভবের স্তর স্তরান্তর। হাওয়ার টানে বেরিয়ে পড়া, ভেসে চলা আবর্তে, নৌকো ভাসানো নদীস্রোতে, এইসব কিছু প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের অনুসন্ধানের স্পৃহাটি চিহ্নিত করে :

(১) বাতাস আমায় আবর্তে নিয়ে চললে সমস্তদিন (দক্ষিণ দিক্‌দেশ)

(২) ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা/যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি (**চতুরঙ্গে**)।

(৩) বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় হাওয়া বাইরে-র থেকে আসছে (**বাহির থেকে**)।

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো-তে প্রকৃতি-নিসর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'বৃষ্টি' শব্দটির বহুল ব্যবহার, নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হতে হতে যা পরিণত হয়েছে এক গভীর ব্যঞ্জনাময় চিহ্নে। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যে* যেমন বারবার এসেছে 'গাছ', 'বাগান', 'পুকুর', তেমন *ধর্মে আছো*...র কবিতাগুলিতে পাই বৃষ্টি ও বর্ষার পৌনঃপুনিক উল্লেখ, বৃষ্টির সবিশেষ চিত্রকল্প। 'বৃষ্টি' নিয়ে লেখা পুরো একটি কবিতা **যখন বৃষ্টি** নামলো : 'বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো/কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল/নেই নিকটে-হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে/চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে/পোড়োবাড়ির স্মৃতি?.../বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা/দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা/হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে/আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে/কিন্তু তুমি নেই বাহিরে-অন্তরে মেঘ করে/ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!' এই কবিতায় 'বৃষ্টি' সংরক্ত হৃদয়ের আকুলতার প্রতীক, এক 'objective correlative'; যে বৃষ্টি হৃদয়কে ভাসিয়ে দেয়, অথচ যাকে বাইরে ঝরতে দেখা যায় না। প্রকৃতি-জগতের চিত্রকল্প এখানে অন্তর্জগতের গভীরতা বহন করছে। আষাঢ়ের বৃষ্টি ভেজা দুটি কবিতা **এবার হয়েছে সন্ধ্যা** ও **আনন্দ ভৈরবী**। সারাদিনের পাথর ভাঙার শ্রম ও ব্যস্ততা শেষ হলে সন্ধ্যা নামে পাহাড়তলীতে— 'এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর/পাহাড়ের কোলে/আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে/তোমারও তো শ্রান্ত হলো মুঠি...।' সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের শেষে যে অলস মন্থরতা আসে, যা ছড়িয়ে যায় কবিতাটির সর্বাঙ্গে, আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে যাওয়া আর 'শ্রাবণের মন্থর মেঘ' তার সঙ্গে কি চমৎকারই না মানিয়ে যায়। আষাঢ়-শেষের বর্ষা ও বিদ্যুৎ-চমকের কথা আছে **আনন্দভৈরবী**-তে— 'আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি/এমন ছিল না আষাঢ় শেষের বেলা/উদ্যানে ছিল বরষা-পীড়িত ফুল.....'এবং 'এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে/বিদ্যুৎ-রেখা মেলে'। কবিতাটির প্রারম্ভিক পংক্তিগুলিতে এক বিষণ্ন স্মৃতিমেদুরতা আছে— ছবির স্থানচ্যুতি যখন ঘটেনি, যখন আষাঢ়শেষের বেলায় বাগানে ছিলো 'বরষা-পীড়িত ফুল'। 'বরষা-পীড়িত' এই যৌগিক বিশেষণটিতে 'বরষা' ও 'পীড়িত' পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক রহস্যময় বিরোধাভাস সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে শক্তি তৈরি করেছেন এমন এক চিত্রকল্প যা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের যোগসূত্র। চিত্রকল্পের অসামান্য অভিনবত্বে বর্ষার মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের ধারালো চমক মূর্ত হয়ে ওঠে 'এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে/বিদ্যুৎরেখা মেলে'—এই দুটি লাইনে। বৃষ্টি ও বর্ষার আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে পড়বে **অবনী বাড়ী আছো** কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের সেই আশ্চর্য রহস্যময় পংক্তিগুলি—'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে/পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস/দুয়ার চেপে ধরে।' সজল, শ্যামল এ কোন্ চিরবৃষ্টির দেশের কথা বলেছেন কবি? বাস্তবে এমন কোনো দেশ কি কোথাও আছে? মনে হয় অবিরাম বৃষ্টির এই মেঘমেদুর, চিরসবুজ জায়গাটি কবির কল্পনার, ভালোলাগার জায়গা, বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে। এই চিরবৃষ্টি আর দুয়ার চেপে ধরা সবুজ নালিঘাসের সঙ্গে অসম্ভব স্বতঃস্ফূর্তিতে শক্তি প্রয়োগ করেছেন গাভীর মতো চরে বেড়ানো মেঘপুঞ্জের চিত্রকল্প। বৃষ্টি, মেঘ, নালিঘাসের এই চিত্রপটটি যেন আভাসিত করে মগ্নচৈতন্যের এক পরাবাস্তব জগৎ।

প্রকৃতির মনোরম শোভা, নিসর্গদৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ ও বর্ণনা করাই কবির একমাত্র কাজ নয়, এমনকি হয়তো প্রধান কাজও নয়। আর তাছাড়া প্রকৃতি কেবলই শান্ত, মধুর, উদার এমনও তো নয় ; কখনো সে উদাসীন কিংবা বৈরী, বিধ্বংসী ও ভয়ঙ্কর। তাই কবির ব্যক্তিগত ও তাঁর সমসময়ের সংশয়, ভয়, বেদনা, বিকৃতি ইত্যাদি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ছবি নিয়ে আসে কবিতায় :

(১) চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে/...হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ।

(কোন দিনই পাবে না আমাকে)

(২) হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে/মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে? **(সরোজিনী বুঝেছিলো)**

(৩) রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী'। **(আমি স্বেচ্ছাচারী)**

(৪) ঈশান কোণে অমনোযোগে/মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে/দুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন।

(জুলেখা ডবসন)

শক্তির কবিতায় প্রকৃতি বলতে আমরা নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তথা ভূ-দৃশ্যের বর্ণনা বুঝবো না ; প্রকৃতির নানা প্রসঙ্গ ও উপাদান বাহন হয়ে ওঠে তাঁর আবেগ, আকুতি ও সঙ্কটের। মেঘ, বৃষ্টি, ফুল, বাতাস, সমুদ্র, তরঙ্গমালা, আকাশ, জ্যোৎস্না, রাত্রি, অন্ধকার ইত্যাদি সবই আসে কবির বিশেষ অনুভবের তাগিদে ও কবিতার প্রয়োজনে, নিছক প্রকৃতির শারীরিক বর্ণনার জন্যে নয়।

পর্যটনপ্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বারবার ছুটে গেছেন অরণ্য-পাহাড়, নদী-পাথর-ঝরনার টানে, এক বিপুল, অবিনাশী প্রকৃতির মায়া-কুহকে। বিশেষত উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স, ভূটান গিরিমাল তাঁর অনেক কবিতার উৎসস্থল। প্রকৃতি ও পর্যটনের তেমনি এক আলেখ্য-প্রবাহী গ্রন্থ *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে*। জলপাইগুড়িতে বন্ধুবর অমিতাভ দাশগুপ্তের 'কাঠের ঘরে' বসে লেখা এক দীর্ঘ কাব্য-পরিক্রমা। অবিরত দেখা আর দেখতে দেখতে চলতে থাকা—' কোদালে মেঘের মতো ভেসে চলি—দূর থেকে কাছে'। বর্ধমান-বীরভূমের রাঢ় বাংলার লাল ধুলোমাখা পথ, নুড়ি-পাথর আর উত্তর বাংলা ও ডুয়ার্সের বনভূমির নদী-পাহাড়ে অবিরাম চলেছেন কবি; তাঁর পরিক্রমার স্মৃতিভাষ্যে চিত্রিত হয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরের এক পথপঞ্জি : লোহাগুড়ি, তাজহাট, সামসিং পাহাড়, জোড়বাংলো, ডুয়ার্স, ভুটান বর্ডার, বল্লভপুর, ভেদিয়া, সিউড়ি, ইলামবাজার, লালবাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এ পথ-পরিক্রমা এক অনুভবী পথিকের নিবিড় ইন্দ্রিয়ময় প্রকৃতি-সান্নিধ্য। আন্তরিক মুগ্ধতায় তিনি চলেছেঁন এক দৃশ্য, স্পর্শ, শব্দময় পর্যটনে—তালের ছায়ায় পড়ে থাকা গ্রাম, হাওয়ায় ফেটে পড়া জলপিপিদের কান্না, লেবুবনে ভ্রমরের গুঞ্জন, শালফুল, কাশ, ক্যামেলিয়া, মুচকুন্দ, তুলোফুল, ফার্ন, উইলো, মহুয়া, পাইন, উত্তাল মাদার, কৌটাবাদাম, সেগুনমঞ্জরী, নালিঘাস, জলঝাঁঝি, স্যেভয় ঘাসের জাজিম, রাংচিতাবেড়া, সজিনা, পেয়ারা, পেঁপের হলুদ পাতা, পুঁই-মাচান, বাতাবি, কমলা, কাঠবিড়ালী, ধানকল-পায়রা, কাদাখোঁচা, বাদুড়, মাছরাঙা, ক্যানারি, রেলওয়ে বিল, কোপাই, তিস্তা, অজয়, তোর্সা, কর্ণফুলী, মোনাস্টেরি, ক্যান্টনমেন্টের মাঠ, কুয়াশাঢাকা পথ, পাহাড়চূড়া আর অনন্ত ইঁদারা পেরিয়ে।

কোনো পিছুটানের তোয়াক্কা না করে এক বেপরোয়া স্বভাব-পথিকের মতো অবিরত চলতে থাকা আর কথা বলতে থাকা আপন মনে, শক্তির কবিতায় এ এক পৌনঃপুনিক প্রসঙ্গ, তাঁর

কবিতার অন্যতম মূল 'মোটিফ'। স্মরণীয় *সোনার মাছি খুন করেছি*-র **যেতে যেতে** কবিতাটি: 'যেতে যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক/আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা/...সব দিকেই যাওয়া চলে/অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি/পানাপুকুর, শ্যাওলাদাম, হরিণমারির চর—/...শুধু যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না/...যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে/এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়/তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম/যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে/এই তো চাই—'। পথ চলাই পথিকের ধর্ম ; চিরন্তন যাত্রাপথের বৈরাগী যাত্রীর কোনো সংস্কার থাকতে নেই ; ফিরে আসবার বাসনা ত্যাগ করে কেবলই চলতে থাকা পথের টানে—'আগুন লাগলে পোশাকে যেভাবে ছাড়ে/ তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব।' রবীন্দ্রনাথের গান ছিলো শক্তির প্রাণের আরাম ; উদাসী চিরযাত্রীর এই আত্মকথনে সেই রবীন্দ্রনাথের গানের পংক্তিই যেন বেজে ওঠে— 'যাত্রী আমি ওরে/ পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে' কিম্বা 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ'।

অনন্ত নক্ষত্রবীথি....-র মতো দীর্ঘ কবিতা কিংবা **যেতে যেতে**-র নাতিদীর্ঘ স্বগত-কথন পড়তে পড়তে, তাঁর কবিতার পর কবিতায় 'যাত্রী', 'যাওয়া', 'পথ' ইত্যাদি শব্দ পুনরাবৃত্ত হতে দেখে আমাদের আরও স্মরণে আসতে পারে বোদ্‌লেয়ারের 'Le Voyage' —এক অদম্য কৌতূহল সুমদ্রযাত্রীদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে ; শুধুই ভ্রমণের আনন্দে নয়, মানুষের মধ্যে এক অস্থির তাড়না আছে বলে। গার্হস্থ্যের পরিচিত চতুষ্কোণের বাইরে জঙ্গল-নদী-পাহাড়-সমুদ্র, নাগরিক প্রাপ্তবয়স্কের অন্তঃপুরে লুকিয়ে থাকা এক দুরন্ত গ্রাম্য বালক যেন বারবার শক্তিকে ডেকেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বোদ্‌লেয়ার, দুই ভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধি হলেও শক্তির যাত্রপথে দুজনেরই ছায়া পড়েছে।

এক আত্মমগ্ন পথিকের ভ্রাম্যমাণতা, স্মৃতিময় পরিক্রমার কথা পাই **অলৌকিক পশ্চাদভ্রমণ** কবিতায়। আলো-অন্ধকার, বাস্তব-কল্পনার এক অনুভববেদ্য পরিক্রমায় কবি চলতে থাকেন, কথা বলেন অনুচ্চ স্বরে, স্বগত-কথনের ভঙ্গিতে—"চলেছি বসন্তের রাতে কুয়াশার ভিতর দিয়ে/কেবল কুয়াশা আর পাকাবাড়ি/মাঝে-মাঝে ধীর আর স্থগিত লণ্ঠন-ফোঁটা ভাঙা আকাশ দূর পল্লীতে/গাড়ি থেকে বাম পাশে গরাদের ছায়া—টানেল টিলা/আর স্তূপে-স্তূপে মনে হয় অতীতের ইতিহাসের গৌরব/আমায় বলে, 'ভিতরে এসে দাঁড়াও বারান্দার বুকের কাছে'।" পর্যটকের চেতনায় দৃশ্য-বাস্তবের অনুপুঙ্খগুলি কখনো পায় উদ্ভট রহস্যময়তার মাত্রা, কখনো চিত্রকল্পের সুডৌল সৌন্দর্য :

(১) আমার কাছে কোপাই নদীর জলের রক্তের ছবি পরিস্ফুট হলো তখন।

(২) আরও দূরে অলীক আগ্নেয়গিরি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আলোর পায়রা সব।

(৩) প্ল্যাটফর্ম দৌড়ে গেল পিছনে পুলিশের মতো।

(৪) দূরে এখন ফার্ন গাছের মতো ঝিলিমিলি ছায়াচ্ছন্ন শীত।

(৫) ছোটো-ছোটো ইস্টিশান বাবুই-এর বাসার মতো নিটোল আর নিঃসীম।

নিভৃত পরিক্রমার মুহূর্তগুলিকে এমন অনুভূতিময় ও ইন্দ্রিয়বেদ্য করে তুলতে পারেন শক্তি। 'খিড়কি দরজা দিয়ে' বেরিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস তাঁর আযৌবন মজ্জাগত। এই

পরিক্রমণ, এই সঞ্চরণশীলতা শক্তির কবিতার আঙ্গিক, ভবঘুরে কবির আত্মপ্রতিকৃতি। **পুনর্বিবেচনা** শীর্ষক কবিতাটিতে এই ভবঘুরে কবিস্বভাবের বহু নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে :

'হাজারিবাগের কাছে আমাদের সবই জানাজানি হয়ে গেল—

রুমাল ওড়াও তুমি পথে-পথে
পয়সা ছড়াও তুমি পথে-পথে
চুল খুলে দাও তুমি পথে-পথে

বসন্তে সেবার রাজমহালের দিকে যাওয়া হলো...........'।

এই যাওয়ার কথা—চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পথের শেষ সীমানা পর্যন্ত যাওয়া, পেছনে না তাকিয়ে কেবল ছুটে চলা, ঘর থেকে পথ আর পথ থেকে নদী পর্বতে ঘুরে বেড়ানো, সংসার গার্হস্থ্য ছেড়ে এক বেপরোয়া পরিব্রজ্যা, চলতে চলতে বারবার ভঙ্গি ও গতিপথ বদলানো—শক্তির কবিতায় কতভাবেই না এসেছে :

(১) আর কিছু নয়, খাড়াই পথের শেষ সীমানায় সঙ্গে যাবো/এমন ভেবেই হাঁটতে শুরু করেছিলাম দিনদুপুরে (**আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা**)।

(২) দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই, পাহাড়চুড়োয় থাকবো বসে/চিরটা কাল চলবো ছুটে—পিছনে নেই, পশ্চাতে নেই (**নীল ভালোবাসায়**)।

(৩) তুমি অনেকবার অনেক অরণ্যে গিয়ে বাস করেছো বাংলোয়/তুমি অনেকবার অনেক পান্থশালা সরাইখানায় কাটিয়েছো রাত/...ঘর থেকে পথ, পথ থেকে নদী, নদী থেকে পর্বতে ঘুরেছো তুমি কতই (**ভস্ম অবশেষ**)।

(৪) আর কোনোখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা নয়...../শুধু ঢলে পড়া, গা আলগা করে শানপুকুরে ছুঁড়ে দেওয়া সজল কাপড়/পথের মধ্যখান ছেড়ে পাশে সরে যাওয়া, খানাখন্দে লাফিয়ে পড়া/অনেকদিন হলো একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি (**হলুদ নদী সবুজ বন**)।

(৫) দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট—সব ঘাটে কি থামছে তরী?/...আয় বিদেশে বাস্তু করি—চাল-চুলো-চৌকাঠটা খুলে/নীল দিগন্তে ফুলের আগুন—সেই আগুন পোড়াচ্ছে কবে? (**এই বসন্তে বৃষ্টি হবে**)

(৬) সর্বদা চলার মতো পথ পাই/নিকটে ও দূরে/ভিতরে-বাহিরে কত পথ পাই,/সকলের দাবি:/আমাতে প্রথম এসো/পদচিহ্ন রেখে যেয়ো কিছু—/ যে আসবে দ্বিতীয়, যাবে নির্ভুল তোমারই পিছু-পিছু (**উড়ন্ত সিংহাসন**)।

পর্যটকের পরিক্রমা ও তার চলচ্ছবি, প্রেম ও মৃত্যুর নানা প্রসঙ্গকে ঘিরে তার খেয়ালি কল্পনা প্রকৃতিকে বারবার এনেছে এ কাব্যে। ধরা যাক, **পশ্চাদভূমি** কবিতার কয়েকটি লাইন ; স্থিতি থেকে চলমানতায় নিজেকে বদলে নেবার ইচ্ছা কি চমৎকার ব্যক্ত করেছেন শক্তি গাছ, জলস্রোত, মেঘ, ঝরনা আর নুড়িপাথরের চিত্রকল্পে ; 'অনেকদিন গাছের মতো স্থানু হয়ে, স্রোতের মতো চপল হয়ে,/ কাঁধের ওপর উপর্যুপরি মেঘের চাপে ডুবে গিয়েছিলাম আমি।/ যেমন করে ঝরনা থেকে নুড়িগুলো সরে আসে,/যেমন করে গানের সুর কথা আর পঙ্‌ক্তি ত্যাগ করে—/ তেমন করে চলে যাওয়ার সাধ আমার বুকের ভিতর ক্রমাগত।'

প্রকৃতি ও পর্যটন মিশে আছে হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান এই গ্রন্থনামে। পথে-প্রান্তরে অবিরত চলতে থাকা ও পান্থশালায় রাত কাটানো নিরাসক্ত পথিকের নির্লিপ্তি ফুটে ওঠে এইসব পংক্তিতে— 'একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার—/কোন্ পথে? কোন্ পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।/...আমরা, যারা একবার বেরিয়ে এসেছি/তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।/পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে/নদী বেরিয়ে সমুদ্রে/এই তো নিয়ম।/...পথিকের আবার বাস-বিষণ্ণতা কি?/ যেখানে পথ সেখানেই পথিক/ইতিমধ্যে, পান্থশালায় রাত তো আর কম কাটেনি!' (কোন পথে)। সব বৈষয়িক পিছুটান ফেলে রেখে নির্বিকার পথ-পরিক্রমা, নদীর সাগরসঙ্গমে মিলিত হবার মতোই সহজ ও স্বাভাবিক। আটপৌরে গৃহস্থের ছকবাঁধা জীবনের ব্যাকরণ-শৃঙ্খলা ভেঙে চুরে, লোক-লৌকিকতা, রাজনীতি, শোকসভা আর উৎসব থেকে দূরে ডুবে থাকা, পরিচিত জীবনবৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে চলতে থাকা—'জলের ওপর ভাসতে-ভাসতে অর্ধেক জীবন খরচ হয়ে গেলো/....আজ শেষের অর্ধেক জীবনটা নিয়ে এইসব চেনাজানা ভাসার পরিবেশ ফাঁকা করে/আমি এক চুমুকে ডুবে যাবো/দেখি না কী হয়?/কিছুই না হলে দেশভ্রমণ আমার রোখে কে?/সবার জন্যে তো আর একটানা একজীবন হয় না! (একটানা এক জীবন)। 'যাত্রা', 'যাত্রী', 'পথ', 'পথিক' ইত্যাকার শব্দগুলি শক্তির কবিতার চাবি-শব্দ ; এমন পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ যে বলা যায় প্রতীকচিহ্ন। নগরবাসী এই কবির অন্তঃপুরে ছিলো তাঁর বাল্যস্মৃতির উস্কানি ; ক্লান্তিকর ও নিশ্চেতন নাগরিক জীবন থেকে তিনি সর্বদা মুক্তি চেয়েছেন প্রকৃতি ও পল্লীনিসর্গের বিস্তীর্ণ পরিসরে—'সবাই বলতো, পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও/চলো/পাচনবাড়ি উচিয়েই আছে/.......যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে' (এবার আসি)। 'সাপ-নাগালে উঠি-মুঠি আলপথ', 'নজরালির তালপুকুর', বদু বুড়োর 'উড়ো চাল চুড়ো বাড়ি', ' হোগলা বনে মটকা মেরে' পড়ে থাকা রোদ্দুর, বাশঝাঁড় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চলতে থাকা এই পথিকের 'টিকিটের ওপর কেবলই যাত্রার ছাপ'।

এ কাব্যে অরণ্য তথা প্রকৃতির প্রসঙ্গে আলোচনা নাম-কবিতাটি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করে শুরু করা যেতে পারে—'আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে/অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন/ তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই— হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক/তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন/কতোকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে অই/হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি/একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল/একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।' অরণ্য ও উদ্ভিদ শক্তির জীবন ও কবিতার অসম্ভব অনুরাগের বিষয়। 'গাছ' এক সবিশেষ প্রতীকচিহ্ন। গাছেরা যা পারে, মানুষ তা পারে না ; হেমন্তের অরণ্যে ঘুরতে থাকা পোস্টম্যান দেখে কিভাবে দূরত্ব বেড়েছে একটি চিঠির সঙ্গে অন্য একটি চিঠির, অথচ একটি গাছের থেকে অন্য গাছের ব্যবধান তো বাড়েনি। শিকড় গাছকে দেয় যে স্থিতি আর প্রাণরস, মানুষ তা কিভাবে কোথায় পেতে পারে? প্রেম, সৌন্দর্য, সারল্য হারিয়ে যে মানুষ চলে যাচ্ছে পরস্পরের থেকে দূরে, তাদের কাছে জীবনের সজীব প্রেরণা ও সামর্থ্যের চিহ্ন হল গাছেরা। তাই গাছের লালন-পালন-পরিচর্যা, উদ্ভিদের সান্নিধ্য ইত্যাদির ছোট-বড় উল্লেখ শক্তির কবিতায় প্রচুর—

(১) বেশ আছি...../বীজ পুঁতে জল সইছি......। (অনেকগুলো শব্দের কাছে)

(২) বেড়িয়ে ফিরলুম—আঙুলেব গলি ভর্তি ভিজে ঘাস-মাটির নাছোড়বান্দা আদর/...ওই ঘাসের টুকরোগুলোকে পুনর্বাসন দেবো এবার/ফুল ফোটাবো বলেই তো/ বেড়িয়ে ফিরলুম!

(বেড়িয়ে ফিরলুম)

(৩) চোখ ফেলে মাটি কুপিয়ে বেড়াই। **(নাম জীবন)**

পথ-পরিক্রমাকালীন অরণ্য উদ্ভিদ যেভাবে কবিকে টেনেছে, দিয়েছে শুশ্রূষা ও ত্রাণের আশ্বাস, সেভাবেই ঘরের সংলগ্ন নিজস্ব বাগানটিতে বৃক্ষ-লতা-ফুল-ফলের আন্তরিক পরিচর্যার বাসনা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পূর্বে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির সূত্রে অনুরূপ কিছু উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* থেকে :

(১) নতুন হাত নিড়ুনি করবে এ-ধার ও-ধার দু-চারটি ঘাস/পুঁই তুলবে, মাচা বাঁধবে.../আমি মানবো সাপটে ধরবো নতুন বাগান, নতুন গাছটি/ বেঁচে উঠবো সরস ঋজু রোদ্দুবেবৃষ্টিতে।' **(অতিজীবিত)**।

(২) কখনও কুড়োই ফুল, গাছে জল ঢালি **(আজো উত্তর জানালা)**।

এক শান্ত ও সুন্দর পল্লী প্রকৃতির বিস্তৃত পরিসরে পর্যটনময় এ কবির আত্মমগ্ন অনুভব চিত্রকল্পের ইন্দ্রিয়ময়তায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে :

(১) সেই স্বপ্নগুলি, সেই নিথর সজল রাজহাঁসগুলির/উটের মত সতৃষ্ণ হলুদ গ্রীবা।

(আমায়, পথ থেকে পথে)

(২) সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি/ মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার/রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো/কংকালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ/আমার মাথার উপর।

(কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ)

(৩) মানুষের কাছে যেতে আমার ভারি কষ্ট হয় আজ।/তার চেয়ে ভালো এই নিস্পৃহ বনানীর ভিতর অমল তৃণবাড়ি **(মানুষের কাছে যেতে)**।

(৪) সে রাতে ঝলক ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিলো ঘাটের রানা **(স্মরণিকা)**।

(৫) সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ **(ঐ)**।

(৬) যে-সময়ে মেহগনি খাট ডুবে যায় মেঘে-মেঘে/যে-সময়ে মনোহর প্রত্যভিবাদন নিতে ধানখেতে চাঁদ নেমে আসে **(বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে)**।

(৭) অকৃতজ্ঞতা—সেই পাখি/ডানা যার কর্তালের মতন বাতাস ভাঙছে

(ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে)।

(৮) শাদা বালি অব্যর্থ হাড়ের রঙ বনের ছায়ায় **(পিছনে যাবার রাস্তা নেই)**।

(৯) অলক্ষ্য ধুনুরি/মেঘের সাম্রাজ্য ধোনে **(ঐ)**।

(১০) স্বপ্নের ভিতরে, পথে অসংখ্য হোঁচট খায় চাঁদ/রাত্রিবেলা **(ঐ)**।

(১১) শাদা কাপাসের তৃষ্ণা, বনের আড়ালে..... **(এখানে নিঃশব্দ তুমি)**।

(১২) অন্ধকারে ক্যানাফুল সবুজ পাৎলুন হ'য়ে উদাসীন মিটিঙে বসেছে **(মধ্যাহ্নের দোষে)**।

(১৩) চতুর্দিকে কতো সাবলীল গাছপালা, ইন্দ্রিয়ছোঁয়া নীলবর্ণ **(কথায় বলে)**।

(১৪) হোগলা বনে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে রোদ্দুর **(এবার আসি)**।

(১৫) উপত্যকা থেকে দেখি চারিদিক অনন্তে বিছানো **(সমাধিফলকের স্মৃতি)**।

উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে উপমা তথা চিত্রকল্পের অভিনবত্ব ছাড়াও যা লক্ষণীয় তা হলো প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ কিভাবে কবির অন্তরঙ্গ অনুভব ও চৈতন্যের বাহক হয়ে উঠেছে। কখনো নিবিড় স্বপ্নময়তা (উদ্ধৃতি ১,২,৬,১০), কখনো বা নিঃসঙ্গতা, বেদনা, বিপন্নতার বোধ (উদ্ধৃতি ৩, ৫, ৮, ১১), আবার কখনো প্রকৃতি-নিসর্গের কোনো দৃশ্য বা ভঙ্গি (৯,১২,১৪) আশ্চর্য চিত্ররূপময়তায় আবিষ্ট করেছে পাঠককে। স্পর্শ করেছে উচ্চারণের হার্দ্য নমনীয়তা।

এই কাব্যভুক্ত বেশ কিছু কবিতায় জীবনানন্দ সুলভ কিছু কিছু পংক্তি প্রকৃতিচেতনার কিংবদন্তি কবির ঋণ স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার। **কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ** কিংবা **বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে** কবিতায় জীবনানন্দীয় স্বপ্নাবেশে শক্তির উপমা বা চিত্রকল্প আচ্ছন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। কবি-সমালোচক শামশের আনোয়ারের মতে 'মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার', এরকম একটি জীবনানন্দীয় লাইনের জন্য নষ্ট হয়েছে 'রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো' জাতীয় সচেতন উপমা। তিনি 'কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো/আমায় পুরোনো চাঁদ' (**কাল রাতে....**), এ জাতীয় ছত্রে জীবনানন্দের 'জগদ্দল প্রভাবে'র উল্লেখ করেছেন।[৩৮] শক্তির কবিতায়, বিশেষত, প্রাথমিক পর্বে, জীবনানন্দের প্রভাব অবশ্যই অলক্ষ্য নয় : ক্রমে সেই প্রভাবকে আত্মস্থ করে স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলেছেন শক্তি, যদিও বিভিন্ন লেখায়, সভা-সমিতি-আলোচনায় জীবনানন্দের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করতে তিনি ভোলেন নি। প্রেম ও প্রকৃতি প্রথমাবধি যে কবির কবিতার ভরকেন্দ্র তিনি কিভাবেই বা জীবনানন্দকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারতেন?

শক্তির কবিতায় প্রকৃতি কেবল বাহ্যবস্তু নয়, তা মিশে যায় কবিমানসের সঙ্গে এক হয়ে, কবির মনোমুকুরের মোহময় প্রতিফলন ছড়িয়ে যায় আকাশ-নদী-বৃক্ষ-পর্বতসহ সমগ্র ভূ-নিসর্গের সৌন্দর্য-বিশ্বে। শক্তির *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র প্রথম সনেটটির শুরুতেই প্রকৃতির পূর্ণতায় কবি অনুভব করেন তাঁর মানসিক ঋতু পরিবর্তনের সংকেত— 'ফুলের বিছানা দেখে মনে হলো শূন্যতা যাবার/সময় হয়েছে। কোনও ভয় নেই। পরশকাতর/শরীর আমার পাবে জীবনের একান্ত পাবার/স্পর্শ...।' নিসর্গ প্রকৃতি জুড়ে চাঁদ ও জ্যোৎস্না, ঘাস-ফুল-পাখি-নদী, আকাশের মেঘ-বাদল-নক্ষত্র-নীলিমা, এসব কিছুই শক্তির কবিতায় আদিম প্রেরণার মতো প্রোথিত হয়ে থাকে। দৃশ্য-ঘ্রাণ-শ্রুতি-স্পর্শের নিবিড় অনুভবে শক্তির অবগাহন প্রকৃতির সম্মোহক জগতে, স্বেচ্ছানির্বাসনের ভঙ্গিতে, যেন প্রকৃতি পৃথিবীর আদিম কবিত্বের মতো অবিনাশী।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী-র বেশিরভাগ রচনায় ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির নানা ছবি, স্মৃতি, অনুষঙ্গ। জীবনানন্দকে বাদ দিলে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো আর কেউ আমৃত্যু প্রকৃতির দ্বারা এভাবে আকৃষ্ট, তাড়িত ও মগ্ন হয়েছেন বলে মনে হয় না :

(১) এখন পাতার শব্দে জেগে উঠি, পাতার পতনে/মনে হয় ওতপ্রোত বৃক্ষোপরে তোমার পতন/হয় নাথ! (১৩ সংখ্যক)

(২) জীবনের শাসনপ্রধান/তালিবনে জ্যোৎস্না মেখে ধবল মার্বেল পড়ে আছে (২০ সংখ্যক)।

(৩) আবার জ্যোৎস্নায় ফিরে আসিব কি, আরো অন্ধকার/জ্যোৎস্নায়, আঁধারে নয়—অবাস্তব রুপালি জ্যোৎস্নায়/আবার আসিব ফিরে? (২৩ সংখ্যক)

(৪) বাইশ জেব্রায়,/ঘোড়াগুলি অন্ধকার উতরোল সমুদ্রে দুলিছে/কালের কাঁটাব মতো.../ অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন/চরিয়া বেড়ায় ওরা.... (৩৭ সংখ্যক)।

(৫) কতগুলি দ্বীপ ফেলে গেছো পাশে, কত মায়াবিনী/বঞ্চিত পাখির উড়ো দল মাঝে স্ফুরিত ঢেউয়ের আত্মনিবেদন... (৫০ সংখ্যক)।

(৬) কখনও জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন/শিশিরে, চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণ করা/ হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা... (৬১ সংখ্যক)।

(৭) জ্যোৎস্নায় মাছের খেলা দেখিয়াছি, ফেনার উৎসবে/বহু জলচারিণীর উত্তাল আপেল দেখিয়াছি/পাখি দেখিয়াছি খুব../....গাছের ভিতরে/ভগবান দেখিয়াছি... (৭৬ সংখ্যক)।

(৮) তখনও ফুলের পাশে বিস্ফোরণ হতো ভ্রমরের... (৮৪ সংখ্যক)।

এইসব নমুনা পদ্যাংশের অধিকাংশ চিত্রকল্পে, ভাষা ও ভঙ্গিতে জীবনানন্দের উপস্থিতি বিশেষভাবে নজরে পড়ার মতো। একথা ঠিক যে সামগ্রিক বিচারে জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার মর্মমূলে, ইন্দ্রিয়-মগ্ন রূপাবিষ্টতার অন্তরালে, বিষণ্নতা-বেদনা-বিপন্নতার যে বোধ তা আমরা শক্তির কবিতায় দেখি না। তবু একেবারে প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই শক্তির প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায় মাঝে মাঝেই আভাসিত হয় এমন এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা তথা অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট বা পরাবাস্তবতার ছোঁয়া যা তৎক্ষণাৎ জীবনানন্দের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

নাগরিক জীবনের নিসর্গহীন যান্ত্রিক কর্মব্যস্ততার মধ্যে আবদ্ধ কবিমন শক্তির কবিতায় ফিরে যেতে চেয়েছে বারবার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি, ভালোবাসার সন্ধানে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত আশ্রয়ে। উচ্চারিত হয়েছে রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবনা—'প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে/ঘাস খায় রোজ, কিছু শস্তা বলে, স্বাস্থ্যকর বলে/তুমিও সেভাবে ফেরো ঘাসের গুচ্ছের/ভিতরে পা মেলে বসো..../প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে/শূন্য ভালোবাসা থেকে কাছে ফেরে সম্পূর্ণ কলসে...' (*প্রকৃতির কাছে ফেরো/পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)। 'গাছ' শক্তির কবিতায় বহু-ব্যবহৃত একটি শব্দ, একটি সংকেত, একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন গ্লানি থেকে অব্যাহতি চান বলেই 'গাছ' শক্তির কাছে শান্তি ও স্বস্তির এক নিরাপদ আশ্রয় : 'সারবান গাছে পাতা কী মন্ত্রে নত/হয়ে আছে যেন আমি তাকে অন্তত/যথাযথ বুঝি' (*সেই রাক্ষসী/ঐ*) অথবা 'তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো/সারাজীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে' (*অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না/ঐ*)। প্রকৃতিজগতের মূল্যবান চিহ্ন হিসেবে 'গাছ' শক্তির কাছে স্থিতি ও প্রজ্ঞার প্রতীক। মানুষের প্রাত্যহিকতার গ্লানির বিপরীত 'গাছ' পরিত্রাণ ও উজ্জীবনের দ্যোতক— 'মানুষেরই মধ্যে আছো? নাকি স্থির গাছের ভিতর?' (*দুঃসময়ে, দূরে/ প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)। খোলা আকাশের নীচে প্রখর রৌদ্রতাপে নয়, শক্তি নিবিড় স্বস্তি অনুভব করেন ঘাস, নদী, গাছ, বাতাস ও ছায়ার প্রাকৃতিক শুশ্রূষায়—'এখন গভীরভাবে ঘাসের ভিতরে বসে থাকা/ভালো মনে হয় এই প্রগাঢ় রোদ্দুরে/আকাশের নিচে থেকে থাকা নয় অথচ ছায়ায়/এই ঘাস নদী গাছ—এলোমেলো হাওয়ার কুহক/মনের ভিতরে কিছু গাছপালা এঁকে দেবে বলে' (*উপক্রান্ত ঘাসের ভিতরে/সুখে আছি*)। প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিকতার সঙ্গে তিনি বোধ করেন একাত্মতা—'ফুলগুলো সব ফুটে উঠতো আমার কথা মনে পড়লে' (*ও ফুল আমার/ঐ*)। আপন মধ্যবয়সে শক্তি আবারও একটি গাছের প্রতীকে নিজেকে দেখতে চান—'একটি মধ্যবয়স গাছে নিজেকে বিন্যস্ত/করে দেখেছি দীর্ঘকাল, শাখার মতো আপন/কেউ কিছু নেই গত আমার মনুষ্য-সংসারে!/একটি মধ্যবয়স গাছের শিকড়ে আজ হস্ত/রেখে দেখেছি উষ্ণ সে কি বাঁচার কৌতূহলে....' (*ভালোবাসার প্রাধান্য/ঐ*)।

পথ চলতে চলতে পল্লী প্রকৃতির শাস্ত গাম্ভীর্যে আত্মমগ্ন বিশ্রামের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কবি—'মগডালে নয় গাছের নিচে কিংবা কোনও পুষ্করিণীর/যেখানে মাছরাঙা থাকেন ধেয়ান-মগ্ন/সেইখানে তার পাশটি ঘেঁষে, বসলে হতো' (*কিন্তু আমায় বশ করে কে*/*ঈশ্বর থাকেন জলে*)। বারবার স্মৃতিবাহিত হয়ে এসেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের পল্লীনিসর্গ এবং পথ-পরিক্রমার নানা ইন্দ্রিয়বেদী অভিজ্ঞতা—'এই সেই পুকুরপাড়, এই সেই দোলমঞ্চ/ এখানে একদিন পেতলের থালার মতন এক চাঁদ উঠে এসেছিলো' (*এই সেই*/*প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*) অথবা 'নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরোনো/ভেসে আসে শতচ্ছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল...' (*স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল*/*ঈশ্বর থাকেন জলে*) অথবা 'ভাসন্ত চাঁদের সঙ্গে দৌড়ে গেছি বালক বেলায়' (*বানভাসি*/*অস্ত্রের গৌরবহীন একা*)। বারবার শক্তি মানুষের অপূর্ণতা ও অস্থিরতার বিপরীতে 'গাছ'কে দেখেছেন স্থির ও অর্থবহ অস্তিত্বের চিহ্নরূপে—'কিছুদিন গাছ হয়ে থাকো/শিকড় যেখানে যায়, তুমি যাও—গিয়ে দেখে এসো/ঘেঁষ বালি চুন ক্ষার—মানুষের মহিমার চেয়ে/এদের দাবিও কিছু অল্প নয়...' (*সকলের চেয়ে বেশি অহংকার নিয়ে*/*ঈশ্বর থাকেন জলে*)। প্রকৃতিভুবনের সৌন্দর্য, সংহতি ও প্রশান্তির মধ্যে শক্তি খুঁজে পেয়েছেন মানুষের এক নিভৃত আশ্রয় ; দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ ও ঘ্রাণের এক বিস্তৃত নিসর্গদৃশ্যের প্রতি তাঁর মমতাময় আকর্ষণ—'কেউ কি যাবে? কেউ কি চলে যাবে?/ যেভাবে জল জলের মতো যায়/ যেভাবে ফুল ফুলের দিকে চায়/ সেভাবে কেউ নিজেকে ফিরে পাবে?' (*কেউ কি যাবে*/*ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্যটনপ্রিয় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বারবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন, নগর জীবনের ক্লেদ অপনোদনে যান অরণ্যের আশ্রয়ে, পাহাড়-নদী-ঝরনা-গাছের তল্লাশ করেন মানসিক আরোগ্যলাভের বাসনায়—'খুঁটিয়ে দেখেছি বন, বনাঞ্চল, গাছের শিখরে/যদি সে আনন্দ কিছু করে/গভীর রাত্রের খেলা যদি তাকে পায়/আমোদ বিন্যস্ত থাকে লতায় পাতায়' (*পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছ পড়ে বোঝে*/*ঈশ্বর থাকেন জলে*)। গার্হস্থ্য ও লোকালয় ছেড়ে তাঁর এই অরণ্যের দ্বারস্থ হবার কারণটি শক্তি ব্যাখ্যা করেন এইভাবে—'মানুষ এখানে নীল তাঁবু ফেলে আছে/যাতে শ্বাপদের চোখ এড়াতেও পারে/তাই এই বর্ণচুরি, তাই জেগে থাকা/তাই বনাঞ্চলে আসা, সহজের কাছে' (*একরকম আলো*/*আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল*)। সামান্যতম সুযোগ পেলেই শক্তি ছুটে চলে যেতেন কাছে কিম্বা দূরের যে কোনো অরণ্যে ; গাছেদের আদিম নিভৃত জগতে খুঁজে পেতেন সহজ শান্তি ও সান্ত্বনা—'শীতে আমি ছুটি বনের ভিতরে একা/গাছ পড়ে থাকে, গাছই শুধু থাকে পড়ে/...প্রকৃতির হার প্রকৃত কিছুতে নেই/ ভেঙে যদি যায় একটি বা দুটি গাছও' (*শীতে একদিন*/*সুন্দর এখানে একা নয়*)। জঙ্গলের সংলগ্ন কোনো বনবাংলোয় শক্তি খোঁজেন নিরাময়—'আমার অসুখ অমনি পালায় যদ্যপি যাই বনস্থলীর/কোলছোঁয়া ঐ বাংলোবাড়ি' (*বনস্থলীর বাইরে গলির বছরগুলো*/*আমি ছিঁড়ে ফেলি....*)।

মানুষের জগৎ, বিশেষত নাগরিক জীবনের সময়-সারণী শাসিত কর্মবৃত্তের জগৎ, যখন কবিকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ বা আহত করেছে তখনই পাখি-ফুল-গাছ-নদী ইত্যাদির নিভৃত ভুবনে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন তিনি। কিন্তু এক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন প্রশ্ন এসেছে তাঁর মনে যে মানুষের সুখ-দুঃখ ছেড়ে কিভাবে যাওয়া যায় প্রকৃতির অন্তর্লোকে অথবা মানুষের সব কিছু ভুলে প্রকৃতিতে আত্মনিমজ্জন কি সঙ্গত? *কবিতার তুলো ওড়ে গ্রন্থের কেন যাবো?* কবিতায়

এই প্রশ্নগুলো এসেছে—' বৃষ্টি হলে, মনে হয়, আমি ঐ বৃষ্টির জলের/সঙ্গে ঢুকে মিশে যাবো পড়ে-থাকা ভুবনে, মাটিতে—/কিন্তু, কোনভাবে যাবো? কেনই বা যাবো?/ আকাশে কেটেছে কাল, বাতাসের সাঁতারে সন্ধ্যায়/ ভেসে চলে যেতে হতো পাখির মতন কোনো গ্রামে/তাদের নদীর পাশে গাছের পাতার অন্তরালে/মানুষের সবকিছু ভুলে গিয়ে পাখি হওয়া যেতো—/...কিন্তু কোনভাবে যাবো? কেনই বা যাবো?' বারবার যেমন বৃষ্টিজলে বা জ্যোৎস্নায় স্নাত হবার আকাঙক্ষা, নদী, ফুল, ঝর্নার কাছে সান্নিধ্যভিক্ষা, গাছের ভিতরে আর পাতার আড়ালে পড়ে থাকবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন শক্তি, তেমনি মানুষের সঙ্গে থাকার তাগিদও অস্বীকার করতে পারেন নি—'...আমি থাকি কাছে/মানুষের কাছাকাছি, তাই আমি জেনেছি মানুষ' (**কাছে দূরে**/*কবিতার তুলো ওড়ে*)।

ক্রমাগত গাছকে মানুষের মতো এবং মানুষকে গাছের মতো করে দেখেছেন শক্তি। মাটির গভীরে শিকড়ের সন্ধানে, মাটির ওপরে রৌদ্রের নেশায় যে গাছ তার ডাল-পালা বিস্তার করে, শক্তির ভাবনায় তা এক পূর্ণ জীবনবোধের অবিচল প্রতীক। কিন্তু সেই গাছও কখনো কখনো রিক্ত মানুষের মতো, অসহায় ও ভীত মানবশিশুর মতো মনে হয় ; সে তখন মানুষের একাকিত্বের প্রতিমা যেন—'সমাধি রয়েছে/নদী থেকে কিছুদূরে একফালি জমির ওপরে/একা, পাশে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ গাছ কাঙালের মতো/আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রাণ/শিকড় মুষ্টিতে মেখে, মাটি কালো শিশুটির মতো/চুপ ভয়ে আদিগন্তে বিমূঢ় সম্পত্তিচ্যুত একা।' (**পাথর নদীর কাছে**/*হেমন্ত যেখানে থাকে*) গাছ এখানে অন্তিম শয়ানে শায়িত মানুষের ত্রস্ত, নিঃস্ব সঙ্গী। গাছের মতো গাছের শিকড়ও শক্তির কবিতার এক চিহ্ন ; গভীরে যাওয়ার, জীবনের সব গূঢ় রহস্য ও রসদের সন্ধানে স্তর-স্তরান্তরে যাত্রার প্রতীকচিহ্ন—'গাছের ভিতরে যদি যেতে পারি একবার জীবনে/...বহুদিন থেকে এই সামান্য বাসনা নিয়ে আমি/জঙ্গলে গিয়েছি রাতে, অন্ধকারে। হারিয়ে গিয়েছি/ কোনো শিকড়ের হাত ধরে যেতে চেয়েছি ভিতরে' (**ও গাছ, আমাকে নাও**/*মানুষ বড়ো কাঁদছে*)। অরণ্য ও আরণ্যক জীবন সম্পর্কে শক্তির ছিলো এক অসম্ভব টান এবং তাঁর প্রচুর কবিতায় ছড়িয়ে আছে সেই আকর্ষণের অজস্র চিহ্ন—'পাহাড়ের কাছে তাকে নিয়ে যেতো পাগল বনানী/স্থির নীল, ঝর্না জল, নুড়ি ও পাথর, হাটবার/উলি ঝুলি রাস্তা যায় অরণ্যের গভীরে জন্তুর/মুখোমুখি, চাঁদ উঠে পথরোধ করেও দাঁড়াতো... (**ভালো লাগে**/*ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি*)।

পাহাড়, জঙ্গল আর সমুদ্রের হাতছানি ছিলো আযৌবন শক্তির কাছে অপ্রতিরোধ্য। বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও মধ্যভারতের বিস্তৃত অরণ্যভূমির আনাচে-কানাচে ও বনবাংলোয় প্রকৃতি ও পর্যটনপ্রেমী এই কবি ও তাঁর সহযাত্রীরা ফেলে এসেছেন তাঁদের পদচ্ছাপ। আর শক্তির কবিতার পর কবিতায় সে-সব অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ ও স্বীকারোক্তি ছড়ানো রয়েছে। *চলো বেড়িয়ে আসি, খৈরী, আমার খৈরী, জঙ্গলে পাহাড়ে* ইত্যাদি ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থে যে পর্যটক শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমরা পাই, অজস্র কবিতাতেও সেই শক্তি ব্যক্তিগত ভ্রমণবৃত্তান্তের নানা তথ্য, প্রসঙ্গ, অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে কবিতাপাঠকের মানস-ভ্রমণের রসদ নিয়ে উপস্থিত :

(১) এই সেই সিংভূম, যার জঙ্গলে-পাহাড়ে আমি/ছুঁচের মতন ফোঁড় তুলে-তুলে শেলাই করেছি/পাড়ের রামধনু কাঁথা দীর্ঘদিন ধরে (**এই সেই সিংভূম, যার জঙ্গলে পাহাড়ে**/*আমি চলে যেতে পারি*)।

(২) মনে পড়ে অনিমেষ, কৌটোখাদামের ঘরে সে-নিশি যাপন?/চাঁদের চাতাল, কুয়ো, আচাভুয়ো পাখি-ডাকা রাত/চাবুকের মতো জল ছিপ্‌টির মতন কালো হাওয়া/মনে পড়ে অনিমেষ একা-একা জঙ্গলে কোথায়/হঠাৎ হারিয়ে গেলে? **(চৈত্রের ঘূর্ণিতে ধুলো/ঐ)**

(৩) জঙ্গলে ঢোকার পথ পাতার শিরার মতো অসংখ্য ছড়িয়ে/কেবল গভীরে টান দেবে দেহে আর যেতে হবে/পায়ে পায়ে বুকে হেঁটে কখনো দৌড়ে ছুটে জড়িয়ে লতায়....।

(পাখি আর পোড়া পাতা/*সুন্দর রহস্যময়*)

(৪) টিলার সানুর বাদা পার হলে পীচকালো পথ/পথের দুপাশে জাকারাণ্ডা আর শিরিষের সারি—/....দূরে অর্থবহ রোরো.../ওপারের পথ গেছে লুপুংগুটু ছাড়িয়ে দূরের বড়বিল—সারাণ্ডার পাহাড় জঙ্গল থাকে-থাকে/শ্বাপদ ভরিয়ে রাখে, ডাকবাংলো, অর্জুনমাদার।

(টিলার ওপর সেই বাড়িটির কথা, ঐ)।

(৫) জঙ্গলে যাবার কোনো দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই,/ যে-কোন সময়ে তুমি জঙ্গলের মধ্যে যেতে পারো।/...জঙ্গলে যাবার জন্যে অকৃপণ নিমন্ত্রণ আছে। **(জঙ্গলে যাবার/*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)**

(৬) বৃষ্টিতে ডুয়ারস খুবই পর্যটনময়।/মেহগনি-বীথি পার হলে পাবে দোতলা বাংলোটি/কাঁটাতার বেড়া-ঘেরা সবুজ চাদরে ঘাস বড়ো উচ্ছৃঙ্খল/এখন, এখানে।

(জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন/*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)

(৭) গরুমারা বাংলোখানি জঙ্গলের গভীর টিলার/উপরে, ঘোমটা পরে বসে আছে—মুখ দেখবো বলে/সমতল থেকে আমরা উঠে এসে দুয়ারে দাঁড়াই **(দুজনের জন্যে/*যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)**।

(৮) বদগাঁও-এর বাংলো ছেড়ে চলেছি উত্তরে/চড়াই-উৎরাই পার চলেছি উত্তরে—/বুনোগন্ধে জ্বলে নাক, দু বাহু বাড়ায়/দুটি দিক থেকে সোঁদা সেগুনমঞ্জরী **(অবসর এখানে মাঠ অবসর এখানে গাছপালা/কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে)**।

(৯) দীনহীনতার কাছে পরিত্রাণ পেতে হলে যাও—/জঙ্গলে হঠাৎ চলে, একা একা, দোসর না নিয়ে।/আকাশ ছুঁয়েছে গাছ। তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়াও/বড়র নিকটে গেলে তুমি ঠিকই পরিত্রাণ পাবে **(পরিত্রাণের জন্যে/কক্সবাজারে সন্ধ্যা)**।

(১০) দুদিনের জন্য শুধু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া যায়?/ যায় না বলেই আমি হাতে রেখে মাস ও বৎসর/একাকী জঙ্গলে যাই, কখনও বন্ধুর সঙ্গে যাই **(সমুদ্রে,-জঙ্গলে/ঐ)**।

(১১) জঙ্গলের দরজা নেই,শুধু আছে অন্তর-বাহির।/ ছোটখাট গাছপালা কিছু আছে শ্বাপদের মতো,/তাদের ভিতরে শোয়, তাদের ভিতরে কথা বলে../কখনও নির্বোধ হয়ে যেও না জঙ্গলে/জঙ্গল অনেক চায়, জঙ্গলের চাওয়া তুমি দিতেই পারবে না **(জঙ্গল বিষাদে আছে/*এই তো মর্মর মূর্তি*)**।

(১২) জঙ্গলে সে ভীষণ যেতো অবশ্যত/জঙ্গলে সে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে।/লক্ষ্মীঠাকুর যেমন হাঁটেন উঠোন জুড়ে— **(মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে/*আমাকে জাগাও*)**।

(১৩) জঙ্গলে এসেছি শান্তি পাবো বলে, মহুয়ার নেশা/করবো বলে টেবোর পাহাড় ছেড়ে চলে যাই মেঘাতুবুরুতে.... **(বৃষ্টি চাই/*জঙ্গল বিষাদে আছে*)**।

এইসব পদ্যাংশ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় কিভাবে জঙ্গল ও পাহাড় শক্তির রক্তের গভীরে আসক্তি ও মত্ততার শিহরণ তুলেছিলো। নাগরিক জীবনের সহজ গতানুগতিক পারিপাট্যের

ঘেরাটোপ থেকে অবিরাম তিনি সন্ধান করেছেন আরণ্যক রহস্যের শিহরণ। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে শহুরে শৌখিন পর্যটকের জঙ্গলবিলাসের ইতিবৃত্ত নেই ; আছে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যবিমুখ অরণ্যমদির রোমান্টিক ব্যক্তিসত্তার আকুলতা ও অনুভব। অরণ্যের সঙ্গে এমন নিবিড়, আবেগঘন, ইন্দ্রিয়ময় সংসর্গ শক্তির সমকাল বা উত্তরকালের অপর কোনো কবির কবিতায় পাওয়া যায় না।

সমকাল-সমাজ-রাজনীতি-মানুষের মুখ

মানুষ বড়ো কাঁদছে

বহড়ু থেকে দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ কলকাতা শহরে চলে আসার পর, পঞ্চাশের দশকে, বিশেষত প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায়, সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতিতে সাময়িকভাবে জড়িয়ে পড়লেও কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিলো ১৯৫৮-তে, কবি হিসেবে তাঁর কিংবদন্তি-প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই। তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন 'অসামাজিক' এবং তাঁর নিজের কথাতেই 'সমাজ নামক বিশ্বমানবকল্যাণের ধর্ম' তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভব ছিল না।[৩৯] ষাট দশক থেকে ক্রমে শক্তি পরিণত হয়েছিলেন বাংলা কবিতার এক বিতর্কিত প্রবাদপুরুষে এবং 'কৃত্তিবাস' ও 'হাংরি' আন্দোলনের মতো প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার পর্যায় পেরিয়ে কর্মসূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন সংবাদ ও সাহিত্যের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ বা কর্মসূচী, সমাজ পরিবর্তনের কোনো বিপ্লবী অভীপ্সা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোনো সোচ্চার অঙ্গীকার ইত্যাদি শক্তির কবিতায় নেই যা দিয়ে প্রথাগতভাবে তাঁকে 'সমাজসচেতন' বা 'দায়বদ্ধ' কবি রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মার্কসবাদ তথা দেশ-বিদেশের নানা বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার তেমন উল্লেখও শক্তির কবিতায় নজরে পড়ে না। বরং রাজনীতির নামে মানুষকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করার যে অপচেষ্টা, রাজনীতির নামে যে কাপট্য ও স্বার্থসিদ্ধি, তাকে বারবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ ও ঘৃণায় উন্মোচিত করতে চেয়েছেন শক্তি। এমনকি প্রতিষ্ঠানের শরিক হয়েও প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছেন, কারণ প্রতিষ্ঠান মানুষ এবং অবশ্যই কবির স্বাধীনতাকে খর্ব করে। প্রচলিত রাজনীতি ও তার স্লোগানসর্বস্বতার প্রতি শক্তি বারবার ব্যক্ত করেছেন তাঁর সংশয়, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ; প্রায়শই শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি আর রঙ্গ -পরিহাসের তীর ছুঁড়ে। এক বেপরোয়া, উৎকেন্দ্রিক ও ছাপোষা গৃহপালিত মধ্যবিত্তের ব্যাকরণ-ভণ্ডুল-করা-জীবনে ভেসে যেতে যেতে শক্তি মানুষের জন্যে বোধ করেছেন মমতা ও আততি; রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভ্রষ্টাচারকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন ব্যঙ্গ-কৌতুকে। প্রথাসিদ্ধ অর্থে তাঁকে 'সমাজসচেতন' অথবা 'দায়বদ্ধ' যদি নাও বলা যায় তবু শক্তির কবিতায় সমকাল, রাজনীতি, সমাজ ও মানুষের মুখ যেভাবে বিম্বিত হয়েছে তার যথাযথ সমীক্ষা বিশেষ জরুরি।

একথা হয়তো ঠিক যে তথাকথিত রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে শক্তির এক ধরনের 'সিনিসিজ্‌ম্' ছিলো। ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিপ্রতিভাকে অকপটে স্বীকার করে নিয়েও লিখেছিলেন যে 'কিছু কিছু জায়গায় আমার বিবেচনায় অমিতাভর কবিতা খানিকটা স্লোগানধর্মী হয়ে যায়। সেটা এতখানি রাজনীতির সাথে মাখামাখি না থাকলে হতো না। ওর কবিতার আরও বেশি উপকার হতো। কবিতা আরও পরিপূর্ণ হতো।'[৪০] এরও অনেক আগে

'কবিতার প্রতি সমীহ' নামক একটি রচনায় শক্তি লিখেছিলেন 'কবিতার কোনো বাস্তবিক উদ্দেশ্য নাই। কবিতা কবিগণের কাছে একপ্রকার নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার। কবিতা ঘোরতর অসামাজিক। অবশিষ্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজসেবা।'[৪১] কবিতাকে সামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহারের স্পষ্ট বিরোধী ছিলেন শক্তি। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে অমিতাভ দাশগুপ্ত পর্যন্ত অনেক অগ্রণী কবির বিপ্লবী ও প্রতিবাদী আবেগমথিত পথে কবিতাকে হাতিয়ার করতে চান নি শক্তি, বরং আর্ত ও বিপন্ন বোধ করেছেন মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি-যন্ত্রণায়, অস্ত্রের গৌরবহীন একাকিত্বে। 'মানুষ' শব্দটি বারবার এসেছে তাঁর কবিতায় কিন্তু শক্তি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বা শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখেন নি। রাজনীতিতে অশ্রদ্ধা এত স্থায়ী ও প্রবল ছিল যে পীড়িত ও অসহায় মানুষদের উত্তরণের কোনো সরলীকৃত দিক্‌নির্দেশও শক্তির রচনায় দেখি না। সম্ভবত এই কারণেই শক্তির কবিতায় দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ টি উঠলেই পাঠক-সমালোচকেরা সন্দেহের তর্জনী তোলেন। বলা যেতে পারে যে, অনেকটা কবি কীট্‌সের মতো কবিতায় কোনো 'প্রত্যক্ষ অভিসন্ধি' বা 'palpable design শক্তির মনঃপূত ছিলো না।

শক্তির কবিতায় সমকাল, সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের মুখ নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে বিশদ আলোচনায় প্রবিষ্ট হবার আগে আলোচ্য বিষয়ে কবির বন্ধু সমীর সেনগুপ্তর একটি অভিমত উল্লেখ করতে চাই। তাঁর 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' সঙ্কলনের 'ভূমিকা'য় শ্রীসেনগুপ্ত লিখেছেন : 'প্রথাসিদ্ধ সমালোচক শক্তির কবিতায় সহজেই কয়েকটি দোষ আবিষ্কার করবেন—সাম্প্রতিকতার অভাব, স্পর্শসহ বক্তব্যের অভাব, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের (অথবা তার অভাবজনিত যন্ত্রণাবোধের) অভাব। সমগ্র কাব্য পড়ে উঠেও বোঝা যায় না এই কবি কোন দেশে কোন কালে কবিকর্মে ব্যাপৃত।.... তাঁর কবিতা পাঠককে কোনো সামাজিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে না, মুক্তি দেয় না কোনো সমষ্টিগত আবেগকে। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মহত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাছে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই।'[৪২] 'প্রথাসিদ্ধ সমালোচক'-এর সঙ্কীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বিচারের ফলেই শক্তির কবিতায় এই 'দোষ' গুলি ধরা পড়ে, এরকমই যদি শ্রী সেনগুপ্ত মনে করতেন তাহলে বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু কবিবন্ধু স্বয়ং এ জাতীয় সমালোচনাকে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় যখন তিনি মন্তব্য করেন—'দেশকাল, বক্তব্য, মূল্যবোধ—এইসব স্পর্শসহ বিষয় বর্জিত হওয়াতে শক্তির কবিতার কান্তি বড় আশুক্লান্ত, বড় বেশি কমনীয়, প্রায় স্পর্শের অতীত হয়ে ওঠে কখনো-কখনো—যা বিশেষভাবে তাঁর যুগের, অবক্ষয়িত সৌন্দর্যের চরিত্রলক্ষণ। প্রিরাফায়েলাইটদের মতো, দিবাস্বপ্নে লীন ফন্‌-এর মতো আপনাতে আপনি মগ্ন ; যেন বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল, সর্বশক্তিমান, বন্ধুতাহীন, নীতিজ্ঞানহীন, সর্বাত্মক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে না-পেরে নিজের অন্তরতিমিরে ডুব দেবার চেষ্টা।'[৪৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় কমনীয়তা আছে ; আত্মমগ্নতাও প্রথমাবধি তাঁর কবিতার অন্যতম লক্ষণ। তবু, তিনি কেবল 'দিবাস্বপ্নে লীন', দেশকাল তাঁর কবিতায় বিম্বিত হয় না, সময় ও সমাজের গ্লানি, বৈকল্য, বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে তিনি কেবল ডুব দেন 'নিজের অন্তর তিমিরে', 'তাঁর যুগের, অবক্ষয়িত সৌন্দর্যে'র কেলাসনে—এমন সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিরূপণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৯৫—এই চার দশক ধরে অবিরল ও স্বচ্ছন্দ লেখনীচারণায় যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন সমকালীন বাংলা কবিতার সর্বাপেক্ষা

বর্ণময় ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, জীবনবাসনা ও মৃত্যুবোধের যুগপৎ উৎসার ও বিমিশ্রণ, প্রেম-প্রকৃতি-আত্মজীবন যাঁর কবিতাকে দিয়েছিলো ঈর্ষণীয় গভীরতা ও বিস্তার, তাঁকে কেবল 'প্রিরাফায়েলাইটদের' মতো আত্মমগ্ন, কলাকৈবল্যবাদী বলে ভাবা হলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় না।

সমসময় তথা সাম্প্রতিকতা, দেশকাল, সমাজজীবন ও সাধারণভাবে মানুষ সম্পর্কে স্পর্শসহ বিষয়ের অভাব যে শক্তির কবিতাতে নেই, সমাজ-সময়-জীবনমনস্কতার প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ অজস্র নিদর্শন যে তাঁর কবিতাতে ছড়িয়ে আছে, এবার আমরা সেই সমীক্ষণের পথে অগ্রসর হবো। শক্তির অগ্রন্থিত কবিতাগুলির অন্যতম, ১৯৬২-তে লেখা **সীমান্ত প্রস্তাব : মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন**[৪৪] দিয়ে এ অনুসন্ধান পর্ব শুরু করা যাক। মানুষের জন্যে ভালোবাসা, দেশ আর গোটা পৃথিবীর বিধ্বংসী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়ে আছে সমসময় ও জীবন নিয়ে নির্মীয়মান কোনো এক তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্যের মতো করে লেখা এ কবিতার আপাত-অসংলগ্নতার ভেতরে। ভারত সীমান্তে চীনের যুদ্ধ, হিংসা-মেগাটোন-ধর্মহীনতার লাল ঝাণ্ডা, কেনেডি ও ক্রুশ্চভের বিয়ে দেওয়ার উদ্ভট কৌতুককর প্রস্তাব, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ক্ষুধার্ত কবিদের সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ—এ সব কিছুর মধ্যে এক হৃদয়বিদারক, বাষ্পাকুল 'ক্লোজ আপ' হয়ে আমাদের নাড়িয়ে যায় একটি ভিখারি ছেলের ভাতের জন্যে ভালোবাসা—'একটি ভিখারি ছেলে ভালোবেসে দেখেছিল ভাত আর পরখ করেছিল/ জ্যোৎস্নায় ছড়ানো ধানগাছগুলি ধানের গোড়ায় স্তব্ধ জল ভরা/মাখনের মতো/মাটির সাবলীলতার চিকন-ফাঁপানো ধান, ধানগুলি ভাত হতে পারে?' মানুষের জীবন ও সভ্যতা-বিনাশী যুদ্ধের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই কবিতায় শক্তির কণ্ঠস্বর বেজেছিলো ব্যাকুল প্রার্থনায়—'যে কোনো প্রকারে যুদ্ধ বন্ধ করো/প্রাকৃতিক মৃত্যুগুলি মরতে দাও/আমাদের পরিচিত মৃত্যুতেই আমাদের মরতে যেতে দাও।' একই বছরে লেখা আর একটি কবিতা **ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা**-য়[৪৫] বিপন্ন ও বিপর্যস্ত স্বদেশ ও মানুষের প্রতি বেদনা, যুদ্ধ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে ধিক্কারময় আবেগ উৎসারিত হয়েছে—'ঈগলের অতি ক্রুর পাখার ভিতরে আমি দেখেছি স্বদেশ..../মানুষের মতো দুঃখ দিতে আর পারে না কেহই—/নিষ্ঠুরতা জানে বটে মানুষেই, তাই যুদ্ধ করে।..../যুদ্ধ যদি না ঘটিত সৃষ্টি থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের, তাহলে স্বর্গের/ চেয়ে সভ্য উচ্চতর/ কোনো দেশে আমরা নিতাম স্থান/....ওদের ক্রন্দন থেকে ভেসে আসে ভাষাময় বিপদের অসুখের ধোঁয়াগুলি/ওদের ক্রন্দন থেকে টের পাওয়া যায় মানুষের ঝলসানো গন্ধগুলি, বারুদ-পীড়িত।' এই সময়ের অন্যান্য রচনায় শক্তি তুলে ধরেছেন কলকাতা মহানগরের ক্ষুৎপীড়িত বাসনা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শূন্যতার ছবি :

(১) ওদেরও প্রিয়তা আছে, প্রেম আছে, লিঙ্গদাহ আছে/বুভুক্ষা ওদের গ্রাস করে এঁটোকাঁটা ডাস্টবিন/দেহ থেকে দেহাতীত খোঁজে না বলেই ওরা সন্তোষপ্রধান/গাড়ি বারান্দার তলে ঘুমাতেছে, মশা তাড়াতেছে/পাছায় চাপড় মেরে ওর নারী/বিয়োতেছে ছেলে.... ।[৪৬]
(বাটার বল)

(২) অন্ধকার হতে থাকে কলকাতা ও মহাকাশজয়ী সোবিয়েতময় ভাগ্য/কম্যুনিস্ট আলো আর বাঁচাতে পারবে না পৃথিবীর জীবন্মৃত নারীকে/রাসেলের ধ্যান ঐকান্তিক বিষ ও কীটের প্রেরণে বিরুদ্ধতাকে বলে/নোয়া, নোয়াহীন প্লাবন এবার।[৪৭] **(পৃথিবীর শেষদিনে)**

(৩) চোরাইচালান হয় বড়বাজারে—কেনে মাড়োয়ারি/পুণ্য পাবে বলে দেয় পায়রায়, পিঁপড়েয়, ষাঁড়ের ধ্বজে/বিদেশে চালান দেয়/বিপদসূচক খুলি এঁকে দেয় "সাবধান, সাবধান" (ঐ)।

এইসব পংক্তির আড়ালে হয়তো বা কাজ করেছে *সাতটি তারার তিমির* ও *বেলা অবেলা কালবেলা*-র বিপন্নচিত্ত জীবনানন্দের প্রভাব, হয়তো শক্তি প্ররোচিত হয়েছেন গিন্‌স্‌বার্গ ও 'হাংরি'-র উদ্দামতায়। তবু একথা তো বলা যাবে না যে দেশকাল ও মানুষের জীবন সম্পর্কে স্পর্শসহ বিষয়ের অভাব রয়েছে শক্তির কবিতায়।

কোনো বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতাদর্শের প্রতি প্রত্যক্ষ পক্ষপাতে শক্তি কবিতা লেখেন নি। আপন অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি দিতে চেয়েছেন, কবিতাকে কোনো উদ্দেশ্যের অনুগত না করে। প্রতীক ও চিত্রকল্পের উদ্ভটত্বে ও রূপরীতির খেয়ালিপনায় এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যার সর্বতোগ্রাহ্য সারমর্ম নিষ্কাশন করা কঠিন। তবু সেইসব কবিতার ভাষা ও রূপের রহস্যময়তার অন্তরালে দেশকাল ও জীবন যে উঁকি দিয়ে যায় নি এমন নয়। ধরা যাক্ *সোনার মাছি খুন করেছি* (১৯৬৭) কাব্যের **সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়** কবিতাটি: "পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ, ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে/বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক/আর কিছু নয়.....'হ্যাণ্ডস্ আপ'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তোমাকে তুলে নিয়ে যায়/কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি/সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান—ওলোটপালোট কঙ্কাল/কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু.....।" এ কবিতা কি শুধুই জনৈক মদ্যপায়ীর টলোমলো শিথিল পায়ে মাঝরাতে বাড়ি ফেরার সময় অসংলগ্ন কথা বলা? একই শব্দ ও শব্দাবলী, লাইন বা লাইনের অংশ বারবার ব্যবহার করে এক অদ্ভুত প্রতীকী রীতিতে যে কবিতা শক্তি লিখেছেন তাতে কি সমসময় ও জীবনের বিকার, বিপর্যয়, উদ্ভটত্ব, সন্ত্রাসের টুকরো ছবি বা চিত্রাভাস প্রক্ষিপ্ত হয়নি? ১৯৬৭ বা তার সন্নিহিত স্থান-কাল তো বাস্তবিকই সুখ ও আনন্দের সময় ছিলো না।

ষাট দশকের শেষ থেকে প্রায় গোটা সত্তর দশক ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার এক আগ্নেয় সময়পর্ব। এই সময়পর্বে প্রকাশিত শক্তির কাব্যগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক পর্যালোচনায় তাই আলোচ্য সমীক্ষাটি সারবান হবে মনে হয়। ১৯৭১-এ প্রকাশিত **পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি**-র গ্রন্থনামেই এক শান্ত ও নমনীয় প্রত্যাশার মায়াময়তা জড়ানো। সহজ সরল মানুষজন ও আপাত-তুচ্ছ জিনিসপত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তার আদলে এ কাব্যের কায়া নির্মিত। তবু এখানেও উদাসী পথিকের স্বগত-মন্তব্যে সময়ের সংশয় ও অবিশ্বাস ছায়া ফেলে যায়— 'সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল একের পর এক বিছিয়ে/...বহু দূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি' (**একবার তুমি**)। পূর্বে উদ্ধৃত কবিতার পুলিশের 'কালো গাড়ি'র মতোই পুলিশ ও তার গোয়েন্দা-কুকুরদের কথা এসে পড়ে আচমকা—'আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করছিলাম পুলিশের মতো/আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য লাকি-মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার' (**আমরা সকলেই**)। সঙ্কট ও সর্বনাশ অনিবার্য বলে মনে হয়—'আমরা

■ শক্তি-৬

সকলেই এখানে বাঘের জিহ্বা এড়িয়ে গিয়ে, ওখানের বাঘের জিহ্বার দিকে চলে গেলাম' (ঐ)। গুপ্তঘাতকের জিঘাংসার স্বীকারোক্তি মুদ্রিত হয়ে থাকে— 'অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো/আমরা পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই/মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ/হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে' (**পরশুরাম**)।

একেবারে প্রথম যৌবনে সক্রিয় রাজনীতিতে অভিষেক হলেও, স্বল্পকালের মধ্যেই রাজনৈতিক স্বপ্ন ও শৃঙ্খলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন শক্তি। রাজনৈতিক সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল, নেতাদের ভোটভিক্ষা আর কর্মীদের লড়াই, এ সব কিছুই তাঁর মনে হয়েছিলো তামাশা ও অপচয়। 'স্বাধীনতা', 'মুক্তি' ইত্যাদি শব্দগুলোকে আরও অনেক গভীর ও মানবিক তাৎপর্যে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। **প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই** (১৯৭২)-এর বেশ কয়েকটি কবিতায় রাজনীতি সম্পর্কে শক্তির অনীহা, অনাস্থা ও বেদনা সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে :

(১) স্থবিরতা ঢের ভালো, বিকল্পে চাঞ্চল্য গুপ্তপথ/খোঁড়ে আর তাড়া করে, এমন কি, প্রান্তর মূষিকে—/শিশুকেও মাতৃক্রোড়ে হত্যা করে বাধ্য রাজনীতি।/এও কি মানুষে করে? যে-মানুষ বসেছে হৃদয়ে! (**তীক্ষ্ণ তরবারি**)

(২) অনেক কথা বলবো বলে উঠেছিলাম মঞ্চে যখন/মিটিং হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে—লম্বা ঘড়ি/গা ঘষছে গোল ঘড়ির সঙ্গে—দুই নাবালক/বলছে, ভারি যন্ত্রণা পাই—যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর? ফুটবলে ফাঁক? হাঁটুর ব্যথা? (**কিসের জন্য**)

(৩) কোথায় যেন যাবার কথা আজকে ছিলো ভোরে/কিয়ৎ দাবি-দাওয়ার কলস ছিলোই তো কোমরে/এবং মুঠি রক্তঝুঁটির হাতগুলো সব নাড়ায়/হারায় ওরা হারায়, ওরা এমনি করে হারায়... (**ওরা**)।

একথা ঠিক যে ষাটের শেষ ও সত্তরের শুরুতে কলকাতা ও শহরতলী তথা গোটা পশ্চিমবাংলা যখন আন্দোলিত হয়েছে নকশালবাড়ির 'বসন্ত-নির্ঘোষে', রক্তপাত, সন্ত্রাস ও আগ্নেয় আবেগে যখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যাবতীয় প্রাত্যহিকতা, তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সেই দিনগুলির ডাকে সেভাবে সাড়া দেন নি। রাজনীতি বিষয়ে ঘোর অশ্রদ্ধা ছাড়াও মদ্য ও পদ্যের এক স্বেচ্ছাকারী অতিরেক এর কারণ বলে মনে হয়। আর তাছাড়া কবিতাকে রাজনৈতিক ভাবনা ও ক্রিয়াকর্মের সোচ্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় শুরু থেকেই অনিচ্ছুক ছিলেন শক্তি।

কিন্তু কোন এক দুঃসময়ে মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি, জীবনের তাপ-শৈত্য সম্পর্কে শক্তি উদাসীন থেকেছেন এমন বলা যাবে না। চারদিকের ভাঙচুরের মধ্যে খুঁজেছেন পুরনো মুখ, ওপরের আবরণ সরিয়ে অকৃত্রিম মানুষের মুখ—'স্টেশন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে মানুষের মুখের ধুলো/ফুঁ দিয়ে, উড়িয়ে দেখছি তুমি কিনা' (**দুঃসময়ে, দূরে**)। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব-নির্দেশিত মুক্তি নয়, জীবন নামক 'মায়াবী ছেলেখেলায়' এক দার্শনিক রাহসিক মুক্তির কথা বলেছেন—'সমস্ত সম্পর্ক থেকে মানুষের মুক্তি হবে ব'লে/আমি এতোকাল ধরে বসে আছি, দৈবাৎ কখনো/উঠে যাই, দেখে আসি, কোথাও প্রকৃত কোনও খেলা/হয় নাকি? মানুষের মুক্তি নিয়ে, সার্থকতা নিয়ে?' (**উঠে যাই, দেখে আসি**)। 'অন্ধের সমস্ত মন যেমন চাক্ষুষ' তেমনভাবেই শক্তি 'নিমগ্ন, বন্দী, মুক্তিভরপুর এই দেশে' ; দুঃখ, কান্না, ক্রমবর্ধমান ভেদাভেদ সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস 'মানুষের তাঁত এখনো নিষ্পন্ন প্রেমে' এবং সে কারণে অন্ধ 'শূন্য থেকে শুরু করে একদিন

সমগ্রে পৌঁছায়' (**অন্ধ শুধু**)। মানুষের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা আছে বলেই তার নিছক বেঁচে থাকা শক্তির কবিতায় এক আর্ত ঔদাস্যের জন্ম দেয়—'মানুষও তেমন,/মানুষের আর কোনো বিশিষ্ট কর্তব্য নেই/নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ব্যতীত বা পরোক্ষে মরণ!' (**পরোক্ষে**)। নীতি-নিয়মের খাঁচায় বন্দী মানুষের কথা ভেবে শঙ্কা হয় কবির—'মানুষ কাকে বাঁচায়?/যদি এমনি ক'রে খাঁচায়/ পোরে পাখির চেয়েও খালি/নিবিড়, নরম গেরস্থালি?/আমার ভয় করে, ভয় করে/....যদি নিজেই তাকে মারি../এবং এটুকু তো পারিই, আমি ভাঙায় গড়া মানুষ' (**আমি ভাঙায় গড়া মানুষ**)। মানুষের প্রেমহীন রুগ্ন জীবন শক্তিকে এতদূর বীতশ্রদ্ধ করে যে প্রতিক্রিয়ার আতিশয্যে তাকে মানববিদ্বেষী বলে মনে হয়—'মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে/ প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তের অসুখে/ মোহ্যমান, প্রাণ নিতে পারে/নিশ্চিত কোথাও কোনও ভুল থেকে গেছে/ব্যবহারে।/মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়—/মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর' (**ভুল থেকে গেছে**)। মানুষে-মানুষে প্রেম ও প্রীতির বন্ধন শিথিল হতে দেখে কবি চান দূরে যেতে, যদি দূরত্ব ভালোবাসা ফিরে আসার সহায়ক হয় এই প্রত্যাশায়—'মানুষের মধ্যে থেকে মানুষের কাছাকাছি থেকে/একটি সম্ভাব্য ক্ষতি হয়ে গেছে যখন আমার—/মনে হয়, আর তার কাছে থাকা নিরর্থক হবে/হয়তো বা দূরে গেলে তাকে ভালোবাসাও সম্ভব/একদিন....'(**তীক্ষ্ণ তরবারি**)। এইসব পংক্তিতে এক আর্ত অভিমান আছে, প্রকৃত বিদ্বেষ কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির তুলনায় *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* সঙ্কলনে 'মানুষ' ও মানুষ-সম্পর্কিত নানা অভিজ্ঞতা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই সমস্ত পৌনঃপুনিক উল্লেখ যেন একটি মানসিক অবস্থানভূমি নির্দেশ করছে। *সোনার মাছি খুন করেছি*-র **অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ** কবিতায় যদিও শক্তি মানুষের কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন—'মানুষের কাছে যেতে হলে কোন্ ইস্টিশানে নেমে/ যেতে হবে/সঠিক জানা নেই আমার', তবু, সেখানে কবি ও তাঁর বিষয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিলো। *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*-এর **উঠে যাই, দেখে আসি, পরোক্ষে, আমি ভাঙায় গড়া মানুষ, ভুল থেকে গেছে, তীক্ষ্ণ তরবারি** প্রভৃতি কবিতায় সেই দূরত্ব অপসৃত হয়ে কবি মনন ও অনুভবের এক দার্শনিকতায় উপনীত হচ্ছেন যেখানে 'তাঁর কবিতা সহজ লাবণ্যে মণ্ডিত হলেও, মহৎ কবিতার অস্বস্তি জড়ানো।'[৪৮]

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই, এই শিরোনামে এক পীড়িত সত্তার যন্ত্রণাবোধ ও আন্তরিক অনুনয় বাজে। সন্দেহ-সংশয়, ক্ষোভ-রক্তমোক্ষণ-বেদনার মধ্যে দিয়ে অনুভবের স্তর স্তরান্তরে কবি চলেন ক্লেদ ও পবিত্রতাকে এক পাপ-পুণ্যহীন আলিঙ্গনে জড়িয়ে। অনুভবের নেশায় তাঁর আপাত-অসংলগ্ন পায়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে সমসময় ও জীবনের অস্থিরতা, সময়ের বৈকল্য, নাগরিক জীবনের অপচয়বোধ পাঠককে স্পৃষ্ট করে :

১। সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই/আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি/গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন/রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই/কিসের জন্য নিজে জনি না! (**কিসের জন্য**)

২। কাটে দিন, দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ, ন্যায়নিষ্ঠ দেশে—
কুকুর-কেত্তনে ভাগ্যি আড়ে ঠেকা দেয় রায়বেশে। (**কাটে দিন, দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ**)

৩। হয়েছি আজ ইঁদুর বিদুর স্বভাবে-অভ্যাসে/পোড়ামাটি নীতির আঘাত সোনার বরণ দেশে.... (**অনেকগুলো দিন কেটেছে**)।

৪। কলকাতায় পথ আছে, সে-পথে পথিক শুধু কবি/বারমাস্যা গুণে গেঁথে খোঁপা-খোলা তুমুল ভৈরবী/নিয়ে সে-পথের মধ্যে উদাসীন গর্ত দ্রুত খুঁড়ে/ফুটো-ফাটা বাল্য দিয়ে ইজেরের প্রান্ত দুটি জুড়ে/ঢেকে রাখে, কাউকে বলে না কিছু, প্রকৃত তন্ময়/হয়ে দ্যাখে রাজ্যজোড়া যৌনতার দীর্ঘ অপচয়। (**কলকাতা কলকাতা**)

শক্তির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *সুখে আছি* (১৯৭৪)-র গ্রন্থনামে পরিহাস বা আয়রনির দ্যোতনা রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধ আর দেশে-বিদেশে রক্তপাত ও ধ্বংসের সময়প্রেক্ষিতে লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলিতে কবির সুখে না থাকার লক্ষণগুলি স্পষ্ট। সময় ও সমকাল, একাকিত্ব ও দ্বিধাবিভক্ত মানুষের বিপন্নতা, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ, মানুষের বিপর্যস্ত, ভঙ্গুর জীবনবাস্তব এইসব কবিতায় নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

'ভালা থাকাই কঠিন, যখন বেঁচে থাকাই কঠিন' (**কে সে?**)-এ জাতীয় স্পষ্ট উচ্চারণে কবির সমসময়চেতনা পাঠককে বিদ্ধ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপর্যয় কবিতায় সরাসরি জায়গা করে নেয়—'এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে/বসন্তের দিনে করে বসবাস নেপথ্য ও স্টেজ/হিন্দু ও অহিন্দু করে কোলাকুলি, হত্যা, মুষ্ট্যাঘাত!' (**এই বাংলাদেশে ওড়ে....**)। ভারত-চীন যুদ্ধের স্মৃতি ফিরে আসে এক দশক বাদে এবং কবিচিত্তে সংশয়ের দোলা লাগে এই ভেবে যে, সহৃদয় পৃথিবীতে যুদ্ধের ক্রূরতা মানুষ ডেকে আনে কেন—'অমল প্রাণের সাথে চীনাদের যুদ্ধ হয় ক্রূর!/কিন্তু তা কী করে হবে—পৃথিবী তো সহৃদয় ছিলো?' (**অবাস্তব মার্চ মাস**) এখানে লক্ষণীয় যে নিকট অতীতের একটি প্রসঙ্গ—ভারত-চীন যুদ্ধ—কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, ঘটনার প্রকৃত আবহে নয়। সময়ের বিকলতার চেতনা জন্ম দেয় এক প্রগাঢ় দার্শনিক নৈরাশ্যের—'অন্তরের ঘাম থেকে মুক্তি নেই—মুক্তি নেই কোনো/আবিল পাঁকের থেকে মুক্তি নেই বিদগ্ধ হ্রদের' (ঐ)। মানুষের হাতের অস্ত্র যা ব্যবহৃত হচ্ছিলো 'নদীর কাঁধে বাঁধের ওপর' সেই অস্ত্র কিভাবে মানুষকে খণ্ডিত, রক্তাক্ত করছে, সমসময় এবং হয়তো চিরকালেরই সেই ধ্বংসের প্রসঙ্গ শক্তিকে জীবন-সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়—'অস্ত্র নদীর কাঁধ থেকে আজ জনমানুষের গায়ে পড়ে/গোপন পিঠে এবং মিঠে মাথার ওপর ঘূর্ণিঝড়ে/যেমন ধুলো, অনেকগুলো হিংস্র পোড়ায় দৃষ্টিতে খর/মানুষ নামের জাতক জানে সব যুগে এই ভ্রান্তিমুখর/মানুষ কিছু স্বার্থে নিচু/তাই বলে কি বাঁচাই তুচ্ছ?' (**ঐ যেখানে অস্ত্র**) বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি-তাড়িত কবি শহর কলকাতার সঙ্গে কথা বলেন যেন আপন অস্তিত্বের মগ্ন উচ্চারণে : 'এই যে শহর, একলা শহর চলছে/আমাকে সেই কখন থেকে বলছে :/লক্ষ্মীছাড়া, তোর উপমা তুই/মন হয়েছে তোর ভিতরে শুই/শুস্ না শহর শুস্ না/আমার মধ্যে জ্বলছে যা, তা তুঁষ না!' (**সহজ**)।

সোনার মাছি খুন করেছি-র পর পাঁচ বছরের ব্যবধানে *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* কাব্যে 'মানুষ'-বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যে রূপান্তর দেখা গিয়েছিলো, বর্তমান সংকলনে তারই ক্রম-পরিণতি। একাকিত্ব ও স্ববিভক্তির বোধ উচ্চারিত হয়—'আমার মতন একলা মানুষ দুখান হয়ে শুই' (**আসতে পারে**)। মানুষের সংশয়-সঙ্কট-দ্বিমুখী টানের কথা তাৎক্ষণিক সামাজিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে গিয়ে পৌছোয় এক গভীর আত্মিক ভূমিতে। সে কারণে শক্তিকে নিছক সময় ও স্থানের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে সম্যক বোঝা যায় না—'পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার নিশ্বাস ঠেলে/ক্রমাগত অন্ধকার পড়ে/দূরে-কাছে জনপদ, সিংহাসন জেগে ওঠে/মানুষের হৃদয়ের

কাছে/দুই সিংহাসন নিয়ে মানুষের এই খেলা, মানুষের এই বর্ধমান/শোক আর সাধ আর সিঁড়ি ও নরম জলরেখা.../স্পষ্টত সবাই চেনে....' (**অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে**)। সঙ্কট ও দ্বন্দ্বের মধ্যেও অদম্য মৌল মানবিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়—'যদি কৃপা করো, যাই, সন্তানের মুখ দেখে আসি' (ঐ)। 'মানুষের হৃদয় অবধি' যাওয়ার সম্ভাবনা কবি অনুমোদন করেন (**স্বেচ্ছার ওদিকে**)। সমাজ ও রাজনীতির অস্থির আবর্তেও মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার কথা বলেন কিছুটা অসহায় ক্ষোভে—'আর কীভাবে, মানুষ, আমি তোমার জন্যে ভাঙবো পাথর/আর কী ভাবে, হৃদয় হবে তোমার জন্যে দুঃখে কাতর? (**আর কী ভাবে**) ভালোবাসাহীন এক দহনভূমিতে সভ্যতার অঙ্গারে পুড়তে থাকা জীবন্ত মানুষদের দেখেন কবি—'এই নীল সভ্যতার ঘরের ভিতর আজ দেয়ালের লম্প কিছু তেলচিত্র পুড়ে যেতে থাকে/মানুষেও পুড়তে থাকে, ঘরে বাইরে, সর্বত্র শ্মশান/মৃতই মানুষ নয়, অধিকাংশ অত্যন্ত জীবিত' (**এই নীল সভ্যতার**)। নগর জীবনের এই দহন থেকে অব্যাহতি পেতে যদি সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাওয়াও যায় আরণ্যক অজ্ঞাতবাসে তবু কি সেই বেপরোয়া পলায়নে কিছু পাওয়া যাবে? সেই সংশয় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ওঠে— 'গাছের ভেতর দিয়ে একদিনই পরিত্রাণ নেবো/মানুষের শহরের হাত থেকে ছুটি নেবো ঠিকই/যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো, ভ্রূক্ষেপ করবো না/এলোমেলো করে যাবো গ্রাম, বন, মানুষ, বসতি/সমস্ত, সমস্ত। কিন্তু এভাবে কি কিছু পাওয়া যাবে?' (**এখানে কবিতা পেলে.....**)

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হয়ে অমিতাভ দাশগুপ্ত পর্যন্ত বামমার্গী কবিরা প্রতিবাদী ও প্রত্যক্ষভাবেই রাজনৈতিক কবিতার যে ধারাটি গড়ে তুলেছেন সেই প্রবাহের বিপরীতেই শক্তির কবিতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণব্রত সম্পর্কে শক্তির বিরাগ এত প্রবল এবং অকুণ্ঠ যে, কোনো মতবাদ বা বিশ্বাসের 'পথে আলো জ্বেলে মানুষের ক্রমমুক্তি'র দিশা তাঁর কবিতায় নেই। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রক্তপাত ও হিংসার অঢেল উল্লেখ শক্তির কবিতার পর কবিতায় আছে, কিন্তু তাঁর ভূমিকা মূলত এক পীড়িত, ক্ষুব্ধ, সহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষকের, উত্তরণের প্রত্যয়ে আস্থাবান স্বপ্নদর্শীর নয়। যদিও বা উত্তরণের আভাস কোথাও মেলে সে উত্তরণ রাজনৈতিক আশাবাদের উষ্ণতায় প্রাণিত নয়। বর্তমান রাজনীতির প্রতি শ্লেষ-পূর্ণ ধিক্কারে, প্রায় উপহাসের সুরেই শক্তি লেখেন—'শহর গেরাম করছে কাবু হাবুলবাবুর ভোটের বাণী/উনি পরেন আঙ্গরাখা, আমার পোঁদে হোক্ না কানি!/ভালোই আছি, দিব্য আছি হাবুলবাবুর রাজত্বিরে/আমার জন্য কাঁচকলাটি, ওনার সার্বজনীন চিঁড়ে! (**আর কী ভাবে**)। পেশাদারী ওষ্ঠ-সেবায় দড় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের নির্দেশে নাচতে থাকা পুতুল-মানুষদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গে ঝল্‌সে ওঠেন— 'মিছে এবং নিছক মিছেই/রাজনৈতিক মানুষ নাচে মনুমেন্টের নীচে/সর্বঅঙ্গ ন্যাংটা ওদের মুখগুলো আধ-ঢাকা/শুধ্ ত্রিতালে সঙ্গত করছেন লবাব আল্লারাখা/.. ছিলাম ওদের নাচের দলে, সর্বস্ব ছিলাম না/এক চক্ষু খোয়াতে দিলাম, এক চক্ষু দিলাম না/আমার নেতার বেজায় কেতা, ওদের নেতার দাস্ত/দু হাতে পরনামির মতো তুলে নিচ্ছেন আস্ত—/তখন সন্দেহ কি, মস্ত ঝুঁকি জনগণের জন্যে/তিনি নিলেন, করে রোদন বাংলা জনারণ্য!' (**জনগণের জন্যে**)। দেশপ্রেম ও জনসেবার নামাবলী গায়ে দেওয়া প্রতারক নেতার ভণ্ডামির মুখোশটি শক্তি খসিয়ে দেন শাণিত বিদ্রূপে—'অল্প দুটো কথায় আমি বশ করি জনতা/আমিই আসল দেশপ্রেমিক/তোমরা সবাই নকল, ঝুটো/তাই তো পেলে না একমুঠো/দুর্বো

ঘাসের ফুলের তোড়া/.....আমি মড়ার ওপর মারি/খাঁড়ার প্রচণ্ড এক বাড়ি/তাতেই ভয় পায় জনতা/এবং লক্ষ্য থাকে ঠিক/আমিই আসল দেশপ্রেমিক' (**দুটো কথায়**)। রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের এই যুগে শক্তির এইসব শ্লেষাত্মক পংক্তি কি শুধুই জনৈক পলায়নবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির নিন্দামন্দ বলে অগ্রাহ্য করা যাবে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের দিনগুলিতে যখন 'রক্তমাখা নিউজপেপার' উড়ছিলো 'বসন্তের দিনে', শক্তি পীড়িত হয়েছেন 'মুক্তির সংশ্রবহারা এ দিনযাপনে'। শৈশব ও মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো মুক্তি আছে বলে মনে হয়নি তাঁর। ছায়া-ছলনায় সমাসীন, নিয়তি-নিষ্ক্রিয় স্বাধীনতা বিস্বাদ লেগেছে। *ঈশ্বর থাকেন জলে*-র (১৯৭৫) প্রথম কবিতা **সাম্প্রতিকী ১৯৬৬**-তে স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক ভণিতা বলে মনে হয়েছে—'সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি/বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী/বস্তা বস্তা কাঁকর দিলুম উদর রইলো আস্ত/হাত বাড়ালে টিকোনো দায় স্বাধীনতার স্বাস্থ্য।' খাদ্য-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এ কবিতায় রাষ্ট্রপ্রধানের ছবিটি ফুটে উঠেছে করুণ উপহাসে—'এক যে ছিলো রাজার প্রাসাদ হাজারটা তার দরজা/রাষ্ট্রপতি ছিলেন কবি, এখন গাঁথেন তরজা/অল্পসল্প বিদেশে যান দেশের বাজার মন্দা/খাদ্য চেয়ে করছি মাটি—শিল্প যোজনগন্ধা।' বামপন্থী তথা প্রগতিবাদী কবি-লেখকেরা যখন তাঁদের সোচ্চার বিপ্লবী আবেগের উৎসারণের পাশাপাশি নিজেদের বিযুক্ত করতে পারেন নি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সংসদীয় রাজনীতির সাড়ম্বর ভণিতা থেকে, তখন শক্তি ব্যঙ্গভরে সহজ কথাটি বলেছেন—'আলোর মধ্যে বসে দেখেছি জীবন ছত্রাখান'। একটি স্বাধীন দেশের ভেতরে এবং তার সীমান্তে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলতে থাকা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই দেখতে দেখতে শক্তি যখন মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা বলেন তখন তা প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক অর্থকে অতিক্রম করে এক গূঢ় দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির ইঙ্গিত বহন করে—'বুকের রক্ত মুখে তুললেও কবি বলে মানায় না হে/আজকে—বড়ো স্পষ্ট সকাল/বুলেট বুকে বিঁধলে তুমি যোদ্ধা হবে কিসের মোহে?/আজকে— বড়ো স্পষ্ট সকাল/ মেরেই মরো/সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বুকের মধ্যে তৈরি করো :/স্বাধীনতার জন্যে, নচেৎ কিসের লড়াই?' (**স্বাধীনতার জন্যে**)। আলোচ্য কাব্যের গ্রন্থনামে যে ঈশ্বরের কথা আছে, যিনি স্থলভূমি বা আকাশে নয়, থাকেন জলের গভীরে, তাঁকে শক্তি দেখেছেন আত্মবৎ—'ঈশ্বর কাঁদছেন একা' (**কার জন্য এসেছেন?**) এ কান্না প্রতিনিধিসভায় ভোটে জেতা রাজনীতিকের মানুষের জন্যে কুম্ভীরাশ্রুপাত নয়। রাজনীতির কারবারী ও দেশপ্রেমিকদের প্রতি চমৎকার শ্লেষে শক্তি লিখলেন—'সভায় যে কাঁদে সে সংসদে/মানুষের শুভ পণ্য বিক্রি ক'রে দেশবন্ধু সাজে/বন্যার আখুটে বালি সভ্যতাগঠনে লাগে কাজে/এই বলে যে ভাষায়,/সে কখনো ঈশ্বর দ্যাখেনি!' (ঐ)। পারিবারিক, সামাজিক ও সর্বোপরি রাজনৈতিক নানা অঙ্গীকার ও আনুগত্য রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব পরিচিতি লুপ্ত হয়ে যায়, যা কবির কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক, যদিও শক্তি সমস্যাটিকে ব্যক্ত করেন সরস পৌনঃপুনিক পংক্তিবিন্যাসে—'তোমায় আজিকে তার হতে হবে/কিছুটা বাবার প্রতি হতে হবে/ কিছুটা পত্নীর প্রতি হতে হবে/কিছুটা পাঠশালার প্রতি হতে হবে/কিছুটা কংগ্রেসের প্রতি হতে হবে/কিছুটা কম্যুনিস্টের প্রতি হতে হবে....' (**বিদায়বেলা**)। ছাপোষা সামাজিকের এই নিরুপায় অবস্থার বর্ণনায় রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ঝোঁকটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে উল্লেখ করতে ভোলেন নি শক্তি। এর পাশাপাশি সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্নে যে সব তরুণ আত্মাহুতি দিয়েছিলো রাজনৈতিক নরমেধ যজ্ঞে তাদেরই একজনের মুণ্ডহীন দেহ দেখে তাকে নিজেরই সন্তান বলে মনে করেছেন

কবি—'বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে/মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।/... কেন এই নিদারুণ হত্যা? কেন মায়াহীন ক্রোধ?'/ এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কি করেছে? কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে?/ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী।' (**রক্তের দাগ**) মনে হয় এ জাতীয় স্পষ্ট, প্রতিবাদী ও বক্তব্যমূলক রচনায় শক্তির নিজস্ব আপাত উদাসী উচ্চারণ-ভঙ্গিটি পাওয়া যাচ্ছে না। তবু এক উত্তপ্ত ও সংঘাত-ক্ষুব্ধ সময়ে তিনি যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর সমাজমনস্কতার আন্তরিক পরিচয় মেলে।

সামাজিক সংঘাত ও যন্ত্রণায় বিড়ম্বিত ও ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সহজ ভালোবাসায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা। ক্ষোভ, অভিমান, কিংবা বিতৃষ্ণায় মানুষের সমাজ থেকে যখন দূরে সরে যেতে চেয়েছেন তখনও অনীহা ও বিরাগের আড়ালে থেকেছে বেদনার স্তরগুলি, যে বেদনা মানুষের প্রতি গভীর প্রেম ও মমত্ব না থাকলে কখনো বাজে না। স্বভাব-বৈরাগ্য ও বোহেমিয়ানায় জীবন-যাপনের ফাঁকে মাঝে মাঝে শক্তি যখন তাকিয়ে দেখেছেন সামাজিক মানুষের পরিচিত গার্হস্থ্যের দিকে, তখন কিছুটা লুব্ধ হয়েছেন ; আবার পোশাকি পারিপাট্যকে ছলনা বলেও মনে হয়েছে। এ জাতীয় দোটানা থেকেই এসেছে এইসব পংক্তি—'রুপোলি সোনালি মাছ নীল মাছ জলের পিচ্ছিল/পরিচয় দিতে যদি উঠে আসে গেরস্তের ঘরে/বিজলির আলো পায়, পায় সযতন ধরা-জল/শিশুদের হাসিকান্না শুনে ভাবে মানুষের মতো/মাতা-পিতা হয়ে যদি বাঁচা যেতো ঘরে ও বাহিরে/চমৎকার পোশাকের আদিখ্যেতা দেখিয়ে সমাজে/মানুষের মতো যদি ত্বরা ও আলস্যভরা কাজে/কিছুদিন বাঁচা যেতো, ভালো হতো, ভালো কি হতো না?' (**যদি কিছুদিন**)। 'পোষাকের আদিখ্যেতা' দেখানো 'অতি-বৈতনিক' মানুষদের সুখী পারিবারিক বেষ্টনীতে শক্তি ঐ সোনালি-রুপোলি মাছের মতোই অস্বস্তি বোধ করেছেন ; তবু বিজলিবাতি, জল আর শিশুর কলরোলে মুখর গার্হস্থ্যকে নাকচ করে দিতেও পারেন নি। একদিকে সামাজিক জীবনের দায়-দায়িত্ব-শৃঙ্খলা আর অন্যদিকে এলোমেলো জল-নুড়ি-পাথরের স্বতঃস্ফূর্ত গতিবিধি, এ দুয়ের মাঝে দোদুল্যমান যে মানুষ, শক্তির কবিতায় তাকে বারবার দেখি—'ঘূর্ণিঘাটে জল এলোমেলো/অসংখ্য পাথর তারই সঙ্গে নাচে/হয়ে ওঠে জল/কিংবা টুকরো টুকরো মাছ/নুড়ি হয়ে তার বিশৃঙ্খল..../ঘোরাফেরা/এ সবই মানুষ যেন,....../সমাজশৃঙ্খলা মেনে ভালোবাসে নুড়ি ও পাথর/এমন কি গল্প নয় মাছেদের মনে?' (**মানুষের গল্প**)। রক্তপাতের নেশায় উন্মত্ত মানুষকে আততায়ী রূপে অস্ত্র হাতে অন্ধকার গলিতে যখন ওঁৎ পেতে থাকতে দেখেন শক্তি, তখনই তাঁর ভেতরের অন্য এক মানুষকে চিনিয়ে দেন, যে ভাগ্যহীন ও দুর্বল, কিন্তু যে অন্য কোনো মানুষের ধ্বংসের ধ্বজা হাতে ছোটে না—'আমিও মানুষ, হাতে কিছু নেই—করতলে রেখা/আছে হিজিবিজি ভাগ্য, উড়ে যায়, উড়ে-পুড়ে যায়/কিন্তু, তা কখনো ছুটে মানুষকে আঘাত করে না—/সে কিছু দুর্বল, কিছুটা মানুষে মায়াবাদী' (**সে কিছু দুর্বল, ভালো**)। 'কিছুটা মানুষে মায়াবাদী' বলেই তো তিনি 'ক্ষুধা' ও 'মাৎসর্য জড়ানো' রাজনীতি-লাঞ্ছিত জীবনেও বেঁচে থাকার কষ্ট স্বীকার করেন—'যেন আমি কিছু কিছু মানুষের জন্যে নয়, সকলের জন্যে বেঁচে আছি....' (**আমি সহ্য করি**)। ভালোবাসার ভাণ্ডারে টান পড়েছে, মানুষ আগের মতো সম্পন্ন নয়, বরং সতর্ক ও বিবেচক ; তবু প্রায়-রাবীন্দ্রিক প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ে শক্তি উত্তরণের পূর্বাভাস দেন—মানুষের 'নিজ মর্ত্যসীমা' চূর্ণ করার পূর্বাভাস : 'ভালোবেসে সব কিছু দিতে পারা ছিলো স্বাভাবিক/মানুষ যখন ছিলো সম্পন্ন সমুদ্রে ভাসমান.../এখন জীবন বড়ো বিবেচক, দানও কুণ্ঠাময়/তবুও মানুষই পারে একদিন

মানুষে ছাড়াতে—' (তবুও মানুষই পারে)। কোনো বিশেষ সময়বন্ধনীতে নয়, শক্তি মানুষকে নিয়ে ভেবেছেন জীবন ও অস্তিত্বের অন্তর্গত সংঘাতে, আলো-অন্ধকার, জন্ম-মৃত্যু, স্বপ্ন-বাস্তবের দোলাচলে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিমালায় মানুষ সম্পর্কিত তাঁর পর্যবেক্ষণ তাই বিশেষভাবে জীবনানন্দের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—'সমস্ত মানুষ, শুধু আসে ব'লে, যেতে চায় ফিরে।/মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূমধ্যতিমিরে/লুকোতে চেয়েছে বলে আরও দীপ্যমান হয়ে ওঠে—/আশা দেয়, ভাষা দেয়, অধিকন্তু, স্বপ্ন দেয় ঘোর' (যে যায় সে দীর্ঘ যায়)।

শক্তির নিজের কথাতেই কবিতা এক 'জলজ দর্পণ' যাতে খেলে যায় নানা তরঙ্গ, লতা-গুল্মে আকীর্ণ যার ফলক। সমসময় তাই সে দর্পণে সরল ও প্রত্যক্ষভাবে বিম্বিত না হয়ে ধরা পড়ে অজস্র ভাঙচুর ও বক্রতায়। সামাজিক জীবনের বহিরঙ্গের সোচ্চার ভাষ্য চড়া পর্দায় যত না বাজে তার থেকে অনেক বেশি কবি পুড়তে থাকেন ভেতরে, খুঁড়তে থাকেন বেদনার স্তরগুলি। কয়েকটি উদাহরণ থেকে বিষয়টির আন্দাজ পাওয়া যাবে :

(১) ইন্দ্রিয় সজাগ করে হাতুড়ির স্ববিরোধী ঘা/থেমে যা থেমে যা।/ একি সাপ?/পুণ্যের মোড়কে বন্ধ, আলস্যজড়িত অন্ধ পাপ।.... (ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র)

(২) উল্টোপাল্টা, হাতে পথ কাটে, পদতলে তালি দেয় কবন্ধ/ চোখ টিপে খায়, হাঁ করে লজ্জা, দ্বার খোলা মানে কপাট বন্ধ/এই আতঙ্ক, মানে ভালোবাসা, নীল ছিঁড়ে দিতে আকাশ টুকরো/বাক্স বিছানা অন্তরে পাতা একফালি চাঁদ পারলে উগরো/মাথার পেছনে, অর্থাৎ পায়ে সাপ-খোপ-মেশা তরুণ ছুকরি.... (ঐ)

(৩) শান্তি যেন শস্য-খড় ছেঁকে-নেওয়া ভাগ্যহত নাড়া—/উৎসব-প্রসঙ্গ শুধু শামিয়ানা সংঘর্ষ সমীপে/অখণ্ড ফুৎকার হয়ে উঠে আসে প্রাণশূন্য ছিপে.....। (ঘাসের ভিতরে ঘাস)

(৪) আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়/যেন আমি মাটি, যেন কলকাতার প্রধান সহ্যের রাস্তা, যেন আমি/ দেড়বস্তা রাক্ষুসে বাচ্চার জন্য দুধহীন মাই খুলে রেখে বসে থাকি/আর দাঁত চিবোয় চামচিকে মাংস তার..... (আমি সহ্য করি)

(৫) বৃদ্ধ, তোমার বয়সে ছারখার/বাংলাদেশের নম্র সোনার হার— (তোমাকে)।

কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়খণ্ডের ক্ষোভ ও বেদনাবিদ্ধ অনুভব শক্তির কবিতার 'জলজ দর্পণে' সময়ান্তরের কিম্বা সর্বসময়ের উচ্চারণ হয়ে বেজে ওঠে—'মাঝে মাঝে মনে হয়, কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর/ মধ্যে থেকে উঠে আসে, আজীবন যে শুয়ে রয়েছে.....শিশু/যার সামাজিক মাতা-পিতা নয় স্তম্ভিত ক্রীড়ায়/যে বোঝে সবার মধ্যে লক্ষণীয় স্থান নেই তার—/নিতে হবে, ছলে-বলে, কেড়ে ও কৌশলে/রক্তে ওচোখের জলে ভেসে যাবে গাঙ্গেয় কলকাতা/শিরার সড়ক খুলে ঢালা হবে প্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ/জ্বলবে ও জ্বালাবে তাকে এবং কলকাতা জ্বলে যাবে' (আমি সহ্য করি)। মাঝরাতে কলকাতা শাসন করা চারজন যুবকের অন্যতম এই কবি যখন নাগরিক জীবনের হিমশীতল, অসংবৃত, বাসনাতাড়িত এক নৈশচিত্র তুলে ধরেন তখন বোদলেয়ার ও এলিয়টের কবিতার মতো কোনো বিশেষ সময়খণ্ডের বাস্তবতা না হয়ে তা হয়ে ওঠে সমগ্র নাগরিক অস্তিত্বেরই চৈতন্যরূপ—'স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, ওঠে হরিধ্বনি— শেয়াল রা কাড়ে/...রাত একা বাড়ে/ওষ্ঠ্য পিপাসার মতো—এখন টুপটাপ ঝরে হিম/...কানাভাঙা ভাঁড়ে/বিপুল তাড়সে রস পান করে বিশালাক্ষী রাঁড়ি/বারুদে গরম পল্লী, শজারুর স্বপ্নে ভাসমান/এদেশের সাধারণ্য, বেতারে নিশ্চিন্ত ওঠে গান....' (এদেশে দেবে না ধরা)। অন্যত্র নিজেকে উদ্দেশ করা লেখা কবিতায়

স্পষ্ট হয়ে ওঠে রক্তপাত ও সন্ত্রাস-লাঞ্ছিত সময়ের অস্থিরতা—'.....মনে পড়ে কিংবা মনে প্রকৃত পড়ে না/কার রক্তে নদীজল বহে আনে তিক্ত বনফুল!/ স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচা নয় ; আগুন, খড়ে না/হৃদয়ে-হৃদয় জ্বালো, দারুণ সন্ত্রাসে করা ভুল—/মরো—কিন্তু, মেরে মরো এবং উদ্ধার করো ঘর/নিশ্চিত রয়েছি পাশে, আমি তোর জন্ম-সহোদর' (স্মৃতিচিত্রশালা)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তজ্জনিত বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে শক্তি লিখেছিলেন *অস্ত্রের গৌরবহীন একা* (১৯৭৫)-র কবিতাগুলি। রাজনৈতিক কাপট্য ও স্বেচ্ছাচার, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, ধর্ম ও ভাষার ছুতোয় রক্তপাত ও হিংসার বিরুদ্ধে সহজ ও আন্তরিক আবেগে লেখা এইসব রচনায় দেখি এক বেদনা-বিদ্ধ কবিকে যাঁর অনুভব ও উচ্চারণে সমকাল, স্বদেশ, ও মানুষের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। গ্রন্থনামেও রয়েছে কবির সময় ও রাজনীতিচেতনার ইঙ্গিত। শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর একটি মন্তব্যে এর সমর্থন মেলে—'শক্তির মতে ভাষা একটি অস্ত্র। বাংলাদেশে সেই অস্ত্র গৌরব হারিয়েছে।'[৪৯] বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদকে সরাসরি সম্বোধনে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন শক্তি একটি কবিতায়—'মনে পড়ে আল মাহমুদ? কিংবা মনে প্রকৃত পড়ে না/ক্ষিপ্র ও কোমল বাংলাভাষা নিয়ে সহোদর তুই/ দৌড়ে এলি—ওই অস্ত্র, ওই সুখ, স্বপ্ন ভালোবাসা/আমারও আয়ত্ত, তবু আজীবন স্বপ্নের ভিতরে/ ওষ্ঠাগত প্রাণ, হাড়, গ্রন্থি আর নিরুৎসব মেদ/এসবই দেখেছি....(শরণার্থী বাংলাভাষা, পুনর্জন্মে)। যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপ কলকাতা শহরে এক ম্লান শূন্যতার আবহে শক্তির কবিতা বিবৃতির স্পষ্টতা পায়—'আমরা স্বীকার করি পদ্মাপারে বাংলার স্বাধীন/মায়ার আকাশ, তার এলোচুল, নদী-নৌকা-নদী/আমরা স্বীকার করি সার্বভৌম সূচ্যগ্র মেদিনী/বুড়ো আংলা বাংলাদেশ মাথা তোলে রক্তে ও সবুজে...' (আমরা স্বীকার করি পদ্মাপারে....)।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের আলোড়িত সময়ে তাঁর আপন দেশের স্বাধীনতার স্মৃতি কবিকে কৈশোর-স্বপ্নের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়—'ইস্টিশান ঘেঁষে এলো স্বাধীন সজ্জিত রেলগাড়ি/একদিন, তার মানে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেলো/শুনেছি, সেদিন নাকি ভিক্ষুকেও সেজে ছিল রাজা/গিয়েছিলো বহুদূর টিকিটের আড়ম্বর বিনা/...নিতান্ত কিশোর আমি, ঘুমের ভিতরে কাছে পাই/রেশমি কাপড়, ছবি, রঙিন কাগজ, শাদা টুপি/এবং পকেট থেকে ছিপি খুলে লাগাই কাঁটায়/জড়ানো গান্ধীর ছবি—না বুঝে দারুণ ভালো লাগে (পতাকার নিম্নে, মুখ তুলে)। সেই ভালো লাগার বিস্ময়ানুভূতি ঘুচে গিয়ে এখন শুধু তিক্ততার বোধ, মনে হয় 'নিজভূমে দীর্ঘ পরবাসী' তিনি ; দেশমাতৃকাকে দেখেন উপেক্ষিতা বিষাদিনীর মূর্তিতে—'দেশ আমার, দেশ আমার, মা.../অর্থাৎ এক মুঠো ধুলো, অন্য মুঠে ছাইমাখা কেশ মুঠিভরা নুটি/এবং অনন্ত এক সহ্যের প্রতিমা....' (প্রতিক্রিয়াশীল)।

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, মাতৃভাষার গৌরবহানি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং নাগরিক জীবনের শঙ্কা ও গ্লানির পুনরাবৃত্ত উল্লেখের পাশাপাশি এ কাব্যেও বারবার ভেসে উঠেছে মানুষের মুখ। মানুষের হাতে মানুষের পীড়ন ও প্রতারণা, রাজনীতির ছল-ছুতোর আবর্তে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের নিয়তি কবিকে বিদ্ধ করেছে বারবার :

(১) আমি একা মুখোমুখি সকলেই হিংসুক মানুষ/নিজস্ব বক্রতা নিয়ে স্পর্ধা নিয়ে খুনোখুনি করে/যে-মরে আমার ভাই, অথবা তোমারও হতে পারে—/ সে তো আর বানে ভেসে আসেনি জাঙাল থেকে নীল? (বানভাসি)।

(২) মানুষের আহাম্মকি মানুষকে ভালুক নাচায়/অমন দেখেছি আমি বিবেচনাপ্রসূত মণ্ডপে/সভাস্থলে, কোথা নয়? এমন কি ময়দানের ধারে—/যেখানে বক্তৃতা চলে... **(প্রতিক্রিয়াশীল)**।

(৩) একদিন, মিছিলের ডগা-মধ্য-লেজে বসে থেকে/অনেক ঘুরেছি আমি/কলকাতা, বিপুল বাংলাদেশ..../মানুষের খুব কাছে গিয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি—/ভোলানো সহজ তাকে, তার মধ্যে স্বপ্নের করবী/তাকেও ফোটানো সোজা—শুধু তার বীজে শক্ত বিষ/এ-সম্পর্কে কোনো কথা ভালো নয়, এড়ানোই ভালো। **(ঐ)**

মানুষের কথায় বারবার এসেছে রাজনীতির প্রসঙ্গ, ময়দানের সভায় পাণ্ডাদের বাক্‌চাতুর্য, মিটিং ভেঙে যাওয়ার পর মিছিলের মুখগুলির সার সার রিক্ত প্রত্যাবর্তন, নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে বাড়ি বাড়ি ভোট ভিক্ষা, এ সবের কথাই শক্তি বলেছেন অসঙ্কোচে, কখনো অনুচ্চ আর্ত স্বরে, কখনো বা শ্লেষ-পরিহাসের হুল ফুটিয়ে। যে মোটা দাগের রাজনীতি ব্যক্তিমানুষের স্বতন্ত্র আবেগ-অনুভবকে স্বীকার করে না, তার নিজস্ব মন ও মননকে খর্ব করে আটকাতে চায় ফর্মুলার বাঁধা ছকে, যে রাজনীতি মানুষে মানুষে রচনা করে দূরত্ব, আনে হিংসা ও প্রতিহিংসা, পর্দার আড়াল থেকে মানুষকে নাচায়, সে রাজনীতির প্রতি শক্তি বিকর্ষণই বোধ করেন। আর এই বিকর্ষণ ও অনীহার কারণেই শক্তির কবিতায় সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা নেই এমন অভিযোগ ওঠে।

সমকাল ও তার রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে অনাস্থা ও নৈরাশ্য সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে মানুষ ও তার জীবনের প্রতি শক্তির ভালোবাসার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে কবিতার পর কবিতায়। মানুষে-মানুষে সংঘর্ষ এক করুণ অপচয় বলে মনে হয় তাঁর এবং তিনি ভরসা রাখেন মানুষের মানবিক বোধের জাগরণে—'মানুষের বুকে আজ সাংঘাতিক ক্রোধ.../মানুষেই পারে তবু রক্ত দিয়ে সে বুক ভরাতে/... যে মারে সে কিছুকাল বাদে গিয়ে বলে, বন্ধু ভালো?' **(প্রতিক্রিয়াশীল)**। শিশুর সারল্য ও প্রগল্‌ভতা তাঁকে আকর্ষণ করে—'মানুষের কাছাকাছি, শিশু এসে লুকোচুরি খেলে/কালি মাখে দোল খায় কী নরম সমুদ্রের কোলে' **(এখানে আকাশ এসে মুখ দ্যাখে)**। সমস্ত দুঃখ ও শূন্যতার মধ্যেও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা আর মানুষের মহত্ত্বের প্রতি প্রত্যয় জেগে থাকে— 'পৃথিবীকে মনে হয় ভালোবাসা কষ্টসাধ্য নয়/প্রধান রাস্তায় ঘোরে মানুষের উজ্জ্বল মহিমা' **(কেউ নও)**। বৃষ্টিতে গাছের পাতার ধুলো যাওয়ার মতো যদি মানুষের বহিরাবরণ ধুয়ে যেতো, তাহলে 'অন্তর হতো বহুদূর মালিন্যবর্জিত', যদিও শক্তি জানেন 'গাছেদের মানুষের দুজনের জীবনও আলাদা' **(যে -কিশোর হৃদয়ে বসেছে)**। রাজনীতির ছকবাঁধা ক্রিয়াকলাপে নয়, মানুষকে শক্তি দেখেন মৃত্যুময় জীবনের লোভ, লালসা, অস্তিত্বের নানা দহনের গভীরে এক আশ্চর্য মিস্টিক দৃষ্টিতে— 'মানুষের ভিতরে পাহাড়ে/নদীর ঘুমন্ত মুখখানি/জানি আমি, এ খবরও জানি' **(কষ্ট হয়)**।

প্রায় বয়ঃসন্ধিকালেই বামপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমের শরিক হয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। পরে দলীয় সংস্রব ত্যাগ করলেও এবং কবিতাকে প্রেম, প্রকৃতি ও নির্জন আত্মসমীক্ষণের মাধ্যম রূপে মূলত ব্যবহার করতে চাইলেও সমাজমনস্কতার প্রচ্ছন্ন রেশটি তাঁর কবিতায় থেকে গেছে, সাম্যবাদের মানবতামুখীন ভাবনাটি, মানুষের অস্তিত্বরক্ষার ন্যূনতম দাবিগুলি বারবার উচ্চারিত হয়েছে। নিরন্ন মানুষের ভাতের প্রার্থনা, নিরাশ্রয় পথশিশুদের অসহায় বেদনা, যুদ্ধ

ও দাঙ্গায় পিষ্ট মানুষের রক্তমোক্ষণের'বর্ণমালা উঠে এসেছে সত্তর দশকের অনেক কবিতায়। *জ্বলন্ত রুমাল* (১৯৭৫) কাব্যের **একটা আলপিন পেলে হতো** কবিতায় সেইরকমই এক দুঃখী মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক আক্ষেপ ও ন্যূনতম চাহিদার কথা বলা হয়েছে এইভাবে—'একটু রোদ্দুর পেলে হতো/গা-হাত-পা সেঁকার জন্যেই একটু রোদ্দুর/চাই, রুটি/কাঁহাতক ছুটি/ভোগ করি শূন্য, খালি পেটে.....'। নিতান্ত দরিদ্র এবং হয়তো বা নিরাশ্রয় মানুষের অন্নের বাসনা ও তাকে ঘিরে উদ্বেগ ধরা পড়েছে *ছিন্নবিচ্ছিন্ন* নামের একটি অণু-পদ্যে—'তুমুল বৃষ্টিতে সব পাতা ভিজে গেলো/এখনই শুকাতে হবে রোদ্দুর কোথায়? /তিজেলে চড়াতে হবে অন্ন, তা কোথায়?/মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে শুকাতেও জানে।/এই অন্ন, পাতা-পত্র, এর অন্য মানে'। এই সঙ্কলনেরই অন্য একটি কবিতায় দেখি নিরন্ন মানুষের ক্ষুৎপীড়িত বারমাস্যায় দুমুঠো অন্নের মর্মস্পর্শী প্রত্যাশার ছবি ; কালো হাঁড়িতে ফুটতে থাকা ভাতের গন্ধে ভাঙা ঘরে জ্বলে উঠছে আলো—'টালিখোলার ওপরে পড়েছে রোদ, অনেকদিন/পরে, আমাদের ঘরে ভাত ফোটানো হচ্ছে/দুটো ইঁট পেতে .../ .. কালো তিজেলে ফুটছে ভাত/জোর বরাত, আমাদের ঘরে রোদ্দুর এসেছে/ ভাতের গন্ধে পেটে ভোঁচকানি লাগে, রাগে/ গা জ্বলছে, পেটে জ্বলছে খাণ্ডব/... এই তো/ ভাত নেমেছে, কলাপাতা পুড়ে হচ্ছে কালো—/ভালোই, অনেকদিন বাদে ভালো—আসছে/তাকে ডাকি' (**তাকে ডাকি**)।

দলীয় রাজনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-নিয়ম থেকে দূরে থাকলেও মানুষের, বিশেষত দুঃখী ও অভাবী মানুষের, অস্তিত্ব সংকট থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন শক্তি, এ কথা বলা যাবে না। আগ্রাসী মানুষের উদ্যত অস্ত্রের আস্ফালনে অন্য মানুষের সভয়ে আত্মগোপনের কথা বলেছেন তিনি—'... যেন সে পালাতে চায়, কিংবা চায় লুকোতে তখনি/মানুষের কাছ থেকে, তীক্ষ্মধার তরবারি থেকে' (**সমুদ্রতীরে**)। ভিখারি বালকের ঘুমঘোরে মুঠিভরা খড় ও শস্য যেন গড়ে তোলে ক্ষুন্নিবৃত্তির আশ্চর্য ফ্যানটাসি—'আলো থেকে ছিটকে আসে আলোর পালক/পয়সার বদলে নেয় ভিখিরি বালক/সর্বস্ব সর্বস্ব/ আজ পালকের ঘুমে/ পরম নিশ্চিন্ত ঐ সোনালি ভিখারি/ মুঠো মুঠো খড় আর শস্য চেপে ধরে—/সর্বস্ব সর্বস্ব' (**সর্বস্ব**)। অন্নহীনতার মতো প্রেমহীনতাও মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে শক্তিকে বার বার বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত করেছে, যেমন আলোচ্য সংকলনের নাম-কবিতার এই পংক্তিগুলিতে—'মানুষের মধ্যে থেকে ভালোবাসা শূন্য হয়ে গেলে/তাকেই পাথর বলে ছায়ারোদ ওঠে মুখোমুখি—/যেন বা সরল গাছ খোয়াই প্রান্তরে পড়ে আছে।/এই দীর্ঘ পড়ে থাকা মানুষের মৃত্যুরও অধিক' (**জ্বলন্ত রুমাল**)। সক্রিয় রাজনীতির বাঁধা সড়ক ছেড়ে গ্রাম-শহর, পাহাড়-জঙ্গলের আনাচে-কানাচে স্বভাব-পথিকের মতো ঘুরেছেন শক্তি ; স্বল্পমেয়াদী স্থিতাবস্থার বন্দীত্ব থেকে বেরোতে চেয়েছেন পথে, জীবন ও মানুষের টানে—'অনেকদিন ভেজা হয়নি বৃষ্টিজলে/ছলে বলে কৌশলে তাকে এড়িয়েই গেছি/অনেকদিন রোদ্দুরে পুড়িনি, গান জুড়িনি উচ্চস্বরে/অনেকদিন ভালোবাসার জন্য টিনের কৌটা আর/দরবেশের তাপ্পি দেওয়া ঝুলি নিয়ে মানুষের ঘরদুয়াবে যাইনি' (**পথ তোমার জন্যে**)। কর্মসূত্রে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলেও, বাংলা কবিতায় স্বয়ং এক প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হলেও, প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা বোধ করেছেন শক্তি, যার উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে—'প্রতিষ্ঠান ভাঙা মানে নিজেকে কুঠার করে তোলা/না হলে হবার নয়—রসে-বশে সম্পৃক্ত সংসার/গিলে খায় স্বাধীনতা, মুক্ত মাঠ, বাতাসের রাশি,/একদিন, আসি—ব'লে, চলে যাওয়া বাধ্যতামূলক'

(চলে গেলো)। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবন ও মানুষ বিষয়ে আলোচনায় এই প্রতিষ্ঠান-বিমুখ, সামাজিক-রাজনৈতিক কপট শৃঙ্খলা অমান্যকারী, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রামণিক কবি-স্বভাবটির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি।

অনেকগুলি টুক্‌রো কবিতার সংকলন *ছিন্নবিচ্ছিন্ন* (১৯৭৫)-র কয়েকটি রচনায় সমাজ-মনস্ক কবির ক্ষোভ ও বেদনা লেখা হয়ে আছে স্পষ্ট অক্ষরে। ভাত-না-পাওয়া মানুষদের চাপা কান্না, অন্নহীনতার যন্ত্রণার রূপরেখা ধরা পড়েছে উদ্ধৃত এই পদ্যাংশে—'কার্নিশে বেড়াল কাঁদে, মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়/ কখনো গভীর রাতে হিমঘুমে কাক কেঁদে ওঠে/ কী যেন না পেয়ে এই ছন্নছাড়া গলির ভিতরে/মানুষ সতর্ক হয়ে, অন্ধকারে ফোঁপায় সর্বদা/আগুন যথেষ্ট আছে/কাঠ আছে/কর্তব্য রয়েছে/একমুষ্টি ভাত নেই, ভাতের গন্ধও নেই কোনো' (**২৯ সংখ্যক**)। অভাবী ও ক্ষুধার্ত মানুষের অসহায় বেদনা ও খাদ্যের করুণ প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে 'ভাত' ও 'ভাতের গন্ধ' শব্দগুলি সঞ্চারিত হয় আমাদের অনুভবে। যদি এর পাশাপাশি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্মরণীয় কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যায় তাহলে কবিতায় নিরন্ন মানুষের খাদ্যের অভাব ঘোষণার বর্তমান প্রসঙ্গটি আর একটু স্পষ্টতা পাবে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর **অন্নদেবতা (মুখে যদি রক্ত ওঠে, ১৩৭১)** কবিতায় লিখেছিলেন—'অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্ম সার/অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।/সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে/ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।' উদ্ধৃত পদ্যাংশের প্রথম দুটি লাইনে 'অন্ন' শব্দটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, বিশেষত ঔপনিষদিক অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনায় যে সম্পন্নতা পেয়েছে, শক্তির কবিতায় 'ভাত' তার থেকে অনেক সহজ, প্রাত্যহিক বাস্তবের অস্তিত্বতল ছুঁয়ে থাকা আটপৌরে শব্দ। এছাড়া বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাংশের শেষ দুটি লাইনে যে ক্রোধদীপ্ত প্রত্যক্ষ বাচনভঙ্গি মানুষের অন্ন-অপহরণকারীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় ঝল্‌সে ওঠে, তেমনটা শক্তির কবিতায় দেখি না। অভাবী ও ক্ষুৎকাতর মানুষের একমুঠো ভাতের প্রত্যাশা শক্তির কবিতায় ব্যক্ত হয় আর্ত আবেগী উচ্চারণে ; ক্রোধ ও ঘৃণার প্রত্যক্ষতা, সোচ্চার অঙ্গীকারের পরিবর্তে ফুটে ওঠে অভিমানাহত বেদনার অন্তর্বহ উপলব্ধি।

সোচ্চার রাজনৈতিক আবেগ ও প্রত্যয়ের কবিতা শক্তির মেজাজ ও ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে মানানসই ছিলো না, এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় 'সাম্প্রতিকতার অভাব', 'স্পর্শসহ বক্তব্যের অভাব' কিম্বা 'মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মহত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষণীয়' বস্তুর অভাব তাঁর কাব্যে একথা যথার্থ নয়। ধরা যাক্ দুঃখ প্রসঙ্গে শক্তির নিবিড় মমত্বময় উক্তি—'দুঃখ নিবিড় একটি ফোঁটায়—দুঃখ চোখের জলে/দুঃখ থাকে ভিখারিণীর এক মুঠি সম্বলে' (**১ম পদ্যাংশ**, ***ছিন্নবিচ্ছিন্ন***)। ছেলেবেলার পরিচিত ছড়ার অবয়বে ভাতের অপেক্ষায় থাকা নিরন্ন মানুষের যন্ত্রণাকে মূর্ত করেন শক্তি আর একটি রচনাখণ্ডে—'সকাল থেকে সন্ধে অমন ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদে!/ যখন রঙিন অনেকটা লোক নির্বোধ আহ্লাদে/কিসে তোমার কষ্ট জানি, কোথায় তোমার দুঃখ—/না পেলে ভাত তাকিয়ে থাকো প্রভুর অন্তরীক্ষে।/আর কেঁদো না আর কেঁদো না ভাতের পচাই দোবো।/আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেবো (**৪৭ সংখ্যক**)। অনুরূপ ছড়ার ছন্দে, প্রচলিত শব্দ ও বাগ্‌ধারায়, স্বাধীন দেশের দরিদ্র, নিরন্ন মানুষদের খাদ্যের মর্মস্পর্শী বাসনা ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশদুটিতে :

(১) শাকের নাম শুশনি/একটি মুঠি তুঁষ নিই/উনুনজোড়া আগুন/তার পিছনে লাগুন/আগুন অনেক দামি/পাথর শুধু আমিই! (**১২ সংখ্যক**)

(২) রুটির মতন চাঁদে/আমার ভূ-তল গর্তে বসা/চক্ষু যেন বাঁধে/ওর ছেলেটা কাঁদে/এবং তার ছেলেটা কাঁদে/আমার অপরাধেই/ এবং তাহার অপরাধে। (২৩ সংখ্যক)

সত্তর দশকের রাজনীতি ও সমাজমনস্কতার আবহাওয়ায় শক্তির কবিতায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্য-পীড়িত সমকালের এইসব প্রতিচ্ছবি ও প্রতিক্রিয়া যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাতে করে তাঁকে 'প্রি-র‍্যাফায়েলাইট'দের মতো নিছক রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী বলে চিহ্নিত করা সঙ্গত হবে না।

সুন্দর এখানে একা নয় (১৯৭৬) কাব্যের কম-বেশি দশটি কবিতায় 'মানুষ' ও মানুষের সংকট ও স্বরূপের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে সময়ের ক্লৈব্য ও বিকলতা, যন্ত্রণা ও ভয় ইত্যাদির বিবৃতি ও উল্লেখ। উচ্চারিত হয়েছে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার লক্ষণযুক্ত শ্লেষাত্মক মন্তব্য, সমসময়ের সৌন্দর্যহীনতা ও নীতিহীনতার টুকরো প্রসঙ্গ। সুন্দর ও অসুন্দর মিলেমিশে জীবনের যে চিত্র এ কাব্যে পাই তাতে সমাজমনস্কতার ছাপ যথেষ্টই। *শব্দের ঝর্ণায় স্নান* শীর্ষক কবিতায় শক্তি এঁকে দেন 'স্থিরচিত্র বিংশ শতাব্দীর', এইভাবে—'তরুণ কবির রক্ত, স্মৃতি, মেধা, তছনছ সংসার/বিষের মতন বদ্ধ শব্দ আসে মুক্তস্রোত থেকে/সেখানে সে-গর্তে ওঠে শরবন, ভাসে গুঁড়ো পানা/প্রতিষ্ঠান এইভাবে শিল্পের সংস্রবে সাড়া দেয়/অর্থ দেয়—টাকাসিকি, সম্বর্ধনা, তামার ফলকে/ছেনি দেগে নাম লেখে.... এবং দেয় যা পচনের/আগুপিছু অর্ধসত্য।' বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব এ কাব্যের মর্মমূলে ; সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কবি বিযুক্ত বোধ করেন ; কিন্তু বিচ্ছিন্ন, অন্তর্মুখী অনুভবেও মানুষের প্রতি মমতা ও আকর্ষণ তাঁর কিছুমাত্র কমে না— '...কাছে নেই মানুষের পাড়া/মানুষ সকলে গেছে মন্দিরে ও মঞ্চের উপরে/কী যেন প্রার্থনা আছে, কী যেন বক্তব্য আছে তারও/পোকামাকড়ের নেই মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠান/দলমত নির্বিশেষে ওরা আছে পাগলের কাছে/ যে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো/একা....' (**শিকড়ের মতো, একা**)। অবসাদ ও শূন্যতার বোধে আচ্ছন্ন, ছড়ানো প্রস্তর খণ্ডের মতো চূর্ণিত সময়ের বিষণ্ণতায় অন্তরীণ হয়েও মানুষের কথা ভেবে, তার সঙ্গে মানসিক দূরত্ব অনুভব করে কষ্ট পান—'... ফলত আমার কোনো নির্জনতা নেই, প্রেম নেই/মানুষের কাছে কোন কাজ নেই, কর্মচারী নেই—মানুষের মধ্যে থেকে পাথরেরও মধ্যে থেকে খুব/একেকটি সন্ধ্যায় বড় কষ্ট পাই ; বিচ্ছিন্নতা পাই' (**পাথর পাথরখণ্ডগুলি**)। প্রতারক রাজনীতি ও ক্ষুধার পীড়নে কাতর মানুষের হয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বা ব্যঙ্গের কশাঘাত তেমন দৃষ্টিগোচর না হলেও নানা প্রসঙ্গে মানুষ এসেছে কবিতায় :

(১) আমার নিজস্ব কোনো জানলা নেই, হৃদয় রয়েছে/দক্ষিণ-পশ্চিমে খোলা, হাত-পা সমস্ত আছে ঠিক/হেঁটে যেতে পারি, হাতে নিতে পারি আগন্তুক হাত/মানুষেরও (জানালা)।

(২) পড়ে না দু চোখে জল, অযচ্ছল রক্ত পড়ে সুখে/পাথর গড়িয়ে পড়ে, পাথর গড়িয়ে পড়ে বুকে/সেই যা সশব্দ, বাকি স্তব্ধ ও প্রচণ্ড শব্দহীন/একপাত্র অন্ন যেন অপারগ মানুষে খাওয়াতে/মানুষ কী খাবে, কেন খাবে, তাকি মানুষই জানে? (পড়ে না)।

(৩) মানুষের কিছু কাজ বাকি থাকে, মৃত্যুর পরেও/তাকে ফিরে আসতে হয় বাসা খুঁজে মানুষের মতো/হয়তো সেলামি দিয়ে, হয়তো সেলামি দিয়ে নয়/ অটুট ব্যবস্থা দেখে, বাসট্রাম সাবলীল দেখে/তাকে ফিরে আসতে হয়, কাজের ভিতরে কাজ নিয়ে...... (কিছু কাজ)।

(৪) নদীর ভিতরে ভারি দীর্ঘ হয় চাঁদ/.... নদী বাড়ে নদী পাতে ফাঁদ/মানুষ কেবলই একা কাঁদে **(ফেরা)**।

মানুষের প্রাত্যহিক যন্ত্রণা-পীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের স্পষ্টবাক প্রত্যক্ষতা উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নেই ; আছে এক চাপা বিষণ্ণতা, শূন্যতাবোধজাত এক আর্তস্বর। মানুষকে দেখেছেন কবি সমসাময়িকতার আপাতগ্রাহ্য বাস্তবতার চাইতে বৃহত্তর স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে। তবে এর মধ্যেও কোথাও কোথাও সমসময়ের প্রক্ষিপ্ত চিহ্ন ধরা পড়ে যায়—'আমি আছি—আকাশের স্পষ্ট কথা কানে আসে আজ/সন্ন্যাসী দুপুরে মুক্ত-বিপ্লবের স্বপ্ন দ্যাখে কত এ-সময়ে **(মধ্যাহ্নের দোষে)**। একটি রচনাতে অন্ত্যমিলযুক্ত দ্বিপদী সাজিয়ে শাণিত ব্যঙ্গে বৃহত্তম গণতন্ত্র ও স্বাধীন দেশের মানুষের স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে পূর্ববর্তী কাব্যের শক্তিকে এক ঝলক পেয়ে যাই আমরা—'আকাশে হাট বিছিয়ে আছেন মজুতদারি/মেঘের সেনানিবাস এবং চৌকি, ফাঁড়ি/আমরা নিচে ভুঁই-পিরিচে একটি মুঠো/ধুলোয় শস্য চাটছি জিভে দুহাত ঠুঁটো/শরীর খুললে হাজার ছুরি লক্ষ ফলা/গর্জে উঠে বলবে কিন্তু, এমনি স্বাধীন!' **(স্বাধীন)**।

সত্তর দশকে প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলিতে দেশকাল, রাজনীতি ও মানুষের নানা বিষয় ও প্রসঙ্গ পরিক্রমায় এবার আমাদের মাইল ফলক *কবিতার তুলো ওড়ে* (১৯৭৭)। প্রথমেই উদ্ধার করতে ইচ্ছে করে দেশ ও মানুষ সম্পর্কে অপূর্ব সারল্যমণ্ডিত ও আন্তরিক এই পংক্তিগুলি—'জন্মভূমি—কথাটার মধ্যে এক আশ্চর্য মাদুর বিছানো আছে,/তাতেও শুয়ে দেখতে পারো। জ্বালাযন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে না বললেও টের পাই—/মানুষ যেমন ফুল, মানুষ তেমনি কাঁটা! ঘরের ভেতরকার আশবাবে হোঁচট খেলেও তো তাকে রাখো!/সুতরাং—' **(ফুলঝুরি, তোমার নাম)**। 'মানুষ যেমন ফুল, মানুষ তেমনি কাঁটা!' এ জাতীয় আপাত-সরল উক্তির ভেতরে যে দ্বৈতের স্বীকারোক্তি আছে তা জীবন নামক মুদ্রার দুটি পিঠ সম্পর্কে আমাদের সজাগ ও সহিষ্ণু করে তোলে। মানুষ বিষয়ক ভাবনায় এক মিস্টিক অনুভূতির টানে গূঢ়তার সংকেত ফুটে ওঠে সহজ ও মায়াময় উচ্চারণে—'এক দেশে সে মানুষ এবং অন্য দেশে পোকা/দেখতে দেখতে গাছ ভরে ফুল ফুটলো থোকায় থোকায়/ কোন করুণায়? কার করুণার টানে?/ এর মানে কী মানুষ শুধুই জানে!' **(এক দেশে সে মানুষ)**। দূর থেকে দেবতার মতো নয়, মানুষের কাছাকাছি থেকে তাকে মানুষের মতো দেখাতেই শক্তি দর্শনের সার্থকতা খুঁজে পান—'দেবতা দূরের লোক, দূরে থাকে, আমি থাকি কাছে/মানুষের কাছাকাছি, তাই আমি জেনেছি মানুষ' **(কাছে দূরে)**।

মানুষের কাছাকাছি থাকবার এই ইচ্ছায় কলকাতা শহর থেকে দূরে গ্রামে, বেলপাহাড়ির কাঠ-গুদামে সাঁওতাল কামিনের ভাত ও মাংস-রন্ধনকালীন ঘ্রাণে আলোড়িত বোধ করেন শক্তি—'কোঁড়কভাজা আর কাঠের পাব্‌ড়ার/ খুন্তিতে মাংস ঘাঁটছে সাঁওতালি কামিন, দুটো মোরগ/জবাই হলো আজ রাতে, ভাতের ধোঁয়া উঠছে, গন্ধ/ভাসছে বাতাসে, গুলিয়ে উঠছে পেট, ভাতের গন্ধ/নাকে এলেই কেমন খিদে পায়!' একই কবিতায় মাংস ও অন্নের এই সুঘ্রাণের পাশাপাশি কলকাতার পথে তিজেলে ফুটতে থাকা জঠরাগ্নি-নির্বাপক অন্ন-পথ্যের কটুগন্ধ নাকে এসে লাগে—'কলকাতার রাস্তায়/ভিখিরিরা ইঁট পেতেছে, তিজেলে সিদ্ধ হচ্ছে ভাতের সঙ্গে ছাইপাঁশ/আনাজ কোনাজ—বাজারকুড়ন্তি যা কিছু পাওয়া..... **(মাথার উপর অ্যালুমিনিয়ম চাঁদ)**। গরম ভাতের গন্ধের প্রতি এই সহজাত আকর্ষণে যেন মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভুল প্রমাণিত হতে পারে ; শক্তির কবিতায় অন্নের এই ঘ্রাণ বারবার সেই মানুষকে, তার দিনপঞ্জীকে চিহ্নিত করেছে।

এই সংকলনভুক্ত অপর কয়েকটি কবিতার উল্লেখ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। একটি রচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা পাই ; স্বপ্নের নীল আকাশকে যারা রক্তবর্ণ করে তুলেছিলো সেই সব 'খানছায়েবের চেলা'-দের পাল্টা আক্রমণে 'জ্যান্ত কবর' দেবার অঙ্গীকার আমার ঐখানে জোর জবর কবিতায় ছড়ার ছন্দে খেয়ালি ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ। কবিতা হিসেবে তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় অনুরূপ ছন্দে ও বাগ্‌ভঙ্গিতে লেখা নতুন বুড়িগঙ্গার কূলে ; নির্বাচনী রাজনীতির কাপট্য এ কবিতায় ব্যঙ্গের খর বিদ্রূপে উন্মোচিত— 'কথায় কথায় কথায়/ওরা বশ করে জনতা/এবং অস্ত্রে তাকে মারে/শুধু যখন যেমন পারে/ওরা ভোট দিয়েছে কিসে/হয়তো কাস্তে ধানের শিষে/তখন মানুষ-ভরা বনে/চলেন সিংহ-অন্বেষণে/কে না বেকায়দাতে পেলে/মারেন পরের ঘরের ছেলে/এবং মাংস খাবেন তারই/আমার রাজনৈতিক রাঁড়ি...'। তির্যক ব্যঙ্গে সমসাময়িক জীবনের শান্তিকল্যাণের ভনিতা বিদ্ধ হয়েছে 'মিথ্যে, মিথ্যে' কবিতাটিতে 'এখন শান্তি ওঁ শান্তি, দাবা জুড়ে ধানের মঞ্জরী/দোল খায় সুবাতাসে, এখন জীবনে সহচরী/একাধিক..../এখন বাংলার লোক সুখে আছে সদাসর্বক্ষণ/দাবায় চালের বস্তা ফুটো করে ইঁদুর, দুশমন!'

পরশুরামের কুঠার (১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি রচনায় এবং সেগুলির সঙ্গে দেওয়া কবির স্বরচিত গদ্যটীকাভাষ্যে সমসময়, স্বদেশ, রাজনীতি ও মানুষের মুখচ্ছবি ফুটে উঠেছে বিষণ্ণতার বর্ণমালায়। বিশেষত কবিতার সহায়ক ভাষ্যগুলিতে কবি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন স্পষ্ট গদ্য-বিবৃতিতে। মানুষের কাছে মানুষের ভালোবাসা মূল্যহীন হয়ে গেলে ধ্বংস ও মৃত্যু হয়ে ওঠে সর্বনাশা নিয়তি। রক্তস্রাবী হিংসার সময়ে দাঁড়িয়ে শক্তি সেই নিয়তির দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন—'মানুষের ভালোবাসা মানুষের কাছে ছিলো দামি/একদিন, সুস্পষ্ট গন্ধ ছিলো, তার সন্ন্যাসী গুহায়/অর্থাৎ হৃদয়ে ঘ্রাণ, মনঃপ্রাণ ভক্তের প্রণামী/নিতেও উৎসুক ছিলো, চারিদিক আত্মহত্যাকামী/আজ, কেন? কী কারণে? ..../মানুষই ছুটছে দেখি মৃত্যুর নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে/সারবদ্ধ পোকা যেন বাদলের...' (একদিন)। এই কবিতার শেষে দেওয়া টীকায় শক্তির জীবনবোধ ও সমসময়চেতনা কবিতাটির ভাবমণ্ডলখানি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে— 'শহরে-বন্দরে হত্যা আত্মহত্যা গ্রামে-গ্রামান্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। চোরাগোপ্তা এই বিচারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাদলা পোকার মতো একদল কিশোর যুবকের ঝাঁপ, ব্যবস্থার মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলো। ... মানুষকে মানুষ বলে চিনতে কষ্ট হচ্ছিলো তখন। এক ঠাণ্ডা মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল। ... পুরনো মানুষ ভালোবাসতো, বাসতে পারতো বলেই দীর্ঘদিন শোনা গেছে। মানুষ জন্তু নয়।'[৫০] বোঝা যায় যে, অস্থির সত্তর দশকের হিংসার রাজনীতি ও রাজনীতির হিংসাকে কবি মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর বলেই মনে করেছেন। সামাজিক ব্যবস্থার মূল ধরে নাড়া দিলেও বাদলা পোকার মতো রাজনৈতিক ঘূর্ণিতে ঝাঁপিয়ে পড়া কিশোর-যুবকদের মৃত্যু শক্তির কাছে এক অপচয় বলে মনে হয়েছে, মনে হয়েছে এক অন্ধ যান্ত্রিক আনুগত্যের নিদর্শন। তাঁর নিজের কথাতে— 'মানুষের এই বদলে যাওয়া—হঠাৎ কীভাবে সম্ভব হলো? ...মানুষ যেন অন্ধ যন্ত্র। ... সিঁড়ির নিচে, দরজায়, গলির মধ্যে দিনে-দুপুরে রাজনীতি ন্যাংটো খাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাধা দেবার কেউ নেই। নিজেকে নিয়ে পালাচ্ছে সবাই। মানুষ পিঁপড়ের চেয়েও তাচ্ছিল্যভরা কিছু। মনে হয় এর চেয়ে বড়ো দুঃসময় আর নেই।'[৫১] গদ্যটীকার এই বক্তব্যই সরাসরি রূপান্তরিত হয়েছে কবিতায়, সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন রচনাটিতে— 'মনে হয় মানুষের কাছাকাছি স্থির

দুঃসময়/এসে গেছে, পরিত্রাণ কোনোদিকে শিকড় মেলে না/....মানুষ পিঁপড়ের চেয়ে আজ নিচু সমাজে বসেছে/প্রচ্ছন্ন সংসার আর অন্যদিকে কীর্তিনাশা ডাক/বিপ্লবের,/প্রতিটি গৃহস্থ উপভোগ করে নিহত, ঘাতকে...' রাজনীতির সর্বনাশা খেলায় মানুষের বিনষ্টি শক্তির কাছে এতটাই উদ্বেগ ও বেদনার যে সমাজ-পরিবর্তনের বিপ্লবী কার্যক্রম তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে সময় ও মানুষকে তিনি এড়িয়ে গেছেন এমন নয়। রাজনীতির নীতিহীনতা, হিংসার জন্যেই হিংসা, মানুষের অবমূল্যায়ন ও অসহায়তা—এ সব দেখে শক্তি স্বীকারোক্তির মতো করে লিখেছেন—'মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের মধ্যে থেকে নয়—/আমি দুভাবেই তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন/জানিয়ে এসেছি—এই এতদিন, সম্পদে-বিপদে।/আজ কোনোভাবে তাকে সমর্থনযোগ্য মনে হয়/ তোমাদের কাছে? তার খেলাধূলা, গূঢ় আচরণ।/এর চেয়ে বনবাস ঢের ভালো — হিংস্রে আছে নীতি।/এখানে মানুষে শুধু মুখে বলে : নিশ্চিত সম্প্রীতি/আছে, আর আছে বলে মাঝে মধ্যে তুমুল বৈঠক/বসে দলমতধর্মনির্বিশেষ মানুষে মানুষে....' (**মানুষের মধ্যে থেকে**)। দীর্ঘদিন মানুষের ভীড়ে ও একক দূরত্বে দাঁড়িয়ে কবি যে মানুষকে পূর্ণ সমর্থন করে এসেছেন আজ সেই মানুষে কবির যেন অনাস্থা। মানুষকে এভাবে ইতর প্রাণীদের চেয়েও খারাপ জীবনে দেখতে কবির কষ্ট হয়; বিমর্ষতার সঙ্গে মিশে যায় তিক্ততা।

তাঁর স্বদেশ ও স্বকালকে শক্তি দেখেছেন আন্তরিক আবেগ ও উৎকণ্ঠায়। সমসময়ের বিফলতা ও নৈরাশ্য শুধুই তাঁকে হতাশ ও বিষণ্ণ করেছে এমন নয়। কখনো কখনো অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ও সক্রিয় তৎপরতায় শক্তি তাঁর দেশ ও কালের ব্যাধির নিরাময় খুঁজেছেন আত্মখননের গূঢ় প্রক্রিয়ায়—'অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো/আমরা পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ/হাতে নেবো টাঙি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে/ আমার নিজেরই রক্ত/প্রথম দিন ওকে আমার নিজের রক্ত খাইয়েছি/দিয়েছি রক্তের স্বাদ, করে তুলেছি হিংস্র সিংহ যেন/....তারপর পা টিপে টিপে নেমে পড়ছি রাস্তায়/ ... একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে ক্ষত্রিয় হয়ে/আমাকে তার ঘোর শত্রু করে তুলেছে' (**পরশুরাম**)। এই কবিতার গদ্য-ব্যাখ্যায় শক্তি তাঁর ভাবনার স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন—'আমাদের মধ্যে শরীরে মনে একজন ক্ষত্রিয় আর একজন ব্রাহ্মণের বসবাস। চিরদিন। দুজন একসঙ্গে জেগে নেই। ... এক জাগলে, অন্য ঘুমায়। এবং কখনো এই দুজনের জেগে থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে— শিল্পের জন্যে, সমাজের জন্যে দুজনের আবহমান যুদ্ধ বিগ্রহ। নিজের ভিতরের সেই অংশ, যে বিচার চায়—সে জেগে ঘুমোলে, তার ঘুম ভাঙানো জরুরি হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে কখনো শখনো শান্তির বিঘ্ন ঘটাতেই হয়। ...পরশুরাম সেই কাজে নেমে আসে। মানুষও নামে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিচারের নিজস্ব খাঁড়া হাতে নিয়ে। আমরা এমন ঘটনা দেখেছি। ভবিষ্যতেও দেখতে হবে। অস্ত্রকে জীবিত করতে হলে তাকে রক্তের স্বাদ, প্রয়োজনে নিজের, দিতে হবে। ... দক্ষিণ হাতের কুঠার বাম হাত কাটে। স্বাস্থ্য রাখতে গেলে এমন কাটাছেঁড়া অনিবার্য।'[৫২] সাধারণভাবে হিংসা-প্রতিহিংসা-সন্ত্রাস-রক্তপাত মনুষ্যত্বের চরম বিকার হলেও পরশুরামের কুঠারখানিকে শক্তি দেখেছেন শল্যচিকিৎসকের হাতের যন্ত্ররূপে, রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষায় যে যন্ত্রের নির্মম ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। মনুষ্যত্বের পুনর্নির্মাণে শান্তিভঙ্গ ও হিংসার প্রয়োজন আছে।

রাজনীতি ও ধর্মের হিংস্র গর্জন বরাবরই অমানবিক ও কুৎসিত বলে মনে হয়েছে শক্তির।[৫৩] রাজনৈতিক বিশ্বাসের নামে ধর্মীয় উন্মাদনার ঘোর, মানুষের গলায় রাজনীতির অন্ধ

পুরোহিতদের শ্বাসরোধকারী আঙুল দেখে তিনি লিখেছেন—'মনুমেন্টের নিচে, অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বাংলাভাষা.../হিংস্র দুটি হাত ঘোরে মানুষের কণ্ঠ পাবে বলে/অন্ধকারে, হিংসা দ্বেষ হত্যাপরায়ণ সেই হাত/একদিন ছিলো ছোটো ...' (**সেই দুটি হাত ছোটে**)। ভণ্ড রাজনীতির তমসায় সন্দিহান শক্তি প্রভেদজটিল রাজনীতির ভাষা ও ভঙ্গির আনাচে কানাচে ঘাতকের বেড়ে ওঠা হাতের ছায়া দেখেছেন।

পরশুরামের কুঠার-এ সমসময়, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে বেদনা ও ক্ষোভের এইসব উচ্চারণের পাশাপাশি মানুষ সম্পর্কে এমন কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য পাই যেগুলিতে কবির জীবনযাপন তথা জীবনবোধের চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়ে আছে ঃ

(১) এই আমি, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একজনই/যার সব ছিলো, যার সব গেছে—অকস্মাৎ নয়/ধীরে ধীরে গেছে, গেছে থেমে-থেমে, একটি একটি করে।

(হারাতে হারাতে তাকে)

(২) .... এই বৃষ্টি, মুখাপেক্ষী হাওয়া/আমাকে করেছে নষ্ট মানুষের করতলগত।

(নষ্ট মানুষ)

(৩) একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে/....মানুষের মুখশ্রীর অগোছালো শান্তি ও অগ্নির/পারম্পর্য মেনে নিয়ে, মেনে নিয়ে প্রকৃত চিন্ময়/রূপ তার, ঐ গাছ আমাদেরই মাটিতে বসেছে। **(ঐ গাছ)**

এইসব অনুভববেদ্য, মৃদুভাস উচ্চারণে শক্তিকে পাওয়া যায় তাঁর স্বাভাবিক মেজাজ ও স্বরে। কোনো বিশেষ সময়ের বিশেষ মানুষদের বাস্তবতার সীমিত চতুষ্কোণে নয়, শক্তি সকল মানুষের আবহমানতার ভেতরে তাঁর আপন ক্ষয়ক্ষতি-বিনষ্টির অনুভবকে দিতে চান এক করুণ ও উদাসী আবেগময়তা।

মানুষ বড়ো কাঁদছে (১৯৭৮) শীর্ষক কাব্যসংকলনের গ্রন্থনামে ও সংকলনভুক্ত অনেকগুলি রচনাতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট-কান্নার কথা আছে, যে মানুষ অসহায় ও একাকী, পুড়ে খাক্ কিম্বা যন্ত্রণায় পাথর। একাকিত্ব ও শূন্যতার বোধ থেকে উঠে এসেছে এইসব পংক্তি—'মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি?/একা থাকি বড়ো একা থাকি।/ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মধ্যিখানে একা/ঘরে ও বাহিরে একা .../ ছায়া নেই, মায়া নেই, ফুলের বাগানে নেই ফুল/... মেঘের সম্ভার আছে, জল নেই.../ ধান নেই, টান নেই...' (**মানুষ যেভাবে কাঁদে**)। এই পরিপূর্ণ শূন্যতার মধ্যেও মানুষ বেঁচে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত, একা এবং অনেকের ভিড়ে ; নিঃসঙ্গতা ও জীবনের নানা ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও মানুষ তার অস্তিত্বকে বিনষ্ট করতে পারে না—'তবুও মানুষ বাঁচে, মৃত্যু আছে বলে বেঁচে থাকে/মৃত্যু তো জীবন নয়, ধারাবাহিকতা নয় কোনো।/ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে/বাঁচে, বেঁচে থাকে—এই বাঁচতে হবে বলে থাকে বেঁচে ... (**ঐ**)। শূন্যতা, একাকিত্ব ও মৃত্যুর ছায়াপড়া মানুষের এই অস্তিত্ব আমাদের অবশ্যই মনে পড়িয়ে দেয় জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, *সাতটি তারার তিমির* এবং *বেলা অবেলা কালবেলা*-র অনেক কবিতা, জীবনানন্দের প্রতি ঋণ স্বীকার করে যখন আমরা মানুষকে দেখি 'বেদনার আমরা সন্তান?' এই প্রশ্নচিহ্নের আর্ত জিজ্ঞাসায়। জীবনানন্দ ছাড়া একালের আর কোনো কবির লেখায় এভাবে বারবার 'মানুষ' শব্দটির বিপন্ন, আবেগার্ত উচ্চারণ শুনেছি বলে মনে হয় না।

এ কাব্যের অন্যত্র মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাসও ব্যক্ত হয়েছে, যে মানুষ বাঁধা সড়ক ছেড়ে দুর্গম পথের ঝুঁকি নিতে পারে, যার মনের ভেতরকার আলো তাকে প্রাণিত করে সাজানো পথ ছেড়ে কাঁটাঝোপ ও ঘুরপথ বেছে নিতে— 'মানুষের ভিতরের আলো তাকে পথ থেকে ঠেলে/নামায়, যেখানে কাঁটা ঝোপঝাড় এইসব আছে/চোখে পড়া পথ নেই, আছে—যাতে বুকে হেঁটে যাওয়া/হয়তো সম্ভব। আমি দেখেওছি কেউ কেউ পারে।/সবাই পারে না। আবার সবার জন্যেও পথ নয়!' (**মানুষেও পারে**)। মানুষের প্রতি মমতায় শক্তি বৃষ্টিপাতের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন এইভাবে—'কল্যাণের মতো সুস্থ, ধুয়ে নিতে অযত্ন অসুখ/মানুষের, বৃষ্টি পড়ে, সংসার সমুদ্রে ঝরে জল' (**সারাদিন পথে**)। নিছকই বেঁচে থাকা মানুষের নির্বিকার অস্তিত্ব দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে—'... অন্ধ মানুষের কিছুতেই কিছু যাবার-আসবার নেই/ সে শুধু যা চেনে তার নাম ঐ কমোড, কেদারা, টেলিভিসটা, আর বারটনের ফ্রেম!/.... কত হলো? কতদিন হলো? এই/ বেঁচে থাকা, শুধু বেঁচে থাকা? (**এই বেঁচে থাকা**) সাজানো সংসারের নিরাপদ স্বস্তি ও আত্মসন্তুষ্টির ঘেরাটোপে থাকা নিশ্চল মানুষ ও তার 'শুধু বেঁচে থাকা' কবির মনে হয় এক জড় অস্তিত্ব। মানুষকে তিনি পাথরে পর্যবসিত হতে দেখেন, নিদর্শন হতে দেখেন জড়ত্বের—'পাথর নাকি, পাথর ও নয়, বাতির নিচে/দাঁড়িয়ে, ওকি পাথর, নাকি পাথর ও নয়/একলা মানুষ দোকলা মানুষ বাতির মতো' (**বাতি**)। মানুষের এমন নিরুত্তাপ, জড়বৎ জীবনের জন্য শক্তি দায়ী করেন সময়কে— 'আশ্চর্য সময় এই, মানুষের পশু পাখিদের মনের ঘনিষ্ঠ তাপ নেই বুঝি, শীতল বরফ/হয়ে গেছে পৃথিবীর সব ঘর, বিছানা, পাঁচিল—/আছে তাপ শয়তানের, আর আছে রক্তচক্ষু শঠ/ সে ভয় দেখায়, মারে, যদি পারে টেনে নেয় দূরে/মানুষের কাছ থেকে তার প্রিয় যা কিছু সম্পদ!' (**আশ্চর্য সময় এই**)। অরণ্যপ্রেমী কবি এই শীতল প্রস্তর-গার্হস্থ্য থেকে দূরে মুথা ঘাসের সবুজে মানুষের পরিত্রাণের কথা ভাবলেও তিনি জানেন মানুষের পক্ষে সেই গন্তব্যে পৌঁছনো কঠিন—'মিথ্যা জটিলতা আর পৃথিবীর সর্বত্র মৌলিক/বিপর্যয় ত্যাগ করে মানুষ যদিও ভাবে ঠিক/ এইখানে চলে আসা, আসা যায়?' (**এখানে**)।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাদে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় শক্তির মতো ভাত ও ভাতের গন্ধের কথা আর কেউ বলেছেন বলে মনে হয় না। বর্তমান সংকলনভুক্ত একটি রচনাতেও ভাতের একটি টুকরো ছবি পেয়ে যাই—'বরং, দু'মুঠি ভাত তিজেলের ফাঁকে—হায় সেই তো সুন্দর!' (**দু'তরফা**)। কিন্তু মানুষের ক্ষুৎকাতরতা ও অন্নহীনতার থেকেও গভীরতর এক সংকটবোধ শক্তিকে নাড়া দিয়ে যায়—'মানুষের অন্ধকার, মানুষের সব ঘরদোর/অধিকার করে নেয় আজ এই নষ্ট নক্ষত্রের/ সন্ধ্যায়..../এই অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার পথ ছিলো,/কে না জানে? গেছে কত মানুষের পূর্বপুরুষেরা/ অবাধ মৃত্যুর পথ, কিন্তু এ-জাতক বর্তমান/ ... বসে আছে ঘর ছেড়ে পথের উপরে .../ ঘর তো আঁধারে বন্ধ, বাহিরে আলোক করে খেলা' (**ঝড়**)। এইসব পংক্তিতে জীবনানন্দের বিপন্নতা-বোধ প্রতিধ্বনিত হতে শুনি আমরা। আর উদ্ধৃত পদ্যাংশের শেষে অন্ধকার ঘর ছেড়ে বাইরের আলোয় পথে এসে বসার যে কথা শক্তি বলেছেন তাতে উত্তরণের পূর্বাভাস থাকলেও সে উত্তরণ রাজনৈতিক নয়, 'মিস্টিক', সামষ্টিক নয়, ব্যক্তিক।

'মানুষ', এই অতি-পরিচিত বিশেষ্যপদটি শক্তির কবিতায় এত বিভিন্ন প্রসঙ্গে এত বারবার ব্যবহৃত হয়েছে যে সেটিকে তাঁর কাব্য-ভাবনার আলোচনায় অন্যতম 'চাবি-শব্দ' বলে মনে

করাই সঙ্গত। কোনো বিশেষ দল, মত বা শ্রেণীর চিহ্নিত অবস্থান থেকে শক্তি মানুষকে দেখেননি। নিরন্ন মানুষের ভাতের আকাঙক্ষা তাঁর কবিতায় বারবার ব্যক্ত হলেও দারিদ্র্য ও ক্ষুধার আপাতগ্রাহ্য বাস্তবতার বাইরেও মানুষের বেদনা ও বিপন্নতার যে বহুস্তর উপলব্ধি শক্তি তাকে যথাসাধ্য ছুঁতে চেয়েছেন। ফণীশ্বরনাথ রেণুর স্মৃতির উদ্দেশে লেখা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় সেই রকমই এক উপলব্ধি কল্পনার উদ্ভটত্বে ধরা পড়েছে—'পুরনো এ-দুর্গ। ব্যর্থ জীবন্মৃত কিছু লোক এখানে নিয়েছে ঠাঁই/অনিচ্ছায় নয়। এই আলো হাওয়া রোদ ছেড়ে, মানুষী সোহাগ ছেড়ে/কিছু ক্লান্ত লোক এই দুর্গে, অন্ধকারে এসে চামচিকে পেঁচার সঙ্গে/আস্তানা নিয়েছে ..../ .. কোনো/ বড়ো ভয় থেকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকবে বলে কিছু লোক .... পালিয়ে এসেছে/নদীতীরে খেলা আছে, জ্যোৎস্নায় ফাঁদ পাতা আছে/রঙ্গময় পৃথিবীর সব আছে, কাগুজে বিপ্লব আছে, সম্বর্ধনা আছে/গুণিজন মন্ত্রীদের, ত্রাণ আছে, বান আছে, চোগাচাপকান আছে ফটোর পুরুষে/যেখানে যা নেই শুধু সেই কথা জেনে ফেলেছিলো বলে এই দুর্গে কিছু লোক,/মানুষের মতো দেখতে, কিছু লোক, মানুষের মতো দেখতে নয় যারা/তাদের এড়াতে.... ' (**এই দুর্গে কিছু লোক**)। আবার এই শক্তিই হঠাৎ পথে দেখতে পেয়ে যান এমন এক অলীক মানুষকে যিনি সহজ, কিন্তু সুলভ নন—'সবাই তাঁকে দেখতে পায় না/ সবাই তাঁকে দেখতে চায় না/ কিন্তু, তিনি দেখেন—/কোথায় তোমার দুঃখ কষ্ট, কোথায় তোমার জ্বালা...' (**একটি মানুষ**)। শক্তির নজরে পড়ে আগুনে পুড়তে থাকা মানুষ, বারান্দায় গুটিয়ে থাকা শামুকের মতো মানুষ, মানুষের ব্যবহারে পাথরে পর্যবসিত মানুষ। তবু সময়ের নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনীতির প্রতারণাকে অতিক্রম করে মানুষের জন্য শক্তি উচ্চারণ করেন অঙ্গীকার ও আবেদন :

(১) আর নয়, নিভন্ত—এভাবে থাকা/ ঢেকে রাখা/ আগ্নেয় বালিতে/বিপ্লব/ এখুনি সব/ ডেকে আনো/ মূল ধরে টানো/ মানুষ, মানুষকে/ রক্তমাখা/ আর নয়... (**আর নয়**)

(২) মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও/ .. মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।/.. এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও... (**দাঁড়াও**)

মানুষের প্রতি ভালোবাসা মেশানো এক আশ্চর্য দৃষ্টিপাত শক্তির কবিতার ভুবনকে প্রায় সর্বদাই এক আর্ত মমতায় ভরিয়ে রাখে। *ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি* (১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থের **নদী** কবিতাটিতে শক্তি দেখতে পান 'শহর জুড়ে' মানুষদের পুড়তে থাকা, নিঃসঙ্গ দহন আর আত্মগোপন—'মানুষগুলো পুড়ছে কাঠের টেবিল জুড়ে/মানুষগুলো পুড়ছে কেবল একা-একা/মানুষগুলো লুকোচ্ছে মুখ গর্ত খুঁড়ে/একটি পাখি ঠিক পেয়েছে নদীর দেখা।' লক্ষণীয় যে এই পংক্তিমালার শেষ চরণটিতে নিঃসঙ্গ নাগরিক অস্তিত্বের দহনের বিপরীতে শক্তি অগ্নিনির্বাপক সলিল প্রবাহের কথা বলেছেন, বলেছেন সেই নদীটির কথা একটি পাখি যাকে ঠিক খুঁজে পায়। নির্জনতা ও নিভৃতি শক্তি বরাবরই পছন্দ করেছেন এবং একাকিত্ব মানুষের নিজেকে সম্যক দেখার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেও মনে করেছেন। নিজেকে দেখা, নিজের ভেতরেই ভাঙচুর ও খননকার্য শক্তির মানুষ-সম্পর্কিত ভাবনার একটি পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। সত্তর দশকের শেষভাগে এসে মানুষের সম্পর্কে শক্তির এই ভাবনাটি ব্যক্ত হয়েছে গূঢ় উপলব্ধির সহজ স্বীকারোক্তিমূলক ধারাভাষ্যে—'মানুষ নিজেকে দেখতে কোনো—কোনোদিন যায় দূরে/এমনি জলের কাছে, মাছরাঙাদের রঙে নয়/নিজেকে বিষণ্ন করে, ছিন্ন ক'রে নিয়ে/একাকী, প্রভুত্বময় কোনো কিছু বস্তুর ভিতরে/ঢুকে যেতে চায়, যেতে পারে ব'লে-জন্তুরা পারে না। এতো গর্তে

ঢোকা নয়, এতো নয় সন্ত্রাসে পালানো/মাটির ভিতরে মেশা, এই মেধাময় মানুষের/কিছুতেই মুক্তি নেই, মৃত্যুর শান্তিও নেই যেন আছে ভোগ, নিজেকে টুকরো করা, নষ্ট করা চাঁদের মতন/জঙ্গলে একাকী ভেসে, জলে ভেসে, পাথরেও ভেসে' (**মানুষ নিজেকে দেখতে**)। মেধাসর্বস্ব মানুষের এই পরিণতি করুণ হলেও তাতে শক্তির প্রচ্ছন্ন মমতা অনুভব করা যায়।

সত্তর দশকের শেষ বছরে প্রকাশিত *ভাত নেই, পাথর হয়েছে* (১৯৭৯) সঙ্কলনের শিরোনামে পরিহাসপূর্ণ করুণ বৈপরীত্যে ধরা পড়ে 'ভাত' ও 'পাথর' এই দুটি চাবি-শব্দ। মানুষের মাথায় যখন 'ছাত নেই', ভাত নেই 'এক হাতা', তখন শক্তি গাড়ির মাথায় লাল বাতি জ্বালিয়ে ছোটা বিশেষ মানুষের প্রতি শ্লেষমাখা বক্রোক্তি ছুঁড়ে দেন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে— 'আকাশ-পিদ্দিম গেঁথে মন্ত্রী যায় সানাই বাজাতে' (**ভাত নেই.....**)। সত্তরের অস্থির রাজনৈতিক বাস্তবতা আরও অনেক কবিতার মতো মর্মস্পর্শী ছাপ ফেলেছে **ছেলেটা** শীর্ষক একটি ছোট রচনায়—'ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে/*মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো*/অন্ধ ছেলে, বন্ধ ছেলে, *জীবন আছে জানলায়!*/পাথর কেটে পথ বানানো, তাই হয়েছে ব্যর্থ'। উদ্ধৃতির চিহ্নিত অংশগুলির দিকে তাকালেই ব্যর্থ হয়ে যাওয়া 'মুক্তির দশক'-এর ছবি ফুটে উঠবে। সন্ত্রাসতাড়িত শহরের এই ভয়ার্ত, রুদ্ধদ্বার গৃহস্থ জীবনের কি অত্যাশ্চর্য টুক্‌রোই না শক্তি উপহার দিলেন 'জীবন আছে জান্‌লায়' শব্দবন্ধে! কবিতার ঐ ছেলেটি ছিলো খুন হয়ে যাওয়া এক নকশাল-পন্থী কিশোর।

এ কাব্যেও বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'মানুষ' শব্দ টি। উচ্চারিত হয়েছে সমসময়ের রিক্ততা ও অপচয়ের ক্ষোভ ও অন্তর্বেদনা , চাতুরী, কাপট্য, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নানা ভঙ্গি ও মুখোশ:

(১) সুন্দরের দুটি শূন্য হাতে— /এখন ভ্রমর নয় কিছু পিঁপড়ে তার পচনের/আত্মীয়-বন্ধন আজ মৌমাছি ভুলেছে ফুলে বসা.....। **(গাছের নিজস্ব ফুল নয়)**

(২) রাজনীতি ভাষ্যকার নেমন্তন্ন খাবে এসে মাঝরাতে চাঁদের মতন/বলবে, গূঢ় গুহ্য তার ছলাকলা তীব্র ইন্দ্রজাল,/কালো টাকা আলো করা মেসিনের নমুনা দেখাবে।

(পোড়তে চাই)

(৩) মানুষ যখন কাঁদে, মানুষের সাধ্য কি, থামায়? **(জামা কদিনে ছেঁড়ে)**

(৪) ক্ষিপ্র পথে যায় কেউ/অধিকাংশ আলস্য-কাতর/তাই, শুয়ে-বসে মনোভঙ্গি নবাবের মতো/প্রগতি-বিমুখ/ফুৎকার এড়িয়ে শুধু বেঁচে থাকে, ভোট দিতে থাকে!

(শুধু বেঁচে থাকে)

কবিমাত্রেই তার সময় ও জীবনের ভাষ্যকার। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও সমসময় ও জীবনযাপনের ক্ষয়-ক্ষতি-ক্ষতচিহ্ন নানাভাবে ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও উত্তরণের কোনো তীব্র অভিমুখ যদি তাঁর কবিতায় নাও থাকে, তবু প্রতারিত ও পীড়িত মানুষের দেহ-মনের প্রতি মমতায় তাঁর কোনো কার্পণ্য দেখা যায় না। 'রোদ্দুর অনেক দেয়, অন্ধকার দেয় তারো বেশি' বলে মনে করেন যে কবি তাঁর গূঢ় দৃষ্টিতে মানুষের ভয়ের ছবিটি এক দুরতিক্রম্য বেদনালিপি হয়ে ওঠে— 'ভয় পেয়েছে।/একটি মানুষ মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে!' (**মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে**)

সূত্রনির্দেশ :

১. 'ভূমিকা', অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৪।
২. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ক্ষতিহীন কামনায় বসন্তে হেমন্তে ভেসে যাই', দেশ, ২০মে ১৯৯৫, পৃ. ৪২।
৩. শঙ্খ ঘোষ, 'এই শহরের রাখাল', তদেব, পৃ. ২৭
৪. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'বাঁচার ঘর কবিতার ঘরানা', আজকাল রবিবাসর, ৯ এপ্রিল, ১৯৯৫।
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, 'আধুনিক বাংলা কবিতা ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়', যুবমানস, এপ্রিল-মে '৯৫, পৃ. ৩-৪।
৬. 'ঝর্না' কবিতার নিবিড় পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি কবিতা · তার গল্প', আজকাল রবিবাসর, ৯ এপ্রিল, ১৯৯৫।
৭. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য', একালের রক্তকরবী (১৪০২), পুনর্মুদ্রিত, একান্তর, নভেম্বর '৯৫, পৃ. ১০৪।
৮. বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, '৯৫, পৃ. ৮-৯।
৯. অমিতাভ দাশগুপ্ত, 'পাঁজর পুড়িয়ে বসে আছি', আজকাল, রবিবাসর, ২৬ মার্চ, ১৯৯৫।
১০. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, 'শক্তি চট্টোঃ-র কাব্য পরিক্রমা', শিবরানী প্রকাশনী, ফেব্রু '৮৯, পৃ. ১০৯।
১১. সূত্র : প্রমোদ বসু, 'শক্তির দীর্ঘ কবিতা', সাহিত্যসেতু, শক্তি চট্টোঃ সংখ্যা, পৃ. ৯৩।
১২. দেশ, ২০ মে, ১৯৯৫, পৃ ৫৩।।
১৩. প্রকাশ কর্মকার, 'আমার বন্ধু শক্তি...' কবিতীর্থ, জুন, '৯৫, পৃ. ২৭।
১৪. শঙ্খ ঘোষ, 'এই শহরের রাখাল', দেশ, ২০ মে '৯৫, পৃ ২৭
১৫. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৬২
১৬. টি. এস এলিয়ট, 'ইস্ট কোকার' ('ফোর কোয়ার্টেট্‌স্‌'), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৪, পৃ ২০
১৭. অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রতিক্ষণ, ১৯৯০, পৃ. ২৬৬। রচনার তারিখ ২৬ নভেম্বর ১৯৬৫।
১৮. অরুণ সেন, 'শক্তি চট্টোঃ র কবিতা · রাবীন্দ্রিক, তাঁর জটিল সন্তান', প্রতিক্ষণ, মে, '৯৫, পৃ ৪৮
১৯. বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, '৯৫, পৃ. ৫১-৫২।
২০. 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যসমগ্র ২, পৃ. ১৪১।
২১. শক্তি চট্টোপাধ্যায় : এই সব পদ্য, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৯৭২।
২২. সূত্র : শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'একা একা চলে গেল এইভাবে', যুবমানস, এপ্রিল-মে '৯৫, পৃ. ৩৫।
২৩. দ্রষ্টব্য, সুমিতা চক্রবর্তী, 'কেন ছেড়ে যাবে?', চতুরঙ্গ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৩১১-৩১৬।
২৪. 'পদ্যবন্ধ' পত্রিকার ১৩৮৭-র শারদসংখ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।
২৫. সমীর সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এলেজি সংগ্রহ', জানুয়ারি, ১৯৯৩।
২৬. পদ্যসমগ্র (৪), পৃ ২২৪।
২৭. আমিও শীর্ষক কবিতার টীকা অংশ ; পদ্যসমগ্র (৩), পৃ. ২০৯।
২৮. পদ্যসমগ্র (৪), পৃ. ২২৮।
২৯. পদ্যসমগ্র (৫), পৃ. ৩০৭।
৩০. সুমিতা চক্রবর্তী, 'মৃত্যু অ-সফল'! 'একান্তর', নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ৭।
৩১. বিনোদন বিচিত্রা, শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণসংখ্যা, ১৮ এপ্রিল, '৯৫, পৃ ৫২।
৩২. তদেব, পৃ. ৯।

৩৩. 'এই সব পদ্য', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ,' বিশ্ববাণী, ১৯৭৬, পৃ. ৯।
৩৪. মুখবন্ধ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৯৭৩।
৩৫. 'এলোমেলো', শারদীয় আজকাল, ১৪০২, পৃ. ৫১।
৩৬. সমীর সেনগুপ্ত, 'চাঁদ উঠেছে লম্বালম্বি', সাহিত্যসেতু, জুলাই '৯৫, পৃ. ৪৫।
৩৭. 'অন্যমনে', জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, পুনর্মুদ্রিত, 'কবিতীর্থ', জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৬৩।
৩৮. শামশের আনোয়ার, শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫-৭
৩৯. 'পদ্যাপদ্য সম্পর্কে দু'এক কথা', স্বকাল, জুন, ১৯৮০ ; পুনর্মুদ্রিত, কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২, পৃ. ৮৯।
৪০. সীমান্ত সাহিত্য, বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ৬০।
৪১. অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত (সম্পাদক), প্রতিক্ষণ, ১৯৯০, পৃ: ১৮
৪২. তদেব, পৃ. ১৫
৪৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪৪. তদেব, পৃ. ১৫৪-৫৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ১৫৬-৫৮।
৪৬. তদেব, পৃ. ১৫৯।
৪৭. তদেব, পৃ. ১৬৩।
৪৮. দিব্যেন্দু পালিত, 'শক্তির কবিতা : প্রথম পর্ব', শক্তির কাছাকাছি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬।
৪৯. 'আধুনিক কবিতা : দুই প্রজন্ম', দেশ, ২৯ জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ১১৪।
৫০. পদ্য সমগ্র (৩), সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৯।
৫১. তদেব, পৃ. ১৯০।
৫২. তদেব, পৃ. ১৯২।
৫৩. দ্রষ্টব্য পাদটীকা, তদেব, পৃ. ১৯৫।

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতার শিল্প-প্রকরণ : শব্দ-চিত্রকল্প-অলঙ্কার-ছন্দ-রূপরীতি

কবিতার উপভোগ ও মূল্যায়নে, তার সামগ্রিক অভিপ্রায় ও উপলব্ধির অন্বেষণে কাব্যভাষা তথা প্রকরণের সম্যক বিচার বিশেষ জরুরি। শব্দ, চিত্রকল্প, অলঙ্কার, ছন্দ ও রূপবন্ধের শিল্পিত সমবায়ে কবিতার যে শরীর-সংগঠন, তার যথাযথ অনুধাবন ব্যতিরেকে তার অর্থবোধ ও ভাবাস্বাদন সম্ভব নয়। কবিতার বিষয় ও প্রসঙ্গের বহুস্তর তাৎপর্য ও জটিলতা তার নির্মিত রূপ তথা বিশেষ অবয়ব-সংস্থানের মধ্যেই নিহিত থাকে। বাক্ ও অর্থ, বিষয় তথা ভাববস্তু ও শিল্প-প্রকরণ কবিতায় পরস্পরের থেকে আলাদাভাবে বিচার করা অর্থহীন, অসম্ভবও বটে। একটি রেখাচিত্রে যেমন রেখাই হল চিত্র, আবার চিত্রই হল রেখা, কবিতায় তেমনি কাব্যভাষা ও অবয়বের প্রাকরণিক সমগ্রতা এবং তার ভাবব্যঞ্জনা অভিন্ন ও পরিপূরক। অবয়ববাদী ভাষাবিদ ও সমালোচক জোনাথান কালার তাই কবিতার প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্যের দিকটি উল্লেখ করেছেন তাঁর *Structuralist Poetics* গ্রন্থে '....The principal technique is the use of highly patterned language.'[১] কাব্যভাষার এই বিশিষ্টতার চিহ্নগুলি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

শব্দ হল কবিতার একমাত্র তথা মৌলিক উপাদান। চিত্রকর দেগাকে বলা কবি মালার্মের কথাগুলি যে, কবিতা ভাব দিয়ে লেখা হয় না, লেখা হয় শব্দ দিয়ে, স্মরণ করে আমরা বলতে পারি শব্দের অনিবার্য অভীপ্সাই কবিতা। মানবদেহ ও মানবাত্মা যেমন অবিচ্ছেদ্য, কবিতায় তেমনি ভাবনা কিংবা অনুভব এবং শব্দ ও শব্দবন্ধ একে অন্যের ওতোপ্রোতো।[২] কবির চিন্তাচেতনা-কল্পনা-আবেগ তথা ব্যক্তি ও সমাজের অন্তঃসার যেভাবে বাণীরূপ পায় শব্দের নির্বাচন ও বিন্যাসের বহুবিচিত্র গূঢ়তায়, ঠিক তেমনটা প্রচলিত মুখের কথায়, এমনকি সাধারণ সাহিত্যিক গদ্যেও দেখা যায় না। গদ্যে শব্দেরা ততখানি মুক্ত নয়, যতখানি তারা অভিধানশাসিত। কবির কাছে শব্দেরা নিছক অর্থবদ্ধ, বাক্যগঠনের উপাদান নয় ; শব্দের মধ্যে তিনি সন্ধান করেন তাঁর আবেগ ও মনন, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান ; আর এই সন্ধান-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ক্রমশ রূপায়িত হতে থাকে কবিতার অবয়বটি।[৩] কবি কখনো নতুন শব্দ তৈরি করে, আবার কখনো প্রচলিত শব্দকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে, কখনো শব্দের 'বহুবিধ বিশেষাভিধান'কে (multiple denotations) সুকৌশলে ব্যবহার করে, আবার কখনো তাতে 'গূঢ় ব্যঞ্জনার্থ' (connotations) সঞ্চার করে ভাষাকে ধরে দেন পাঠকের কাছে এক আশ্চর্য সংবেদিতায়। কবিতায় কবি শব্দকে দেন এক আশ্চর্য স্বাধীনতা ; ব্যক্তার্থের সীমাবদ্ধতা ও প্রথাগত ব্যাকরণশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে শব্দকে দেন ব্যঞ্জনা ও অনুষঙ্গের শক্তি ও সৌন্দর্য।[৪] কবিতার ভাষা ও প্রকরণের আলোচনায় শব্দনির্বাচন ও ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি তাই বিশেষ বিচার্য।

শব্দের গঠনরূপ তথা কবিতায় শব্দ সংস্থানের প্রাথমিক স্তরটিকে ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'মরফলজি' (Morphology)। এর পরবর্তী স্তরে বিবেচ্য বিভিন্ন শব্দের পারস্পরিক বিন্যাসে কিভাবে একটি বিশেষ বাচনিক রূপ ফুটে ওঠে যাকে পদান্বয় বা 'সিনট্যাক্স' (Syntax) নামে অভিহিত করা হয়। নিছক মুখের কথা অথবা প্রচলিত ব্যাকরণ-শৃঙ্খলা-শাসিত যৌক্তিক ও উপযোগী গদ্যের থেকে কোথায় ও কিভাবে কবিতার ভাষার 'সিনট্যাক্স' স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী তা উপলব্ধি ও নির্ণয় করা পাঠক-সমালোচকের কর্তব্য। কবিতায় শব্দেরা কেবলমাত্র সংগৃহীত ও ব্যবহৃত নয় ; তারা জাত ও উজ্জীবিত। নতুন শব্দের সৃষ্টি ও চালু শব্দের নতুন ব্যঞ্জনায় কবিতার ভাষায় শাব্দিক দুরূহতা তথা বিচ্যুতি দেখা দেয়। শব্দ ও শব্দার্থগত বিচ্যুতি (lexical/ semantic deviations)-র নানা নিদর্শনের পাশাপাশি নজরে পড়ে পদবিন্যাস তথা বাক্যগঠনরীতির বিচ্যুতি (syntactic deviations)। বাক্যান্তর্গত পদসমূহের সংস্থানে যে স্বাভাবিক ক্রম অনুসৃত হয়, কবিতায় প্রায়শই তার ব্যত্যয় ঘটানো হয় এবং আমরা নানা প্রকার 'বিপর্যাস' (inversion) দেখে থাকি, যথা, কর্তৃপদের আগে ক্রিয়াপদ বসানো কিম্বা বিশেষ্য ও বিশেষণের স্থানবদল। এই অন্বয়গত বিচ্যুতি কাব্যভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক কবিতার ভাষাশিল্পে স্বীকৃত যৌক্তিক পারম্পর্য বা 'formal logic' বর্জনের প্রবণতা তীব্রতা পেয়েছে ; কবিতার সংকেতময়, ব্যঞ্জনাঋদ্ধ, অনুষঙ্গমণ্ডিত নান্দনিক সৌন্দর্যের রহস্য নিহিত থেকেছে সর্বজনবেদ্য প্রথাগত ভাষাবিন্যাসের ছক থেকে তার দূরে সরে যাওয়ায়, যাকে ভাষাবিজ্ঞানের অভিধায় বলা হয়েছে 'বিসারণ' বা 'প্রমুখণ'—'foregrounding'[৫], শৈলীর যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যটি কবিতায় সর্বাপেক্ষা প্রকট। অন্বয়গত বিচ্যুতি ছাড়াও শব্দ ও শব্দার্থগত বিচ্যুতি এবং ব্যাকরণগত নানা বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর ভাষায় শৈলীর ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য ও তাৎপর্য সঞ্চার করেন। কবিতাকে বুঝতে গেলে তার ভাষা ও শৈলীর উৎক্রম ও সৃষ্টিশীলতার দিকগুলি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত হতে হয়।

বাক্যের গভীর গঠন এবং শব্দের জটিল গূঢ়তা রোমান্টিক কবিদের কাছ থেকে আয়ত্ত করেছিলেন প্রতীকতন্ত্রী কবিসম্প্রদায়। এই প্রতীকবাদী উত্তরাধিকার কালক্রমে ন্যস্ত হয়েছিলো আধুনিকতাবাদীদের হাতে। একালের কাব্যবিচারে, বিশেষত ভাষাশৈলীর পর্যালোচনায়, বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে ভাষাবিদ নোয়াম চম্‌স্কির 'deep structure' ও 'surface structure'-এর ধারণায়। তাঁর *Aspects of the Theory of Syntax* (1965) গ্রন্থে চোম্‌স্কি দু'ধরনের বাক্যের গঠনের কথা বলেছেন ; একটি 'অন্তর্বিন্যাস' (deep structure) ও অন্যটি 'বহির্বিন্যাস' (surface structure)। একটি বাক্যের ব্যাকরণগত গঠন হল তার 'বহির্বিন্যাস' এবং তার গভীর অর্থের স্তরটি হল 'অন্তর্বিন্যাস।'[৬]

কবিতার ভাষা যতখানি ইঙ্গিতময়, রূপকাভাসিত ও ব্যঞ্জনামণ্ডিত, মুখের ভাষা কিংবা গদ্যভাষা তেমন নয়। কবিতায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলি অভিধানে পাওয়াই যায় ; কিন্তু কবিতার পাঠ ও উপলব্ধিতে আভিধানিক অর্থ বিশেষ কাজে লাগে না। কবিতার ভাষা সম্পর্কে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞানী রোমান ইয়াকবসন। কাব্যভাষার জন্ম প্রক্রিয়াটি তিনি চিহ্নিত করেছিলেন এইভাবে—'The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination.'[৭] এখানে 'axis of selection' বলতে শব্দাবলীর প্রত্যাশিত বিন্যাসের

একটি আনুভূমিক অক্ষকে বোঝানো হয়েছে, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'syntagmatic axis'; আর 'axis of combination' হল সম্ভাব্য সকল বিন্যাসের একটি উল্লম্ব-অক্ষ, যার পরিচয় 'paradigmatic axis.' যখন এই উল্লম্ব অক্ষের সকল সম্ভাব্য বিন্যাসের ওপর আনুভূমিক অক্ষের একটি বিশেষ বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হল তখনই বলা যায় কাব্যভাষার মূর্ত রূপটি বিধৃত হল। ইয়াকবসন যাকে 'the principle of equivalence' বলেছিলেন সেটি আসলে 'syntagm' ও 'paradigm'-এর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র।

কবি তাঁর ভাব বা আবেগকে ব্যঞ্জনার বিশিষ্টতা দেবার উদ্দেশ্যে প্রমুখণ বা 'foregrounding' -এর শরণাপন্ন হন এবং সে কারণে তিনি নানাপ্রকার 'বিচ্যুতি' ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এইসব 'বিচ্যুতি' ছাড়াও ভাষার এক সৃষ্টিশীল প্রয়োগের কৃতিত্বও দাবি করে থাকেন কবিরা। অটো ইয়াস্‌পারসেন কবিতার ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, 'শক্তি' (energy) ও 'স্বাধীনতা' (liberty) কবিতার ভাষার প্রধান গুণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ভাষার একটি সৃজনশীল দিক থাকে, আর কবিতার ভাষাই সেই সৃজনশীল দিক।[৮] কোন্ কোন্ প্রাকরণিক কৌশলে ভাষার এই সৃজনশীলতা কবিরা পরিস্ফুট করে থাকেন সেগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন :

(১) শব্দকে তার গতানুগতিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা থেকে মুক্ত করে তাকে নতুন অর্থ বা ব্যঞ্জনার মাত্রা দেওয়া।

(২) সমান্তরলতা বা পুনরুক্তি - ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরুক্তির দ্বারা যখন কবিতার ভাষাকে দ্যুতিময় করে তোলা হয়। কাব্যকলার এ এক গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক উপাদান।

(৩) নানাপ্রকার আপাত-অসম্ভব, অযৌক্তিক বা উদ্ভট উক্তি, যেগুলিকে 'semantic oddity' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ভাষাগত বিনিময়ে আমরা যে বোধগম্য তথ্য বা 'cognitive information' প্রত্যাশা করি, কবিতার ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই তেমন পাই না। আতিশয্য, স্ববিরোধিতাপূর্ণ অসংগতি, ঘুরিয়ে কথা বলা ইত্যাদি বাদ দিয়ে কবিতার ভাষা তার ব্যতিক্রমী প্রাণশক্তি অর্জন করতে পারে না। 'প্যারাডক্স' বা 'টটোলজি'-র মতো ভাষার অসংগতি কবিতার ভাষাকে দেয় সৃষ্টিশীলতার নতুন মাত্রা।

(৪) শব্দের দ্ব্যর্থবোধক প্রয়োগের ফলে অর্থের অনিশ্চয়তা, যাকে বলা হয়ে থাকে 'ambiguity' উইলিয়াম এম্পসন যার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'any verbal nuance, however slight, which gives room for alternative reactions to the same piece of language.'[৯]

(৫) ছন্দ ও ছন্দস্পন্দ—এ দুটিই কবিতার ভাষা ও আঙ্গিকের সৃজনশীলতার লক্ষণস্বরূপ।

(৬) ভাষার অলঙ্কারময়তা—কবিতার ভাষা রূপকধর্মী এবং সে কারণে আলঙ্কারিক বা 'figurative' ; কখনো অলঙ্কারময়তা স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ, আবার কখনো তা অন্তর্লীন বা অলক্ষিত।

আধুনিকতাবাদী কবি ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে 'চিত্রকল্প' বা 'বাক্‌প্রতিমা' অর্থাৎ 'Imagery' কবিতার প্রকরণ বিচারের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ; তার অর্থ, অবয়ব ও রসোপলব্ধির প্রধান চাবিকাঠি। কখনো একটি কবিতা গড়ে ওঠে একটি মূল কেন্দ্রীয় চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে ; আবার কখনো বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্রকল্পসমূহ কবিতার অর্থ ও অবয়বকে দেয় দুরূহ স্বাতন্ত্র্য। 'চিত্রকল্প'

হল কবিমনের নানা অনুভবের নিকটতম শাব্দিক প্রতিরূপ ('the closest verbal counterpart'[১০]) যা পাঠকের সংবেদী কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকের আলঙ্কারিক কৌশলে যে সব শব্দচিত্র নির্মাণ করেন কবি, সেগুলি তাঁর ভাবনার বাহন হয়ে পৌঁছয় পাঠকের সংবেদনে। দৃশ্য-শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ-স্বাদের ইন্দ্রিয়সঞ্জাত চিত্রকল্পগুলি যেমন পাঠককে দেয় নান্দনিক সৌন্দর্যের তৃপ্তি, তেমনি নানা বাচনিক গূঢ়তায় চিহ্নিত করে দেয় কবির আবেগ ও অভিজ্ঞতার ভরকেন্দ্রগুলিকে।

ইংরেজ কবি সিসিল ডে লিউইস তাঁর *The Poetic Image* (1947) গ্রন্থে চিত্রকল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও কবিতার ভাষা তথা প্রাকরণিক বিচারে তার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বিষয়ে বিশদ আলোচনায় চিত্রকল্পের তিনটি গুণের উল্লেখ করেছিলেন : 'Freshness', 'Intensity' এবং 'Evocativeness'.[১১] চিত্রকল্পকে হতে হবে মৌলিক ও সদ্য-প্রসাধিত ; তা হবে ঘনসংবদ্ধ, তীব্রতাযুক্ত ও স্বল্পে বৃহতের ব্যঞ্জনামণ্ডিত ; তার থাকবে পাঠকচিত্তে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার শক্তি। সহজভাবে দেখলে 'চিত্রকল্প' হল শব্দের সৃজনী সমন্বয়ে গড়ে তোলা ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রতিমা যা রূপকধর্মী এবং যা কবিমনোবাসিত অনুভাবনার চিত্ররূপ হয়ে পাঠকচিত্তে সঞ্চার করে প্রতিক্রিয়া ও উদ্দীপনা। কবিতার উপভোগ ও মূল্যায়নে চিত্রকল্পের বিচার-বিশ্লেষণ তাই অপরিহার্য। কোন বিশেষ ধরনের চিত্রকল্পের প্রতি কবির অনুরাগ কিংবা বিশেষ বিশেষ চিত্রকল্পের পুনরাবৃত্ত প্রয়োগ থেকে কবির মনোভঙ্গি বা কবিতার ভাববস্তু ও স্বরগ্রামের যথেষ্ট আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চিত্রকল্পের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ক্যারোলাইন স্পার্জন এই পদ্ধতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর *Shakespeare's Imagery and what it Tells us* (1935) গ্রন্থে।

শব্দ ও শব্দবন্ধের অব্যর্থ বিন্যাসে গড়ে ওঠে যে কাব্যভাষা তাকে চলমানতা দেয় ছন্দের স্পন্দন। ছন্দ বলতে শুধু মিলের ছন্দ নয় ; মুখের কথা বা গদ্যের ছন্দও কবিতায় আনে স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা। কবিতাশিল্পের সমীক্ষণে ছন্দের বিচারও তাই বিশেষ মূল্যবান।

একটি কবিতা হল কবির আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার এক বাণীবদ্ধ সংগঠিত রূপ। কোন্ কোন্ প্রাকরণিক কৌশলে এই 'রূপ' বা 'Form'টি গড়ে ওঠে, কিভাবে রূপের উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে কবিতার বিষয় বা ভাববস্তু অর্থাৎ 'Content' বোঝা যেতে পারে সেসব প্রয়াস একালের সমালোচনা-সাহিত্যে হয়েছে ও হচ্ছে। আই. এ. রিচার্ডস্ প্রবর্তিত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি 'Practical Criticism', আঙ্গিক বা অবয়ববাদী (Structuralist) বিচার প্রক্রিয়া এবং একেবারে হাল আমলের উত্তর-অবয়ববাদী বিনির্মাণ তত্ত্ব (Deconstruction) বিগত কয়েক দশকে কবিতা তথা শিল্পবিচারে অনেক অভিনব মাত্রা যোগ করেছে। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হল কবির বিভিন্ন রূপবন্ধ নির্বাচন ও তার নির্মাণ। কবিতার দুটি প্রধান সংরূপ 'তন্ময়' ও 'মন্ময়' কবিতা ; আবার এ দুয়ের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপবন্ধ, যেমন 'তন্ময়' কবিতার শ্রেণীভুক্ত ব্যঙ্গকবিতা, নাটকীয় একোক্তি, কাহিনী কাব্য প্রভৃতি এবং 'মন্ময়' কবিতার শ্রেণীভুক্ত সনেট, শোককবিতা, স্তোত্রকবিতা প্রভৃতি। কাব্যনাট্য বা পত্র-কবিতার মতো রূপরীতি নিয়েও কবিরা ভাষা ও আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও করছেন। একটি নির্দিষ্ট রূপবন্ধের আঙ্গিক, আবহ, স্বরগ্রামের কিছু নির্ধারিত শর্ত ও চাহিদা থাকে যেগুলি পরিপূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রূপবন্ধের প্রথাবদ্ধ কাঠামোয় প্রাণ

সঞ্চারের কাজটিও কবিকে করতে হয় নিপুণভাবে, বিষয় ও রূপবন্ধের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী ও আত্মিক সংযোগ ঘটিয়ে। একজন কবির সমগ্র কবিকৃতির বিচারে বিভিন্ন রূপবন্ধের ব্যবহারে তাঁর পছন্দের বৈচিত্র্য ও নির্মাণসাফল্যও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

* * * * *

ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রায়োগিক সূচনাপর্ব থেকেই কাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস ছিলো বিশেষ লক্ষণীয়। ভামহের 'কাব্যালঙ্কার'-এ শব্দ ও অর্থের মিলন তথা অলঙ্কৃতি কাব্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকৃত হয়েছিলো। তাঁর মতে বক্রোক্তি বা বাক্‌ভঙ্গির বৈচিত্র্যই সব অলঙ্কারের মূল এবং সব অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকারভেদ। কাব্যশরীরের আলোচনায় 'কাব্যাদর্শ' প্রণেতা দণ্ডী ভামহের থেকে খুব স্বতন্ত্র অবস্থানে ছিলেন না। দণ্ডীর ভাবনায় কাব্য হলো অর্থ-প্রকাশক সুগ্রথিত শব্দাবলীর মিলিত রূপ। শব্দ ও অর্থের অলঙ্কৃতিই ছিলো উভয়ের কাছে কাব্যনির্মিতির সারবস্তু। 'কাব্যালঙ্কারসূত্রে' বামন এই অভিমত দিয়েছিলেন যে বাক্য অলঙ্কারের কারণেই কাব্য হয়ে ওঠে। গুণ ও অলঙ্কারের সৌন্দর্যে সুসংস্কৃত শব্দ ও অর্থের মিলনে যে কাব্য গড়ে ওঠে, গুণ তার মূল কারণ বা নিত্য ধর্ম, আর অলঙ্কার তার সৌন্দর্যবৃদ্ধির হেতু, অর্থাৎ অনিত্য। ভামহ ও দণ্ডী কাব্যশরীরের বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিলেন ; বামনই প্রথম তার আত্মার প্রসঙ্গটি, কাব্যের অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের নান্দনিক প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন।

'ধ্বন্যালোক'-খ্যাত আনন্দবর্ধনের বিচারে কাব্যসৌন্দর্যের গভীর আত্মিক তাৎপর্যটি ধরা পড়েছিলো। শব্দ ও অর্থের মিলনে রচিত কাব্যে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যে একটি বিশেষ অর্থময়তা প্রতীয়মান হয়, যা শব্দের অভিধা ও লক্ষণার অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা, তাই কাব্যের প্রকৃত আত্মা। বাচ্যার্থের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গ প্রতীতিকে সৌন্দর্য দান করে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য বাচ্যাতিরিক্ত এই ব্যঞ্জনা বা 'ধ্বনি'র কারণেই পাঠকের মনে আনন্দ জাগায়। আনন্দবর্ধনের মতানুসারে অর্থের এই ব্যঞ্জনা বস্তু, অলঙ্কার ও রস, তিনটির মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, অর্থাৎ রস তো বটেই, কাব্যের সার্থকতা আসবে বস্তু ও অলঙ্কার ধ্বনিত হলে। আরও স্পষ্টভাবে আনন্দবর্ধনের উত্তরসুরী অভিনবগুপ্ত 'রসধ্বনি'-কে চিহ্নিত করেছেন কাব্যের 'মুখ্য আত্মা'রূপে। বস্তু ও অলঙ্কার ধ্বনিত হয়ে পর্যবসিত হয় রসে ; তাই রসের সঙ্গে ধ্বনির নিত্য সম্পর্ক।

প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মধ্যে কাব্যনির্মাণশক্তির যথাযথ আলোচনা করে তাকে কাব্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কুন্তক, কবিতার প্রকরণ বিষয়ক চর্চায় যাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শব্দ ও অর্থের 'সাহিত্য' নির্দেশ করে ভামহ যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন কুন্তক সেই 'সাহিত্য' বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুন্তকের ব্যাখ্যায় শব্দ ও অর্থের 'পরস্পরস্পর্ধা' ও 'অন্যূনাতিরিক্তত্ব' ভামহ-নির্দেশিত 'সাহিত্যে'র তাৎপর্য। একদিকে শব্দ ও অর্থ যেন দুই যোদ্ধা যারা পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বে লিপ্ত; আবার অন্যদিকে ঘাটতিও নয়, বাড়তিও নয় এমন পারস্পরিক সাম্যে উভয়ের যথোপযুক্ত বিন্যাস। কুন্তক আরও বলেছেন যে, 'বক্রোক্তি' বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গির সঙ্গে উক্তি কাব্যের প্রাণ। 'বৈদগ্ধ্য' বলতে বোঝায় কবির 'কর্মকৌশল' বা কল্পনাশক্তি, আর 'ভঙ্গি' হলো বৈচিত্র্য বা চমৎকারিত্ব যা 'কর্মকৌশল' থেকেই জাত।

কুন্তক আলোচিত শব্দ ও অর্থের সাহিত্যের ভাব—তাদের রমনীয় 'পরস্পরস্পর্ধিত্ব'—এবং তাদের মনোহরী যথোপযুক্ত বিন্যাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক

আলোচনায় শ্রীসুশীলকুমার দে-র ভাষ্য। শ্রীদে কালিদাস কর্তৃক কবিতাকে 'অর্ধনারীশ্বর' রূপে প্রতীকায়িত করা এবং পার্বতীকে 'শব্দ' ও পরমেশ্বর তথা শিবকে 'অর্থ' হিসেবে কল্পনা করার বিষয়টি উল্লেখ করে কুন্তক ও কালিদাসের ভাবনার সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। কুন্তক শব্দকে কেবলমাত্র বাহ্য মাধ্যম বলে মনে করেন নি ; শব্দ ও অর্থের পরস্পর সাম্য ও সহিতের ভাব নির্দেশ করেছেন।

* * * * *

এই অধ্যায়ে কবিতার শিল্প-প্রকরণের এই সামগ্রিক ও সাধারণ প্রেক্ষিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রকরণ কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত শিরোনামে পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচিত হয়েছে:

(১) শব্দ প্রকরণ
(২) চিত্রকল্প ও অলঙ্কার
(৩) ছন্দ প্রকরণ
(৪) রূপরীতি
(৫) বিবিধ বৈশিষ্ট্য

শব্দ-প্রকরণ

'শক্তিকে নিয়ে ব্যক্তিগত' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যভাষ্যে কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন— " 'প্রকৃতি যেভাবে শুকনো ঘাসের কাছে যায়, কবিরা তেমনই শব্দের কাছে' লিখেছিলেন একদিন এই কবি। সব কবিই সেভাবে শব্দের কাছে যান কিনা জানি না, কিন্তু শক্তি যেন প্রায় প্রকৃতির প্রাণ আর প্রাচুর্য নিয়ে ঝুঁকে পড়েন শব্দের দিকে, সজীব করে তোলেন তাঁর সমস্ত সংসার। এই প্রাচুর্য এমনই যে তার স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়লে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দিশেহারা লাগে কোনো পাঠকের। কিংবা অজস্র পাতা ঝরে পড়া সুঘ্রাণ বনের মধ্যে একলা হেঁটে যাবার মতো অনুভব হয় তার .....।"[১২] কবিতার মতো শব্দ-নির্ভর শিল্পে বিভিন্ন ভর, আয়তন ও মেজাজের 'রূপবান কথার মোহরগুলি'কে শক্তি তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে ছড়িয়ে দিয়েছেন এমন এক ঈর্ষণীয় প্রাচুর্যে, শব্দের অমোঘ শক্তির প্রতি এমন এক নিরুদ্বেগ আস্থায় যে শঙ্খ ঘোষের উদ্ধৃত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কোনো অনুরাগী পাঠকই দ্বিমত হবেন না। এক সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততা ও শুচিবায়ুহীনতায় আটপৌরে ও প্রথাসিদ্ধ, কাব্যিক ও অ-কাব্যিক, শালীন ও অশিষ্ট ইত্যাদি আপাত-বিষম শব্দসমূহকে শক্তি যেভাবে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন অজস্র পংক্তিতে, শব্দ ও শব্দবন্ধকে যেভাবে তাদের স্বীকৃত অর্থের পাহারাদারি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনার দূরপ্রসারী আবহমণ্ডলে, যেভাবে ভেঙেচুরে বারবার নতুন করে গড়েছেন শব্দের নানা চমকপ্রদ মায়াবী বিন্যাস, তাতে করে শঙ্খ ঘোষের মতোই শক্তি-সুহৃদ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমতও সংশয়াতীত বলে মনে হয় : 'শক্তি যেভাবে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করে, সেরকমভাবে আর কেউ পারে না। একেবারে ম্যাজিকের মতো শব্দ ব্যবহার। শক্তিকে বলা উচিত শব্দের প্রভু। ...শক্তির কবিতা প্রধানত ধ্বনিনির্ভর। প্রত্যেকটি শব্দ অন্য একটি শব্দের পাশে তার চরিত্র বদলে ফেলে ; ধ্বনিত এই মায়াজগতে শক্তি নিমজ্জিত।'[১৩]

ধ্রুপদী, তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী, গ্রাম্য তথা আঞ্চলিক, এমনকি নানা ইতর শব্দের উপার্জনে যতখানি সাবলীল ছিলেন শক্তি, ততখানিই খেয়ালি অমিতব্যয়িতায় দু'হাতে খরচ করেছেন ঐ 'রূপবান কথার মোহরগুলি'। জীবনযাপনে বৈষয়িক অনাসক্তির সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর কবিস্বভাবেরও লক্ষণীয় সাদৃশ্য। তাঁর এই অমিতব্যয়িতার স্বীকারোক্তি পাই একটি স্মরণীয় পংক্তিতে— 'শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি' (**পেতে শুয়েছি শব্দ**/*প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)। তবে এ পংক্তিতে এক ধরনের চাপল্য ও সরলতা আছে। কেবল নির্বিচারে শক্তি শব্দ খরচই করে গেছেন, তা অবশ্যই ঠিক নয়। অসংখ্য শব্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মহৎ কবির প্রতিভা ও দায়িত্বে। খরচ হয়ে যাওয়া শব্দগুলি জমা পড়েছে, ধৃত রয়েছে পাঠকের অনুভব ও স্মৃতিতে। ভাষা ও সংস্কৃতির নানা স্তর থেকে অব্যর্থভাবে শব্দগুলিকে তুলে আনা এবং অভাবনীয় চৈতন্যময় উচ্চারণে তাদের অভ্রান্ত প্রয়োগে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক অনায়াস দক্ষতার পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি শব্দের তাৎপর্য ও রহস্যের নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন বেশ কয়েকটি কবিতা, যা কবি হিসেবে তাঁর গভীর শব্দ-বোধের পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় তাঁর *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র **৯৫ সংখ্যক** রচনাটি :

> শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে
> আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা, মায়াভরা পাড়
> সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে....
> ....অবশ্য জানি শব্দ কতো আদর্শ-নির্ভর—
> শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে, হিসি করে বুকে
> খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ,
> তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, নুঙ্কু নতমুখ—
> এ-ভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে!

মানুষের সহজ গার্হস্থ্যজীবনের চিত্ররূপে এখানে দেখা হয়েছে শব্দকে। শক্তি এখানে শব্দের সাংসারিক ধর্মে বিশ্বাসী ; কোনো অসম্ভব উচ্চাকাঙক্ষা নেই তাঁর ; বরং এক স্বাভাবিক মৃত্যুবোধ তাঁর শব্দবোধেও সংক্রামিত। শব্দের প্রয়োজন, শব্দের শক্তি, শব্দের জীবন-মৃত্যু, যন্ত্রণা-উদ্দীপনা, ভাঙা-গড়া নিয়ে নানাভাবে ভেবেছেন শক্তি। ব্যবহারে জীর্ণ হতে হতে, তার অর্থের সঙ্কোচন/অবনমন হতে হতে শব্দ হয়তো একদিন অবসিত হয়, এমনটা ভেবেছিলেন শক্তি। ক্লান্ত, অবসন্ন শব্দ এসে তার অক্ষমতার কথা বলে—'....শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শব্দের সমুদ্রে/যেখানে মূল শব্দ উঠে আসে/উপকূলের বালুতে রাখে বুকের দাগ/মুখ লালায় দেয় ভরিয়ে/কাঁধে মাথা রেখে বলে:/ক্ষমা করো—আর বাজতে পারি না' (**ক্ষমা করো**/*সোনার মাছি খুন করেছি*)। আবার এই শক্তিই শব্দ নিয়ে তাঁর দার্শনিক প্রতীতি ব্যক্ত করেন এইভাবে—'আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে...../যে আমি একদিন তাকে আগাপাছতলা পেটাতাম..../....এখন তার দুঃখে আমি দুঃখী, অনুতাপী—/.....একদিন ফিরে যেতে হবে প্রসিদ্ধযৌবনে/.....অবাধ্য শব্দ ক্রমাগত সাজিয়ে মহান/আবার বানাতে হবে নিজহাতে নিজেরই সমাধি.....' (**ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ**/*প্রভু, নষ্ট যায় যাই*)। অমোঘ শব্দ ব্যবহারের ক্ষমতা, যা ছিলো তাঁর যৌবনসম্পদ, তাকে ক্রমশ হারাতে হারাতেও তিনি উপলব্ধি করেছেন—

'শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্বজুড়ে' (**শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি/*প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই***)।

আবেগ-অনুভব, ভাবনা-অভিজ্ঞতাকে সৃজনের মুহূর্তে ঈপ্সিত শব্দের অনন্য বিন্যাসে সার্থক বাণীরূপ দেওয়া কবির কাজ। এ কাজে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার প্রসঙ্গটি সেই প্লেটোর আমল থেকে নানাভাবে আলোচিত ও বিতর্কিত হলেও, শব্দ চয়ন ও বিন্যাস, চিত্রকল্প-রসায়ন, ছন্দ প্রয়োগ ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে যে নির্মাণপ্রক্রিয়াটি চিহ্নিত করে তাকে স্বয়ংক্রিয় উৎসারণ কখনোই বলা যাবে না! কবিতা রচনার প্রাকরণিক দক্ষতা যান্ত্রিকভাবে আয়ত্ত করা যেমন অসম্ভব, তেমনি একটি কবিতা এক বিশেষ অবয়বী বাণীশিল্প, নিছক দৈব কিম্বা প্রযত্নহীন উৎসারণ কখনোই নয়। কবিতার এই নির্মাণ রহস্য বিষয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হতে পারে সে সব মতামত সর্বদা নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় ; কোথাও হয়তো বা স্ববিরোধিতার লক্ষণযুক্ত। ষাট দশকের শেষে এক সাক্ষাৎকারে নিজের কবিতা সম্পর্কে শক্তি বলেছিলেন—'প্রকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব ভেবে-চিন্তে দিই না, তবে যে লেখা লিখতে চাই, সেই লেখাই প্রকরণকে সঙ্গে নিয়ে আসে। লিখবার ইন্সপিরেশন হয় কিনা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে একটা ঘোর আসে। অনেকে যে বলেন, হঠাৎ কোনো লাইন মনে এসে যায়—ও সব কিছুই হয় না।'[১৪] এখানে শক্তি কবিতা রচনার অন্তরালে 'প্রেরণা' নামক কোনো ঐশী শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নন ; তবে একটা আবিষ্ট অবস্থার কথা বলেছেন। প্রকরণভাবনারহিত কোনো স্বয়ংক্রিয় সৃজনপ্রক্রিয়ার তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছেন, যদিও 'প্রকরণ' কবিতায় সৃজনেরই সহজাত হিসেবে সক্রিয় থাকে। কয়েকবছর বাদে একটি রচনায় কবিতাসৃষ্টির শাব্দিক প্রক্রিয়াটিকে শক্তি বিবৃত করেছিলেন আরও রহস্য-সচেতন অভিঘাতে—'বহুরকম মেলায়—ভাঙ্গা দেয়ালের পাশে, চাঁদের রুজুরুজু উন্মাদ দৌড়ঝাঁপ—এবং হৃদয়, হৃদয়ের চতুর্দিক ঘিরে ফেলার নেশা আমাদের পেয়ে বসে। এবং আমরা শব্দে শব্দে ঘা মেরে বাজিয়ে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেই সব আলেখ্যর কাছে এনে সবাইকে দাঁড় করাতে চাই।'[১৫] এরও অনেক পরে ১৯৯৪-এ 'সাহিত্যসেতু' পত্রিকার কাছে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কবিতা রচনার 'পূর্বপ্রস্তুতি' ও 'স্বতঃস্ফূর্ততা' প্রসঙ্গে শক্তি বললেন—'পূর্বপ্রস্তুতি বলতে মাথার মধ্যে থাকেই। পুরো কবিতাটি ঠিক থাকে না, একটা অনুষঙ্গ তৈরি হয়, সেই অনুষঙ্গ থেকে হঠাৎ একসময় পদ্যটা বেরিয়ে আসে'।[১৬] আবার ঐ সাক্ষাৎকারেরই অন্যত্র স্বীকার করলেন যে 'অবনী বাড়ি আছো' ও 'আমি স্বেচ্ছাচারী' কবিতাদুটি 'খুব সুচেতনভাবে' আসে নি। 'ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে' (**সে বড়ো সুখের সময় নয়**, *সোনার মাছি খুন করেছি*)-র মতো অনেক লেখাই হয়েছে 'প্রায়-অর্ধচেতন অবস্থায়'। শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'শব্দ আর সত্য' (১৯৮২) সঙ্কলনভুক্ত 'ঈশ্বরের এক মুহূর্ত' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে সত্তরের গোড়ায় জনৈক জার্মান অধ্যাপকের কাছে শক্তি 'নিতান্ত অলজ্জভাবেই' কবুল করেন— 'হঠাৎ একসময়ে কলম নিয়ে বসলেই স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে তাঁর অবচেতন রচনা।'[১৭] একবার রচিত হয়ে গেলে তার কোনো সংস্কারও তিনি চান না। আবার এই শক্তিই 'অন্বীক্ষণ' পত্রিকায় এর ঠিক আগেই এক সাক্ষাৎকারে কবিতার নির্মাণে শব্দসচেতনতার কথা বলেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে—'শুনেছি বাসে যেতে যেতে কারও কারও কবিতার লাইন নাকি হঠাৎ মাথায় আসে। আমার কিন্তু সেরকম হয় না। এখন সচেতনভাবে কিছু ছবি আমি আগে তৈরি করতে চেষ্টা করি।..... শব্দটা ঠিক যথাযথ ওজনে বসানো হলো কিনা এ ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবায়'।[১৮]

বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে ব্যক্ত এইসব মতামতের ভেতর থেকে আমরা কয়েকটি সূত্রনির্দেশ পেতে পারি যেগুলি শক্তির কবিতায় শব্দনির্বাচন, প্রয়োগ, বিন্যাস, তথা সমগ্র কাব্যাঙ্গিকের বিচারে সহায়ক হবে :

(১) কবিতা রচনার মূলে 'প্রেরণা' নামক একটি দুর্জ্ঞেয় বস্তু আছে।

(২) বিষয় বা ভাবনা এবং প্রকরণের মধ্যে কোনো ভেদরেখা নেই।

(৩) কবিতায় শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির একটা স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলেও, সঠিক শব্দটি যথাযথভাবে বসানো গেল কিনা সে সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি।

(৪) কোনো একটি জায়মান অনুষঙ্গ থেকে কবিতার জন্ম হয়, কিন্তু তার জন্মের মুহূর্তে কবিতা স্বতোৎসারিত।

'প্রেরণা' ও 'স্বতঃস্ফূর্ততা' এবং শব্দ তথা 'প্রকরণ-সচেতনতা'র সংমিশ্রণে এ এক রোমান্টিক—আধুনিকতাবাদী নন্দনভাবনা। স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিক অভিব্যক্তি রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব-অনুসারী ; অন্যদিকে শব্দসচেতনতা মূলত আধুনিকতাবাদী উত্তরাধিকার।

বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় চৈত্র, ১৩৬২-তে প্রকাশিত এবং সাধারণ্যে শক্তির প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলে স্বীকৃত **যম** শীর্ষক চতুর্দশপদীটির দিকে তাকালে আমাদের যথেষ্ট বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম' থেকে কলকাতা শহরে আসা ও বাম রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এক সদ্য-যুবা কিভাবে মৃত্যু-দেবতার স্মরণে এমন একটি সুসংবদ্ধ ও আগাগোড়া সংস্কৃত ও তৎসম শব্দে মোড়া সনেট রচনা করেছিলেন—'বিপ্রকর্ষ, তমোময় তোমার অভিধা/সুজন দুর্জন বৃক্ষে তুমিই পরম/অগ্রদানী নামরূপ, লোকায়তে যম'। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে অনুরূপ গাম্ভীর্য ও রূপময়তায় ঝংকৃত হয়েছে 'প্রাণব্রজা', 'বিশ্রামবাহ', 'দুর্জয়', 'নদবাহে', 'অপ্রমিত', 'অনুত্তম', 'সুভদ্র', 'স্বস্থ', 'বসুধা', 'বিভা', 'সায়ং' ইত্যাদি শব্দ, ছন্দশৃঙ্খলার দৃঢ় লাবণ্যে ও মন্দ্র উচ্চারণে।

গীতিকবিতার সর্বাধিক সুসংবদ্ধ সংরূপ 'সনেট' যা লিখতে গেলে প্রখর শব্দচেতনা ও পরিমিতিবোধ অতি-আবশ্যিক এবং অন্যদিকে সংস্কৃত ও তৎসম শব্দভাণ্ডার হল বাংলা ভাষার বহু-চর্চিত ও সমৃদ্ধ খনিবিশেষ। এ দুয়ের প্রতি শক্তির এই টান এক অর্থে তাই বাংলা কবিতার ভাষা ও প্রকরণশৃঙ্খলার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের স্বীকরণ। *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* সঙ্কলনে মুদ্রিত কবির 'আদিরচনা' (১৯৫৫-৫৭)[১৯] পর্বের কবিতাগুলি খুঁজে দেখলে পাওয়া যাবে আরও কুড়িটি চতুর্দশপদী, এবং এইসব রচনায়, এমনকি গদ্যরীতিতে লেখা কিছু কবিতাতেও, দেখা যাবে সংস্কৃত ও তৎসম শব্দাবলীর অঢেল নিদর্শন। এখানে প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি উৎকলিত হল:

(১) স্তনের চন্দনস্তূপ গলে যাবে মুখের গহ্বরে/অন্যবিধ চিহ্নগুলি রক্তাপ্লুত, উদ্‌গত মীনান্তক যোনিকূপ (**উরু**)।

(২) আমাকে প্রবৃদ্ধ করো অনঙ্গার যৌবনের ভারে (**চতুর্দশপদী**)।

(৩) হে মক্ষি স্মৃতির বীচি, হে বিতান হে উর্ণলাঞ্ছন (**অসাধারণ**)।

(৪) লোধ্ররেণু অঙ্গরাগ দারুগন্ধে অরণ্যদক্ষিণী (**চতুর্দশপদী**)।

(৫) সে এক বিপুল অঙ্গতমিস্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমায় আলোক হতে হলো। মৃন্ময় মায়ের উভমর্ণ পুষ্পকে ছিন্ন করে প্রসন্ন উদ্ভিদ হই। তারপর বার্ষেয় প্রভাত, পৃথিবী, সুখের সাম্রাজ্যের প্রজা.... (**দ্বিজ**)।

(৬) কঠিন শীতে শিলা হয়েছে শরীর, রোমাঞ্চিত, তনুরুহে ছেয়েছে দেহের মৃন্ময় গোচর, স্তনশীর্ষ তীক্ষ্ণ সুতীক্ষ্ণ নির্জন শাখার মতো আর তোমার প্রেম বলে ভাবি যাকে সে তখন সর্বশুক্ল কুবলয় হয়ে বিজন আকাশে ঘুরে ঘুরে ফিরছে (রাহু)।

আবার আদিপর্বের রচনাগুলিতে ধ্রুপদী ও তৎসম বিশেষণ ও বিশেষ্য-শব্দ যেমন প্রচুর, তেমন তাদের পাশাপাশি দেশজ, কথ্য, কখনো বা অশিষ্ট, শব্দ ও শব্দবন্ধও শক্তি ব্যবহার করেছেন সংস্কারের তোয়াক্কা না করে। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা যেতে পারে :

ধোঁকে, গোদা, আউরে, সোহাগে, বিলোই, নাচি কুঁদি, বেতো, নেঙটা, ছিনাল বোষ্টমী, ঢপের কীর্তন, নুলো, আদুল, ঘুপচি, কানি, নিড়ুনিকরা, হাপুস হুপুস, বোঁচকা, পোয়াতি, নিকেজো, কাছেভিতে, খেলো, আকখুটে, গুলগুলে, এঁড়োতো, দাগড়া, গত্তি, কোলকুঁজো, ঝামরে, ন্যাকড়া, পাছা, দাব্‌না, ডাগর, পিমড়ে, ন্যাকা, টোকো, কচিখুকি, ঝামরালো, ঢলঢলে, কানাপোটো, কুতকুতে, নুড়ো, হাটুরে, আর্শি, বাদা, ধচ্‌কা, নেওটা, আমের কষি, পলকা, জিরেনের রসে, খুড়ো, গুমসে, নিকোনো, কাঁকাল।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র অন্তর্গত **জরাসন্ধ** কবিতাটি শক্তির একেবারে গোড়ার দিকের উল্লেখযোগ্য রচনা। গদ্য আঙ্গিকে লেখা এই কবিতাটিতে একইসঙ্গে তৎসম ও দেশজ/চলিত শব্দসমূহের ব্যবহারে শক্তি দেখিয়েছেন তাঁর অনায়াস দক্ষতা। কবিতাটির প্রথম ও শেষ পংক্তি নিতান্ত সহজ কথ্যরীতিতে লেখা, জননীর কাছে সন্তানের আর্ত অভিমান— 'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে'। এই সহজ অন্তরঙ্গ উচ্চারণে প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও অনুজ্ঞা মিলে এক অদ্ভুত স্বরগ্রাম তৈরি হয়েছে। এছাড়া লক্ষণীয় 'তুই', এই ব্যক্তিবাচক সর্বনামটি যা অন্তরঙ্গতার সূচক এবং কিছুটা সরল গ্রাম্যতারও। তৎসম শব্দ ব্যবহারে শক্তির সাফল্যের নমুনা হিসেবে নিম্নলিখিত পংক্তিটির দিকে তাকানো যাক—'যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ'। একটি তদ্ভব শব্দ ('চোখ'), একটি সংখ্যাশব্দ ('দুটি') এবং তিনবার অব্যয়ের প্রয়োগ বাদ দিলে, সাতটি তৎসম শব্দের সমাহারে দুটি উপমায় বিধৃত ইন্দ্রিয় ও আবেগঘন ছবি পাই গদ্যরীতির এই বাক্যাংশে (মুখ, অন্ধকার, শীতল, রিক্ত, হ্রদ, কৃপণ, করুণ)। তৎসম শব্দের সঠিক সজ্জাই এই ঘনত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। আবার এ কবিতায় দেশজ বা গ্রাম্য কিছু শব্দও কবি ব্যবহার করেছেন কার্যকরভাবে : 'ধানের *নাড়ায়* বিঁধে কাতর হ'লো পা' ; '*সেবন্নে* শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে' ; '*ডুবো জলে তেচোকো* মাছের *আঁশ* গন্ধ ; 'আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে *নাইতে* নামলে....'। 'অন্ধকার' শব্দটি এ কবিতায় মোট আটবার ব্যবহৃত হয়েছে ; একবার মাত্র বিশেষণরূপে *(অন্ধকার অনুভবের ঘরে....')* ও বাকি সবক্ষেত্রেই বিশেষ্য পদরূপে। 'অন্ধকার' শব্দের এই পৌনঃপুনিক ব্যবহার এবং বিশেষত 'অনঙ্গ অন্ধকার' এই শব্দবন্ধের দুবার উল্লেখে, পুরো কবিতাটির মগ্নচৈতন্যের অনালোক জগত তথা মাতৃগর্ভের জটিল অনুভূতি আভাসিত হয়।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কাব্যভাষাকে এক মননশীল রূপময়তা দান করতে তৎসম শব্দাবলীর ওপর যে পরিমাণ নির্ভরতা দেখিয়েছেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও সেই ধারারই অনুসারী। গ্রাম্য বা আঞ্চলিক, অশিষ্ট বা অশ্লীল শব্দের প্রচুর নিদর্শন, কথ্যরীতির নানা রকমফের শক্তির কাব্যভাষাকে প্রায়শই দিয়েছে শুচিবায়ুহীন ও নির্ভার এক মৌখিকতা। কিন্তু তবু তৎসম

শব্দসমূহের ধ্বনির গভীরতা ও গঠনরূপের ব্যঞ্জনাময় দার্ঢ্য কবিকে তাঁর কবিমানসের আলো-আঁধারিকে অবয়ব দিতে যে অপরিমেয় সমর্থন জোগায় শক্তি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* থেকে কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করে এই সচেতনতার পরিমাণ ও গুণগত বিচারের চেষ্টা করা যেতে পারে :

(১) প্রভেদ জটিল, *অবগুণ্ঠিত সড়কে* চাঁদের আলো (**কারনেশন**)
(২) *কেলাসিত আনন্দিত* গান (**চিত্রশিল্প অনন্তকাল**)
(৩) বর্ষার ভ্রু-লতা দুলতো, *কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা* (**শৈশব স্মৃতি**)
(৪) কে চাইবে রোদ *আচিতা অনল*, কে *চিরবৃষ্টি* (**চতুরঙ্গে**)
(৫) বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার *মরীচিভার শূন্য* নদীতটে (**ভ্রান্তি**)
(৬) *লালসাময় তড়িৎ* তুমি কিছু-কিছু *অশ্রুবেদনার্ত* (**সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী**)
(৭) মনে হয় কোনো *সমূহ হরিণ* পিছোয় যেদিকে (**ফুল কি আমায়**)
(৮) স্ফটিক হে আদিনাগ *পলালমণ্ডিত কেশমালা* (**পাতাল থেকে ডাকছি**)
(৯) *সারঙ্গ*, যদি ঝর্না ফোটাই (**ঝর্না**)
(১০) কী করবে তুমি, *অলস প্রস্থিত রৌদ্রসম*/ ক্ষেতের সীমায় পড়ে (**আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো**)

উৎকলিত পংক্তিগুলিতে চিহ্নিত শব্দ/শব্দবন্ধগুলি কবিতারচনার প্রারম্ভিক পর্বেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শব্দসচেতনতার মাত্র কয়েকটি নির্বাচিত উদাহরণ ; তৎসম শব্দনির্ভর, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ, সুঠাম, অলঙ্কারমণ্ডিত আধুনিক বাংলা কাব্যভাষার উত্তরাধিকারের অনুবর্তনের উদাহরণ। ধ্রুপদী ভাষায় বিশেষণপদের গুরুভার সৌন্দর্য বিশেষ লক্ষণীয় ; উদ্ধৃত অংশগুলিতে পাওয়া শব্দাবলীও, কিভাবে বিশেষণের সংহত রূপে, উপমার গূঢ়ত্বে কবির অনুভব-উপলব্ধি মূর্ত অবয়ব পায়, তার চমৎকার নিদর্শন—'অবগুণ্ঠিত', 'কেলাসিত', 'আচিতা', 'লালসাময়', 'পলালমণ্ডিত', 'প্রস্থিত' প্রভৃতি। আবার কয়েকটি বিশেষ্য শব্দের অভিনব প্রয়োগও কবিতার আবহ নির্মাণে সাহায্য করে, যেমন, '*কনীনিকা* দৃষ্টিপাতমালা' (উদ্ধৃতি ৩), 'ভস্মভার *মরীচিভার* শূন্য নদীতটে' (উদ্ধৃতি ৫), '*সারঙ্গ*, যদি ঝর্না ফোটাই' (উদ্ধৃতি ৯) ইত্যাদি। 'মালা' যোগে বহুবচনার্থক 'দৃষ্টিপাতমালা'র আগে 'কনীনিকা' বিশেষ্যপদটি প্রলম্বিত অবলোকনের গভীরতা ও রম্যতাকে ফোটাতে চাইছে। নদীতটের শূন্যতার আবহে 'মরীচি' অর্থাৎ 'আলো' যেন পরিণত হয়েছে মরীচিকাবিভ্রমে। ঝর্নার ফুটে ওঠার সঙ্গে 'সারঙ্গ' শব্দটির গীতলতা যেন চমৎকার সামঞ্জস্যে জাগিয়ে তোলে সুর ও ছন্দের অনুষঙ্গ। 'হরিণ' অর্থে 'সারঙ্গ' শব্দটি যেন বহন করে প্রাচীন তপোবনাশ্রমের এক শান্ত-সুন্দর পরিবেশ। **ফুল কি আমায়** কবিতার অংশটিতে (উদ্ধৃতি ৭) 'সমূহ হরিণ', 'সমূহ' বিশেষণপদটির প্রয়োগের বিশিষ্টতায়, অর্জন করেছে এক প্রতীকী রহস্যময়তা, যা 'হরিণসমূহ' এই বহুবচনার্থক শব্দটির থেকে একেবারেই ভিন্নতর ব্যঞ্জনার্থ সূচিত করে। 'চিরবৃষ্টি' (উদ্ধৃতি ৪) এবং 'অশ্রুবেদনার্ত' (উদ্ধৃতি ৬) জাতীয় শব্দ, শক্তি যাকে বলেছিলেন, শব্দকে ঠিক যথাযথ ওজনে বসানো, তার উল্লেখনীয় উদাহরণ।

জয়সন্ধ কবিতায় শক্তি 'অনঙ্গ অন্ধকার' শব্দবন্ধে 'অনঙ্গ' বিশেষণটিতে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের জৈবতার যে অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, **সুবর্ণরেখার জন্ম** কবিতায় সেই অন্ধকারেরই নিশ্ছিদ্র নিরালোক শীতলতার ভিন্নতর অনুভূতি নিয়ে এলো ঈষৎ পরিবর্তিত

শব্দবন্ধ— *'অনঙ্গার অন্ধকারের পিঠ* তীক্ষ্ণ নখরে/বিদ্ধ করতে করতে খোঁজায় রত হ'লাম তার'। তাঁর কবিজীবনের একেবারে প্রারম্ভে লেখা এই কবিতায় দুরূহ অথচ ঋজু তৎসম বিশেষণ ও বিশেষ্য পদসমূহের পরিশীলিত প্রয়োগ পাঠককে চমৎকৃত করে—*'স্বর্ণনিভ* শরীরের শাখায় সুখ বেঁধে', *'বিপ্রতীপে রুক্ষরুচি পর্বত'*, *'রুদ্ররুক্ষের পথ'*, *'অরণ্য প্রসাধিত দুর্মর ক্ষুধা'*, *'অভ্রংলিহ* আমার শরীরের' প্রভৃতি। তৎসম শব্দ ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ অভ্যাসকে কাজে লাগিয়েই শক্তি কখনো কখনো নতুন শব্দ তৈরি করে নিয়েছেন বাড়তি অর্থের তাৎপর্য সঞ্চারে, যেমন, '.....আর ধূ-ধূ *উদ্বেলার* সারস' (**অসঙ্কোচ**)। অবশ্য এ কথা ঠিক যে দু-একটি ক্ষেত্রে তৎসম শব্দচয়নের আগ্রহে মনে হয় সঠিক শব্দকে যথাযথভাবে বসানো হয় নি—*'নিপাখি নির্পতগ* আকাশ' (**সুবর্ণরেখার জন্ম**)। 'বেলাভূমি অতিক্রমকারী'—এই অর্থের সঙ্গে হৃদয়ের ব্যাকুলতার তরঙ্গাঘাত বোঝাতে 'উদ্বেল' শব্দের অর্থ মিশ্রিত করে শক্তি যে কুশলতায় 'উদ্বেলা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, 'নিপাখি' ও 'নির্পতগ' তেমনি প্রয়োগদক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে না।

প্রাত্যহিকতার ক্লান্তি ও রুক্ষতা অতিক্রম করে তৎসম শব্দেরা অনুভব ও মননের যে সূক্ষ্ম বিস্তার সম্ভব করে তোলে কবিতায় সে সম্পর্কে শক্তির সচেতনতা ও সার্থক প্রয়াসের আরও কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যেতে পারে :

(১) *তারাভিলাষী* মাতাল শুক *ফেনাবগাঢ়* রাতে (**ভ্রান্তি**)

(২) ও কি পিশাচ নদী দুলছে *বাষ্পাকুল* গলিত *স্রোতাবর্ত* (**সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী**)

(৩) একজন *প্রেমারূঢ়* অন্যে পোড়ে *কর্কশ* রুচিতে (**শৈশব স্মৃতি**)

(৪) যে-বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ *অনব্যবহিত কর* হ'তে/তোমাতেই ফিরে যায় (**দেবদূত**)

(৫) সমস্ত কাপড়-সুদ্ধ পিঠময় ছড়ানো *সংক্রাম*/চুলের (**আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো**)

(৬) পৃথিবী *আবৃত* করে শুয়ে সেই *গর্হিত* বালক/ খোঁজে ও *ক্লীবের* দেহে, *অভ্যন্তরে, মহান* শূন্যতা (**উৎক্ষিপ্ত কররেখা**)

(৭) নরক! নরক! ওরা বলে তারে *চীৎকৃত সমীহে*/বরং দূরেই রয় ; *রম্য লীঢ় সম্পতি-সম্বৃত* (**পাতাল থেকে ডাকছি**)

(৮) বক্ষোদেশ *স্রোতোপীড়িত* ভাণ্ড (**অবিশ্বাস্য**)

(৯) *লেহন-চুম্বন-যুদ্ধে* এসো, যারা গ্রীষ্মে পুড়েছিলে (**হে গান হে নৈঋত**)

(১০) উদ্দাম *শৃঙ্গারযুদ্ধে* গণিকারা *অনুজ্জ্বল* মৃত (**দ্বিধাহীন**)

'অভিলাষী', 'অবগাঢ়', 'আবর্ত', 'আরূঢ়' ও 'অব্যবহিত'—এই শব্দগুলিকে স্বরসন্ধির চমৎকার কুশলতায় যে গভীরতা ও বিস্তার দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিয় তথা অনুভবের যে ঘনত্ব, 'তারাভিলাষী', 'ফেনাবগাঢ়', 'স্রোতাবর্ত', 'প্রেমারূঢ়', 'অনব্যবহিত'-র মতো সন্ধিবদ্ধ পদগুলিতে, তা তৎসম শব্দ ব্যবহারে শক্তির নিশ্চিত জ্ঞানের প্রমাণ। উদ্ধৃতি (৩)-এর 'প্রেমারূঢ়' ও উদ্ধৃতি (৫)-এর 'সংক্রাম' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বিষ্ণু দে-বাহিত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অনুক্রমে শক্তির শাব্দিকতার নিদর্শন। প্রেমের সংরাগ এবং হয়তো কিছুটা গা-জোয়ারি 'প্রেমারূঢ়' শব্দটিকে যেমন স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তেমনি 'সংক্রাম' শব্দটি আলুলায়িত কেশগুচ্ছের দ্বারা সঞ্চারিত বাসনাকে এক অসাধারণ ঘনসংবদ্ধ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছে। উদ্ধৃতি (৬)-এর 'আবৃত', 'গর্হিত', 'ক্লীব', 'অভ্যন্তর' ও 'মহান' শব্দগুলি পড়লেই মনে হয় এমন সংহত অভিব্যক্তির জন্যে এইসব তৎসম শব্দগুলির বিকল্প নেই। উদ্ধৃতি (৭)-এর 'রম্য', 'লীঢ়' ও

'সম্পতি-সম্বৃত'-র মতো শব্দ আশ্চর্যজনকভাবে শক্তি প্রয়োগ করেছেন প্রায় একআততায়ীসুলভ দক্ষ আক্রোশে।[২০]

শক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থে তৎসম শব্দসমূহের যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য নজরে পড়ে সে তুলনায় দেশজ-চলিত শব্দাবলীর প্রয়োগ হয়তো কম, কিন্তু মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। **জরাসন্ধ** কবিতায় 'ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা' কিম্বা 'ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ' জাতীয় শব্দ-প্রয়োগে গ্রাম্যতার গন্ধ স্পষ্ট। কিছু কিছু বিদেশী শব্দের ব্যবহারও প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সংখ্যায় কম হলেও এ ধরনের দেশজ/তদ্ভব/অর্ধ তৎসম এবং দু-একটি ক্ষেত্রে বহিরাগত শব্দের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যেতে পারে কিভাবে চলিত বা কথ্যরীতির ঈষৎ গ্রাম্যতাগন্ধী প্রয়োগে শক্তি কবিতায় যোগ করতে চেয়েছেন ভিন্ন স্বাদ-গন্ধ :

(১) পুকুর ভাসবে সবুজ *পানায়* নিরুৎসুক দৃষ্টিতে (**অতিজীবিত**)
(২) নতুন হাত *নিড়ুনি* করবে এ-ধার ওধার দু-চারটি ঘাস (ঐ)
(৩) *কঞ্চির* মাথায় একটি ঝিঁঝি বসে/বেলা যায়/*তেরছা* দূর তাজপুরের মাঠে (**তির্যক**)
(৪) পাহাড় তাকে ডাকছে তাকে নদীর মতন *সাপটে* ধরছে বুকে (**নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো**)
(৫) বুড়ো দেয়াল ঢেকে রাখছে যৌবনের *হল্‌কা* (**বাহির থেকে**)
(৬) ফুটো তাঁবু লাগে পাঁজরে, *ফাঁদ্‌রা* ডুলি (**ছায়ামারীচের বনে**)
(৭) মাছ হয়ে খাবো *ঠুক্‌রে* কলার *থোড়* (**চাকার বাতাসে ঝরাপাতা উড়ে যায়**)
(৮) অফিস যাবে কি বয়ে *চোথাপত্তর* (ঐ)
(৯) *হে ডুবো* শরীর/*চাড়া* দিয়ো বুকে, নখে-দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর/*উদোম* সড়ক (**আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো**)
(১০) আমার কাছে ছিলো না *মুখপুড়ি* (**মিনতি মুখচ্ছবি**)
(১১) নিশ্চিত *উগরেছে* সব রঙ/*ডাঁই*-করা খণ্ডবস্ত্রে (**টবের ফুলগুলোকে দাও**)
(১২) একটি ইঁদুর থমকে দাঁড়ায় খড়-*বিচুলির* ক্ষেতে (**বদলে যায় বদলে যায়**)
(১৩) যাওয়ার মধ্যে *ঝাঁট* দিতে চাই বিশ্বভুবন *জাঙাল* (ঐ)
(১৪) *ঠিক শাদা নয় চিহ্ন চক্কোরে* মায়ায় শান্ত (**সুনিভৃত, সুনিভৃতি**)
(১৫) *ইয়ার্কির* সীমা আছে প্রভু, (**দ্বিধাহীন**)
(১৬) বহু মানুষের শান্তি ছেনে (**বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে**)

এটা একটি আংশিক নমুনা-তালিকা। তবু তৎসম ও কাব্যরূপময় নানা শোভন বিন্যাসের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী শব্দের অনায়াস প্রয়োগের এইসব নিদর্শন কবির শব্দ ব্যবহারে শুচিবায়ুতামুক্ত খেয়ালিপনার সাক্ষ্য বহন করে। আরবি-ফারসি ছাড়াও কিছু কিছু ইংরেজি শব্দও শক্তির কবিতায় এনেছে অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনার গূঢ় মাত্রা ; ধরা যাক্ 'কারনেশন' নামের ফুলটি, যা উচ্চারণ করলেই যেন ফুটে ওঠে নানা রংয়ের অপরূপ ঐশ্বর্য ; কিংবা যখন **সেনেট ১৯৬০** কবিতাটিতে শক্তিকে প্রয়োগ করতে দেখি দুরূহ অনুষঙ্গমণ্ডিত ইংরেজি শব্দাবলী—'*হেমলিনের* বাঁশিঅলা, এ-সশব্দ কলকাতা আমার/সানাইয়ে সঙ্গীতে যন্ত্রে *ট্রিস্টানের* নবম *সিমফনি*।' এই কবিতাতেই পুরোনো সেনেটের বাস্তুকলারীতির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে শক্তি ব্যবহার করেন '*স্ট্রিমলাইন্‌ড বাড়ি*'। শক্তি যখন লেখেন, 'কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস', তখন কি 'গ্রীস'

শব্দটি কেবল একটি দেশের নাম বলে মনে হয় আমাদের? অথবা বাংলার ছড়ায় শোনা সেই মধুর নাম 'কমলাপুলি' যখন **'ছায়ামারীচের বনে'** কবিতায় উঠে আসে শক্তির কলমে—'বলি, বড়মিঁয়া, যাবো সে কমলাপুলি। নিশানা কী তার?'—তখন কি মনে হয় না কবি একটি শব্দের ভেতরে তার প্রাণভোমরার মতো ধরে রেখেছেন স্মৃতি ও লোকায়ত সংস্কৃতির স্পন্দনটিকে? এই কবিতাতে যখন পড়ি মরুদেশের ভারবাহী প্রাণী উটের কথা—'হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও/... হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে ঘুরে', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কবি নিছক মরুচারী প্রাণীটির কথাই বলছেন না। একটি চেনা শব্দ যে এইভাবে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় নতুন হয়ে ওঠে, একেই শঙ্খ ঘোষ বলেছেন 'শব্দের নতুন সৃষ্টি'।[২১]

বর্তমান সঙ্কলনভুক্ত **শবযাত্রী সন্দিগ্ধ** কবিতাটি বিচার করলে তাঁর প্রথম কাব্যেই শক্তির শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যের, বিশেষত চলিত শব্দ ব্যবহারে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার, তর্কাতীত প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই কবিতার মুখ্য বাহক চরিত্রটি এক গ্রাম্য মানুষের, জনৈক শবযাত্রীর, যার মুখের কথাকে তার মতো করেই সাজিয়েছেন কবি—'খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া/কাল রাতে যে-সাতপহর গাওনা হ'লো, তর্জা কাপ কবি/বিলেতবাতি ঝুললো, পোকা, লোকলশকর।' কবি-মানস এখানে আশ্রয় করেছে যে ব্যক্তিত্বটিকে, তারই অভিজ্ঞতা-অনুভূতি-সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে দেশজ-চলিত শব্দ, তৈরি করেছে ছবি। আবার কবিতার শেষ পংক্তিতে কবির কণ্ঠ যখন শোনা যায় তখন আর গ্রাম্য ও সন্দিগ্ধ শবযাত্রীর নিজস্ব শব্দ ও বাক্‌রীতি নেই—'আনন্দ কি বৈতরণীর অন্য পারে বিন্দু পাওয়া যাবে।'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শব্দ-প্রকরণে জীবনানন্দের প্রভাব স্বয়ং কবিই স্বীকার করেছেন। 'সোনালি চুল', 'সোনালি ধান', 'জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা', 'বহু মানুষের শান্তি ছেনে'—শব্দচয়ন ও বিন্যাসে এ জাতীয় জীবনানন্দীয় বলয় আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। জীবনানন্দেরই অনুসরণে শক্তি একই পংক্তিতে তৎসম ও চলিত শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে দেন—'সারারাত *ম্লান* মেছো বক ছিল পুকুরের পাশে' (**কারনেশন**)। শব্দ সাজিয়ে যে অনুপ্রাস গড়ে তোলেন—'বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে' (**ভ্রান্তি**)—তাতে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর বিখ্যাত পংক্তিটি উঁকি দিয়ে যায় যেন। এছাড়া কবিতায় সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ ও ক্ষেত্রবিশেষে পদ্যরূপের ব্যবহার শক্তি অসঙ্কোচে করেছেন যার আড়ালেও মনে হয় জীবনানন্দের কাব্যভাষারীতি কাজ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ বেছে নেওয়া যেতে পারে—

(১) পাবে না কখনো *তারে* আর, একবার *পেয়েছিনু* যেন বাল্যে খুব দূরদেশে (**খেলনা**)

(২) ছুটে কে *তুলিলে* শালবন, ঘনবন্ধন চারিধারে? (**অন্ধকার শালবন**)

(৩) পিঠের কাছে ছিলো শ্যামল আসন/কবে তোমার করুণ অঙ্গুলি/তুলে ময়ূর অথবা রাজহাঁস/মমতা-ভরে *দেখিত* অপলক (**পিঠের কাছে ছিলো**)

(৪) *সহিতে* পারি না, হে সখি, অচল মনে (**ছায়ামারীচের বনে**)

(৫) এখন আমার কোনো কাজ *জানা নাই*/যা *লয়ে বসিব* পশ্চিম বাগিচায় (**উৎক্ষিপ্ত কররেখা**)

(৬) শেফালিতলায় শুধু অবিরল কিশোরীরা নৃত্য করেছিলো, পুরুষেরা *যায় নাই* (**অন্তর্পঞ্জী**)

(৭) ভালোবেসে ভুলে কারে *রেখেছিনু* খাঁড়ার আড়ালে (**সতীদেহ**)

(৮) নীরব হাঁসের সার নেমে আসে মস্তিষ্ক *ব্যাপিয়া* (**বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে**)

শালীন ও শ্রুতিনন্দন শব্দাবলীর সঙ্গে অশালীন, কর্কশ ও অশিষ্ট শব্দব্যবহারে শক্তির আগ্রহ তাঁর শুচিবায়ুহীনতার এক সোচ্চার প্রমাণ। তাঁর স্বভাবের বেহিসাবি, বেপরোয়া বাউণ্ডুলেপনা, মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার ও নীতিসর্বস্বতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পড়ার তাড়না এ ব্যাপারে তাকে অনেকখানি প্ররোচিত করে থাকবে। তবে সবক্ষেত্রেই তাঁর এই অসঙ্কোচ নির্মমতা ফলপ্রসূ হয়েছে তা' বলা যাবে না। কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করে এ প্রসঙ্গে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

(১) শিল্পের *প্রস্রাবরসে* পাকে গণ্ড, পাকে *গুহ্যদেশ* (নিয়তি)

(২) গহ্বরে মাংসের বিড়ে *মাড়, মুত,* ফুল রক্তপাত (**জন্ম এবং পুরুষ**)

(৩) *যোনির মাটির খিল হাট* করা (ঐ)

(৪) *উপস্থ ব্যাধির পোকা, কৃমি, পুঁজ* রক্তপাত বুকে (**পাতাল থেকে ডাকছি**)

(৫) বেশ্যার মতন *শাদা উচ্ছ্বসিত ফোলা উরু বেঁকে* (**হে গান হে নৈঋত**)

(৬) *শোথ হতে চুয়ায়* অশ্লীল/ দেহের *বিহ্বল* মুত (স্বকৃত আলেখ্য)

উদ্ধৃতি (১)-এর চিহ্নিত শব্দগুলি কবিতার শেষ পংক্তিতে আচমকা এসে যেভাবে পাঠককে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়, **জন্ম এবং পুরুষ** কবিতার লাইনদুটিতে (উদ্ধৃতি ২ ও ৩) শক্তির ইচ্ছাকৃত তীব্রতা ও ককর্শতা সেভাবে বিব্রত করে না, কারণ এই কবিতায় শুরু থেকেই 'ফেঁপে', 'ফাঁসা', ইত্যাদি শব্দ এক প্রথাগত শিষ্টাচার বিরোধী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। 'চিতিয়ে মরেছে রাশি, শাদা পেট উল্লুক চৌতাল/ মরা উরু, মরা মাছ কুঁচ সাপ'—এ রকম উদ্ভট ও অনান্দনিক শব্দের দুঃসাহসে পাঠক টের পেয়ে যান কবির আক্রমণাত্মক মনোভাব। আবার উদ্ধৃতি (৬)-এর 'দেহের বিহ্বল মুত' আমাদের স্তম্ভিত করে দেয় শালীন ও অশিষ্ট শব্দের এক অসম্ভব যোগসাজসে। প্রচলিত কাব্যিক সংস্কার অগ্রাহ্য করে যে কোনো শব্দকেই কবিতায় অসঙ্কোচে জায়গা দেওয়ায়, অসুন্দর ও অ-নান্দনিক শব্দের ঔদ্ধত্যে ধরা পড়েছে শক্তির চরিত্রের সেই 'ম্যালিগন্যান্সি' যার উল্লেখ করেছিলেন কবির বন্ধু চিত্রকর প্রকাশ কর্মকার। এইসব শব্দের নির্বাচন ও প্রয়োগের আড়ালে যেন এক আততায়ী সুলভ মনোবৃত্তি রয়েছে। হয়তো বা অবক্ষয়বাদী প্রবণতার কিছু প্রচ্ছায়াও। কিম্বা একটু অন্যভাবে দেখলে এ হয়তো উত্তর-আধুনিকতার এক সূচনা-লক্ষণ।

তাঁর প্রথম কবিতা-সঙ্কলনে শক্তি সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের যে বিপুল ঐশ্বর্য অসম্ভব নৈপুণ্যে উন্মোচিত করেছেন তার মধ্যে সচেতন অনুশীলন ও প্রয়োগমনস্কতার ছাপ খুব স্পষ্ট। এইসব শব্দের একটা বড়ো অংশ সাধারণ পাঠকদের পরিচিত হলেও বেশ কিছু শব্দকে শক্তি যেভাবে তাদের আভিধানিক তথা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার করেছেন তা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের শব্দগত ব্যঞ্জনা ও দুরূহতার কথা বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। 'অবগুণ্ঠিত', 'পরিকীর্ণ', 'বিপ্রতীপ', 'বাষ্পাকুল', 'উচ্ছ্বসিত', 'বিহ্বল', 'গর্হিত', 'কোরক' ইত্যাদি শব্দ পাঠকের চেনা; কিন্তু 'কনীনিকা', 'মরীচিভার', 'চূর্ণশোভা', 'উচ্ছ্রিত', 'প্রস্থিত', 'স্বর্ণনিভ', 'নির্পত্রগ', 'প্রেমারূঢ়', 'নীঢ়', 'উপস্থ' প্রভৃতি শব্দ পাঠককে অভিধান খুলে দেখতে বাধ্য করবে।

তৎসম শব্দ-সমবায়ে নির্মিত কয়েকটি সমাসবদ্ধ পদের উদাহরণ নিলেও শক্তির ব্যাকরণ-জ্ঞান ও শব্দানুশীলনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে—'সমুদ্র-সন্দিগ্ধ' (**শৈশবস্মৃতি**), 'ফেনাবগাঢ়' (**ভ্রান্তি**), 'আকাশলেখ' (**আলেখ্য**), 'বিহগশ্রেষ্ঠ' (**সেনেট, ১৯৬০**), 'পলালমণ্ডিত' (**পাতাল

থেকে ডাকছি), 'অনব্যবহিত' (**দেবদূত**), 'প্রস্রাবরস' (**নিয়তি**), 'সম্পতি-সম্বৃত' (**পাতাল থেকে ডাকছি**), 'স্রোতোপীড়িত' (**অবিশ্বাস্য**), 'প্রভেদ-জটিল' (**কারনেশন**) ইত্যাদি। **খেলনা** কবিতায় একটি উপমাবাচক শব্দ 'পরাণভ্রমর'। এখানে লোকগানে বহু-ব্যবহৃত অর্ধ-তৎসম শব্দ 'পরাণ' ও তৎসম 'ভ্রমর' নিয়ে সমাসবদ্ধ শব্দটি নির্মিত হয়েছে। শুধু শব্দচয়নের বৈচিত্র্য ও শব্দের গম্ভীর ধ্বনিঝঙ্কারই নয়, একটি নির্দিষ্ট শব্দকে ভিন্ন অনুভবের একটি শব্দের আগে বা পরে বসিয়ে শক্তি প্রত্যাশিত ও প্রচলিত বিন্যাসভাবনাকে নাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। সন্নিহিতির এই অভিনবত্ব জীবনানন্দের কবিতায় আমাদের বারবার চমৎকৃত করে। 'নীলকান্ত জলস্রোত' (**শৈশবস্মৃতি**), 'অবগুণ্ঠিত সড়ক' (**কারনেশান**), 'চীৎকৃত সমীহ' (**পাতাল থেকে ডাকছি**), 'লালসাময় তড়িৎ' (**সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী**), 'সলিতালতা রূপসী' (**ভ্রান্তি**) প্রভৃতি এই অভিনব সন্নিহিতির কয়েকটি উদাহরণ।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, শক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থের শব্দজগতে চর্চিত অথচ মরমী গাম্ভীর্যের একটি বলয় গড়ে উঠেছে প্রধানত তৎসম শব্দাবলীর নির্বাচন, নির্মাণ ও প্রয়োগবৈচিত্র্যে। অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব, কথ্য তথা দেশজ কিম্বা অশালীন শব্দের সংখ্যা তৎসম শব্দের তুলনায় যথেষ্ট কম এবং তারা এসেছে কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে, কয়েকটি কবিতায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঘাত বা চমক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। গ্রন্থটির সামগ্রিক ভাষার আবহটি তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং বলা যায় ঐতিহ্যানুগত্যের বিপরীতে এসব শব্দ চিহ্নিত করেছে কৌলীন্যবিরোধী এক অশান্ত ঘূর্ণি।

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো-তে সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের সাড়ম্বর বাহুল্য হ্রাস পেয়েছে। সেই সঙ্গে শক্তি পরিহার করেছেন অশিষ্ট ও অ-নান্দনিক তথা বেপরোয়া যৌনাচারের অনুষঙ্গবাহী শব্দাবলী ব্যবহারের অভ্যাস। তুলনায় এ কাব্যে আমাদের অনেক বেশি ছুঁয়ে যায় গ্রাম্য, লৌকিক, কথ্য শব্দের মধুর নমনীয়তা, সুপ্রযুক্ত কিছু পদ্যরূপ, সাধুরীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ, কিছু পুনরুক্তি, 'চাঁদ', 'বৃষ্টি', 'হৃদয়পুর' ইত্যাদি কিছু চাবি-শব্দ, বিদেশী শিল্প-সাহিত্য-দর্শনভাবনার প্রসঙ্গসূচক কয়েকটি চমৎকার নামবাচক বিশেষ্য।

সংখ্যায় কম হলেও তৎসম-তদ্ভব শব্দের রূপময় ঘনত্বে অনুপম পংক্তি নির্মাণের ঈর্ষণীয় দক্ষতা শক্তির এ কাব্যেও প্রমাণিত ; অন্ত্যমিল-যুক্ত দ্বিপদীকে আশ্রয় করে শক্তি **প্রেম** কবিতায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দগুচ্ছকে প্রয়োগ করেছেন অনায়াস সাফল্যে—'চিরটাকাল সঙ্গে আছে—জড়িয়ে লতা/শাখার, বাহুর নিমন্ত্রণকে ব্যাপকতা/বলার সময় হয়নি আজো ক্ষেমংকরে—/তার পরিচয় ? মনে পড়ে, মনেই পড়ে।' 'ক্ষেমংকরে' শব্দটি এখানে যেভাবে মিলের প্রয়োজনে এসেছে, কবিতার তিনটি স্তবকে ব্যবহৃত ধুয়া 'মনে পড়ে, মনেই পড়ে'-র সাহচর্যে, তাতে পাঠকমাত্রেই অবাক হবেন। সাধু ক্রিয়াপদ, পদ্যরূপ ও তৎসম শব্দের এক চমকপ্রদ সমন্বয়-পারিপাট্যে **হৃদয়পুর** কবিতায় শক্তি সঞ্চার করেছেন এক বেদনামণ্ডিত মিস্টিক আবহ—'তখনো ছিল অন্ধকার তখনো ছিল বেলা/হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা/ডুবিয়াছিলো নদীর ধার আকাশে আধোলীন/সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন/কী কাজ তারে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে/সতর্কিত বন্ধদ্বার প্রহরা চারিভিতে.....।' এ কাব্যভাষায় জীবনানন্দের উপস্থিতি সংশয়াতীত। এই সাবেকী, অনাধুনিক কাব্যভাষা আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ 'হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা'-র মত লাইনে বিদ্যুচ্চমকের মতো ধরা

পড়ে কল্পনার অনির্দেশ্য ও অবাধ ভাসমানতা যা আধুনিকতার লক্ষণটি চিনিয়ে দেয়। অনাধুনিক, সাধু বা কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করে আধুনিকতার বাহ্যিক গড়নটি ভেঙে দেওয়া ও নতুনত্বের এই সন্ধান বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের ভাষ্য স্মরণযোগ্য : 'শক্তির কবিতায় সাধুভাষার ছিল সেই ভাঙার কাজটা, আধুনিকের বাইরের চেহারা ভেঙে দিয়ে ভেতরের দিকে যাওয়ার কাজ ছিল সেটা।'[২২] 'আজানুকেশ', 'অনাবশ্যক', 'অবর্তমান', 'অনন্যোপায়', 'অবিনশ্বর', 'লিখনিকা', 'আভূমিতল', 'বিনয়াবনত', 'মনোস্থাপন', 'সমাদরণীয়', 'অহর্নিশ' ইত্যাদি শব্দ শক্তি ব্যবহার করেছেন এমন অনায়াস নৈপুণ্যে যে সংহত ও চিত্রকল্পগুণসমৃদ্ধ তৎসম শব্দাবলীর কারুকৃতিতে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি বিষয়ে পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকে না।

গ্রাম্য তথা লৌকিক শব্দ এবং কথ্যরীতির কিছু নমুনাও সংগ্রহ করা যেতে পারে এ কাব্য থেকে:

(১) ভুলে *যেয়োনাকো* তুমি আমাদের উঠানের কাছে (**অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে**)
(২) যে ঘরে *পৌঁছুলাম* দেখি ভাঙা *আগল* (**যাকে চেয়েছিলাম তাকে**)
(৩) মাঠের ধারে গড়েছে *মিস্তিরি* (**হলুদবাড়ি**)
(৪) হাটের *কাচকড় কুপি* অনেকেই জ্বালে (**কোনদিনই পাবে না আমাকে**)
(৫) হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে *কাৎ* (**ঐ**)
(৬) আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো *আকাশ-ছেঁচা* জলে (**যখন বৃষ্টি নামলো**)

পদ্যরূপ এবং সাধুরীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে শক্তি জীবনানন্দের সার্থক অনুগামী। কোথাও কোথাও এই অনুগমন অনুকরণের মতো মনে হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সব শব্দ কবিতার আবহ ও স্বরগ্রামকে নিরূপণ করেছে :

(১) গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে *রবে* সূর্যমুখী-পাড়া (**অনন্ত কুয়ার জলে....**)
(২) সে কি *জানিত* না, এমনি দুঃসময়......... (**আনন্দ-ভৈরবী**)
(৩) এ-ভুবনময়, বলেছিলে বেয়াকুবে—/কল্পনা *তব* পাতা (**মনে কি তোমার**)
(৪) *লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?* (**চাবি**)
(৫) হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো *বহিবে* হাওয়া বেগে (**সরোজিনী বুঝেছিল**)
(৬) যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো/ দেখে যেতে চেয়ে থাকো, *তাহাদের* ঘরের ভিতরে (**অনন্ত কুয়ার জলে.........**)

এই তালিকাভুক্ত **চাবি** কবিতার পংক্তিটি (উদ্ধৃতি ৪) আলাদাভাবে পরীক্ষা করলে সাধুরীতির প্রয়োগে ক্ষেত্রবিশেষে শক্তির নিরঙ্কুশ সাফল্যের সন্ধান মেলে। এক আর্ত স্মৃতিমেদুরতায় বিষণ্ণ এ কবিতার প্রেমিক। প্রেমিকার প্রিয় চাবিটি পরম যত্নে রাখা ছিল তার কাছে। আজ হঠাৎই সে চিঠি লিখল প্রেমিকার কাছে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে চিঠি লিখতে বসে যে অভিমান ও আর্তি প্রেমিকের স্বর ও উচ্চারণকে মরমী করে তোলে, ঘটে যায় যে স্বরান্তর, তাকে সাধু শব্দ ও বিন্যাসরীতিতে এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি দেন শক্তি—'লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?' এখানে কথ্যরূপ বা রীতি মনে হয় ভাবাই যেতো না।

পুনরুক্তিময়তা শক্তির কাব্যভাষার এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শব্দ, শব্দগুচ্ছ, পংক্তির ঘুরে ফিরে আসায় যেন এক সম্মোহক আবহ তৈরি হয়। বিষয়টি এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্বে

স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য কাব্য থেকে এখানে কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

(১) তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে (**প্রেম**) [এই পংক্তিটি কবিতার তিনটি স্তবকের প্রত্যেকটিতে শেষ চরণ হিসেবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে, লিরিকের ধুয়ার মতো]

(২) যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না (**যাকে চেয়েছিলাম তাকে**) [চার লাইনের তিনটি স্তবকের প্রতিটিতেই এই পংক্তিটি ঘুরে ঘুরে এসেছে ; প্রথম স্তবকের প্রথম ও বাকি দুটি স্তবকের শেষ চরণরূপে]

(৩) চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন (**যখন বৃষ্টি নামলো**) ['চলচ্ছক্তিহীন' শব্দটি কবিতায় তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে]

(৪) মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে (**মনে পড়লো**) [প্রথম ও চতুর্থ স্তবকের প্রথম লাইন এটি; কবিতার বিষয় ও গঠনরূপের ধারক-পংক্তি]

(৫) যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো (**এবার হয়েছে সন্ধ্যা**) [প্রথম দুটি স্তবকের শেষ পংক্তি এই চরণটি কবির মনোবাসনার সরল অভিব্যক্তি]

(৬) লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা? (**চাবি**) [কবিতার শেষ দুই স্তবকের অন্তিম চরণ এই পংক্তিটি কবিতার নিহিত আর্ত অভিমানের আন্তরিক বাচনিক রূপ, পুনরাবৃত্তি যাকে এক মরমী বিষণ্ণতায় আর্দ্র করেছে]

(৭) রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী' (**আমি স্বেচ্ছাচারী**) [কবিতার প্রথম ও শেষ স্তবকের শেষ লাইন হিসেবে পুনরাবৃত্ত এই পংক্তিটিই যেন এ কবিতার রহস্যময়তার চাবিকাঠি]

(৮) কেবল মেঘে-মেঘে-মেঘেই দিন ফুরালো (**ঝাউয়ের ডাকে**) [দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামার কথাটি কি সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় কবি ধরে দিলেন 'মেঘে-মেঘে-মেঘেই' এই পুনরুক্তিময় শব্দবন্ধে]

বর্তমান প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয় **আনন্দ ভৈরবী** ও **অবনী বাড়ি আছো** কবিতাদুটি। **আনন্দ-ভৈরবী**-র প্রথম চারটি পংক্তি কবিতাটির ধ্রুবপদ এবং প্রথম স্তবকটিই হুবহু ফিরে এসেছে এ কবিতার শেষ স্তবকরূপে। এছাড়া পাই 'সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়' এবং 'সে কি জানিত না যত বড় রাজধানী'-র মত পুনরাবৃত্তি, যা কবিতার ভাববস্তুকে তার প্রার্থিত রূপটি পরিগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। কবিতাটির শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত 'আনন্দভৈরবী' শব্দটিও দুটি শব্দের সমাহারে সৃষ্ট এক আশ্চর্য যৌগ, যা হতে পারে আনন্দের রাগিণীবিশেষ অথবা দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তির আদলে কল্পিত এক নারী অথবা শেষ-আষাঢ়ের 'বরষা-পীড়িত' এক ফুলেরই নাম 'আনন্দ ভৈরবী'। এ কবিতার আর এক অভাবনীয় শব্দ 'আনখসমুদ্দুর' ; নিশ্চিত অর্থের পরোয়ানা নিয়ে আসে না এমন শব্দ ; দুটি ভিন্ন শব্দের এক অমোঘ যৌগ, যেন এক লহমায় আমাদের শব্দার্থের সীমান্ত পার করে নিয়ে যায়। কবি কি এখানে নখ থেকে সমুদ্রের দূরত্বের কথা বলছেন, নাকি কবি যাকে জানেন সেই নারীই সমুদ্রের মতো ব্যাপ্ত ও গভীর তার নখ পর্যন্ত? শক্তির অন্যতম প্রিয় শব্দ 'হৃদয়পুর'ও এ কবিতায় ব্যবহৃত ; এক সহজ লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ বহন করে আনে এ শব্দ ; বিশেষত যখন আমরা এর আগে বৈষ্ণবপদগন্ধী দুটি পংক্তিতে কোনো এক পূর্বতন রাখালিয়া জীবনসৌন্দর্যের স্মৃতিতে কবিকে

আক্ষেপ করতে শুনি—'আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে/কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল।' **অবনী বাড়ি আছো** কবিতাটির ধ্রুবপদ মন্ত্রের মতো রাত্রির অন্ধকারে উচ্চারিত সেই নিশিডাক— 'অবনী বাড়ি আছো?' যা ধুয়ার মত তিনবার ফিরে ফিরে আসে তিনটি স্তবকে। এই কবিতায় 'পরাঙ্‌মুখ সবুজ নালিঘাস' কিম্বা 'আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী'-র মত লাইন পড়লে বোঝা যায় কিভাবে মহৎ কবিতা শব্দের অভিধা--অর্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার্থে। দুয়ার চেপে ধরা সবুজ নালিঘাস কেন ও কার প্রতি 'পরাঙ্‌মুখ'? 'পরাঙ্‌মুখ' শব্দটি কি এখানে প্রতিকূলগামী বা ঊর্ধ্বগামী অর্থে ব্যবহৃত? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'পরাঙ্‌মুখ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে 'যুগচিহ্ন' পত্রিকার জুন, ১৯৮৪-তে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শক্তি বলেছিলেন— 'আসলে নালিঘাস তো সবসময়ই পরাঙ্‌মুখ হয়ে থাকে। এ আমার মনে হয়। আর যদি কখনও ব্যবহার করি তো ওই একই বিশেষণ ব্যবহার করবো।' 'আধেকলীন' বিশেষণটি 'হৃদয়ে'র আগে অপরিহার্য মনে হয়, কিন্তু 'আধেকলীন হৃদয়' বলতে বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে যায় ব্যঞ্জনার্থের গূঢ়তা। দুয়ার বন্ধ ঘরে দূর বিস্তৃত ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে থাকা কবিমনের বিশেষণরূপে শব্দটি আমাদের গূঢ়ার্থের মায়ায় ঢেকে দেয় যেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, 'আধেকলীন' শব্দটি শক্তি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাঁর 'কুয়োতলা' উপন্যাসে।[২৩] প্রায় কবিতার মতো যে আত্মজৈবনিক গদ্য-আখ্যান ছিলো শক্তির জীবন ও সৃজনের এক আশ্চর্য আকর-গ্রন্থ।

'হৃদয়পুর' শক্তির কবিতায় বারবার ব্যবহৃত কয়েকটি চাবি-শব্দের একটি। ১৩৮১-তে প্রকাশিত শক্তির অন্যতম আত্মজৈবনিক একটি গদ্য-আখ্যানের শিরোনামও ওই 'হৃদয়পুর'। প্রসঙ্গ ত উল্লেখযোগ্য যে 'কুয়োতলা' ও তার পরবর্তী গদ্যরচনাগুলিতে 'হৃদয়পুর' ছাড়াও 'পরাঙ্‌মুখ', 'আধেকলীন', 'এতোল-বেতোল' ইত্যাদি কিছু শব্দ ঘুরে ফিরে এসেছে যেগুলি কবিতাতেও বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। শক্তির অনুভবে কিছু কিছু শব্দ স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছিল এবং তাদের আশ্রয় করে অনেক গদ্য-পদ্য জারিত হয়েছিল।

'হৃদয়পুর-এর মত একটি কোমল, রোমান্টিক শব্দকে যেমন আধুনিকতার উদ্ভাস দিয়েছেন শক্তি, তেমনি উল্লেখ করতে হয় 'চাঁদ' ও 'বৃষ্টি', এ দুটি বহু-ব্যবহৃত শব্দের আশ্চর্য পুনরুজ্জীবনের। চিরাচরিত, কবিপ্রসিদ্ধ 'চাঁদ' শব্দটি জীর্ণ, বলা যায় 'ক্লিশে' (Cliche) ; অথচ ভাবনা ও প্রয়োগের দিক থেকে কতভাবে শক্তি এই জীর্ণ শব্দটিকে নবায়িত করেছেন, মুক্ত করেছেন 'ক্লিশে'র অবস্থা থেকে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মৃত শব্দে নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমে **হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য** থেকে .

(১) চাঁদের মুখে ভয়াল চুল চাঁদের মতন কেউ কি একা ছিলি (**যৌবন থেকে বামে**)

(২) আবার কে মাথা তোলে ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ (**জন্ম এবং পুরুষ**)

(৩) চাঁদের পাহারা বন্ধ ক'রে দিক গ্রন্থ-শিল্প-নারী (**তুমি যেন প্রেম**)

(৪) চাঁদ ছিল চাঁদে লেগে (**ছায়ামারীচের বনে**)

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো-তেও 'চাঁদ' শক্তির অন্যতম প্রিয় উল্লেখ, একটি বহু পুরনো শব্দকে বারবার নতুন করে বাঁচিয়ে তোলা, ধাক্কা দিয়ে যেন বার করে আনা নতুন দ্যোতনা ও তাৎপর্য :

(১) অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে (**অনন্ত কুয়ার জলে....**)

(২) **চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে/মনোস্থাপন করি ভিক্ষে (জুলেখা ডবসন)**

(৩) **সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন (হৃদয়পুর)**

ভয়াল চুলে ঢাকা চাঁদের মুখ ও তার একাকিত্ব, ফুলে ফেঁপে ওঠা চাঁদ, এইসব ছবি নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। 'অনন্ত কুয়ার জলে' প্রতিবিম্বিত 'চাঁদ'-ও আমাদের দেখা চাঁদের মতো নয় ; সময়প্রবাহ-উত্তীর্ণ এক অ-লৌকিক কুয়ার জলে চাঁদের বিম্বন-ক্রিয়া সুদূরতম কালস্রোতের সৌন্দর্য যা পাঠককে উদ্রিক্ত করে গভীরতম বোধে। 'অন্তরীক্ষে' চাঁদ উঠলে 'মনোস্থাপন' করার সময় আসে ; 'মনোস্থাপন' শব্দটির সঙ্কেতময়তা অন্তরীক্ষের চাঁদকে বহুশতবার কবিতায় পড়া চাঁদের ক্লিশে থেকে মুক্ত করে দেয়। শক্তি যখন লেখেন যে 'চাঁদের পাহারা'র অবসান হোক এবং রুচিমান মানুষেরা চন্দ্রালোকের আবেশ কাটিয়ে আকৃষ্ট হোক 'গ্রন্থ-শিল্প-নারীর' প্রতি, তখনও 'চাঁদ' শব্দের প্রথাগত অর্থ ও প্রয়োগ থেকে আধুনিক কবি সরে যান ভিন্ন তাৎপর্যের পটভূমিতে।

'বৃষ্টি' শব্দটি শুধু নয়, তার নানা অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্প শক্তির কবিতায় গভীরতাবাহী চিহ্নের মতো। শক্তি যখন লেখেন 'কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে/ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!' (**যখন বৃষ্টি নামলো**) তখন 'বৃষ্টি' অন্তর্জগতের উদ্বেল আবেগ ও ধারাবর্ষণের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'বাহিরে', এই সাধু শব্দটি এবং 'বৃষ্টি'র বিশেষণ পদ 'ব্যাপক' পংক্তিদুটিকে এক আর্ত সংবেদনে স্পন্দিত করে তোলে। এর ঠিক আগে বর্ষণসিক্তা এক নারীর কথা ছিলো—'আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে।' 'ব্যাপক বৃষ্টি'-র ছবি আঁকতে গিয়ে 'আকাশ-ছেঁচা জলে'র ব্যবহার সত্যিই অভাবনীয়, বিশেষত 'আকাশ-ছেঁচা'র মত শব্দ যেভাবে নির্ভাবনায় শক্তি বসিয়েছেন একই লাইনে 'আজানুকেশ', এই সমাসবদ্ধ, চিত্রকল্পঋদ্ধ শব্দের সঙ্গে। এক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে **অবনী বাড়ি আছো** কবিতায় শক্তি লিখলেন, 'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস'। 'এখানে' বলতে কোন্‌খানে? কোথায় এই সজল স্বপ্নের দেশ? বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে মগ্নচৈতন্যের, পরাবাস্তবের গহনে যেন নিয়ে যায় আমাদের চিরবৃষ্টির এই কল্পচিত্র। অথচ **হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য**-র **চতুরঙ্গে** কবিতায় তো শক্তির অপছন্দ ছিল অনিঃশেষ বৃষ্টি—'কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি?' হতে পারে **চতুরঙ্গের** এই পংক্তিতে কবি কোনো এক মুহূর্তের সত্যের কথা বলেছিলেন। **অবনী বাড়ি আছো**-তে অভিব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতির মেঘ-বৃষ্টির চিরসজল ও চিরশ্যামল জগতে বাঁচবার চিরবাসনা। **যখন বৃষ্টি নামলো** কবিতায় 'বৃষ্টি' এসেছিল বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সেতু-চিহ্নরূপে ; **অবনী বাড়ি আছো**-তে 'বৃষ্টি' ব্যবহৃত হলো অবচেতন-রহস্যে প্রবিষ্ট হবার অনুষঙ্গে। **হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য**-র একাধিক রচনায় 'বৃষ্টি'র উল্লেখ আছে। গাছেদের বাড়-বৃদ্ধির জন্যে বৃষ্টি যেমন অপরিহার্য, তেমনি মানুষের মানসিক শুশ্রূষার জন্যেও চাই বৃষ্টির অবিরাম আর্দ্রতা। **অতিজীবিত** কবিতার প্রথম পংক্তিতে গাছের কথা এবং শেষ পংক্তিতে নিজের অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার কথা আছে—'বাগানের গাছটিও বাড়বে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে/আমি মানবো সাপটে ধরবো নতুন বাগান, নতুন গাছটি/বেঁচে উঠবো সরস ঋজু রোদ্দুরে বৃষ্টিতে।' মানুষকে গাছের মত করে দেখা ছিলো অরণ্যপ্রেমী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বরাবরের অভ্যাস ; বৃষ্টির প্রতি তাঁর আকুলতা বলা যায় উদ্ভিদের আরণ্যক-বাসনা।

শক্তির কবিতায় শব্দ প্রয়োগের দিকগুলি আলোচনা করতে গেলে উল্লেখ করতেই হয় বিদেশী সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ-নির্দেশক নামবাচক বিশেষ্য পদসমূহের ব্যবহার। বিদেশী কবি-শিল্পী-

দার্শনিকদের নাম ও বিশেষ বিশেষ রচনা কি অভাবনীয় অনুষঙ্গ বহন করে এনেছে তাঁর একাধিক কবিতায়। এই রেফারেন্স-প্রবণতা শক্তির শব্দ ও প্রকরণ-শৃঙ্খলার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। Max Beerbohm-এর 'Zuleika Dobson'-এর সুন্দরী নায়িকাকে নিয়ে একই শিরোনামে শক্তি লিখেছিলেন যৌবনের চিত্তচাঞ্চল্যের এক সরস প্রেমের কবিতা, যাতে উপন্যাসে বর্ণিত অক্স্ফোর্ডের যুবা-শিক্ষার্থীদের মতোই জুলেখা ডব্সনের প্রতি শক্তির এক আর্ত অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে—'হাঁসের দল দোলায় পাখা/তবু তোমার সঙ্গে থাকা/চমৎকার জুলেখা ডব্সন।/.....চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে/মনোস্থাপন করি ভিক্ষে/ তোমার জন্য জুলেখা ডব্সন!' 'মনোস্থাপন করি ভিক্ষে'-র মতো একটি পংক্তিতে জুলেখা ডব্সনকে নিয়ে ছাত্র-প্রণয়ীদের উন্মাদনার সার-সংক্ষেপ কি অনবদ্য ভঙ্গিতেই না তুলে ধরেছেন শক্তি। বিশেষ করে ঐ 'মনোস্থাপন' শব্দটির মনে হয় বহুতর মাত্রা আছে। **মনে পড়লো** কবিতায় মার্কিন কবি হার্ট ক্রেনের উল্লেখ আছে যা কেবলমাত্র অন্ত্যমিলের প্রয়োজনেই শক্তি ব্যবহার করেছেন এমন নয় ; কবিতার বিষয় ও আবহের সঙ্গে হার্ট ক্রেন খুব স্বচ্ছন্দেই মানানসই হয়ে ওঠে— 'মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে/বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে/ লেভেল-ক্রসিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন/এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন?' 'হার্ট ক্রেন' নামটি যে মিলের তাগিদেই কেবল আসেনি সে কথা শক্তি একাধিকবার উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৬৬-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাসভায় এবং *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যের **স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি** কবিতাটিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন তিনি—

"নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলাম
অথচ তুমি জানো সবই—আমাদের মিল-মিলন হবার নয়।"

স্বেচ্ছা শীর্ষক কবিতাটিতে এসেছে 'ওসামু দাজাই' ও 'শোপেনহাওয়ার'-এর নামদুটি। কবি শামশের আনোয়ার তাঁর 'শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা' গ্রন্থে 'হাস্যকর অন্ত্যানুপ্রাস' এই অভিযোগে হার্ট ক্রেন, ওসামু দাজাই ও শোপেনহাওয়ারের উল্লেখগুলিকে খারিজ করে দিলেও নিতান্ত মিলের ঝোঁকে সম্পর্কহীন নামগুলি শক্তি ব্যবহার করেছেন একথা মেনে নেওয়া যায় না। ওসামু দাজাইয়ের বিখ্যাত রচনা 'অস্তগামী সূর্য' এবং শোপেনহাওয়ারের দর্শনতত্ত্বের উল্লেখ তাঁদের নামের পাশাপাশি কবিতায় এসেছে।

সোনার মাছি খুন করেছি-র কবিতাগুলিতে গম্ভীর তৎসম শব্দাবলীর ঝঙ্কার প্রায় অন্তর্হিত। বরং অনেক গ্রাম্য তথা লৌকিক শব্দ, কিছু কিছু অশিষ্ট বা কর্কশ শব্দ, কথ্যভঙ্গির উপযোগী নানাপ্রকার শব্দদ্বৈত, কিছু উদ্ভট বা প্রতীকী শব্দ, শক্তির শুচিবায়ুহীন খেয়ালিপনার বহু চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় এই সঙ্কলনে :

(ক) **গ্রাম্য/দেশী/লৌকিক শব্দ** : (১) বন্দী আমি তোমার আঁচলের *গিঁঠে* চাবির মতো (**একদা এবং আমি**)

(২) কোমরের *কষি* খসে হয় *আলুথালু* (ঐ)

(৩) *হেঁটোয়* কাঁটা-ওপরে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন? (**নীল ভালোবাসায়**)

(৪) লক্ষ্মীটি, ওই ঘাগরা-বরণ *পরজাপতি* পুচ্ছ তুলে (**এই বসন্তে বৃষ্টি হবে**)

(৫) পিলসুজে *পিদ্দিম* জ্বালাবো উঠোন জুড়ে হ্যাজাক্-বাতির (**এই খেলাটি একলা আমার**)

(৬) ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো *পুরুষ্টু* বীজ (**বিষ-পিঁপড়ে**)

(খ) **শব্দদ্বৈত (যুগ্মশব্দের ও পদবিকারবাচক ; মূলত লৌকিক/গ্রাম্য শিকড়জাত)** : এতোল-বেতোল, একলা-ফেকলা, নোংরা-ঠোংরা, গড়ন-পেটন, গুম্ফা-গম্বুজ, ঠাট্টা-বট্‌কেরা, গাঁ-গেরাম, কূট-কচাল, টানা-পোড়েন, উলুক-ঝুলুক, ফাঁক-ফোকর, ট্রেন-ফেন, চাল-চুলো, খানা-খন্দ ইত্যাদি।

'ঘনান্ধকার', 'লক্ষ্যগোচর', 'ক্রম-অগ্রসরমাণ', 'পূর্বাচল', 'লোকালোকহীন' প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ ধ্বনিময় শব্দ শক্তি ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু কথ্যরীতির বহু শব্দ এসে রঙ্গ-কৌতুক-তির্যকতার লৌকিক মাত্রা যোগ করেছে, তৎসম শব্দ-নির্ভর ভাষায় এনেছে আটপৌরে ও অন্তরঙ্গ জীবনের বাচনিক লক্ষণ। ওপরের তালিকা ছাড়াও 'দৌড়ুচ্ছে', 'দিলুম', 'পড়তুম', 'ভালবাসতুম' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ এবং 'ডুম', 'মেজে', গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি', 'টিউকল' ইত্যাদি শব্দ আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহড়ু গ্রামের কিশোরটিকে যে কলকাতা শহরে এসে লিখেছিলো নিরুপমের প্রথম গদ্য-আখ্যান **কুয়োতলা**। এই সঙ্কলনে কিছু অশিষ্ট, উদ্ভট বা প্রতীকী শব্দের কথা আগেই বলেছি, যেমন, 'ন্যাংটো', 'থুতু-পেচ্ছাপ', 'উড়োনচণ্ডি', 'গো-ভাগাড়', 'বাসরঘরী', 'বিষ-পিঁপড়ে' ইত্যাদি। তৎসম শব্দ ব্যবহারের হার লক্ষণীয়ভাবে কমে এলেও প্রচলিত তদ্ভব শব্দের ভাষারীতিতে মাঝে মাঝে একটি-দুটি তৎসম শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদ নিয়ে এসে শক্তি পাঠকের উপলব্ধিকে কোনো এক ভাবনার গূঢ়ত্বে ঠেলে দিতে চেয়েছেন:

(১) বেশ কিছুদিন সময় ছিল—*সুদুঃসময়* ভাঙতে/গড়তে কিছু গড়নপেটন—তার নামই তো কান্তি?/ এ সেই *নিশ্চেতনের* দেশের শুরু না *সংক্রান্তি* (**তোমার হাত**)

(২) এই তো রোমাঞ্চকর *যামিনী*— সোনায় কোনও গ্লানি লাগে না (**নীল ভালবাসায়**)

(৩) বলতে পারো মাংসাশী জিভ *অমৃত-আস্বাদী তৃণে/সুখের স্বর্গ পাচ্ছে খুঁজে?*

(**তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই**)

(৪) *সঞ্চরমান* মেঘের মাঝে ভাসছে *নাতিশীতোষ্ণ* চাঁদ এক (**ভস্ম অবশেষ**)

হাওয়া-বদল শীর্ষক একটি কবিতায় বারো লাইনের ছিয়াশিটি শব্দের মধ্যে একত্রিশটি তৎসম শব্দ আছে। শতকরা হিসেবে তৎসম শব্দ অনুল্লেখ্য না হলেও 'নিশিদিন', 'শোকসন্তপ্ত' 'বিস্তৃতি' প্রভৃতি শব্দ আমাদের প্রাত্যহিক ভাষা ব্যবহারে বিশেষ পরিচিত। তাই বলা যায়, এ কাব্যে শক্তি গাম্ভীর্য ও ঝঙ্কারময় শব্দ প্রয়োগের অভ্যাস কিছুটা বদলে কবিতাকে মৌখিক রীতির কাছাকাছি এনে ফেলেছেন। ইতস্তত দুটি-একটি তৎসম শব্দ/সমাসবদ্ধ পদ কিম্বা কোনো একটি রচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তৎসম শব্দের উপাস্থিতি দেখা গেলেও দুরূহ ও অপ্রচল শব্দের রহস্যাবরণটি কার্যত সরে গেছে।

অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এ সঙ্কলিত আদিপর্বের বহু রচনায়, *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* ও *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*-র বেশ কিছু কবিতায় সাধুরীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে জীবনানন্দীয় এক মরমী আবহ তৈরি করেছিলেন শক্তি। 'কৃত্তিবাস'-এর তুমুল তোলপাড়ের যুগেও এক ধরনের প্রত্ন-প্রকরণের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল ; ছিল সাধু-চরিত্রের চেষ্টিত গুরুচণ্ডালী, যা শব্দ-সচেতন এই কবির প্রতিভার পক্ষে সর্বদা সম্মানজনক হয়ে উঠতে পেরেছে এমন নয়। পঞ্চাশের দশকে তরুণ কবিরা, বিশেষত 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীভুক্ত কবিরা, গুরু-চণ্ডালীকেই আধুনিক কবিতার সঠিক ভাষা বলে মনে করেছিলেন। এর সমর্থন মেলে সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে।[২৪] **হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান** কাব্যের **বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে** কবিতাটিতে জীবনানন্দের শব্দ ও প্রকরণের ছায়া বড় দীর্ঘায়িত মনে হয় : 'অতি আদরের পথে *গলির বারান্দা* ভালবেসে/ শেষবার সেই লোক *কাহাদের বিড়ালেরই সাথে/করিয়াছে* মুখোমুখি দেখা।/অবহেলা তোমাদের, অবহেলা *তাহার তো* নয়—/*অমর নারীর* মতো তোমরা *করিতে পারো* খেলা,/*তাহাদের* সে-সময় আছে?' এই কবিতায় আরও রয়েছে 'মানুষ'-'মানুষী', 'প্রাচী দিগন্ত' ; বারবার এসেছে 'বেদনা' ও 'অন্ধকার'। অন্যান্য কবিতাগুলির ইতস্তত স্থান পেয়েছে আরও কিছু জীবনানন্দীয় শব্দ, যেমন—

(১) *মৌসুমি* সমুদ্রের ভারাক্রান্ত *প্রসববেদনা* (**এবার আসি**)

(২) ঘাসে *আবিল* ভেড়ার পেটের মতন (**হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান**)

(৩) তুমিই সেই *আবলুশ সিংহের* পিঠে চড়ে (**স্মরণিকা**)

(৪) সারারাত *অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির* মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি (**কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরনো চাঁদ**)

প্রচুর লৌকিক শব্দ ও শব্দদ্বৈত এ কাব্যেও ব্যবহার করেছেন শক্তি যার মধ্যে অনেকগুলিই কবিতায় ব্যবহারের উপযুক্ত বলে মনে করাই দুঃসাহস। 'উঠি-মুঠি', 'কবলা-কসরৎ', 'মাগ-ভাতারে', 'নোক-নকুতো', 'ঢেউ-টেঁকুর', 'জো-সো', 'চৌ-চম্পট', 'উদোমাদা', 'নাচ-নাচুনি' ইত্যাদি শক্তির আগে ও পরে আর কোনো কবি এমন অবিরল ও প্রগলভ আয়াসে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। তবে শক্তির সমকালীন কৃত্তিবাসী কবিদের রচনায় গুরুগম্ভীর রীতির সঙ্গে লঘু-চপল দৈনন্দিন বাগ্‌ভঙ্গির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে অশিষ্ট বা অপ শব্দ, যা কবিতায় নিতান্তই অপাংক্তেয়, শক্তি তাদের স্থান করে দিয়েছেন অসঙ্কোচে। গ্রামীণ শব্দ ব্যবহারে শক্তির কবিতায় সাধারণ পথ-চলতি মানুষের বাচনভঙ্গি, অঞ্চলবিশেষের কথ্যরীতির টানটোন কিভাবে ফুটে ওঠে তার কয়েকটি নিদর্শন দেখা যেতে পারে :

(১) সবাই বলতো পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও/চলো/*পাঁচনবাড়ি উঁচিয়েই* আছে (**এবার আসি**)

(২) উনুনমাটির *গা চিতিয়ে* চওড়া হয়েই আছে/ছাই (**ঐ**)

(৩) *হাড়-মাস পেখক* করি/দুর্গা দুর্গা হরি (**ঐ**)

(৪) পরনের *তেনায়* টান তো পড়বেই (**অনেকগুলো শব্দের কাছে**)

(৫) ছেড়াখোঁড়া *পেন্টুল* পরনে/লোকটাও সাবেকি/বুট হাতে খালি পায়ে *এন্টে পর্যন্ত* কাপড় ফাঁকা (**বাড়ি বদল**)

(৬) হাতে তুলে গায়ে মাখার *অপিক্ষে* (**সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি**)

(৭) *আলোটুক্* জ্বালতে *পারলিই* সন্দেহ খতম (**আলো জ্বালতে পারলে**)

উৎকলিত অংশগুলির চিহ্নিত শব্দগুলি ছাড়াও দেখতে পাওয়া যাবে, 'মটকা', 'একবগ্‌গা', 'নট্ নড়ন-চড়ন ঠকাস্', 'আখুটে', 'ন্যাংটো', 'কোঁদল', 'সেঁধিয়ে', 'দাঁতকপাটি', 'দেখনাইপনা' প্রভৃতি শব্দ যাদের কবিতায় কদাচিৎ প্রবেশাধিকার মেলে। এসব শব্দ শহুরে মানুষদের মুখের কথাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বিশেষ শব্দ-প্রয়োগের নমুনা পরীক্ষা করলে শক্তির সহজাত শব্দাগ্রহ ও এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার অভিনব ধরনটির আন্দাজ পাওয়া যাবে। **কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ** কবিতাটি থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি :—

(১) 'মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার/ *রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো*'।

(২) 'আমাদের উঠানে উলোটপালোট খাচ্ছিলো/ *পাল্লাদাসের* সমাধিফলকে *দুর্নিরীক্ষ ডার্জ*'।

প্রথম উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কনিফেরাস' শব্দটির ব্যবহার প্রথম পংক্তির নিতান্ত সাদামাটা আকাশ-চিত্রটিকে উপমার এক বিরল অভিনবত্ব দিয়েছে। 'কনিফেরাস' অর্থে 'মোচাকৃতি' ; কিন্তু 'বগলের কনিফেরাসের মতো', এই উপমা-নির্মাণে কি 'মোচাকৃতি' ব্যবহার করা যেত? 'পাল্লাদাস', এই অদ্ভুত শব্দটি ঘুরেফিরে চার বার এসেছে কবিতাটিতে। *এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র নবম খণ্ডে 'পাল্লাদাস' নামে এক গ্রিক সন্ন্যাসী ও ইতিবৃত্ত-লেখকের উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্রিটানিকা থেকে এরকম একটি অখ্যাত নাম শক্তি কবিতায় বারবার প্রয়োগ করেছেন তার সম্ভাবনা কম ; মনে হয় অন্য কারও মুখে এই নামটি শুনে থাকবেন শক্তি এবং অজানা নাম-শব্দটির প্রতি স্বভাববশত আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। ওপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয় পংক্তির শেষে 'দুর্নিরীক্ষ ডার্জ' এক আশ্চর্য শব্দ-বন্ধন। 'দুর্নিরীক্ষ', এই ঝংকৃত তৎসম শব্দের পাশে শক্তি নির্বিবাদে বসিয়ে দিয়েছেন ইংরেজি শব্দ 'ডার্জ' (dirge) যা এক ধরনের শোকগীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে শক্তির মোটেও অনীহা ছিল না। 'কলোনি', 'প্ল্যানড টাউনশিপ', 'লেভেলক্রসিং', 'শিফন', 'এপিটাফ', 'ডিগনিটি', 'মোনাস্টেরি', 'অ্যাপ্রন', 'ভয়েল', 'ওরিজিন্যাল', 'ফ্ল্যাগপোস্ট', টুর্নামেন্ট, 'লাইট হাউস', পোর্ট হোল', 'ব্রেস্ট-স্ট্রোক' প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ শক্তি অক্লেশে বসিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। একটি ইংরেজি শব্দকে কতখানি প্রয়োগ করা যায় তার উদাহরণ **পুনর্বিবেচনা** কবিতার এই পংক্তিটিতে 'ব্রেস্ট-স্ট্রোক' শব্দটির ব্যবহার—'এখন ব্রিজের তলে ব্রেস্ট-স্ট্রোক দিতে দিতে ট্রেন চলে যায়......।' সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন যায় সাঁতারুর জল ভেঙে চলার ভঙ্গিতে। ইংরেজি আর বাংলা শব্দ মিশিয়ে শক্তি তৈরি করেছেন অদ্ভুত সব শব্দবন্ধ, যেমন 'নক্ষত্র-রিভেট্' (**আমাদের ঘর নাই—আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে**/ *তিন তরঙ্গ*) ও 'পোর্টার-পাখি' (**এবার আসি**/ *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*)। *তিনতরঙ্গ* কাব্যের **আমাদের ঘর নাই—আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে** কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে তো ইংরেজি শব্দেরা সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে—'দুপাশে চায়ের বন, সভার *ফেস্টুন—ফ্ল্যাগপোস্ট*/ সে সবের মতো যেন দাঁড়িয়েছে *শেডট্রির* সারি—/বক্তব্য কোথায়? ভাষা-গণ আন্দোলন—*মনুমেন্ট?*/নাকি এ *তুষার রেঞ্জ, অবসোলিট্, প্রাণের রেপ্লিকা?*' **অতিদূর দেবদারুবীথি** শীর্ষক কবিতাটিতে একটি পরিচিত ইংরেজি শব্দকে ব্যবহার করে এক চমৎকার ব্যঞ্জনার্থ আভাসিত করেছেন শক্তি—........'দেশাতীত কিছু/ইলিশের নেতা জানে, *ইলিশের ক্যাবিনেট* জানে।' 'দুর্নিরীক্ষ ডার্জ' তাই সাহসী ও সার্থক হলেও, বিরল বা ব্যতিক্রমী নয়। এই কাব্যে তো শক্তি আরও ব্যবহার করেছেন 'অ্যাশফল্ট-রোড', 'কোল্‌-ক্রাশার', 'ক্যাথিড্রাল-হাওয়া' ও 'প্যানথেয়িস্ট মনোভাব'-এর মত ইংরেজি তথা মিশ্র শব্দ-যোজনা। আবার 'টার্কিশ টাওয়াল'-কে বাংলায় আক্ষরিক তর্জমা করেছেন 'তুরস্ক তোয়ালে'। বোঝা যায় যে, শব্দ-ক্রীড়ায় সদা-উৎসুক, বোহেমিয়ান কবি প্রচলিত প্রথার বিশেষ পরোয়া না করে চালিয়ে গেছেন তাঁর খেয়ালি শব্দানুসন্ধান। কিছুটা কম-পরিচিত ইংরেজি শব্দসমূহের এইসব নমুনা

ছাড়াও এই কাব্যগ্রন্থে পাই পরিচিত এমন কয়েকটি ইংরেজি শব্দ যেগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা তথা কবিতার ভাষাতে অপ্রত্যাশিত নয়—**নার্স, সিগন্যাল, ক্লাউন, কেবিন, বার্নিশ, ট্রেন** ইত্যাদি। 'অনেকগুলো শব্দের কাছে আজ আমার ছুটি মিলেছে', এ কথা বললেও আরও অনেক শব্দের প্রতি শক্তির আকর্ষণ বেড়েছে, বিশেষত গ্রাম্য, কথ্য চালের শব্দ এবং ইংরেজি তথা মিশ্র শব্দ ও শব্দবন্ধ। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমগ্র *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিদেশি শব্দের মধ্যে ১৫০টিরও বেশি ইংরেজি শব্দ রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু শব্দ যেমন, 'স্টেশন', ও 'ট্রেন' একাধিকবার এসেছে। **পুনর্বিবেচনা** শীর্ষক একটি কবিতাতেই ৪১টি ইংরেজি শব্দ আছে।

অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে ৬৩২ পংক্তির এক দীর্ঘ কবিতা, শক্তির দীর্ঘতম কবিতা। উত্তরবঙ্গ ও ডুয়ার্স তথা বীরভূম, বর্ধমানের নদী-অরণ্য-পর্বতের বিস্তৃত ভূ-নিসর্গ ও মানব-বসতির এই গতিময় কাব্য-পরিক্রমায় শক্তি অকৃপণভাবে ব্যবহার করেছেন অনেক ইংরেজি শব্দ, ইংরেজি ও বাংলার মিশ্র যৌগ এবং যৌগিক শব্দ, যাদের মধ্যে অনেকগুলিই অভাবিত। গম্ভীর ও চিত্ররূপময় তৎসম শব্দও এ কাব্যে বিরল নয় ; আর আছে কিছু সাধু ক্রিয়াপদ, পদ্যরূপ এবং চর্যাপদ থেকে নেওয়া দুটি উদ্ধৃতি। নিচের তালিকাটি থেকে এই শব্দ-প্রাচুর্যের একটি ধারণা পাওয়া যাবে :—

(১) **নামবাচক শব্দ**— বাঘ, সিংহ, হরিণ (ঘাইহরিণী/মায়াহরিণী), জিরাফ, ঈয়াক, গন্ধগোকুল, টেরিয়ার, বাদুড়, জলপিপি, মাছরাঙা, ক্যানারি, কাদাখোঁচা, মথ, ভ্রমর, পাইন, পাইন-ধুপি, আকাশমণি, অর্জুন, উইলো, নালিঘাস, স্যেভয়-ঘাস, সূর্যমুখী, ক্যামেলিয়া, পলাশ, মুচকুন্দ, সেগুনমঞ্জরী, পুঁইমাচান, রাঙ্চিতাবেড়া, অজয়, কোপাই, তিস্তা, লোহাগুড়ি, তাজহাট, বল্লভপুর, কঙ্কালীতলা, ডুয়ার্স, সামসিং, ভুটান-বর্ডার, জোড়বাংলো।

(২) **ইংরেজি শব্দ, ইংরেজি-বাংলা মিশ্রযৌগ**— করিডোর, টার্মিনাস, অ্যারিস্টোক্র্যাট, স্যানিটারি, ল্যান্টার্ন, প্যারাসাইট, ফরেস্টার, একাডেমি, মোনাস্টেরি, ফ্ল্যাগপোস্ট, পলিটব্যুরো, পোর্টম্যান্টো, ফাইন, ক্যান্টনমেন্ট, জিগজ্যাগ, এ্যালিবি, নেমপ্লেট, স্টীল প্ল্যান্ট, কিচেন-গার্ডেন, অ্যামিবা-উইড, সেগুন-অর্গান, ধর্ম-মিউজিয়াম, পলিথিন-সমুদ্র, রেলওয়ে-বিল।

(৩) **তৎসম শব্দ, সাধু ক্রিয়াপদ, পদ্যরূপ**— জ্ঞানাঞ্জন, স্ফীতোদর, বাল্যমনা, আত্মসমীক্ষণ, সৌন্দর্যতৎপর, কার্যব্যপদেশ, কিয়দংশ, খরস্রোতা, অনন্তস্রোতসা, সারাৎসার, আত্মগ্রাসী, পরম্পরাবোধ, দ্বৈরথ, কুঞ্চন, আকর্ণবিস্তৃত, তটপ্রান্ত, দিঙরেখা, পড়িত, বসিব, করেছিনু, নিরজনে।

(৪) **যৌগিক শব্দ**— স্বজন-সায়র, পরমাত্ম-পরিচয়, বোধি-নিরুদ্দেশে, অবস্থা-বন্দিত্ব, শ্বাপদ-সঙ্কুল, মাকড়সা-তন্তুজাল, বুদ্ধ-বিলাসিনী, স্পর্শ-লালায়িত বিলাস-ব্যসন, বাউল-বৈরাগ, কাহিনী-বিস্তার।

এটি একটি বাছাই-তালিকা যা থেকে বৈচিত্র্যের আন্দাজ পাওয়া গেলেও প্রয়োগ ও বিন্যাসের অভিনবত্ব ও কুশলতার কোনো ধারণা মেলে না। সে উদ্দেশ্যে আরও বিশদ ও নিবিড়ভাবে

শব্দ-প্রকরণের খানা-তল্লাশি নেওয়া জরুরি। কিভাবে প্রয়োগের অভিনবত্বে চেনা শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে তাদের গতানুগতিক বা অভিধা-অর্থের খাঁচা থেকে মুক্ত করে কবি সমৃদ্ধ করেন নতুন ব্যঞ্জনা ও গভীরতায় তার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

(১) মাঝে মাঝে আমাদের *অবস্থা-বন্দিত্বে* আসে রোদ

(২) *অনন্ত খঞ্জনী* বাজে— *দীর্ঘ গ্রাম* যায় *বেঁকেচুরে/উদ্দাম ধুলোট্*

(৩) তোমার ইস্কুল ছিল, *হাইবেঞ্চ ডেকেছে* তোমাকে

(৪) *সৌন্দর্যতৎপর বাঘ* লাফ দেয় হরিণের পানে

(৫) জঙ্গলে বাংলার কত দাম অ্যারিস্টোক্রাটের কাছে—/*স্যানিটারি সংসার* তাদের!

(৬) তুমিই নক্ষত্রবীথি—তাই *শুদ্ধ তৃষ্ণার আঁধার*

(৭) আমি *সে-কথার সুদ* ভোগ করি

(৮) তুমি *বেদনার হালখাতা* করো টেরেটিবাজারে

(৯) *একাডেমি ফুটো করে এলে* পাবে বিবাহ ও বাড়ি

(১০) উৎসব-শেষের রাতে *অঝোর সানাই*

(১১) জোড়বাংলো থেকে আসে ট্রাক নিতে *মাংস পাহাড়ের*

(১২) ক্যান্টনমেন্টের মাঠে দেখি *ক্ষীর-পুতুলের নাচ*

'অবস্থা-বন্দিত্ব' (বন্দীদশা), 'সৌন্দর্যতৎপর বাঘ' (হরিণের সৌন্দর্যশিকারে তৎপর?), 'স্যানিটারি সংসার' (অভিজাতদের বাহারি সংসার), 'কথার সুদ' (কথা জমিয়ে রেখে তার সুখ-ভোগ), 'অঝোর সানাই' (অবিরাম ঝরে পড়া সানাইয়ের সুর), 'মাংস পাহাড়ের' (পাহাড় ভেঙে বার করা পাথর) ইত্যাদি শব্দ/শব্দগুচ্ছ কবিতার ভাষাকে দেয় সৃজনশীলতার অভিনব মাত্রা। এভাবেই হয় 'শব্দের নতুন সৃষ্টি' (দ্রষ্টব্য, সূত্রনির্দেশ ৪)।

শব্দ, শব্দার্থ ও অন্বয়ের নানা বিচ্যুতি ঘটিয়ে কবি তাঁর ভাব বা আবেগকে পরিস্ফুট করতে পারেন। শব্দগত বিচ্যুতির অন্যতম হল 'আর্ষপ্রয়োগ', যে প্রয়োগ ব্যাকরণের নিয়মসিদ্ধ নয়। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* গ্রন্থের **খেলনা** কবিতায় 'সখ্যতা' ও **সতীদেহ** কবিতায় 'ব্যাদন' এই বিচ্যুতির দুটি নিদর্শন। আলোচ্য কাব্যের একটি পংক্তিতে অনুরূপ একটি নজির মেলে—'ঢাকে কাঠির *জাজ্বল্য* হিংসা-দ্বেষ...।' 'জাজ্বল্যমান' থেকে শানচ্ প্রত্যয়ান্ত 'মান' অংশটি বাদ দিয়ে শক্তি 'জাজ্বল্য' ব্যবহার করেছেন, ঠিক যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর **বিদায়-অভিশাপ**-এ—'অন্তরে *জাজ্বল্য* থাকে উজ্জ্বল রতন'। অন্য একটি শব্দগত বিচ্যুতির উদাহরণ পাই বিশেষ্য শব্দটিকে বিশেষণরূপে প্রয়োগে— 'মুখের *কুঞ্চন* মাংসে ধরে গেছে উই।' রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের অনুসরণে সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদকে একইসঙ্গে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও শক্তি কুণ্ঠিত নন :

(১) ...ওরা তাকে *পেতে চেয়েছিলো*, আমাদেরই মতো/সুতরাং *পায় নাই*

(২) দারুণ দুপুরে *চুল তুলে দেবে* জানালার ধারে/দুজনেরই ছুটি—তাই আসন্ধ্যা *বসিব* পাশাপাশি।

শব্দার্থগত বিচ্যুতি ঘটিয়ে কবি কিভাবে শব্দকে তার পরিচিত অর্থের অনুষঙ্গ থেকে বার করে এনে পাঠককে ধন্দে ফেলে দেন তারও কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

(১) *মূর্তির ঝর্নায় আছে গান*

(২) অথচ সংসার পড়ে আছে যেন *পেঁপের হৃদয়*

(৩) কাঠবিড়ালীর পাশে *শুয়ে আছে মন/ভাঁজ হয়ে* ধুলোর উপরে

বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো আলোচ্য কাব্যে শক্তির ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি-বাংলার মিশ্র যৌগিক শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ :

(১) ইতস্তত শর, ঘাস-*খই/অ্যামিবা*-উইড কতো পড়ে আছে পাশে

(২) নিজের কাছেই তুমি বসে থাকো, নতুন *ল্যান্টার্ন/*জ্বালিয়ে চিরটাকাল....

(৩) *প্যারাসাইটের* মতো একাগ্র কি জীবনবাসনা?

(৪) যেন-বা শতাব্দী পরে দেখেছি তোমার/ফটোগ্রাফ—*পোর্টম্যান্টো* খুলে

(৫) অমিত সারল্য ভেঙে *জিগ্‌জ্যাগ* করেছি কৌশল

(৬) *সেগুন অর্গানে* বাজে *বেলো*

(৭) *ধর্ম-মিউজিয়ামে* যত্নে রাখা আছে আত্ম-প্রবঞ্চনা

(৮) হত্যার *এ্যালিবি* নেই কোথা

শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও ব্যাক্যের পুনরুক্তি কবিতার ভাষাকে দেয় ব্যঞ্জনার দ্যুতি। পুনরুক্তিময়তা শক্তির কবিতার অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখা যেতে পারে:

(১) রঙের দুলালী সে যে, সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ *খেলা* করে/আমরাও *খেলা* করি—আমাদের *খেলা* থাকে রোজ/রেফারির ছুটি সেই *খেলাকে* বিপন্মুক্ত করে—

(২) তার ফুল মুখে-ধরা গাছের ঝিনুক দেখে আমি/*সমুদ্রের* কথা ভাবি—*পলিথিন-সমুদ্র* কি *নেই?*/ কেউ কেউ টের পায় *সেইসব সমুদ্র—সাল্‌মন/বাতাসে*ও ধরা পড়ে— *বাতাসের*ও অশ্বশক্তি আছে।

(৩) পুরাতন বইগুলি রেখেছো কি ঘরে/*আজো কি আমাকে মনে পড়ে*/নির্দ্বিধায়?/হেমন্ত-সন্ধ্যায়/গাছের শিথিল পাতা ওড়ে ঘূর্ণিঝড়ে/*আজো কি আমাকে মনে পড়ে?*

গদ্যভাষা ও মুখের কথায় শব্দ-বিন্যাসের যে স্বাভাবিক-রীতি-নিয়ম, কবিতায় প্রায়শই তার উৎক্রম ঘটানো হয়ে থাকে। এই অন্বয়গত বিচ্যুতি শব্দ-সংস্থানকে দেয় বিবিধ সৃজনী মাত্রা। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের এই পংক্তিগুলিতে বিন্যাসরীতির এই উৎক্রমের নিদর্শন রয়েছে— '*লোহাগুড়ি গ্রামখানি পড়ে আছে তালের ছায়ায়/ যেন বা নেবার নেই কেউ তাকে/ সে একাকী তার/* এক্রাম মোল্লার ছেলে এদেশ-ওদেশ ঘুরে দ্যাখে।'

শক্তির একশটি সনেটের সঙ্কলন *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* ১৯৭০-এর মে মাসে প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থের চতুর্দশপদীগুলি বেশ কয়েকবছর ধরে লেখা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবির স্বীকৃত প্রথম প্রকাশিত কবিতা **যম** ছাপা হয়েছিলো 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৫৬-র এপ্রিলে। সেই থেকেই যে শক্তি সনেট লিখে গেছেন তার সমর্থন মেলে *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* সঙ্কলনভুক্ত চতুর্দশপদীগুলি থেকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একশখানি কবিতার মধ্যে পঁচিশটি আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল চৈত্র ১৩৬৭ থেকে শ্রাবণ ১৩৭৬ এই সময়সীমার মধ্যে। এছাড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যসমগ্র* সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত শ্রীসমীর সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে, ৯৬-সংখ্যক চতুর্দশপদীটি শক্তি লিখেছিলেন 'তাঁর নিজের নষ্টজাত সন্তানের উদ্দেশে রচিত এলেজি হিসেবে'। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯৬৯-এর জানুয়ারি

মাসে। *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র উৎসর্গ-কবিতাটি ('যে শিল্প ঐকিক নয়.....') *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* গ্রন্থে **সদর স্ট্রীট** শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। যার দশম পংক্তিতে উল্লিখিত '১৯৬০' সাল উৎসর্গ-কবিতায় বদলে করা হয়েছে '১৯৭০'। এইসব সূত্র থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র রচনাগুলি শক্তির কাব্যরচনার আদিপর্বের **হে প্রেম**..... এবং **ধর্মে আছো**.....-র সমসাময়িক। শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্বে, তৎসম শব্দাবলীর চিত্রকল্পময় সৌন্দর্যে, সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহারে এবং জীবনানন্দের প্রকরণ-অনুসারী সাধু-চলিতের মিশ্রণে, **চতুর্দশপদী কবিতাবলী** শক্তির প্রথম পর্বের কাব্যভাষার ক্রম-পরিণতিতে এক বিস্ময়কর মাইলফলক।

শক্তির এই সনেটশৃঙ্খলায় সাধারণ সামগ্রিক শব্দ-প্রকরণে ও বিশেষত সাধু ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়ের বহুল প্রয়োগে এবং সাধু ও চলিত রীতির ব্যাপক মিশ্রণে জীবনানন্দের কবিতার শব্দেরা ও তাঁর প্রত্নভাষাপ্রকরণ প্রবলভাবে উপস্থিত। কয়েকটি নির্বাচিত নমুনা থেকে এই উপস্থিতির হদিশ মিলবে:

(১) *সেই দিন হতে* আর একযোগে বালিকারা কেউ/এইখানে *আসে নাই, শোয় নাই, বসে নাই, আহা*/একে একে *আসিতেই* উহাদের ভাল *লাগিতেছে/উহাদের* আর কোনো সংঘ নাই, ভালবাসা নাই (**৪ সংখ্যক**)

(২) আবার জ্যোৎস্নায় *ফিরে আসিব* কি, আরো একবার/জ্যোৎস্নায়, আঁধারে নয়—অবাস্তব রুপালি জ্যোৎস্নায়/*আবার আসিব ফিরে?* (**২৩ সংখ্যক**)

(৩) *সাধ নাই হে সুন্দরি*, সাধ নাই *পরান ভরিয়া*—/ অথবা *ঝরিয়া গেছে* সব সাধ হেমন্তের মতো (**৩২ সংখ্যক**)

(৪) *মহীনের ঘোড়াগুলি* মহীনের ঘরে *ফেরে নাই/উহারা* জেব্রার *পার্শ্বে চরিতেছে* (**৩৭ সংখ্যক**)

(৫) জ্যোৎস্নায় মাছের খেলা *দেখিয়াছি*, ফেনার উৎসবে/*বহু জলচারিণীর* উত্তাল আপেল *দেখিয়াছি*/পাখি *দেখিয়াছি* খুব (**৭৬ সংখ্যক**)

(৬) ....নিবিড় আঁধারে/*তাহারে* পাব না টের, মনে হয় *আরও যাহা* আছে.... (**৮৯ সংখ্যক**)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী-র একশোটি সনেটের মধ্যে ২৯টি কবিতায় সাধু ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়পদ নেই ; ১৪টি সর্বতোভাবে সাধু ভাষারীতিতে রচিত এবং অবশিষ্ট কবিতাগুলিতে রয়েছে সাধু-চলিতের গুরুচণ্ডালি, যা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় মূলত জীবনানন্দীয় প্রকরণ-উত্তরাধিকার। ভাষার এমন প্রত্ন-আবহ শক্তির অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থে আছে বলে মনে হয় না। জীবনানন্দের কবিতার মতো 'চামেলি' ও 'শেফালি' নারী-নাম, 'জাহাজ', 'জ্যোৎস্না', 'হাঁস', 'জেব্রা', 'মানুষ', 'কান্তার', 'মেয়েমানুষ', 'শূন্যতা' ইত্যাদি বিশেষ্য পদ, 'নিভায়ে গেছে', 'আবার আসিব ফিরে', 'ঝরিয়া গেছে', 'চরিয়া বেড়ায়', 'কথা কয়' ইত্যাদি পদ্যগন্ধী মিশ্ররীতির ক্রিয়া-রূপ, 'উহাদের', 'উহারা', 'তাহারে' প্রভৃতি সাধু সর্বনামপদ এবং 'মতো', 'মতন', 'তবু', 'আর', 'হে' প্রভৃতি অব্যয়পদ শক্তির এই সনেট-শৃঙ্খলায় তাঁর পূর্বসূরির প্রতি ঋণের নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ। 'শুধায়', 'প্রবেশিয়া', 'হিয়া', 'বারেক', 'মদীয়', 'অয়ি', 'মূরতি', 'বারি', 'পায়সান্ন', 'চুমি' ইত্যাদি বহু-ব্যবহৃত, সাবেকী, কাব্যিক শব্দ তথা পদ্যরূপ শক্তি এ কাব্যে যে হারে ব্যবহার করেছেন তা নজরে পড়ার মতো।

ধ্বনিগাম্ভীর্যমণ্ডিত ও চিত্রকল্পঋদ্ধ ধ্রুপদী ও তৎসম শব্দ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, সন্ধিবদ্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের ঝঙ্কার শক্তির প্রথম পর্বের কবিতায় যেমন অঢেল তেমনই এই সনেট-সংগ্রহে: **লোকায়তিক** (উৎসর্গ কবিতা), **নাতি-আলোকিত** (৪), **নৈরাশা** (৬), **কূটজ** (২১), **প্রতিঘাতী** (২২), **কলঙ্কালিম্পন** (২৩), **অনাক্রমনীয়** (২৩), **সমার্থবাসিনী** (৪৫), **পুণ্যচ্ছায়াহীন** (৪৬), **অনুধাবনীয়** (৫০), **দ্যোতিত** (৫১), **স্বতোৎসার** (৫৩), **অসংসক্ত** (৫৩), **লোষ্ট্রপাত** (৫৪), **মনোবাঞ্ছারাশি** (৫৪), **পরিদৃশ্যমান** (৫৬), **অপসৃয়মান** (৫৮), **দীর্ঘিকা** (৬২), **প্রসন্নতাপিয়াসী** (৬৩), **সঞ্চয়িত** (৬৬), **মুমুক্ষা** (৬৮), **গ্রাসচ্ছলনা** (৬৮), **দংষ্ট্রা** (৭১), **উর্ণাময়** (৭৮), **অনুধাবনীয়তা** (৭৮), **মুষ্ট্যাঘাত** (৭৯), **চালচিত্র-নিষ্পন্ন** (৮১), **সাশ্রয়চ্যুত** (৮৩), **সংরচন** (৮৩), **পুনরভ্যুত্থিত** (৮৪), **নিষ্ক্রন্দিত** (৮৪), **অননুসৃতি** (৮৬), **প্রোষিতভর্তৃকা** (৮৮), **কাংস্য** (৯৩), **নিশ্চেতন** (৯৬), **পরিপ্লুত** (৯৭), **অমিততেজা** (৯৯)।

এই তালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে আরো বেশ কিছু শব্দের নমুনা, নির্মাণ ও প্রয়োগের অভিনবত্বে যেগুলি শক্তির শাব্দিক দক্ষতা ও নিয়মনিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ :
আমিষদষ্ট (উৎসর্গ কবিতা), **সংশয় সুবাদী** (৬), **গোলাপ স্থাপিত** (১৪), **অনচল** (১৭), **মর্মরস্তবক** (১৮), **বাহবাস্ফোট** (২০), **বাস্তু-বিভাজন** (২৫), **অতিবিজড়িত** (৩৫), **অমনোযোগিতাময়** (৩৯), **স্বাগতসাপেক্ষ** (৪৫), **অভিসন্ধিমূলময়** (৪৬), **ক্রমক্ষীয়মানময়** (৫১), **অশ্বঅক্ষরেখাব্যাপ্ত** (৪৬), **অশ্রুপাতবদ্ধ** (৫০), **অনুভাবনীয়** (৫২), **পেটি-বাবুয়ানি** (৫৪), **বিষাদ-প্রহৃত** (৫৯), **আশির গোড়ালিনখ** (৬৮), **সৃপ্যমান** (৭১), **প্ল্যানচেট-পাথর** (৭৮), **ভালোবাসাসঙ্কুল** (৮১), **নাট্য-প্রতিনাট্যবোধ** (৮৬), **মেখলাসুনীল** (৮৮), **প্রত্যন্ত ভূমি** (৮৯), **প্রকৃতি-প্রাক্তন** (৯৯), **আজন্ম সম্প্রতি** (১০০)।

শব্দের প্রতি কতখানি প্রবল টান থাকলে এবং শব্দ নির্মাণ ও যোজনার বিধিনিয়ম কত অনায়াস আয়ত্তে থাকলে কবির পক্ষে এমন সমারোহ সৃষ্টি করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। চেনা-অচেনা তৎসম শব্দ ও দুই বা ততোধিক শব্দের সমবায়ে গঠিত ধ্বনিগাম্ভীর্যমণ্ডিত সাধিত ও যৌগিক শব্দ ব্যবহারে শক্তির আগ্রহ ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় নিচের তালিকায় সঙ্কলিত উদাহরণগুলি থেকে :

ঘাগরার **ঔদাস্য** (৪), **মুহূর্তমণ্ডিত** দিনগুলি (৯), **মর্মরগঠিত** আয়োজন (১৪), **ভেদাভেদময়** মনস্তাপ (১৫), অসম্ভব **মর্মরস্তবক** (১৮), জীবনের **শাসনপ্রধান** তালিবনে (২০), **প্রতিঘাতী** সিঁড়ি (২২), মানসিক **বাস্তু-বিভাজন** (২৫), নূপুরের **আক্রমণভার** (২৮), **অতিবিজড়িত** শালবনে (৩৫), **নাশকতাহীন** নারী (৩৫), **ঐতিহ্য-গঠিত** নৌকা (৩৯), **অমনোযোগিতাময়** সিঁড়ি (৩৯), কড়াইশুঁটির **প্রস্রবণ** (৪০), **উপদ্রবময়** উঠানে (৪৪), **স্বাগতসাপেক্ষ** মূল্যবান (৪৫), **পুণ্যচ্ছায়াহীন** দ্বীপে (৪৬), **অভিসন্ধিমূলময়** মানুষের প্রাণের জিজ্ঞাসা (৪৬), **আ-পরিপ্রেক্ষিত** প্রেম (৪৯), **অশ্রুপাতবদ্ধ** পদতলে (৫০), মানুষের চিৎ-সাঁতারের **মনোবাঞ্ছারাশি** (৫৫), প্রভাতের **মনস্বিনী** আলোর মঞ্জরী (৫৭), **সংঘবদ্ধ** ঘাস (৬০), গায়ের সমস্ত **মুগ্ধকারী** আবরণ (৬৩), নৈরাশার **অননুমোদিত** নিমগ্নতা (৬৭), **বদ্ধমূল স্ববিরোধী** খেয়া (৬৮), খেলা-দরজা **যাঞ্ছাহীন** (৭০), **সৃপ্যমান** জগৎসংসার (৭১), **অনুধাবনীয়** অন্ধকারে (৭৮), **ভালোবাসাসঙ্কুল** ধমনী (৮১), রীতির **সাশ্রয়চ্যুত** বার্তা (৮৩), **মেখলাসুনীল** মিনে (৮৮), **কাংস্য** মুটেঅলা (৯৩), **প্রকৃতি-প্রাক্তন** রাজধানী (৯৯)।

চিহ্নিত শব্দগুলি শক্তির শব্দসৃজন ও প্রয়োগ দক্ষতার নির্দশন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় কিভাবে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দগুলিকে একেবারে ভিন্ন তাৎপর্য ও অনুভবের একটি শব্দের

আগে বা পরে বসিয়ে সন্নিহিতির আশ্চর্য চমক তৈরি করেছেন শক্তি। সন্নিহিতির অভিনবত্বে এইভাবে হয়েছে অর্থের প্রমুখন।

মূলত সাধু ভাষারীতি ও গুরুভার তৎসম শব্দাবলীর শিঞ্জিত ঝঙ্কারে মণ্ডিত যে কাব্যসঙ্কলনের আবহ তাতেও স্থান পেয়েছে অশিষ্ট, অনভিজাত তথা গ্রাম্য কথ্যরীতির কিছু শব্দ, সঙ্কর শব্দ ইত্যাদি। তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, অশিষ্ট, দেশি ও বিদেশী নানা শব্দের বিচিত্র ব্যবহারে সজীব ও বহমান প্রাত্যহিকতার যে ভাষা তাকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া শক্তির জীবনযাপন ও কবি-স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁর কৈশোরকাল অবধি কলকাতা শহর থেকে দূরে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে, তার ভাষা-সংস্কৃতি-অভিজ্ঞতার পরিসরে বেড়ে উঠেছিলেন যে কবি, তাঁর রচনায় গ্রামীণ ও দেশজ উৎস থেকে শব্দেরা আসবেই। আবার ষাট দশকে 'কৃত্তিবাস'-'হাংরি'-'বিটনিক' আলোড়িত মহানগরীতে এক তুমুল বেপরোয়া জীবনযাপনে প্রবাদপ্রতিম কবির কাছ থেকে কিছু কটু বা কুরুচিকর শব্দও অপ্রত্যাশিত ছিল না। 'উৎসর্গ কবিতা'য় শক্তি ব্যবহার করেছিলেন 'চাঁড়াল' ও 'কিমা'। এছাড়া অন্যান্য রচনায় এসেছে অনুরূপ কিছু কর্কশ অশিষ্ট ও সাধারণভাবে কবিতায় অপাংক্তেয় কিছু শব্দ :

(১) যেন মানুষের মোক্ষমাত্র *মরে হেজে* যাওয়া (৩)

(২) পারো *ন্যাংটো হয়ে* রুক্ষ দর্পণের/সামনে দাঁড়াতে? (৩)

(৩) একমাত্র সাক্ষী এই আমরা তিন *উল্লুক কাঁহাকা* (২৬)

(৪) *পোঁদের জ্বালায় হু হু করতে-করতে* দিক্‌বিদিকহারা (২৬)

(৫) ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার/*আখাম্বা গতর* কেড়ে নিয়েছিল আদি পুরস্কার (৩৩)

(৬) কী ভয় করছে রে *শালা*.... (৩৬)

(৭) চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, *লাথি মারবো পোঁদে* (৩৬)

(৮) শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে, *হিসি* করে বুকে (৯৫)

(৯) ...গায়ে জামা নেই, *নুঙ্কু নতমুখ* (৯৫)

(১০) *পোঁদের কাপড় তুলে* ছেঁকা দিই.... (৯৯)

তৎসম শব্দের অসম্ভব প্রাচুর্য ও সাধুভাষানুগ কাব্যরীতির সচেতন প্রয়োগের দ্বারা একদিকে যেমন শক্তি তাঁর কাব্যের আবহটিকে প্রাত্যহিকতার সীমা থেকে দূরে নিয়ে গেছেন, তেম্‌নি আবার অশালীন শব্দের বেপরোয়া প্রয়োগে পরিশীলিত ভাষা ও শৈলীর শোভনসুন্দর মসৃণতা প্রায়শই ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছেন। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আততায়ীসুলভ আক্রমণ শক্তির কবি-স্বভাবের একটি বিশেষ দিক। বিষয়ের ক্ষেত্রে তো বটেই, শব্দ-প্রকরণের এই শুচিবায়ুহীন, নিম্নসীমালঙ্ঘনকারী চালেও আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করা চার যুবার অন্যতম এই কবির।

সংখ্যায় কম হলেও গ্রামীণ অথবা কথ্যরীতির কিছু শব্দ, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত অতিথি শব্দ এবং কয়েকটি সঙ্কর শব্দও এ কাব্যের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে :

(ক) **গ্রামীণ/কথ্যরীতির শব্দ**— গতর, তুবড়ে, কানি,রাঁড়ি, ভজানো, কেত্তন, চিক্কুর, চক্কর, ফক্কিকারি, হিঁচড়ে, গেরস্ত, পাঁশ।

এই শব্দগুলি সবই তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশজ শব্দ।

(খ) **অতিথি শব্দ—** ট্র্যাপিজ্, এপিটাফ্, অরফ্যান, ক্যাম্প, কিউ, মফ্-চেন, রায়টাস, ট্রেজন-মার্ডার-লুট, মার্বেল, পিকনিক, ক্লাসরুম, অ্যাভিনিউ, ইমারত, আস্তিন, তুফান, ফানুস, তদবির।

এই শব্দগুলির অধিকাংশই ইংরেজি থেকে সংগ্রহ করা ; আরবি, ফার্সি ইত্যাদিরও কিছু শব্দ এই তালিকায় রয়েছে। 'রায়টাস' কিম্বা 'ট্রেজন'-এর মত শব্দ যা সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে বিশেষ অচেনা, শক্তি সেসব শব্দকেও স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালে কবিতায় টেনে এনেছেন।

(গ) **সঙ্কর শব্দ—** অ্যাঙ্করহীন, ইমারতবন্ধ, ম্যুজিয়ম-লুণ্ঠিত, তদবির-ভরা, পেটি-বাবুয়ানি, প্ল্যানচেট-পাথর।

জীবনানন্দের শব্দ ও ভাষারীতির কাছে শক্তির ঋণ এ কাব্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সংখ্যাগতভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুপরিচিত শব্দ শক্তি ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'অয়ি', 'করোজ্জ্বল', 'উতরোল', 'তরী', 'মনোহরণ', 'বারি', 'হিয়া', 'বক্ষোপরে' প্রভৃতি। জীবনানন্দের কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের গান ছিল শক্তির সৃজন ও দিনযাপনের দুই দিক্‌চিহ্ন।

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি গ্রন্থে সঙ্কলিত পনেরোটি চতুর্দশপদী কবিতা ও দুটি দীর্ঘ কবিতায় সাধু ভাষানুগ কাব্যরীতি এবং তৎসম শব্দের ঝঙ্কার লক্ষ্য করা যায়। শক্তি স্বয়ং এই রচনাগুলির একটি শিরোটীকায় উল্লেখ করেছেন যে এগুলি তাঁর একেবারে প্রারম্ভিক পর্বে (১৯৫৫-৫৮) রচিত হয়েছিলো। গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য কবিতাগুলি—**চাইবাসা ১৯৬২** ব্যতীত—সহজ কথ্যভঙ্গিতে লেখা ; গাম্ভীর্যমণ্ডিত, ওজনদার তৎসম শব্দের আধিপত্য থেকে সরে এসে যেন আপাতস্বচ্ছ অথচ ইঙ্গিতময় ভাষার সন্ধানে ব্যাপৃত কবি। পনেরোটি চতুর্দশপদীর মধ্যে ছ'টি (১, ৩, ৮, ১২, ১৩, ১৫) ইতোপূর্বে প্রকাশিত *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-তে স্থান পেয়েছিলো। বাকি ন'টি রচনার মধ্যে সাধু এবং সাধু-চলিতের মিশ্ররীতি পূর্বে আলোচিত জীবনানন্দীয় প্রকরণের প্রভাব-বলয়টিকে সূচিত করে। এই 'চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে' সাধুরীতির ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সচেতন প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়—'ভালবাসিত', 'ছলিবে', 'ভুলিতে', 'ভাসিল', 'জানিতে,' 'তোমারে', 'আমারে', 'মোর' প্রভৃতি। তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ ও প্রত্যয়নিষ্পন্ন ধ্বনিগাম্ভীর্যময় বেশ কিছু শব্দও এই চতুর্দশপদীগুলির ভাষাকে প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা থেকে এক শৈল্পিক দূরত্বে স্থাপন করে, যথা—'পিপাসাপ্রযত্ন', 'অগ্রসরমান', 'পশ্চাদ্ধাবিত', 'অভিক্ষেপ', 'সংস্রবহারা', 'পদযুগ', 'অশ্রুবদ্ধ', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'অদ্যোতিত', 'বন্ধন-মুমুক্ষাসম', 'ফেণপুঞ্জ', 'বিদ্যুল্লতা' ইত্যাদি। তবে এই সনেটগুলিতে কথ্যরীতির বা গ্রাম্যতাগন্ধী শব্দ শক্তি সর্বাংশে পরিহার করেছেন এমন নয়। 'নেচে কুঁদে', 'তেরাত্রি', 'ভজে যাই', 'অপোগণ্ড', 'গোটকাঁখে' প্রভৃতি উদাহরণ শক্তির শব্দব্যবহারে সংস্কারবর্জনের প্রমাণস্বরূপ।

চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ এবং **চাইবাসা ১৯৬২** বাদ দিলে এ কাব্যের অন্যান্য রচনায় আটপৌরে তথা গ্রামীণ শব্দ, দু-একটি ক্ষেত্রে অপভাষা-ঘেঁষা শব্দ, কথ্যরীতির ক্রিয়াপদ ইত্যাদি বিশেষ নজরে পড়ে :

(১) '*উস্কোখুস্কো* ভেড়ার পাল' (**আজ আমি**) ; (২) 'কাজকর্মে *ভুলচুক্*' (**ঐ**) ; (৩) '*ফাউরি* দিতো সে' (**অন্ধকার করিডোরের এককোণে**) ; (৪) 'একটা তৎক্ষণাৎ *রেডিসেডিভাব*' (**মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট**) ; (৫) 'নিজেরা তো *নট নড়ন চড়ন ঠকাস্*' (**দেখি, কে হারে**) ; (৬) 'কানে

এট্টু তুলো *দে বসো বাপু'* (ঐ) ; (৭) 'এখন আমিই *শালা* বাঁচছি' (ঐ) ; (৮) '*ঐ ব্যাটা কেলে* কুষ্মাণ্ড' (ঐ) ; (৯) 'আমি *চুপকি দিই*' (**পিছনে চলেছে, থাকে দূর**) ; (১০) 'সেই *হাকুচ্‌-তেতো* পাতাগুলো' (**অনাময়ের স্মৃতি**) ; (১১) 'দরজা বন্ধ থাকলে তোমাকে ডাকতে *পারতুম, বলতুম.....*' (ঐ) 'পুরীর ঝিনুক-ছাঁকা ফেনার *চোরাই মাল* (**প্রতিবিধান**)। অশিষ্ট, গ্রাম্যতাদুষ্ট তদ্ভব শব্দ, বিকৃত উচ্চারণে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ শক্তি ব্যবহার করেছেন প্রায়শই। ভাষার আভিজাত্যকে যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই ক্ষুণ্ন করতে— **মাই, কোঁৎ, মুচ্ছুদি, সেখেন, অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে, সেগেন-থট, থোক্** ইত্যাদি। যেন সাধারণ স্বল্পশিক্ষিতের মুখের ভাষার সঙ্গে এক আত্মীয়তা শক্তি কৌলীন্যবাদী নাগরিক পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরতে বিশেষ উৎসুক। সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও কিছু কিছু ওজনদার, সমাসবদ্ধ শব্দ অবশ্য এইসব আটপৌরে শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে ভিন্ন গোত্রের সতীর্থরূপে, যেমন, 'সর্বাবয়ব', 'সম্ভ্রমজড়িত', 'সন্নিধি', 'জড়তামুখীনা', 'অভিজ্ঞতাভার', 'অপচ্ছায়া', 'করতলগত' ইত্যাদি। এছাড়া 'ভবিষ্যৎ-গাড়ি' কিম্বা 'বেতারমুগ্ধ' আমাদের চিনিয়ে দেয় শব্দপ্রয়োগে শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতা। পরিচিত শব্দের যোজনায় নতুন শব্দের সৃষ্টি।

তবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চালে কখনো কখনো শক্তি কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন পাঠককে চমক দিতে চান উদ্ভট শব্দের দুর্গম হেঁয়ালিতে। **পোকায় কাটা কাগজপত্র** কবিতার এই লাইনগুলিতে দেখতে পাই শক্তির এক খেয়ালিপনা—'পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে— *ফ্যানজোলেঙ্গা*/অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত/উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত—/হেন্ করেঙ্গা, তেন্ করেঙ্গা!' এখানে 'ফ্যানজোলেঙ্গা' শব্দটি অবশ্যই ছন্দের তথা অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে এসেছে। এই কবিতারই অন্যত্র শক্তি ব্যবহার করেছেন 'হোহেনজোলার্ন' শব্দটি যা এক জার্মান রাজবংশের নাম এবং যা সাধারণ পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলবে। 'মার্টিন ও বার্ন'-এর সঙ্গে মিলের শর্তে মানানসই বলে মনে হলেও 'হোহেনজোলার্ন'-এর অজানা প্রসঙ্গ পাঠকসাধারণের কাছে আকস্মিক চমকের মতো ঠেকবে।

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই সাতচল্লিশটি কবিতার সঙ্কলন। এর মধ্যে দশটি সনেট এবং তার মধ্যে চারটি *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-তে প্রকাশিত। এছাড়া রয়েছে ইতোপূর্বে *তিনতরঙ্গ* শীর্ষক সঙ্কলনে (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর সঙ্গে শক্তির কবিতার সঙ্কলন) প্রকাশিত তিনটি রচনা। অবশিষ্ট চল্লিশটি কবিতার তদন্তসূত্রে বলা যায় যে কথ্যরীতি এবং তদ্ভব তথা দেশজ/গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারে শক্তির আগ্রহের কিছু কিছু নমুনা সত্ত্বেও তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের গাম্ভীর্য ও ঝঙ্কারে গড়ে তোলা ভাষা-কাঠামোটি এ কাব্যেও শক্তি বজায় রেখেছেন জীবন ও অস্তিত্বের বহুমাত্রিক অনুভবের জটিলতাকে বাচনিক রূপ দিতে। 'ঠেঙাবো' (**কিসের জন্যে**), 'ছেনে' (**দুঃসময়ে, দূরে**), 'উড়োনচণ্ডি' (**হৃদয়, মানে**), 'ঠেক্' (**তার মৃত্যু : নবেন্দুর স্মৃতি**), 'গতর' (**বাঘ**), 'দড়ো-জড়' (**পিছনে-পিছনে**), 'ত্যানা' (**তার কাছাকাছি**), 'গোবেড়েন' (**ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ**) ইত্যাদি শব্দ কথ্যরীতির অনভিজাত ও গ্রামীণ অভ্যাসজারিত শব্দসমূহের প্রতি শক্তির সহজাত আকর্ষণের প্রমাণরূপে গণ্য হলেও তৎসম শব্দ ও শব্দবন্ধ, অপ্রচল আভিধানিক শব্দ এবং স্বরচিত সমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগের প্রবণতা এ কাব্যের ভাষারীতির মূল চরিত্রটি নির্ধারণ করেছে :

(১) মানুষের সাবধান *পদচারণা*-র মতো *ধ্যেয়* (**উঠে যাই, দেখে আসি**)

(২) *কালবিনাশী সহাস্যতায়* /নদীতে বাঁধ বাঁধলে কথায় (**শব্দ শুধু শব্দ**)

(৩) মানুষের তাঁত এখনো *নিষ্পন্ন* প্রেমে **(অন্ধ শুধু)**

(৪) *স্পন্দনবিহীন* স্থির *রোষ/চুম্বনের* মধ্যে পেয়ে *তড়িৎ-তাড়িত* আশুতোষ/সংস্পর্শ **(পাথরে পাথরে)**

(৫) এই ভাষা চিরস্থায়ী বাংলা নয়.....*মুহূর্তজাতক* **(ঘর ধরে মন্দিরের চূড়া)**

(৬) কোনো *তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার* মোহে/আমাকে যেতেই হবে, *পূর্ণাপূর্ণ*, প্রাণে ও অপ্রাণে **(শুদ্ধসীমা থেকে)**

(৭) পলেস্তারা খসাবো *পীযূষে* **(মুহূর্তে শতাব্দী)**

(৮) যেন পাতাটাও/রেহাই পায় না *বৃক্ষ-সমগ্রতা* **(পিছনে-পিছনে)**

(৯) সঙ্গী বরং *কলধ্বনির* ভিতর-বাহির *কৌতূহলের*/মধ্যে আমিই *ময়ূরবাহন*, প্রতীক-প্লুত বর্ণমালার/সুগন্ধ ফুল, হলুদ পরাগ, কিংবা পোড়া হৃদয়জ্বালার/অবশ্য *ক্রোধ*, *সিক্ত* হব *নির্নিমেষের* বৃষ্টিজলে **(শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি)**

(১০) যেন *নিগৃহীত* কোন্ পলাতক বালক বিদেশে/বিচ্ছিন্ন *সংবিদে* স্থির **(ভোর কাছাকাছি)**

(১১) কেউ বা ছিলো *কপোতাক্ষ*, কেউ হয়েছে *ক্ষীণগবাক্ষ* **(সে তার প্রতিচ্ছবি)**

(১২) *পারম্পর্যহীন* যে নৌকা ভাসানো জলে তার ডুবো *দ্যোতনার* মত/গভীর অক্ষর সব **(কবিতার কাল)**

ধ্বনিময় ও গম্ভীর এইসব বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ শক্তি ব্যবহার করেছেন উপলব্ধির গূঢ় তাৎপর্যকে এমন এক শাব্দিক লাবণ্যে নিষিক্ত করতে যা কেবলমাত্র আটপৌরে শব্দের সরল প্রাত্যহিক বিন্যাসে সম্ভব ছিলো না। 'রোদন', 'সৃজন', 'সাশ্রু', 'ওজস্বী', 'অগ্নি', 'স্মরবিরহ', 'সমুৎপন্ন', 'নিরাত্মীয়', 'অশ্রুসিক্ত', 'স্পৃষ্ট', 'চিত্রার্পিত', 'মিলনাতুর', 'নিবন্ধন', 'কালহরণ' প্রভৃতি সাধুরীতির গুরুভার শব্দের অনায়াস প্রয়োগে শক্তি রবীন্দ্রোত্তর কবিতার ধ্রুপদী ও তৎসম শব্দনির্ভর কাব্যভাষার স্বাভাবিক উত্তরসাধক। বিক্ষিপ্তভাবে তদ্ভব, দেশজ ও গ্রামীণ শব্দ উঁকি মারলেও কবিতার অন্তর্বয়নে তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দেরা অনেক বেশি অর্থবহ। **ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ** নামক সনেটটি পরীক্ষা করলে এর সমর্থন মিলবে—

> আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে....
> যে-আমি একদিন তাকে আগাপাছতলা পেটাতাম
> উত্তাল রাস্তার মধ্যে, কিংবা কানাগলিতে ঢুকিয়ে
> কষে গোবেড়েন্ দিয়ে রক্তচক্ষু ভূমধ্যদলিত
> করতাম, এখন তার দুঃখে আমি দুঃখী, অনুতাপী—
> আমার হলো কী হাল, ভগবান এ-বৃদ্ধবয়সে!
> বস্তুত আমি কি মৃত? অধিকন্তু মর্মরধ্বনিত?
> ভাঙাবাড়ি, নীলাঞ্জনশ্যামটানে কবিত্বে চুরমার?

উদ্ধৃত এই অষ্টক অংশে 'আগাপাছতলা পেটাতাম' এবং 'কষে গোবেড়েন্ দিয়ে' গ্রাম্য কথ্যরীতির নমুনা হলেও এ কবিতার মূল ভাষাকাঠামোটি নির্ভর করে আছে আভিধানিক ও তৎসম শব্দের ব্যবহার ও তাদের অভিনব সন্নিহিতির ওপর—'শব্দের নিজস্ব অনুতাপে', 'রক্তচক্ষু ভূমধ্যদলিত', 'অধিকন্তু মর্মরধ্বনিত', 'নীলাঞ্জনশ্যামটানে' ইত্যাদি। এই সনেটের

'ষট্‌ক' অংশেও কবিতার গঠন ও তার অনুভবকে বাঙ্‌ময় করে তোলে 'প্রসিদ্ধযৌবনে', 'কারুণ্যলাঞ্ছিত', 'পিতৃদুঃখ' প্রভৃতি কবির স্বরচিত, কাব্যসৌন্দর্যময় সমাসবদ্ধ শব্দগুলি। পরিচিত ধ্রুপদী বা তৎসম শব্দের সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় জুড়ে দিয়ে শক্তি তৈরি করেছেন বিশেষণ পদ, যেমন '*দর্প-দপ-দপে* মুখের.....' ; বহু-ব্যবহৃত একটি সহজ গদ্যময় শব্দের আগে বসিয়ে দিয়েছেন কিছুটা অপ্রত্যাশিত ও আবেগসূচক বিশেষণ—'*উত্তাল* রাস্তার মধ্যে'।

এই গ্রন্থের অন্য একটি কবিতায় শক্তি তৎসম শব্দের কথ্য তথা কোমল রূপ ব্যবহার করেছেন ছন্দের প্রয়োজনে এবং কবিতার আর্ত অনুভবের নমনীয়তাকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে—'বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো/*দুয়ার* খুলে দেখিনি—ওই একটি *পরমাদ* ছিলো।/যখন তুমি দাঁড়াও এসে/*আন্ধারে-রোদ্দুরে* ভেসে/হাসির *ছটা* ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো..../ও মন দরদ দিয়েছো তায়/রাত-ভেজানো বনের লতায়/একদিবসের প্রেমে প্রখর স্মরবিরহ বাদ ছিলো'.... (**একটি পরমাদ**)। 'দুয়ার', 'পরমাদ', 'আন্ধারে-রোদ্দুরে', 'ছটা'—এইসব শব্দের কোমলতায় সমগ্র কবিতাটির সহজ স্বগতকথনের সুরটি বেজেছে। শক্তি কথ্যরীতির ক্রিয়া 'কইতে' এবং ফার্সি 'দর্দ' থেকে কথ্য প্রয়োগে কোমলায়িত 'দরদ' ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। আবার কোমল কথ্য চালে যে কবিতাটি গড়ে উঠেছে তারই মধ্যে মধ্যে শক্তি কিঞ্চিৎ ভিন্ন মাত্রার শব্দ নিয়ে এসে অনুভবী পাঠককে চকিত দোলা দিয়েছেন। কবিতার নবম পংক্তিতে 'একদিনের প্রেমে', 'প্রখর স্মরবিরহ' এবং শেষ পংক্তিতে 'হৃদয়হরণ' কবির স্বগতোক্তির আর্ত নমনীয়তাকে হাল্‌কা বিদ্রূপের ছোঁয়ায় প্রোজ্জ্বল করে তোলে।

শব্দ ও ছন্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে বিরল কৃতিত্বের দাবীদার শক্তি কিন্তু কখনো কখনো উদ্ভট শব্দসর্বস্বতার ঝোঁকে পাঠককে বিপদগ্রস্ত করেন। মিলের ছন্দের মজা উপভোগ করতে গিয়ে পাঠক আটকে পড়েন আপাত-অর্থহীন, বেয়াড়া শব্দের ফাঁদে—'হৃদয়, মানে আজ যেখানে ওই উঠেছে উরুস্তম্ভ/কিংবা বালিয়াড়ির মধ্যে ভীষণ গর্ত, ছন্দভাঙা/পাগল ছেলের গল্প যেমন, উড়োনচণ্ডি কবরখানার/দেয়াল গেঁথে বন্দী করা আত্মা—মানেই *বহ্বারম্ভ*, (**হৃদয়, মানে**)। 'বহ্বারম্ভ' ও 'উরুস্তম্ভ'—এ দুয়ের মিলের মজা সত্ত্বেও বিমূঢ় পাঠক বিব্রত বোধ করেন 'উরুস্তম্ভ' শব্দটি নিয়ে। তাঁকে অভিধানের শরণাপন্ন হয়ে জানতে হয় যে 'উরুস্তম্ভ' হচ্ছে উরুতে জাত দুষ্টব্রণ বা স্ফোটক। *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* সঙ্কলনভুক্ত কবিতাগুলিতে বিদেশী শব্দ, বিশেষত ইংরেজি শব্দের ব্যবহার খুব বেশি চোখে পড়ে না। 'স্টেশন', 'প্ল্যাটফর্ম', 'প্লাস্টার', জাতীয় চেনা কয়েকটি শব্দ বাদ দিলে একমাত্র নজরকাড়া প্রয়োগ 'এমারল্‌ড ঘর'—'মাছেদের মন আছে, স্মৃতি আছে, এমারল্‌ড ঘর/আছে নাকি'? পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ **সুখে আছি**-তেও শক্তির শব্দ-প্রকরণে কোনো নতুন মাত্রা নেই। একদিকে গুরুভার, শোভন তৎসম শব্দের আভিজাত্য ও ধ্বনিময় সৌন্দর্য ও অন্যদিকে অর্ধ-তৎসম, ক্ষেত্রবিশেষে অশিষ্ট, গ্রামীণ শব্দের সাহসী প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বিপ্রতীপ ভাষারীতির মিশ্রচালে শক্তি এ কাব্যেও সফল প্রয়াসী। তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থ *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*-এর তুলনায় বর্তমান সঙ্কলনে মৌখিক রীতির শব্দ, অনভিজাত তথা গ্রামীণ শব্দ কিছু বেশি সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে ; ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি বিদেশী শব্দও। দক্ষিণবঙ্গের পল্লী-পরিবেশে আ-কৈশোর বেড়ে ওঠার ফলে এই অঞ্চলের লোকমুখের শব্দ শক্তিকে বারবার আকর্ষণ করেছে। শহুরে শিক্ষিত মানুষের শিষ্ট শব্দভাণ্ডারে এইসব অশিষ্ট অ-নান্দনিক শব্দকে

জায়গা করে দেবার এই সচেতন প্রয়াসের আড়ালে অবশ্যই মধ্যবিত্ত পাঠক-সাধারণের প্রথাগত রুচিবোধকে আঘাত দেবার অভিপ্রায় ছিল :

(১) *হট্‌রাপেটা* চাঁদের দেশে থামে হাওয়ার বেগ **(চাঁদের দেশে)**

(২) যেভাবে ভূত নাড়ে, বুকের *রক্তটুকুন* কাড়ে **(কে সে)**

(৩) হৃদয়হরণ *বাক্যি* শোনায় আমার কাছে এসে! (ঐ)

(৪) বাসমতিয়া হাঁড়ির *পিরিত* **(আর কী ভাবে)**

(৫) উনি পরেন আঙ্গরাখা, আমার *পোঁদে* হোক না *কানি* (ঐ)

(৬) ভালই আছি, দিব্য আছি, হাবুলবাবুর *রাজত্বিরে* (ঐ)

(৭) কোথায় গিয়ে রাখছে ঢেকে/নষ্ট শুভ্র *মুখচ্ছিরি* **(বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে)**

(৮) কষ্ট হয়ত একটু হবে, এই তো *ছিরির* ঘর **(মেঘ ডেকেছে)**

(৯) এ *বাপা* গেরস্ত নয়, *আলাভোলা*, কবির আত্মীয় **(এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবো)**

(১০) *হাত মারে, হেগে যায়*........(ঐ)

(১১) *রক্ষে করো*, ঐ দিকেই তো সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে **(ঐ গুরু কাজটি)**

(১২) সর্বঅঙ্গ *ন্যাংটো* ওদের মুখগুলো আধ-ঢাকা/শুধ্ ত্রিতালে সঙ্গত করছেন *লবাব* আল্লারাখা **(জনগণের জন্যে)**

(১৩) দুহাতে *পরনামির* মতন তুলে নিচ্ছেন আস্ত (ঐ)

(১৪) তু তু করে ডাকে *ন্যাংটো* রক্তের নিজস্ব টেলিফোনে.... **(উঠোনের একপ্রান্তে)**

(১৫) ..... রেলওয়ে-লতা, *নেবুফুল*, মুখোমুখি চাঁদ (ঐ)

(১৬) কিশোরের চেনাশুনো *উলোনুলো* নাপিতের মতো এইখানে **(কিশোরগঞ্জে মামার বাড়ি)**

শোভনরুচির সমাসবদ্ধ ও প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ প্রয়োগের অভ্যাস শক্তি যে পরিত্যাগ করেন নি তা আগেই বলেছি। 'সঙ্কেতমুখর', 'আকাশসিন্ধু', 'লাক্ষণিক', 'চৈতন্যরাশি', 'পতনবিমুখ', 'অতসীকুসুমশ্যাম', 'কামিনীকাঞ্চন', 'সংশ্রবহারা', 'অনির্বচনীয়' প্রভৃতি শব্দেরা বসেছে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা তথা লোকমুখের সাধারণ, হয়তো বা অপাংক্তেয়, শব্দগুলির পাশাপাশি। অশোভন, অনান্দনিক নানা শব্দকে যেমন কবিতায় স্থান দিয়ে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করেছেন শক্তি, তেমনি আবেগ-অনুভবের সূক্ষ্ম ও জটিল পরতগুলি ধরা পড়েছে ধ্বনিমণ্ডিত, চিত্রকল্পসৌকর্যময় তৎসম শব্দ ও শব্দবন্ধের নিপুণ সন্নিহিতিতেই :

(১) পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার নিশ্বাস *ঠেলে*/ক্রমাগত অন্ধকার পড়ে **(অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে)**

(২) এখন গভীরভাবে ঘাসের ভিতরে বসে থাকা/ভাল মনে হয় এই প্রগাঢ় রোদ্দুরে **(উপদ্রুত ঘাসের ভিতরে)**

(৩) খল, শঠ, প্রবঞ্চক, হৃদয়বিহীন, বৃদ্ধা লোল/এবং কখনো টেনে গৃহ থেকে শিশুকে চাকায়/থ্যাঁতলায়, নিহত করে **(দুঃখ)**

(৪) উরুৎ, বাহু, পদ্মনাভি এবং নকল স্তম্ভ খিলান/জঙঘা, মোচড়—গর্তগুহার পার্শ্ববর্তী দীর্ঘ টিলার/মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে **(বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে)**

(৫) তার দীর্ঘ সিঁড়ি আছে অন্ধের চৈতন্যরাশি ঢেকে **(অন্ধের চৈতন্যরাশি)**

(৬) আমাদের প্রাণময় সতর্কতা পাহারা শিখেছে **(নূতন মার্বেল তুমি)**

(৭) চরিতার্থতার শেষে আছে কি বিস্ময়ে-ঘেরা দেশ?/মুক্তির সংশ্রবহারা এ দিনযাপন?

(এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে!)

এ কাব্যে কয়েকটি বিদেশি শব্দ, ইংরেজি ও আরবি ভাষার, শক্তি ব্যবহার করেছেন। শুরু থেকেই শক্তি তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ শব্দসমূহের ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ ব্যঞ্জনা বা অনুষঙ্গের তাগিদে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষার শব্দ ব্যবহারে সঙ্কোচ করেন নি। এখানে তো একটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ও হিন্দি দুটি শব্দকে পাশাপাশি জুড়ে দিয়েছেন :

(১) চাঁদবেনে উড়ে যায় কোঙ্কন সিংহল/*ব্লিজার্ড*! *ব্লিজার্ড*! **(এই বাংলাদেশে ওড়ে......)**

(২) মাছরাঙাদের মতো ওড়ে *পেটিকোট* **(ঐ)**

(৩) দেয়ালে দেয়ালে জমা *ম্যাজেন্টা* ও *ক্রিমজন* **(ঐ)**

(৪) ডাবের নৃমুণ্ড প'ড়ে ইতস্ততঃ, *জিগজ্যাগ ট্রেনচ* **(কিশোরগঞ্জে মামার বাড়ি)**

(৫) শরীর *তছরূপ* করে পায় আনন্দ, আনন্দ! **(এখানে কবিতা পেলে.....)**

(৬) উদোম পাঁজরে লাগে বৈদ্যুতিক পাখার ঝাপট,/বরফ, *ফ্রিজের পানি* **(অবাস্তব মার্চ মাস)**

'মনসামঙ্গল'-এর চাঁদ বেনে ও অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী কোঙ্কন ও সিংহলের পাশে প্রবল হিমঝঞ্ঝার এক বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ এনেছে 'ব্লিজার্ড' শব্দটির দু'বার প্রয়োগ। এই 'ব্লিজার্ড' শব্দটি জীবনানন্দে পূর্বেই ব্যবহৃত। মাছরাঙাদের সঙ্গে উপমিত উড়ন্ত পেটিকোট যে দৃশ্যরূপ নিয়ে আসে, 'পেটিকোট'-এর সম্ভাব্য কোনও বাংলা সমার্থক শব্দে তা আদৌ সম্ভব হত না। 'ম্যাজেন্টা' ও 'ক্রিমজন' শব্দদুটি লাল রঙের যে বিশেষ উজ্জ্বল উদ্ভাস ফুটিয়ে তুলতে পারে তা কি সমার্থক শব্দ দিয়ে করা সম্ভব? এ দুটির সঠিক সমার্থক শব্দ বাংলাভাষার প্রাত্যহিক বাচনে আছে কি? 'জিগজ্যাগ ট্রেনচ'ও অনুরূপ একটি বাক্যাংশ যাকে বাংলায় বাচনিক রূপ দিতে গেলে বাক্যাংশের ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতাই হারিয়ে যাবে। আরবি শব্দ 'তছরূপ'কে শক্তি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই কবির আত্মনিগ্রহের প্ররোচনা বোঝাতে 'তছরূপ'-এর থেকে আর অর্থবহ শব্দ তিনি খুঁজে পান নি।

ঈশ্বর থাকেন জলে-র কবিতাগুলিতে তৎসম শব্দ ও তৎসম শব্দনির্ভর সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে। বাক্যের কথ্য চাল ও মৌখিক রীতির সাধারণ তদ্ভব/অর্ধ-তৎসম শব্দের সঙ্গে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন ওজনদার ও স্বল্পজ্ঞাত তৎসম শব্দ। **সাম্প্রতিকী ১৯৬৬** কবিতাটিতে আগাগোড়া অন্ত্যমিলের ছন্দে, ছড়ার চালে, মুখের কথার ঢংটি ধরে রাখলেও তার মধ্যে অকস্মাৎ এমন এক বিপ্রতীপ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন যা বিশেষ লক্ষণীয়—'বুকের মধ্যে চাষ করেছি একপো প্রেমের ধান/তার আবার খাজনা কত/কার যে সর্বনাশ করেছি *স্বতই সন্দিহান*/সে ভুলের বাজনা কত' এবং '...অল্পস্বল্প বিদেশে যান দেশের বাজার মন্দা/খাদ্য চেয়ে করছি মাটি— *শিল্প যোজনগন্ধা*'। কথ্যরীতি ও চারপাশের সদা-ব্যবহৃত শব্দের তুচ্ছতা ও চাপল্যে যদি কবিতার ভাবনাটি শিথিল হয়ে পড়ে তাই 'স্বতই সন্দিহান' এবং 'শিল্প যোজনগন্ধা'র মত অনুপ্রাসযুক্ত ও অপ্রচল শব্দবন্ধ নিয়ে এসেছেন শক্তি। **ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র** কবিতায় কথ্যরীতির

সাধারণ শব্দ ও ব্যঙ্গাত্মক তথা অবজ্ঞাসূচক শব্দের সঙ্গে অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করেছেন তৎসম শব্দনির্ভর সমাসবদ্ধ পদ ও স্বরচিত শব্দ—'মাথার পেছনে, অর্থাৎ পায়ে সাপ-খোপ-মেশা তরুণ ছুকরি/ *আলস্যে* ঘাসে চিৎ *হয়ে* আছে *কনকখচিত* বেতের টুকরি/অর্থাৎ *কণা-কবিত্ব* শেষ, ঝোড়ো চাপা বনবকুল গন্ধে/*আতঙ্কে* মনে *ভালবাসনায়* সাঁতার কেটেছে *ব্যাকুল* অন্ধ।' 'সাপ-খোপ-মেশা', 'ছুকরি', 'টুকরি', 'ঝোড়ো' প্রভৃতি শব্দের পাশাপাশি শক্তি নির্বিবাদে প্রয়োগ করেছেন 'কনকখচিত', 'ভালবাসনায়' ও 'ব্যাকুল'-এর মত শব্দ। তৎসম শব্দ নির্বাচন ও বাক্যে সেইসব শব্দের অপ্রত্যাশিত বিন্যাসে শক্তি কিভাবে কবিতার ভাষাকে প্রাত্যহিকতার সীমার বাইরে নিয়ে যান তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় **এদেশ দেবে না ধরা** কবিতায়—'কিছুতে যাবে না ধরা, আলেয়ার মতন উত্তরে/ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণ-বুদ্ধের আলেখ্য? নাকি ঝড়ে/করুণ কামিনীগন্ধ তাৎক্ষণিক? পরলোকপ্রিয়/এদেশ দেবে না ধরা। সাঙ্কেতিক কিন্তু রমণীয়।' 'কামিনীগন্ধ' এই সমাসবদ্ধ বিশেষ্যপদটির আগে ও পরে 'করুণ' ও 'তাৎক্ষণিক' দুটি বিশেষণ পদ এবং 'এদেশ' শব্দের আগে কিছুটা নতুন ধাঁচের অথচ ওজনদার বিশেষণ 'পরলোকপ্রিয়' শক্তির সতর্ক শব্দানুশীলনের নিদর্শনস্বরূপ। জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্ব বিষয়ক এক সংহত আবেগের কবিতা **যে যায় সে দীর্ঘ যায়** তৎসম শব্দ ব্যবহারের গভীরতা ও আভিজাত্যে অনেকটা সাধু ভাষারীতির কাছাকাছি। জীবনানন্দের ভাষার মননগাম্ভীর্য এখানে শক্তির রচনায় বিশেষভাবে অনুভূত হয়—'মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূ-মধ্য তিমিরে/লুকোতে চেয়েছে বলে আরও দীপ্যমান হয়ে ওঠে—/আশা দেয়, ভাষা দেয়, অধিকন্তু, স্বপ্ন দেয় ঘোর।' তৎসম শব্দের বহুল অথচ স্বচ্ছন্দ প্রয়োগের একটি উদাহরণ **তুমি তারই পূজা আজ নেবে** কবিতাটি। ছাব্বিশ লাইনের এই কবিতায় তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রায় তেষট্টি। অবশ্য এই শব্দগুলি সবই আমাদের পরিচিত ; পাঠককে বিভ্রান্ত-করা দুরূহ, নিরীক্ষাধর্মী শব্দ নয় ; যেমন, 'জন্মাবধি', 'অকস্মাৎ' 'করতলগত', 'মুহ্যমান', 'অধিকন্তু', 'শ্বেতশুভ্র', 'শোকতপ্ত', 'স্মরণকার্য' ইত্যাদি। অপর একটি রচনা **পরমেশ্বর তুমি**-তে অবিরল প্রবাহে ব্যবহৃত হয়েছে ধ্বনিময়, গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদসম্ভার—'নভোজায়মান চিলের নীলিমা', 'অপরিবর্তনপ্রিয়', 'সহচরকরহস্তে', 'ভ্রমণকালীন', 'পরিস্ফুটন', 'আত্মগ্লানিভরা', 'আপৎকালীন', 'অতিক্রান্ত উল্লোল নীলিমে'।

মনন ও অনুভবের গভীরতাকে বাচনিক সিদ্ধি দিতে, ধ্বনিময়তা ও চিত্রকল্পের ঝঙ্কার ও সুষমা পরিস্ফুট করতে শক্তি তৎসম শব্দ তথা বাক্যাংশের সচেতন ও বিশিষ্ট প্রয়োগের বহু উদাহরণ উপহার দিয়েছেন এ কাব্যে। এ জাতীয় নির্বাচন ও শব্দের সন্নিহিত বিন্যাসে স্বকীয়তা ও প্রথা বিসর্জনের চেষ্টা পাঠককে আলোড়িত করে—'কঠিন সন্নিধানে' (**সে কই?**), 'সঙ্গহীন মণীষা' (**ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র**), 'রূঢ় সুষমার পংক্তি' (**কবির মৃত্যু**), 'সংঘর্ষসমীপে' (**ঘাসের ভিতর ঘাস**), 'তৃষিত কল্পনাপ্রবণতা' (**বিদায়বেলা**), 'তাপতমসা' (ঐ), 'আভাসময় রক্ত' (ঐ), 'পরতন্ত্রশীল' (ঐ), 'দ্বাররুদ্ধ প্রাণ' (**কার জন্য এসেছেন**), 'সুপারিসঙ্কুল' (**স্মৃতিচিত্রশালা**), 'রেখা ও বর্ণিকাভঙ্গে গাঢ়' (**কী সুখ, গভীর দুঃখে**), 'ভ্রাম্যমাণ শব' (**স্থির স্বাধীনতা**), 'মর্মন্তুদ জ্যোৎস্না' (**তবুও মানুষই পারে**), 'শুক্তি মনোহীনা' (ঐ), 'দুর্গচূড়' (**সবাই বাহিরে**), 'অগ্নির গণ্ডুষ' (**পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছ পড়ে বোধে**), 'আমোদ বিন্যস্ত থাকে লতায় পাতায়' (ঐ), ইত্যাদি।

শক্তির শব্দযোজনার সমীক্ষণে সর্বদাই নজরে পড়ে বিপ্রতীপের মিশ্রণ ; তুলনায় হালকা ও কথ্যরীতির শব্দের সঙ্গে ভারী, সাধু রীতির শব্দের আপাত-বিষম সমবায় :

(১) রগচটা কোন পদ্যে জবর/থাকত লেগে জাদুর ছিটে, সন্ন্যাসিনীর গোপন খবর/ *গোমাংসবৎ পরিত্যাজ্য* **(আজ সকলই কিংবদন্তি)**

(২) পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে *তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে* **(কবির মৃত্যু)**

(৩) লক্ষণীয় শুঁড় তোলে বিষণ্ণ গোধুলি-পোড়া ঢিবি/তারও শীর্ষে, *ন্যাড়া মর্যাদায়* **(পচা নষ্ট ফল আমি)**

(৪) বিপুল তাড়সে রস পান করে *বিশালাক্ষী রাঁঢ়ি* **(এ দেশ দেবে না ধরা)**

জীবনযাপনে নানা পরস্পর বিরোধিতার মতো শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও শক্তি প্রচলিত সংস্কার ভেঙে কাব্যভাষার জগতে বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। এই কাব্যে তাঁর তদ্ভব, দেশজ ও বিশেষত অনভিজাত গ্রামীণ শব্দসমূহের কয়েকটি নিদর্শন থেকে এই অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হবে— 'আদুলবাদুল', 'আদিখ্যেতা', 'উগরো', 'সট্‌কে', 'ষাঁড়া', 'মাই', 'গু-গোবর', 'ধুলোট', 'এঁড়ে', 'আমোদগেঁড়ে', 'ছুঁড়ি', 'এক-ঠেঙে', 'চক্কর' ইত্যাদি।

অস্ত্রের গৌরবহীন একা সঙ্কলনেও শক্তির শব্দভাণ্ডারে তৎসম শব্দ, স্বরচিত সমাসবদ্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যথাপূর্ব শক্তি বিভিন্ন ওজনের শব্দের অপ্রত্যাশিত বিন্যাসে আমাদের উপহার দিয়েছেন চমকপ্রদ সব বাক্যাংশ। **প্রতিক্রিয়াশীল** কবিতাটিতে এরকম অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়—

(১) '*নিরঙ্কুশ* ভয় যা কারো *চৈতন্যময় জাগে*' ; (২) 'এমন দেখেছি আমি *বিবেচনাপ্রসূত মণ্ডপে*'; (৩) '*রজঃস্বলা* দুই উরু' ; (৪) 'ভিখারির *বাচাল ব্যগ্রতা*' ; (৫) '*হিংসাপরবশ* সড়কি' ; (৬) '*উত্থানক্ষমতাহীন* মেরুদণ্ডে' ; (৭) 'এই পৃথিবীর *মূঢ়তার দ্যোতক* ইস্কুলে' ; (৮) '*সর্বজন গ্রাহ্য* ঘুণ' ইত্যাদি। এই তালিকার ভারী শব্দগুলি এবং সেগুলি যোজনার বিশিষ্টতা শক্তির কাব্যভাষাকে তাঁর অভিপ্রেত গাম্ভীর্য দেয়, প্রাত্যহিকতা থেকে দেয় সতর্ক দূরত্ব। কয়েকটি ক্ষেত্রে তো শক্তি এইসব সর্বজ্ঞাত শব্দের অনুকরণে রচনা করেন পাঠকসাধারণকে প্রলুব্ধ করার মতো অনুভব তথা চিত্রকল্পমণ্ডিত শব্দ—'অমাবস্যাময়', 'হিশেবনবিশ', 'মজ্জাতৃষ্ণা', 'প্রবাসবোধ', 'প্রজড়', 'আত্মরক্তপ্রিয়' প্রভৃতি। এইসব ভারী শব্দসমূহের সঙ্গে শক্তি কবিতার শরীরের খাঁজে খাঁজে ঢুকিয়ে দেন কথ্যরীতির কিছু শব্দ, কিছু গ্রামীণ/অশিষ্ট শব্দ—'*মাজা ভেঙে ন্যাংটো*' ; '*পেট কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যায় ঝিউড়ির* মতন'; 'মুঠিভরা *নুটি*' ; '*হেঁটোয়* ওপরে কাঁটা'।

অন্যান্য রচনাগুলিতেও নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ, যেমন, 'সনির্বন্ধ', 'নিস্ক্রান্ত', 'মালিন্যবর্জিত', 'মহামহোৎসব', 'সার্বভৌম', 'কনীনিকা' ইত্যাদি। তবে দুরূহ ও দুঃসাহসী প্রয়োগের নিদর্শন তেমন নজরে পড়ে না। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই শক্তি শব্দচয়ন বা নির্মাণ এবং শব্দগত বা অন্বয়গত বিচ্যুতির সফল প্রয়াসের সাক্ষ্য রেখেছেন :

(১) মৃত্যু হয়তো এক, হয়ত *অপৃথক*, নিশ্চিত একাকী **(যে কিশোর হৃদয়ে বসেছে)**

(২) ওর *শরণার্থী চোখ* কোনোদিন দেখতেও হবে না **(শরণার্থী বাংলাভাষা, পুনর্জন্মে)**

(৩) ওষ্ঠাগত প্রাণ, হাড়, গ্রন্থি আর *নিরুৎসব মেদ* **(ঐ)**

(৪) তারই মধ্যে কৃষ্ণচূড়া ছায়া ফ্যালে *আশ্লেষমধুর* **(কিছুক্ষণের জন্যে)**

(৫) অনুপস্থিতি আর *মরা পদচ্ছাপ* রেখে ওরা—/যাদের পেছনে ফেলে দিয়ে গেলে, তারা মনে করে/তোমার *স্বভাবস্মৃতি*...... (**মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি**)।

সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তদ্ভব, দেশজ, গ্রামীণ শব্দের কিছু নজর-কাড়া প্রয়োগ এ কাব্যেও আছে ; দু-একটি বিদেশি শব্দও অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে। 'জাঙাল', 'উড়োপুড়ো', 'উশিখুশি', 'বিক্কিরি', 'দুক্কুর', 'পেতেন', 'গুমে-ভেজা' শক্তির ভেতরে লুকিয়ে থাকা সাদাসিধে গ্রামীণ মানুষটির মুখের কথা থেকে নেওয়া শব্দ। আরবি, ফারসি ও ইংরেজির কয়েকটি শব্দকেও শক্তি বেশ স্বচ্ছন্দেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—'খেলার *নকাশি*', 'তদ্‌বির', 'লটবহর', 'জবড়জং', 'অ্যালকোহলিক'। ফারসি 'নককাশী' থেকে পাওয়া 'নকাশি' শব্দটি 'চিত্রণ' অর্থে শক্তি ব্যবহার করেছেন কিছুটা কাব্যিকতার প্রয়োজনে। তুলনায় বাকি শব্দগুলি অনেক বেশি পরিচিত ; এমনকি মদ্যাসক্ত ব্যক্তিকে বোঝাতে যে 'অ্যালকোহলিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটিও শহুরে কবি-পাঠকদের মহলে খুবই চালু শব্দ। তবে এই শব্দটি শক্তিকে বাছতে হয়েছে অন্ত্যমিলের তাগিদে—'পাতালপুরীর রহস্যে *ঠিক*/আর আমাকে *অ্যালকোহলিক/* যায় কি বলা?' (**আমাকে আর অ্যালকোহলিক**)। অবশ্যই শব্দটি অন্ত্যমিলের চাহিদা মিটিয়েও অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে হয়। আবার এই মিলের ফাঁদে পড়ে কবিকে কখনো কখনো এমন হাস্যকর শব্দ বসাতে হয়েছে যার ফলে কবিতা স্পষ্টতই নিছক '*পদ্যে*' পরিণত—'ভালবাসায় *হুলুস্থুলুস* এইভাবে তাই দুঃখ *ভুলুস*' (**দশমী**)। শক্তির শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের মস্করার প্রবণতা বা 'frivolity' ছিলো।

জ্বলন্ত রুমাল গ্রন্থের **আমি যাই** কিম্বা **একটা আলপিন পেলে হতো** কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঢং অনুসরণে কথ্য চালে লেখা। গম্ভীর ওজনদার তৎসম শব্দের চেয়ে দেশজ, আটপৌরে নানা স্বাদ-গন্ধের শব্দের সঙ্গে মুখের ভাষায় চালু কিছু বিদেশী শব্দের সাবলীল সমাহারে লেখা :

(১) এ পথে আসতেই *হবে/ছাড়ান* নেই (**আমি যাই**)

(২) *মস্করার* মাঝখানেই বৃষ্টি এলো (ঐ)

(৩) *কিউ*—মরণকালেও *লাইন/আগু-পিছুর ফাইন* (ঐ)

(৪) গোটা, মানে টুকরো টুকরো/*ফাঁক ফুকরো* (ঐ)

(৫) *পোড়ার মুখো মিনসে*/মা গো কী তার হিংসে (ঐ)

(৬) *ফুটফাট* কাজ সারবো/*টিউকলে* খাবো জল (ঐ)

(৭) চাই রুটি/*কাঁহাতক* ছুটি (**একটা আলপিন পেলে হতো**)

'ছাড়ান', 'আগু-পিছু', 'ফাঁক-ফুকরো', 'পোড়ার মুখো মিনসে', 'ফুটফাট', 'টিউকল' ইত্যাদি শব্দ একেবারে নীচুতলার পথচলতি মানুষদের মুখ থেকে নেওয়া। 'কিউ', 'ফাইন', 'মস্করা', 'কাঁহাতক'—এইসব বিদেশী শব্দও নিয়মিত ব্যবহারে সাধারণ কথ্য রীতিতে সর্বদা স্বীকৃত। এই গ্রন্থের অপরাপর কবিতায় কাব্যঝঙ্কারময়, গাম্ভীর্যমণ্ডিত তৎসম শব্দ যথেষ্টই ব্যবহার করেছেন শক্তি—'মূঢ়', 'তীক্ষ্ণধার', 'সম্পৃক্ত', 'ক্রন্দন', 'দ্রংষ্টা', 'সূচ্যগ্র', 'প্রাপণীয়', 'তেজস্বিনী', 'আলেখ্যমন্দির', 'নাতি-আলোকিত' প্রভৃতি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শক্তির আগেকার শব্দঝঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ঘনত্ব সৃষ্টির অভিনবত্ব চোখে পড়ে না। প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী আমীর খাঁ সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশে রচিত **বৃক্ষের দীর্ঘতা**-র মতো কবিতাতেই গম্ভীর ও কাব্যসুষমামণ্ডিত শব্দের শিল্পীরূপে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে এক ঝলক দেখা যায়—'তাঁর দীর্ঘ নাদময় মর্মান্তিক

স্বর/ভুবন ছাড়িয়ে ওই আকাশ অবধি/ধন্য মানুষের বোধে, হৃদয়ে, মেধায়/তীব্র বিদ্যুতের মতো মেঘের ভিতরে/তুলার ভিতরে অগ্নি জ্বলে।' অন্যথায় 'কোশ', 'চিকুর', 'ন্যাংটো', 'গাঁ-গেরাম', 'উলুকঝুলুক', 'বোঁচকা-বুঁচকি', 'কালিয়ে', 'টুটাফুটা' ইত্যাদি শব্দ দেখে মনে হয় অভিজাত তথা কুলীন শব্দাবলীর জাত্যভিমান ভেঙে দিতেই এইসব গ্রাম্য ও কিছুটা অশিষ্ট শব্দ বেছে নিচ্ছেন কবি। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের মধ্যে রয়েছে আরবি, হিন্দি এবং কিছু ইংরেজি শব্দ—'তারিফ, 'জনাব', 'কবুতর', 'ঝুট', 'ম্যানশন', 'বাইনোকুলর', 'ডলার', 'টকি' ইত্যাদি।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন শীর্ষক পদ্য-গ্রন্থনায় বিদেশি শব্দেরা প্রায় অনুপস্থিত। ইংরেজি শব্দ একেবারেই নেই। তৎসম ও তদ্ভব শব্দেরাই এ গ্রন্থের শব্দভাণ্ডারের প্রধান অংশ। 'বৃক্ষমূল', 'খরতর', 'পূর্বাপর', 'নির্নিমেষ', 'করতল', ইত্যাদি তো শক্তির বিশেষ পছন্দের শব্দ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য 'তৃণাঞ্চল', 'বল্মীকস্তূপ, 'দুঃস্মৃতি', 'সংস্রব', 'কলুষ-ক্লিন্ন', 'তন্মুহূর্তে', 'অন্তরীক্ষ', 'অতসীকুসুম', 'গন্তব্যবিহীন', 'ক্ষুৎপিপাসা' প্রভৃতি ওজনদার, অনেকক্ষেত্রেই চিত্ররূপের অনুষঙ্গ বাহী, ধ্বনিগাম্ভীর্যযুক্ত শব্দ। আবার এদের পাশাপাশি বলা যেতে পারে কিছু অর্ধ-তৎসম বা দেশি শব্দের কথা—'কইলে', 'কালি', 'ছিরি', 'পচাই' ইত্যাদি। আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে 'অসহজ', 'অমূল' এবং 'অনভিনিবেশ'-এর মতো নঞর্থক শব্দ। জীবনানন্দে বহু-ব্যবহৃত সাধুরীতির সর্বনাম 'তাহার' দুটি জায়গায় ব্যবহার করেছেন শক্তি ; অন্যত্র কথ্যরূপে 'তার' লেখা হয়েছে। সংখ্যায় বেশি না হলেও 'ধেয়ান', 'বালুকা', 'যবে'র মতো বহুদিন ধরে পদ্যে ব্যবহৃত শব্দও শক্তি ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করেছেন। 'ভিতর', ও 'বাহির'-এই বিপরীতার্থক শব্দযুগল নানা জায়গায় শক্তির বিশেষ পছন্দসই। এখানে এ দুটি শব্দ বিভিন্ন পদ্যাংশে ঘুরেফিরে এসেছে যথাক্রমে ১৯ বার ও ৯ বার।

সুন্দর এখানে একা নয় কাব্যেও ভিনদেশি, বিশেষত ইংরেজি শব্দ তেমন চোখে পড়ে না। উল্লেখ করার মত শব্দ বলতে 'ইনকমপ্লিট', 'বেকার' ও 'ওয়াস্তা'। শেষোক্ত দুটি আরবি শব্দের মধ্যে 'ওয়াস্তা' বাংলায় খুব বেশি চালু নয়, যদিও শক্তি কথ্যরীতির হালকা চাল ও চমক আনতে শব্দটি নির্দ্বিধায় বসিয়ে দিয়েছেন—'তাদের আসল গল্পটা সেই দেশলাই-এর নির্জন একটা কাঠির/শুধু ধরিয়ে দেবার ওয়াস্তা'! (**আসল গল্পটা**)। তৎসম ও কাব্যসৌন্দর্যের সহায়ক, কিছু ভর ও আয়তনবিশিষ্ট শব্দেরা আছে, কিন্তু শব্দনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পর্বের বৈচিত্র্য ও দুঃসাহস নেই। 'সংস্রব', 'স্বেচ্ছাচারী', 'সমভিব্যাহারে', 'আজানুলম্বিত', 'শ্বাপদসঙ্কুল' শক্তির বারবার ব্যবহার করা শব্দসমূহের মধ্যে পড়ে। কেবল একটি বিশেষণ-শব্দ আমাদের কিছুটা চমকিত করে—'মুখে *পর্যবসিত* আঁধার' (**দূর থেঁকে কাছে আসে**)। এই গ্রন্থের আর এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কয়েকটি মজাদার কথ্যরীতির শব্দ—'আদিখ্যেতা', 'গুবগুবি', 'ভুঁই-পিরিচ', 'জুবড়ে' প্রভৃতি। এইসব শব্দ এসেছে অনভিজাত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অশিষ্ট শব্দাবলীর প্রতি শক্তির বরাবরের ঘোষিত আগ্রহ থেকে। কখনো বা একটি পংক্তির বিন্যাসে অন্তর্বর্তী মিলের প্রয়োজনে, যেমন, 'আমরা *নিচে* ভুঁই *পিরিচে* একটি মুঠো......(**স্বাধীন**)'। অন্ত্যমিলের দায় অনেকক্ষেত্রে শক্তিকে বাধ্য করেছে একটি অপ্রচলিত, খানিক উদ্ভট, শব্দ ব্যবহারে—'তাঁবুর মধ্যে গোলাবারুদ চুম্বনে স্বাদু *তিন্তিড়ী*/শুধু তোমার এবং তোমার বাইরে ওঠা-নামার সিঁড়ি (**ওঠা-নামার সিঁড়ি**)।

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল-এ শক্তির প্রিয় তৎসম ও তদ্ভব, চিত্ররূপমণ্ডিত, ঝঙ্কারময় শব্দেরা যথেষ্টই রয়েছে—'সংস্থাপিত', 'সন্নিধি', 'দীপ্তিমান', 'বিষাদপ্রতিমা', 'পিঞ্জর',

'যুগাতীত', 'অধিকৃত', 'স্রোতস্বিনী', 'বহ্নিমান', 'দাক্ষিণ্যহীন', 'রহস্যপীড়িত', 'স্বায়ত্তশাসন' ইত্যাদি। স্থান পেয়েছে কিছু অতিথি শব্দ, প্রধানত ইংরেজি ভাষার—'ডায়নামো', 'সসপ্যান', 'অটোমোবিল', 'ফার্নারি', 'কার্তুজ', 'ইমানদারি', 'হেস্তনেস্ত', 'কাম ফতে'। অশিষ্ট শব্দের প্রতি শক্তির আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায় **নামছে মেঘ** কবিতার এই পংক্তিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে—'তীক্ষ্ণ কলার শাঁস ঠাসচাপা খোসা থেকে *কেলিয়ে বেরুচ্ছে*'।

কবিতার তুলো ওড়ে শীর্ষক সঙ্কলনে ইংরেজি বা অন্যান্য বিদেশী শব্দ তেমন নেই ; অশিষ্ট শব্দের কোনো নমুনাও নজরে পড়ে না। তবে শক্তির বিশেষ পছন্দসই ধ্বনিময় ও ভাবব্যঞ্জনামণ্ডিত শব্দের নির্বাচন ও বিন্যাসের কিছু কিছু নিদর্শন এ কাব্যেও পাঠককে মুগ্ধ করে :

(১) আমার জীবন যেন শ্রুতির নিষ্ফল/প্রবাসের পাড়া **(সন্ধ্যায় দিলো না পাখি)**

(২) শরণ্য দুই পদতলের যাজ্ঞা মুখ্য **(সুখ ও দুঃখ)**

(৩) মানুষের কাছে আমি/জড়তারই মতো নির্বিরোধ **(কিন্তু তাও, বাহ্যত মানুষ)**

এই আমি, যে পাথরে কাব্যগ্রন্থে কখনো গদ্যরীতিতে কথ্য চালে, কখনো ছন্দের মিলকে আশ্রয় করে শব্দেরা এসেছে ; এসেছে ব্যঞ্জনাধর্মী, শ্রুতিসুখকর শব্দ এবং ক্ষেত্রবিশেষে আটপৌরে ও কিছু গ্রাম্য বা অশিষ্ট শব্দও। সুনির্বাচিত শব্দের স্বচ্ছন্দ বয়নসৌন্দর্যে কোথাও কোথাও শক্তি যথাপূর্ব মনোগ্রাহী :

(১) প্রিয় সুকুমার যুবা, মন দিয়ে শোনো/ঐ রমণীর স্নেহ ছিলো না কখনো/নিভন্ত চুল্লির প্রতি। ওর ভাল লাগে/যে পুরো দিবস রাত শীর্ষে বসে জাগে/পদতলে নয়..... **(অন্যকে)**

(২) কৃত্রিম শব্দের বনে বাজে কার বিষণ্ণ নূপুরে/গান, ধ্বনি, বর্ণময়, রূপবান স্বতন্ত্র ঈশ্বর **(রূপবান)**

(৩) সেই ছেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দীপশিখা/সজল বিনম্র শোভা সুন্দরের, যেন অনামিকা/হীরক-অঙ্গুরী-চক্ষু, একাকী ও স্বয়ংনির্ভর! **(সেই ছেলে)**

আবার কথ্য চালের বিবরণধর্মী গদ্যে লেখা কবিতায় শক্তি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারহীনতায় ব্যবহার করেছেন অশিষ্ট শব্দ :

(১) *কেলিয়ে কাতরিয়ে* পড়বে সম্ভাবনা **(চলে যাচ্ছি, চলো)**।

(২) নেমন্তন্ন বাড়ি খেয়ে *আইঢাই* করতে করতে *মাগভাতারে পথ*/পাড়ি দিচ্ছে, মোটরে **(জঞ্জালে পাক হচ্ছে)**।

সুশ্রাব্য ও ব্যঞ্জনাময় শব্দাবলীর রুচিশীল প্রয়োগে অর্থের গভীরতা সৃষ্টিতে শক্তির দক্ষতার কথা আগেই বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। *হেমন্ত যেখানে থাকে* গ্রন্থে এর অনেক নিদর্শন আছে, বিশেষত বিশেষণ-শব্দ ব্যবহারের কুশলতায় :

(১) আজ ভুলে ভুলে যাই বিকেলের শুঁড়িপথ *হাস্যকরোজ্জ্বল* ছেলেবেলা **(আমি সুখী)**।

(২) সেরকম খেলা থেকে *প্রাপণীয়* সমস্ত বোধের/জন্ম হয়, মৃত্যু হয় **(সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের)**।

(৩) খাদ্য ক্রমে যেতে থাকে *সমুৎসুক* গানে ও জীবনে **(অস্তিত্বের পাশে)**

(৪) চুপ ভয়ে আদিগন্তে *বিমূঢ় সম্পত্তিচ্যুত* একা **(পাথর নদীর কাছে)**

অনুরূপ প্রবণতাই চোখে পড়বে **উড়ন্ত সিংহাসন**-এর কবিতাবলীতে। শালীন ও রূপবান বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের প্রয়োগে কবিতায় গম্ভীরতা ও সংহতি সৃষ্টির প্রবণতা। 'অশ্রুপাত', 'সমর্পিত', 'সাশ্রুলোচন', 'সন্নিহিতি', 'দ্যোতনা', 'আপাতদুর্জ্ঞেয়', 'মর্মঘাত', 'প্রকীর্ণ', 'সংক্রাম', 'পিপাসাজড়িত', 'স্পর্শাতুর', 'হিরণ্য' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার শক্তির ভাষা-প্রকরণে ঝঙ্কারময় ও রুচিশীল তৎসম শব্দব্যবহারের উত্তরাধিকার চিহ্নিত করে। আবার শুচিবায়ুহীন শক্তি এ সবের পাশেই অকস্মাৎ স্থান করে দেন কথ্যরীতির অশিষ্ট শব্দকে— 'চিত্র দুটি চরিত্রে এক, অভিজ্ঞতায় দুই/আমার মতন *একল্‌ষেঁড়ে ভাগ করে মাগ* শুই **(আমার মতন একল্‌ষেঁড়ে)**।

অনেক কবিতাতে শক্তি ব্যবহার করেছেন বিশেষ আঞ্চলিক বা গ্রাম্য ভাষারীতি, উচ্চারণ-বিকৃতিতে পাওয়া অর্ধ-তৎসম শব্দ। *মানুষ বড়ো কাঁদছে* কাব্যের **সেই কাঠচাঁপা** কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। স্বামীর ঘরে ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে গয়লা-বউয়ের মনে যে দুশ্চিন্তা তাকে শক্তি এইভাবে লিখেছেন—'সন্ধের *রুজুরুজু* গ্যাছে সেই *নাইন* পেরিয়ে নাটোর *পাক্কের* দিকে?/—*আত কতো* হলো?' এই কবিতার অন্যত্র পাই পূর্ববঙ্গীয় কথ্যরীতির এক টুকরো সংলাপ-'দোকানে *জিগান দেহি,* অরে ছুটকি, কাছে আয় বাপ/ *কেডা যে কহন যায়!*' 'কেশ্চান', 'বেঁচে বততে', 'গভ্যে', 'নাপতে্', 'পরজাপতি', 'অনাছিষ্টি' ইত্যাদি শব্দ সহজ ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন শক্তি এই সঙ্কলনে। আবার তৎসম, তদ্ভব, সমাসবদ্ধ এবং চিত্র ও ধ্বনিময়, অভিজাত শব্দেরাও বাদ পড়েনি। 'নির্হিংস', 'সুদুঃশোভা', 'ব্রীড়া', 'বৃহ', 'অযচ্ছল', 'সরীসৃপসম্মত', 'সন্নিপাতী', 'স্মার্ত', 'চীৎকৃত', 'কনকনিন্দিত', প্রভৃতি শব্দ শক্তি প্রয়োগ করেছেন সতর্ক ও সচেতনভাবে। পরিচিত বিদেশি শব্দের মধ্যে 'চোগাচাপকান', 'আকছার', 'কমোড', 'কী-হোল্', 'করিডোর' ইত্যাদি নজরে পড়বে। আর নজরে পড়বে 'মেধার বিষণ্ণ অগ্নি' কিম্বা 'প্রাণময় জ্যোৎস্নায় জড়ানো'-র মতো কাব্যমণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত শব্দবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে আটপৌরে এবং কিছুটা অশিষ্ট শব্দের উপস্থিতি— 'ভুট্টিনাশ', 'মরে-হেজে', 'গুয়েমাছি', 'বগলদাবা', 'থোলো', 'মাদুরে মুতের শিশু-দাগ' ইত্যাদি।

শুরু থেকেই তৎসম শব্দের ভাবঘনত্ব, ঝঙ্কার ও রূপময়তার কাছে হাত পেতে রেখেছিলেন শক্তি, আধুনিক বাংলা কবিতার কীর্তিমান পূর্বসুরি সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-জীবনানন্দ প্রমুখের মতোই। দেশজ ও চলিত শব্দ এবং প্রায়শই অশিষ্ট শব্দের প্রহারে যতই পাঠকরুচিকে আহত করতে চান না কেন, আবেগ ও মননের উপযোগী কাব্যভাষা নির্মাণে আধুনিকতার এই স্বীকৃত প্রকরণ থেকে কখনো শক্তি সরে আসেন নি। *ভালবেসে ধুলোয় নেমেছি* গ্রন্থে এর প্রচুর নিদর্শন আছে :

(১) দুঃখ যেন পাণ্ডুলিপি, অকালপ্রয়াত হলে কবি/থাকে চমকের মতো স্মৃতি অভিমান খরচোখ/কপালের অশ্বক্ষুর, নাসার দুপাশে অশ্রুরেখা.....**(দুঃখ কি সহজে যায়)**

(২) বাদলে মাদলে ভাঙে রাত...../দাম্ভিক, পর্যাপ্ত, ক্রুদ্ধ, অশান্ত ও শোকে ভয়ঙ্কর **(গাড়ি ছোটে যেন বাঘ)**

(৩) হারাতে-হারাতে চলি বহির্মুখী মানুষ যেমন/অন্দরের সবকিছু অনভিনিবেশে তুচ্ছ করে **(হারাতে হারাতে চলি, খুঁজে পাই)**

(৪) তখন স্মৃতির সৌধ টানে তাকে স্বপ্নের সোপানে **(আবার পোড়াবে পোড়ামুখ পাথরের মতো)**

(৫) জটিল মননে আনে ক্ষুরধার সাঁতার সন্ধ্যার **(আচার্য, তোমার সার্ধশতবর্ষে বাংলার প্রণাম)**

'অবিসংবাদী', 'উপঢৌকন', 'সঞ্চরমান', 'উল্লেখযোগ্যতা', 'নিষ্কলুষ', 'নীলাঞ্জনছায়া', 'আনন্দভুবন' ইত্যাদি ভাবগম্ভীর তথা রূপময় বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ শক্তি ব্যবহার করেছেন যথাপূর্ব আগ্রহ ও প্রযত্নে।

পরশুরামের কুঠার কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কবির নিজস্ব গদ্যটীকা-যুক্ত, যেখানে প্রতিটি রচনার উৎস ও গঠন সম্পর্কে তাঁর মতো করে বলেছেন শক্তি। অনেক শব্দের কবিতায় চলে আসার কথাও আছে। 'খরস্রোতা বেজি' কিম্বা 'শনাক্ত তালগাছ'-এর মত শব্দবন্ধে বিশেষণ শব্দগুলি প্রয়োগের প্রচলিত সীমার বাইরে চলে এসেছে অনুষঙ্গ ও তাৎপর্যের স্বাতন্ত্র্যে। বহুমাত্রিক ও ধ্বনিমণ্ডিত তৎসম শব্দসম্ভারের প্রতি শক্তির গভীর আকর্ষণের অনেক নজির রয়েছে এই কাব্যেও—'সম্ভ্রমজড়িত', 'সন্নিধি', 'মর্মতল', 'শ্রুতিবন্ধ', 'অপেক্ষমান', 'অজাতক', 'গর্জমান', 'গবাক্ষ', 'অপরিমেয়', 'রুদ্ধবাক' ইত্যাদি। আবার কখনো নির্দ্বিধায় কুলীন ও গম্ভীর বিশেষণ শব্দকে প্রত্যাশাবহির্ভূতভাবে বসিয়ে দিতে পারেন—'*পরিত্রাণহীন খাটা-পায়খানা* ভাল লাগে আমাদেরও।' কৌলীন্যহীন তথা গ্রাম্য রীতির শব্দও খুঁজে নেন অক্লেশে—'*গা-গত্তি-ভর শ্যাওলা*', 'তাঁদারিখেকো', 'পীরিত', ইত্যাদি।

ভাত নেই, পাথর রয়েছে সঙ্কলনটিতে অনুরূপ আটপৌরে বা আঞ্চলিক শব্দেরা এসেছে— 'বগা', 'ছেদ্‌রে', 'মচ্ছব', 'ক্যারা', 'গুমো', 'মাগ্‌না' ইত্যাদি। আত্ম-সমীক্ষণের ভঙ্গিতে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অভ্যাসবশত পীড়িত করেছেন পাঠকের শ্রবণরুচি— 'ধ্বংসের ভিতরে ঢুকে, মুখোমুখি/দাঁড়াই জীবনে, *চোখ মারি*......./নিজের *পেন্টুলে মুতি*.....' (**আমি চাই**)। সঙ্কলনের নাম-কবিতায় শক্তিকে ব্যবহার করতে দেখি খুবই পরিচিত প্রবচন—'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই লাগে ভাল।'

১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কম-বেশি কুড়িটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটিতে বেশিরভাগই পূর্বে মুদ্রিত কবিতা। সামগ্রিকভাবে দেখলে শক্তির শব্দ-প্রকরণের রীতি ও বৈশিষ্ট্য এই পর্বেও অপরিবর্তিত। কাব্যসুষমাযুক্ত, ওজনদার, প্রধানত তৎসম শব্দ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন শক্তি ; এদের মধ্যে অধিকাংশই অলঙ্কারময় বিশেষণ পদ। সংখ্যায় খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও রয়েছে অশিষ্ট/গ্রাম্য/দেশজ শব্দ এবং ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে নেওয়া কম-বেশি পরিচিত শব্দ। আসলে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে যে দশকভিত্তিক পর্ববিচার করে থাকি শক্তির মত অতিপ্রজ কবি, অথবা যে কোন কবির ক্ষেত্রেই, তার তেমন কোনো সার্থকতা নেই। কবির শব্দাগ্রহ ও তাঁর প্রকরণের রদবদল তো দশকভিত্তিক নয়। শক্তির শব্দ প্রকরণের কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই সময়পর্বে নজরে পড়ে না বলে কয়েকটি নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থের সাহায্যে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য তুলে ধরছি। *আমি চলে যেতে পারি* সঙ্কলনটিতে সাধারণ আটপৌরে শব্দের মাঝখানে ইতস্তত ঘুরে ফিরে আসে ধ্বনিগাম্ভীর্যময়, পোশাকি শব্দেরা—'পুষ্পরূপ নামিয়েছে মাথা', 'হে বিষমানুপাতী বিরহ', 'উচ্ছ্রিত জলের মুখে দুহাত বাড়িয়ে দোলা খায়', 'সৃষ্টিছাড়া উল্লাসের সমগ্রতা', 'তুমি সেই মহান পাবক সমুদ্রের মৌন অগ্নি' ইত্যাদি। শ্রুতিনন্দন ও চিত্ররূপমণ্ডিত শব্দের ভাবমধুর গীতলতা শক্তির শব্দ প্রকরণে লিরিকের স্বীকৃত উত্তরাধিকার। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখনীয় **সময়ের দুটি মুখ** কবিতায় 'সৃপ্যমানতা' শব্দটির ব্যবহার—'মানুষ ঘুমোলে পরে, সৃপ্যমানতায়/ছেদ পড়ে'। বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোনো চলিত অভিধানে শব্দটি নেই,[২৫] অথচ শক্তি 'সৃপ্‌' ধাতু থেকে ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নিষ্পন্ন করেছেন শব্দটি। জীবনযাপনে বেহিসাবী

মানুষটি তাঁর শব্দচেতনায় সতর্ক, সক্রিয় ও ব্যাকরণ-শৃঙ্খলায় পারঙ্গম। এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা **আজ-কালের গপপো যেটি সুদর্শন পোকা!** নামে **যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো** কাব্যে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বাচনভঙ্গি—গ্রাম্যভাষার পদবিন্যাস ও উচ্চারণরীতির নিজস্বতায় অসামান্য, কোনো এক দরিদ্র গ্রাম্য নারীর জবানিতে রচিত।[২৬] দক্ষিণবঙ্গে সুর্দশন পোকা চেলে দূরদেশে বসবাসকারী স্বামী তথা প্রিয়জনের সংবাদ সংগ্রহের এমন অদ্ভুত রেওয়াজ ছিল। গ্রাম্য বা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে ও সহজ কথ্য বাচনভঙ্গির সার্থক প্রয়োগে শক্তির দক্ষতা এই কবিতায় প্রশ্নাতীত। আর পর পর পংক্তির শেষে বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে 'সুর্দশন পোকা' যা নিশ্চিতভাবেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-র সেই 'উড়িতেছে সুর্দশন' :

> 'ধুলোতে ওই ঘূর্ণী, ঘোরো সুদর্শন পোকা/দূরের চিঠি কাছে আনাও সুদর্শন পোকা/শুভ খবর কাছে আনাও, দাবার চালে দোলা বানাও/হাপিত্যেশ নোলা বানাও সুদর্শন পোকা!/আঙুল চেলে গণ্ডি করি সুদর্শন পোকা/নিখাকি হাতে গড় করেছি সুদর্শন পোকা/.....পরার কানি হাতের পাণি, মড়ার কাঠ কই?/ছেলেপুলের বুক না তো ও, ডোঙার ওপর ছই!/লোকটা আছে না ফুঁকে গ্যাছে—দিও না মোকে ধোঁকা/আজ না দিলি, কাল ক'রো না সুদর্শন পোকা':

শব্দ, ছন্দ, ভঙ্গি ইত্যাদি যেভাবে বক্তা ও তার বক্তব্যের উপযোগী একটি আঙ্গিক ও আবহ রচনা করেছে তা প্রকৃতই বিস্ময়কর।

'পশ্চাদ্ধাবিত', 'প্রত্যন্তভূমি', 'স্পৃহনীয়', 'নির্নিমিখ', 'মার্জনাসম্ভব', 'শিল্পকূট-নিবন্ধন' ইত্যাদি ওজনদার সাধু শব্দ শক্তি সহজ সাবলীলতায় ব্যবহার করেছেন *মন্ত্রের মতন আছি স্থির*-এর কবিতায়। আবার 'সেঁধিয়ে', 'নেবুগন্ধ', 'গোল্লাছুট', 'ফোতো', 'নাইকুঁড়লি'-র মত অনভিজাত কিন্তু বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্য বাচনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শব্দ শক্তির শব্দ-প্রকরণে নাগরিকতা ও আঞ্চলিকতার স্বচ্ছন্দ সহাবস্থানকে চিহ্নিত করে। বৃষ্টিপাতের সুর ও সারল্য বোঝাতে *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল* সঙ্কলনের **বৃষ্টিই কবিতা** রচনাটিতে একটি প্রাচীন বিদেশী অনুযঙ্গবাহী শব্দ ব্যবহার করেছেন শক্তি—'এমন সারল্য বুঝি *ক্রবাদুর* মন্ত্রেই নিহিত।' আবার এই গ্রন্থেরই **যে যদি** কবিতায় বাউলগানে বহুশ্রুত 'আরশিনগর' শব্দটি তার রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহার করেছেন কৌলীন্য তথা শ্রুতি-সৌন্দর্যহীন শব্দ—'*বেটো হয়ে ঘুরতে থাকা*' **(কবিতার মতো)**। নান্দনিক ও শোভন শব্দের পাশাপাশি ইতর বা গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগে শক্তির শুচিবায়ুহীনতার কথা আগে বলেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সহাবস্থান পীড়াদায়ক মনে হলেও মোটের ওপর বলা যায় যে, একালের বাংলা কবিতায় অশিষ্ট ও গ্রাম্য শব্দের ব্যাপক ও সার্থক প্রয়োগে শক্তি অদ্বিতীয়। *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ* কাব্যগ্রন্থের **শিকার কাহিনী** কবিতায় নিম্নোদ্ধৃত সমিল দ্বিপদী একটি চমৎকার নিদর্শন—'দু'গণ্ডা লোক দু'গণ্ডা পোক নেবুঘাসের রসে/পটাক্ করে চুল্লু মারে নিসর্গ-সন্ন্যাসে!'

শক্তির বিশেষ জনপ্রিয় সঙ্কলন *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*-র কবিতাগুলি ঋজু ও সজ্জাবিহীন। তৎসম শব্দাবলীর গম্ভীর মেদুরতা অপেক্ষা তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের সহজ ব্যবহারে যেন ছড়িয়ে আছে শিল্পসিদ্ধির স্বাক্ষর। 'মুখ', 'সাপ', 'খিদে', 'তেষ্টা', 'ভাঙা', 'ছেঁড়া', 'আধখানা' ইত্যাদি চলতি জীবনের শব্দ কথ্য-রীতির সহজ স্বাভাবিকতায় ব্যবহার করেছেন শক্তি। 'পাথর' ও 'চাঁদ'-এর মত চাবি-শব্দ পুনরাবৃত্ত হয়েছে আত্মজীবন ও অনুভবের

নানা অনুষঙ্গে। বিষাদ ও আবেগের গভীরতা থেকে যেসব কবিতা উঠে আসে তাতে একেবারে আটপৌরে তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের প্রয়োগ নিয়ে সংশয় থাকে। শক্তির কলমে কিন্তু এসব কাজ বেমানান বা অনুপযুক্ত মনে হয়নি—

(১) কপালের *আধখানা* খাবো বলে কখনো জাগিনি/শুয়ে আছি, *ভাঙা* ঘুম, *ছেঁড়া* স্বপ্নে

(২) *ট্যারা* হয়ে আছে একা চাঁদ

(৩) *পথ* চলে পিছনে তাকায়,/কীসের *ঘেন্নায় থুতু* ফেলে

(৪) *ছিষ্টি* পুড়ে খাক

(৫) গলা *তাক* করে *আঁশবটি* এগিয়ে আসছে

গ্রামীণ তথা প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে জড়িত বহু শব্দকে শক্তি কবিতায় জায়গা করে দিয়েছেন কুলীন ও কাব্যিক শব্দসমূহের পাশে। অশিষ্ট-অন্ত্যজ এইসব শব্দের প্রতি শক্তির আযৌবন টানের নমুনা **মানুষ কেন?** কবিতাটি :

'*এল্‌টে* পর্যন্ত পরনের *তেনি* তোলা/কাদায় মাখামাখি *কালো-কোলো* ছেলের পাল/....*কুচো কাচা জিয়ল* মাছে *কোঁচড়* ভর্তি/কারো বা কঞ্চির *খালই/ভরভরন্ত*.....'

আবার এই কাব্যেরই বিভিন্ন লেখায় দেখতে পাই কিছু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ; দু-একটি ক্ষেত্রে কিছুটা স্বল্পব্যবহৃত ও মার্জিত শব্দ এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে :

(১) কেমন রোমাঞ্চ লাগে, প্রখর *কনট্যুবে*/ভাসে বয়া..... (**ধ্বংস করো**)

(২) প্রকৃত তরণী নয়, ওই *লনচ* এখন ভাসে না (**কেন আছে**)

(৩) *থ্রোন*, সকালে সেখানে বসে ঘণ্টা শোনে ধীমান-ধীমতি (**আগুনের ফলা টেনে**)

(৪) ঠিক *কানালের* ধারে শব্দের ভিতরে/কার কথা....... (**দেখে আসি**)

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে কাব্যেও তৎসম, ধ্বনিময় ওজনদার সমাসবদ্ধ শব্দেরা সংখ্যায় বেশি নয়। 'গ্রীতশয়ান', 'অনগম্য', 'কীর্তিজড়িত', 'উত্তরণময়', 'বর্ণিকাভঙ্গ' প্রভৃতি কিছু শব্দে আমরা শক্তির গম্ভীর ও কাব্যময় আবহ নির্মাণের প্রবণতা বুঝতে পারি। '*অথিরবিজুরি* মাকু পড়ে আছে শামুকের মতো' (**মনে-বনে জানি না কিছুই**), এরকম পংক্তি পড়লে মনে হয় কোন্ মন্ত্রবলে কবি 'অথিরবিজুরি', এই কোমল রূপের তুলনাবাচক বিশেষণটিকে 'মাকু', এই নিতান্ত সাদামাটা ফারসি শব্দের আগে বসালেন? বিদ্যাপতির শব্দ কিভাবে বিশেষণ হয়ে বসে গেল চলমান মাকুর অস্থিরতা বোঝাতে? কিন্তু 'তাংড়ে', 'কেলিয়ে', 'গোদা', 'চামকুটি' ইত্যাদি প্রয়োগ থেকে এর পাশাপাশি বোঝা যায় কিভাবে সংস্কারমুক্ত এই কবি শব্দের শ্লীলতা-অশ্লীলতাকে অগ্রাহ্য করে কবিতায় কথ্যরীতির প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। এছাড়া রয়েছে ইংরেজি যৌগিক শব্দ, যথা, 'মডেল-টাউন', 'স্কাইলাইট'।

কক্সবাজারে সন্ধ্যা-র কবিতাগুলিতে শক্তির প্রিয় কাব্যময়, তৎসম শব্দেরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাতেই উপস্থিত। 'প্রতিষ্ঠাবেষ্টিত ঝাউ', 'স্থূলতার পরিপ্রেক্ষা', 'মানুষ, তুমি ভুলে যাও অত্যাগসহন', 'প্রসারণের উদাসীনতা' ইত্যাদি শব্দবিন্যাসে ভাবসৌন্দর্যমণ্ডিত শীলিত শব্দের অভিযাত্রী শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সহজেই চেনা যায়। বুঝতে পারা যায় যে সতর্ক শব্দচয়ন ও ব্যতিক্রমী যোজনায় তিনি আপাত-অর্থের গণ্ডি পেরিয়ে ইশারা করছেন গূঢ়তর কোনো চিন্তাবীজের দিকে— 'নিচের পাটির দাঁত খুলে নিলে মুখশ্রী তামাম/বদলে যায়' অথবা 'দুটি ঠোঁট

দীর্ঘদিন বৃষ্টির ফোঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি বলে/দু ঠোঁট প্লেতেছি' অথবা 'প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে'। কথ্যরীতির কিছু শব্দ থাকলেও এ গ্রন্থে অশিষ্ট শব্দ নজরে পড়ে না। ইংরেজি যৌগিক শব্দ 'আপার ডেক' ও 'পাউডার পাফ' ছাড়াও পাই 'পর্চ', 'স্যুপ', 'টোস্ট'-এর মত বহু-ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ।

'করিডোর' ও 'বনেট' আগেও একাধিকবার ব্যবহার করেছিলেন শক্তি ; *এই তো মর্মরমূর্তি* সঙ্কলনে এছাড়াও পাই 'গর্জ', 'ভ্যালি', 'ওয়াচপয়েন্ট' জাতীয় ইংরেজি বিশেষ্য শব্দ ; যেগুলি অরণ্য-পাহাড়ের দুরন্ত পর্যটক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা। প্রয়োজনে এইসব শব্দের বাংলা তর্জমা করা যেতে পারে, কিন্তু শক্তি সে প্রয়োজন বোধ করেন নি। দেশজ শব্দের প্রতি শক্তির আগ্রহ তাঁকে নিতান্ত আটপৌরে, কখনো বা নিছক গ্রাম্য/অশিষ্ট, আবার কখনো ধ্বন্যাত্মক শব্দের কাছে নিয়ে গেছে। 'ঘেঁষটে', 'ঘষটানি', 'জ্যাবড়া', 'কেঁকে', 'জবুস্থবু', 'ছিছিক্কার' ইত্যাদি কৌলীন্যবর্জিত শব্দকে শক্তি অসঙ্কোচে স্থান দিয়েছিলেন ও **চিরপ্রণম্য অগ্নি**-র কবিতায়। **এই তো** *মর্মরমূর্তি*-তে দেশজ রীতির শব্দদ্বৈত ও যুগ্ম ধ্বনির ব্যবহার দেখি—*আলুথালু*, আগোছালো, *এতোল-বেতোল সেই পথ*' (*জঙ্গল বিষাদে আছে*)। গ্রাম্য ছড়ায় ব্যবহৃত এইসব শব্দকে শক্তি বারবার জায়গা দিয়েছেন কবিতায়। তৎসম শব্দ তথা সমাসবদ্ধ পদের প্রতি শক্তির আকর্ষণের বহু নিদর্শনও এ কাব্যে ছড়িয়ে আছে—'উপঢৌকন', 'আপাদনখ', 'শারীরজোড়', 'সান্ধ্যমেঘ', 'পদঝংকার', 'বহির্মুখী', 'তপশ্চরণ', 'স্পর্শণীয়', 'সুশ্বেতবসনা', 'তমোহীন', 'প্রণিপাত' ইত্যাদি। সেই 'কৃত্তিবাস' ও হাংরি আন্দোলনের সময় থেকে শক্তি শব্দব্যবহারের এই ঐতিহ্যলালিত কৃষ্টি অনুসরণ করে এসেছেন। ছন্দসৌন্দর্য ও ভাববস্তুর মার্জিত চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে শক্তি বেছে নিয়েছেন চেনা শব্দের ঈষৎ অচেনা রূপান্তর—'আরেকটি চোখ *অচতুর্থ* , সেই তো দেখায় সব' (**দেখাও আমায়**)।

তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ কথ্য ভাষার প্রাণস্বরূপ ; এইসব শব্দ ধারণ করে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের চিহ্ন। এদের সঙ্গে যোগ করা যায় নানা দেশজ শব্দ ও প্রবচন। সব মিলিয়েই মানুষের মুখের ভাষা। অলঙ্কারময় তৎসম শব্দাবলীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ সত্ত্বেও শক্তি তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশজ শব্দকে বেছে নিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। **আমাকে জাগাও** কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করছি:

(১) শুধু দেখি *মুখচ্ছিরি*, গন্ধ তার শুঁকি না কখখনো (**রজনীগন্ধার নিবেদন এই**)।

(২) *আগুপাছু ছিলো শুধু মেঘ বৃষ্টি আলো অন্ধকার* (**দশমী ও বিসর্জনে**)।

(৩) মূঢ় মূল *ছেঁড়ে-ছিনে.....* (**উৎসবে**)।

(৪) লোকটা *পোস্কার* নয়, ঝুঁটা (**লোকটা**)।

(৫) কেবিন দশ-এর মধ্যে শুয়ে অর্ধসমাপ্ত শার্দুল/স্বপ্ন দ্যাখে *মচ্ছবের* (**অর্ধসমাপ্ত ও সমাপ্ত শার্দুল**)।

(৬) প্রেম *পীরিতি নারলাম* দিতে..........(**ধান কাটা শেষ, কবিমশাই**)।

আবার অলঙ্কারধর্মী, চিত্ররূপমণ্ডিত, মূলত তৎসম শব্দেরাও উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত, লিরিকের ভাবসৌন্দর্য ও নন্দনের পরিচায়করূপে—'পরিত্রাণময়', 'অগ্নিগর্ভ', 'তন্নিষ্ঠ', 'তরঙ্গ ভঙ্গে', 'মাৎসর্য-ভুবন', 'সানুতল', 'প্রাপণীয়', 'আধিপত্নী', 'সামীপ্য', 'নীরক্ত' ইত্যাদি। পরিচিত

উপসর্গযোগে শক্তি কখনো কখনো এমন না-বাচক শব্দ তৈরি করেন যা খুব শ্রুতিসুখকর মনে হয় না, যথা 'অপুড়ন্ত' কিম্বা 'নির্ঘাস'। 'ময়' প্রত্যয় যোগে বহু শব্দ শক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু *'অতি জ্বালাতনময় প্রেম'*-এ প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণপদটি বোধহয় শক্তির শব্দক্রীড়ার এক চমৎকার নমুনা।

৪১টি কবিতা এবং একটি ছোটো কাব্যনাটক সঙ্কলিত হয়েছে শক্তির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ *জঙ্গল বিষাদে আছে*-তে। এদের মধ্যে তিনটি কবিতা পূর্ববর্তী *ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিলো। *জঙ্গল বিষাদে আছে*-র প্রথম রচনাটিতেই শক্তি বলেছেন তাঁর শব্দ-সন্ধান ও প্রয়োগের কথা—'আসলে আমি পুরনো এক বকের মতো সাদা!/....মাছের মতো শব্দ গাঁথি ঠোঁটের আধিআধা,/....বুকে পেটের বন্ধনে সেই শব্দকে দিই রেখে,/রক্তে আর পিত্তে জরে শিরায় রাখি ঢেকে—/কিছু বেরোয় পিছল ঠোঁটে, কিছুবা থাকে বাঁধা' (**আসলে আমি**)। শিকারী বকের সতর্ক মৎস্যশিকারের মতো শক্তির শব্দ-সংগ্রহ ; অন্ত্যমিলের পারিপাট্য বজায় রাখতে 'আধাআধি'র বদলে লেখেন 'আধিআধা'। এই সঙ্কলনের অন্য একটি কবিতায় আবার শক্তি শব্দ নিয়ে খেলার কথা বলেছেন—'এতোল বেতোল খেলা খেলি আমি শব্দ নিয়ে শুধু' (**জেগে থেকে না খেলার অপরাধ গ্লানি**)। আবেগ ও মননের ভার বহনে সক্ষম অভিজাত, ওজনদার শব্দেরা এ কাব্যে অপ্রতুল নয়—'অতিপ্রাকৃতিক', 'অগ্নিস্পৃষ্ট', 'তমোহীন', 'অপেক্ষমাণা', 'সম্মোহ', 'অর্ধেকচেতসা', 'নিশ্চেতন', 'অসমগ্রন্থন', 'স্পর্শভারাতুরা', 'তমোঘ্ন', 'ক্ষণত্যাজ্য', 'কায়কল্প', 'সম্বেষ্টনী', 'মানসক্ষুণ্ণতা', 'নির্বাহুবন্ধন' ইত্যাদি। 'ঝরনা', 'বৃষ্টি', 'বাগান', 'পাথর', 'গাছ', 'অগ্নি', 'চিতা' ও 'চিতাকাঠ'—এর মতো শক্তির বেশ কিছু প্রিয় চাবি-শব্দ এ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো বা সহজ কথ্যরীতির বিন্যাসে, একটি চেনা শব্দ প্রয়োগের কিঞ্চিৎ নতুনত্বে যেন স্মৃতিভাষ্যময় হয়ে ওঠে বাক্য—'হাতে রুলি, কানে টব, গলায় চিকন সরু হারে/সুদেষ্ণা এখনো যেন *স্থগিত কিশোরী* (**আমি তো পাথর—তুমি জানো**)। আবার অন্যত্র সহজ শব্দের নির্ভার সজ্জায় গড়ে ওঠা ছবি মৃৎ-পৃথিবীর জীবন-রহস্যের ইঙ্গিত বহন করে—'এভাবেই, কোনো গভীর গূঢ় সময়ে, মাথা তুলে প্রান্তরে দেখেছি—/বাতাসের মুখের ভিতর কীভাবে শস্যের কান পূর্ণ হয়ে ওঠে' (**হে দেবদারুর বিস্তার**)।

জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক সচেতন, বহুপ্রসূ শব্দের কারিগর। শুরু থেকেই তৎসম শব্দ ও তৎসম শব্দভিত্তিক সমাসবদ্ধ রচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখালেও ক্রমেই দুরূহ ব্যঞ্জনাঘনত্ব ও আভিধানিকতা থেকে শক্তি সরে এসেছেন শব্দের স্বাভাবিক উৎসারের দিকে। চারপাশের সর্বদা ব্যবহৃত শব্দাবলী, দেশি-বিদেশি-আটপৌরে নানা মাপের শব্দ শক্তি সহজ স্বাভাবিকতায় মিশিয়ে দিয়েছেন ধ্বনিময়, নান্দনিক ও কাব্যিক বহুবর্ণময় শব্দসমূহের সঙ্গে। শব্দ-প্রকরণে শক্তি প্রমাণ দিয়েছেন সূক্ষ্ম, প্রখর শ্রবণক্ষমতার ; এক সহজিয়া খেয়ালি প্রবণতার ; কাব্যিকশব্দ ও সাবেকি বাগ্‌ভঙ্গির কুশলী প্রয়োগে আধুনিকতার মধ্যে লালন করেছেন এক আস্বাদময় অনাধুনিকতা। অজস্র অশিষ্ট ও কথ্যরীতির শব্দে প্ররোচনা দিয়েছেন এক অবাধ্যতার যা রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কবিতার শীলিত ভাষা প্রকরণে সর্বদাই প্রবাহিত হয়েছে চোরা স্রোতের মতো। স্বপ্নার্ত, রহস্যময় পরাবাস্তবতা ও মগ্নতা থেকে উত্তরোত্তর সহজতর ও স্পষ্টতর বাণীশিল্পে তাঁর প্রতিষ্ঠা, অলঙ্কারময় ব্যঞ্জনামণ্ডিত শব্দের অভিজাত বিন্যাসের পাশাপাশি গুরুচণ্ডালি ও অপশব্দের পশরা শক্তির কবিতার পাঠককে সম্মোহিত, বিব্রত করে তোলে।

চিত্রকল্প ও অলঙ্কার

একটি শব্দ প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের চিহ্ন বা সংকেত, আবেগ-অনুভব-মননের বাহন, যা অন্য শব্দাবলীর সঙ্গে নানাভাবে অন্বিত হয়ে গড়ে তোলে বাক্য এবং একটি বাক্যের অন্তরালে সর্বদাই সাধারণভাবে ফুটে ওঠে একটি ছবি বা 'ইমেজ'। কবিতার ক্ষেত্রে আমরা ছবির এই প্রাথমিক স্তর থেকে কিছুটা এগিয়ে এমন শব্দচিত্র পেয়ে থাকি যা মূলত তুলনা বা সাদৃশ্যবাচক, যেখানে বিভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে তুলনার মধ্যে দিয়ে কবির আবেগ-মনন-অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বাচনিক রূপে ধরা পড়ে। তুলনা বা সাদৃশ্য নির্মাণের এই শক্তি কম বেশি প্রায় সকলেরই থাকে, কিন্তু কবি যখন শব্দগুচ্ছের অভাবিত কোনো প্রয়োগে এমন একটি বাক্‌প্রতিমা উপহার দেন যা পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও দীপ্যমান করে তোলে, তখন আমরা পাই যথার্থ 'পোয়েটিক ইমেজ', যা কবিচেতনার প্রসারিত ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে, বিষয় বা ভাবনাকে দেয় মূর্ততা ও বৈশদ্য।

কবির কাছে এই 'ইমেজ বা 'চিত্রকল্প' হলো কবিতার অবয়বী রূপের প্রধান উপকরণ, নির্বাচিত শব্দের বিন্যাসে গঠিত মনন ও অনুভবের এমন এক জটিল যৌগ যা কবির ভাবনাকে দেয় ইন্দ্রিয়ঘনত্ব। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে বিখ্যাত 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় এজরা পাউণ্ড 'ইমেজ'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই কথাই বলেছিলেন—"An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time." সার্থক চিত্রকল্প এমন এক মেটাফরধর্মী রূপচিত্র যা প্রথাগত সাদৃশ্যকে অতিক্রম করে পাঠককে চালিত করে ব্যঞ্জনার্থের দুঃসাহসিক গভীরতায়। যথার্থ চিত্রকল্প নিছক 'সজ্জাসর্বস্ব' বা 'decorative' নয়, তা 'ক্রিয়ামূলক' বা 'functional'. দৃশ্য-শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ-স্বাদের ইন্দ্রিয়সংবেদন আশ্রয় করে কবি শব্দের এই জটিল যৌগ নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করেন শব্দের অন্তর্নিহিত সংকেতধর্মিতাকে অভাবিত সৃজনী মাত্রায় চিহ্নিত করে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য কবি শঙ্খ ঘোষের এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্য : 'কবিতার প্রতিমা এই গাঢ়তর অর্থদ্যোতনার দিকে টান দিতে চায় আর তারই সঙ্গে রচনাকে করে তোলে ঘনতাময়'[২৭]। বাক্‌প্রতিমার ইন্দ্রিয়বেদ্য মূর্ততা সৃষ্টিতে কবিকে সাহায্য নিতে হয় অলংকারের। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-রূপকের সাহায্যে তিনি চিত্রকল্পটি নির্মাণ করেন. যদিও অলংকার মাত্রেই সার্থক চিত্রকল্প নয়। সার্থক চিত্রকল্পে কবির কারিগরি দক্ষতার বহিরঙ্গরূপের অন্তর্লোকে থাকে গূঢ় দ্যোতনার প্রতীতি।

চিত্রকল্প-নির্মাণে কোনো কবির মুনশিয়ানার বিচারে আমরা নিম্নলিখিত সূচকগুলির সাহায্যে অগ্রসর হতে পারি :

(১) কোন্ কোন্ ক্ষেত্র থেকে চিত্রকল্পের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্র/বিষয়/প্রসঙ্গ আশ্রয় করে পৌনঃপুনিক প্রতিমাগুচ্ছ নির্মিত হয়েছে কিনা ;

(২) শব্দ ও অলংকারের প্রয়োগে বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে কবির বিশিষ্টতা ;

(৩) বিভিন্ন শ্রেণীর ইন্দ্রিয়সঞ্জাত চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্পের মাধ্যমে অনুভূতির 'ইন্দ্রিয়ান্তরকরণ' (synesthesia).

(৪) সজ্জাসর্বস্বতা অতিক্রম করে চিত্রকল্প কার্যকরী (functional) তাৎপর্য অর্জন করেছে কিনা ; এবং

(৫) কিভাবে চিত্রকল্প ব্যঞ্জনাঘনত্ব লাভ করে প্রতীকে পরিণত হচ্ছে।

চিত্রকল্পনির্মাণ যে কেবলই আধুনিক কাব্যসাহিত্যের অন্বেষণ তা নয় ; প্রাচীন গ্রিক ও রোমক মনীষায় তথা ভারতীয় সাহিত্যালোচনা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের প্রয়োগনৈপুণ্যের ভূমিকার স্বীকৃতি দুর্লভ ছিলো না। বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারকে অ্যারিস্টটল 'মেটাফর' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর *পোয়েটিক্‌স্* গ্রন্থে।[২৮] পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখের ব্যাকরণ ও দণ্ডীর অলঙ্কার বিষয়ক রচনায় উপমা-রূপক ইত্যাদির দ্বারা কাব্যসৌন্দর্যবিধানের কথা আছে। তবে বোদ্‌লেয়ার ও তাঁর উত্তরসুরি ফরাসি প্রতীকবাদী কবিদের সময় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল অবধি চিত্রকল্পের বিষয় ও প্রকারান্তরে কবিতার গ্রাহ্য চেতনায় যে বিপুল বিস্তার লক্ষ্য করা যায় তা আধুনিকতার প্রবর্তনা। *Les Fleurs du Mal* কাব্যগ্রন্থের জন্যে খ্যাত প্রতীকবাদী কবিতার পুরোধা শার্ল বোদ্‌লেয়ারের হাতে শব্দ তথা চিত্রকল্পচেতনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লাভ করেছিলো তীব্র, ইন্দ্রিয়নির্ভর মন্ময়তা। তাঁর বিখ্যাত 'Correspondences' কবিতায় বোদ্‌লেয়ার বলেছিলেন যে আমাদের প্রকৃতিজগৎ নিজেকে ব্যক্ত করে অসংখ্য প্রতীকের মধ্যে দিয়ে আর এইসব ইন্দ্রিয়ানুভূতিগম্য প্রতীকের অখণ্ড উৎস এক অসীম দিগন্তব্যাপী অন্ধকার। বোদ্‌লেয়ার প্যারিসের নাগরিক জীবনপরিবেশ থেকে তাঁর কবিতার বাক্‌প্রতিমাগুলির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এলিয়ট প্রমুখ আধুনিক ইংরেজি ভাষার কবিদের আদর্শস্থল। বোদ্‌লেয়ার-অনুগামীদের মধ্যে মালার্মে বহির্জগতের অন্তরালে এক আদর্শের সন্ধান করেছিলেন এবং এক তীব্র সংসক্ত ধ্বনিময় সাংগীতিক ভাষায় কবিতায় আভাসিত করতে চেয়েছিলেন বাস্তবাতীত ভাব-নির্যাস। বিশ শতকের ত্রিশ দশকের 'অডেন প্রজন্মের' অন্যতম কবি সিসিল ডে লুইস তাঁর *পোয়েটিক ইমেজ* গ্রন্থে চিত্রকল্পের রূপ ও রীতি বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন। আপাত বৈসাদৃশ্যের মধ্যে নিহিত সাদৃশ্যকে কবি তাঁর চিত্রকল্পে যেভাবে উন্মোচিত করেন সেই 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'-র ওপর আলোকপাত করে লুইস লিখেছিলেন—'... it is when object and sensation, happily married by him, breed an image in which both their likeness appear, that something comes to us with an effect of revelation'[২৯] ডে লুইস সরলভাবে চিত্রকল্পকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন শব্দাবলী-নির্মিত প্রতিমা বা 'picture made out of words' রূপে,[৩০] কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় চিত্রকল্পের যথার্থ তাৎপর্য পরিস্ফুট হচ্ছে না বলে তিনি আরো কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। 'চিত্র' হলেও কাব্যের বাক্‌প্রতিমা কেবলই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যরূপের ছবি নয়; এছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাবাহিত স্মৃতিতে কোনো মূর্ততা অনুভূত হলেই তা 'ইমেজ' বা চিত্রকল্পের মর্যাদা পেতে পারে। চিত্রকল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গে ডে লুইসের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—একটি উপমা বা রূপক বা একটি বিশেষণবাচক শব্দ/শব্দবন্ধ একটি 'প্রতিমা' নির্মাণ করতে পারে, কিন্তু একটি বাক্‌প্রতিমা পাঠকের কল্পনাতে ফুটিয়ে তোলে বাহ্য বাস্তবের যথাযথ প্রতিচ্ছবির থেকে কিছু বেশি ঃ 'An epithet, a metaphor, a simile may create an image ; or an image may be presented to us in a phrase or passage on the face of it purely descriptive, but conveying to our imagination something more than the accurate reflection of an external reality. Every poetic image, therefore, is to some degree metaphorical.'[৩১]

তাঁর আত্মপ্রকাশ-সংকলন *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* শক্তিকে চিহ্নিত করেছিলো এক দুঃসাহসী ভাষাব্যবহারকারীরূপে, যিনি মধ্যবিত্ত সংস্কারলালিত প্রত্যাশা নির্দয়ভাবে ভেঙে চুরে, শব্দ ও অর্থের চিরাচরিত সমঝোতা অগ্রাহ্য করে গড়ে তুলেছিলেন কবিতার এক স্বতন্ত্র ভাষাশরীর, যা শব্দচিত্রের বৈচিত্র্য, বিস্তার ও আগ্রাসী অনন্যতামণ্ডিত। কেবলমাত্র উপমান ও উপমিতের মধ্যে সহজ সাদৃশ্যবাচক চিত্রকল্পে এই বেপরোয়া কবির তৃপ্তি হয়নি ; তাই তুলনাত্মক চিত্রকল্পের মসৃণতা ত্যাগ করে বার বার তিনি মেটাফরের ব্যঞ্জনা ও দুরধিগম্যতায় তাঁর কবিতাকে নির্দিষ্ট অর্থের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকে চিত্রকল্প-নির্মাণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই সৃজনী আগ্রাসনের কিছু আন্দাজ পাওয়া যাবে :

(১) যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে/তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। (**জরাসন্ধ**)।

(২) শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ (**নিয়তি**)।

(৩) বর্ষার ভ্রূ-লতা দুলতো, কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা (**শৈশবস্মৃতি**)।

(৪) যোনির মাঢ়ির খিল হাট করা, বেহায়া পাংশুতা (**জন্ম এবং পুরুষ**)।

(৫) বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া (**শবযাত্রী সন্দিগ্ধ**)।

(৬) .... তীরে/দাঁড়িয়ে পড়েছে শাদা গাছগুলি, উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া (**ঝর্না**)।

(৭) তারাভিলাষী মাতাল শূক ফেনাবগাঢ় রাতে (**ভ্রান্তি**)।

(৮) গাভিন গরুর মতো কালো ছায়া ফলের বাগানে (**তির্যক**)।

(৯) যাবার সময় দেখেছি শুধুই/ ঝরছে পাতার শিখর-গলানো কার রাঙা চুল

(**অন্ধকার শালবন**)।

(১০) কানা-লণ্ঠন মাথার ওপর টলছে যেন গরঠিকানী পান্থ (**নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলি**)।

(১১) বেশ্যার মতন শাদা উচ্ছ্বসিত ফোলা উরু বেঁকে/স্বস্তিকের শীর্ষে (**হে গান হে নৈঋত**)।

(১২) শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল/দেহের বিহ্বল মুত (**স্বকৃত আলেখ্য**)।

'অন্ধকারের মতো শীতল' মুখ ও 'রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ' দুটি চোখ আর্ত অভিমানের এমন এক ইন্দ্রিয়বেদ্য দৃশ্যরূপ তুলে ধরে যা সাধারণ উপমার সাদৃশ্যবাচক উদ্দেশ্যকে নিশ্চিত অতিক্রম করে যায়। বিশেষত তদ্ভব ও তৎসম শব্দের এই ইন্দ্রিয়ঘন বিন্যাস, দৃশ্য-প্রসঙ্গে স্পর্শের অনুভূতি আরোপ ('অন্ধকারের মতো শীতল'), অনুপ্রাসের সীমিত প্রয়োগ ('কৃপণ করুণ') এই চিত্রকল্পকে প্রথাগত উপমার থেকে অনেক গভীর ও আবেগার্ত ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে। এখানে লক্ষণীয় যে কবি উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার করে সাদৃশ্যবাচক অলংকার পূর্ণোপমার গড়নটি অটুট রাখলেও নিছক সাদৃশ্য সূচিত না করে প্রচলিত কাঠামোর অন্তর্বস্তুতে এক ধরনের মরমী প্রতীকধর্মিতা সঞ্চার করেছেন। আবার উপমার প্রচলিত প্রকরণ পরিহার করে তৎসম শব্দসমূহের সংহত ও রূপময় ঝংকারে শক্তি রচনা করেছেন 'কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা', 'ফেনাবগাঢ় রাতে' কিম্বা 'অনঙ্গ অন্ধকার' জাতীয় অজস্র চিত্রকল্প। *অন্ধকার শালবন* কবিতার উদ্ধৃতিটিতে 'ঝরছে পাতার শিখর-গলানো কার এলোচুল' শক্তির চিত্রকল্পনির্মাণের অনায়াস ইন্দ্রজাল-প্রতিভার নমুনা। উঁচু শালগাছের পাতার শীর্ষদেশ যখন অস্তায়মান সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত তখন শক্তি একগুচ্ছ চেনা শব্দের গ্রন্থনায় অসামান্য

এক মুহূর্তকে চিত্ররূপে বন্দী করেছেন। শালগাছের উঁচু পাতাগুলি যেন এক পর্বতশীর্ষ যার ওপর সূর্যাস্তের সোনা গলানো আলো পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে তা কোনো নারীর এলোচুল। একটি পংক্তিতে সন্নিবদ্ধ এমন জোড়া তুলনা সূর্যাস্তের এক শরীরী সংবেদন গড়ে তোলে। **ঝর্না** কবিতার উদ্ধৃতাংশে আমরা দেখি চিত্রকল্প-নির্মাণে শক্তির অনুরূপ বিস্ময়কর কারিগরি : ভালোবাসা যখন ঝর্নাকে এক নৃত্যপর নদীতে রূপান্তরিত করলো, তখন তীরে থমকে দাঁড়ালো অলীক 'শাদা গাছগুলি' আর নদীতে তারা ছুঁড়ে দিতে থাকলো আশ্চর্য কারুকার্যময় ছায়া, 'উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া'। শব্দচিত্রের এই ঘনসংবদ্ধতা, দৃশ্যবাস্তবের চিত্রময়তার আড়ালে অনুভূতির এমন মায়াময় সূক্ষ্মতা, চিত্রকল্পনির্মাণে শক্তির বিশিষ্টতার ঈর্ষণীয় নজির। এই শক্তিই আবার পাঠকের সংস্কারে আঘাত হেনেছেন অশালীন ও যৌনতাগন্ধী শব্দচিত্রের বেপরোয়া উপস্থাপনায়—'যোনির মাঢ়ির খিল হাট করা...'। পল্লী-নিসর্গের থেকে আহৃত উপকরণের সাহায্যে নির্মিত নমনীয় ও লাবণ্যময় চিত্রকল্পে যেমন শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি রুগ্নতা, রিরংসা ও যৌন মর্বিডিটির শব্দচিত্রনির্মাণে তিনি সংকোচহীন, নৃশংস—'বেশ্যার মতন শাদা উচ্ছ্বসিত ফোলা উরু' কিম্বা 'শোথ হতে চুয়ায় অশ্লীল/দেহের বিহ্বল মূত'। এইসব পংক্তিতে শক্তি বোদ্‌লেয়ারের যৌনতা ও জুগুপ্সার ব্যঞ্জনা বহনকারী শব্দ ও চিত্রকল্পের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলে মনে হয়। সুরাসক্ত ও ভারসাম্যহীন পায়ে মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার সময় পথ ভুল হয়ে যাওয়া কবিই সম্ভবত 'চোখে *টলছে* হাজার চন্দ্রবোড়া' ও 'কানা-লণ্ঠন মাথার ওপর *টলছে* যেন গরঠিকানী পান্থ', এমন চিত্রকল্প রচনা করতে পারেন।

জীবনানন্দকে বাদ দিলে শক্তির মতো বাংলাভাষার আর কোনো কবি প্রকৃতি ও ভূ-দৃশ্যকে তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণে এমন সর্বতোভাবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। গাছ, ফুল, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ ও আকাশের সমগ্র স্পন্দমান পরিমণ্ডলের সঙ্গে শক্তির নিবিড় সংসর্গের উদাহরণ হয়ে আছে এইসব শব্দচিত্রমালা :

(১) আমরুলের পুঞ্জ পুঞ্জ নীল অম্লতা (**চিত্রশিল্প অনন্তকাল**)।

(২) গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর (**ঝর্না**)।

(৩) মেঘের মতন ঠাণ্ডা সাঁতারু দুজন শোল (**সুনিভৃত, সুনিভৃতি**)।

(৪) আকাশ শাদা ফণার মতন (**সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী**)।

(৫) কপালের আয়তন ভাঙা ডালিমের মতো (**বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে**)।

(৬) শীর্ণ হাতগুলি ভালো/শীর্ণতম কটি/পেখমের মতো নিদ্রালস (ঐ)।

জীবনানন্দের কথামতো যদি উপমাই কবিত্ব হয় তবে শক্তির এইসব নিসর্গাশ্রয়ী উপমা বা সাদৃশ্যমূলক শব্দচিত্র কবিকল্পনার উজ্জ্বল উদ্ধার, রং-রূপ-স্পর্শের অনবদ্য অবয়বী নির্মাণ। চিত্ররূপময় হয়েও এরা সজ্জাসর্বস্ব নয়; আলংকারিক লাবণ্যের আড়ালে এদের রয়েছে এক অপরূপ বিষণ্ণতা। তুলনাবাচক গড়নের ইন্দ্রিয়ঘনত্বের উৎকর্ষ ছাপিয়ে এইসব শব্দচিত্র কবিমানসের সংকেতচিহ্ন। ধরা যাক্ '**ঝর্না**' কবিতার উদ্ধৃত পংক্তিটি— 'গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর' ; কবি যখন ফুটিয়ে তুলবেন ঝর্না আর সেই ঝর্না হয়ে উঠবে নদী, ভালোবাসার সৃষ্ট সেই অতি-ভৌগোলিক নদী দেখে গাছ হবে নৃত্য-উৎসুক। কিভাবে শব্দগত বিচ্যুতি ঘটিয়ে শক্তি সেই ঔৎসুক্যের চমকপ্রদ বাক্‌চিত্র এঁকে দিলেন।

চাঁদ ও জ্যোৎস্না শক্তির অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ ; প্রকৃতির সঙ্গে কবির আসক্তির এক অনিঃশেষ চিহ্ন। চাঁদকে নিয়ে শক্তি রচনা করেছেন অজস্র, বিভিন্ন স্বাদ ও রুচির বাক্‌প্রতিমা। প্রকৃতিনির্ভর পৌনঃপুনিক চিত্রকল্পগুচ্ছের উদাহরণ হিসেবে এইসব বাক্‌চিত্রের কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে :

(১) জ্যোৎস্নার রেখাটি দূরে অশ্রুবিন্দুর মতো কাঁপতে লেগেছে' (**অন্তিম কৌতুক**, *হে প্রেম...*)।

(২) চাঁদের মুখে ভয়াল চুল চাঁদের মতন কেউ কি একা ছিলি' (**যৌবন থেকে বামে**, *ঐ*)।

(৩) 'আবার কে মাথা তোলে ফুলে, ফেঁপে একাকার চাঁদ' (**জন্ম এবং পুরুষ**, *ঐ*)।

(৪) 'চাঁদ দেয় নিঃসীম পাহারা' (**তুমি যেন প্রেম**, *ঐ*)।

(৫) 'প্রবল কুচক্রী চাঁদ ফাঁদে পড়ে রয়েছে উঠানে!' (**আমি কেবলই বাতাপি**, *ধর্মে আছো...*)।

(৬) 'মাথার উপর/চাঁদের অসংখ্য চালাঘর' (**তোমাকেই মনে পড়ে**, *ঐ*)।

(৭) 'চাঁদের ভিতরে কতকাল/ পড়ে আছে তোমার কঙ্কাল' (**চাঁদের ভিতরে**, *ঐ*)।

(৮) 'পথে টলে চাঁদের লণ্ঠন' (**কে বাগানে?**, *ঐ*)।

(৯) 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে' (**অনন্ত কুয়ার জলে**, *ঐ*)।

(১০) কখনো উলঙ্গ হয়ে পোশাকের প্রতি যেতে পারি না, আমি/নিরাবরণ চাঁদ যেমন মেঘের কাছে যায় তেমনভাবে যেতে পারি না আমি (**পশ্চাদ্‌ভূমি**, *সোনার মাছি খুন করেছি*)।

(১১) ঝাউবীথি অন্ধকার—কাফে-র মাথায় আঁটা চাঁদ/ আমাকে সন্দেহ করে, উঁকি দেয়—আমি কি অলস? (**উড়ন্ত সিংহাসন**, *ঐ*)।

(১২) এক সময় চোখ তুললেই দেখতে পেতুম/এক গাধা আর চাঁদ নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে/কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না (**গাধা আর চাঁদ**, *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)।

(১৩) চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়/কোথাও লাগে না জল, ধুলো কিংবা ধোঁয়া ও চোরকাঁটা (**চাঁদ, তুমি থেকো**, *ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

(১৪) আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছ্‌না-আলোয়.... (**আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি**, *অস্ত্রের গৌরবহীন একা*)।

(১৫) জ্বলন্ত বাদুড় হয়ে চাঁদ ঝুলে আছে (**ছিন্নবিচ্ছিন্ন**)।

চাঁদ ও জ্যোৎস্না চিরাচরিতভাবে কবিদের অত্যন্ত প্রিয়, অতি-ব্যবহৃত এক ধরনের 'ক্লিশে' ; তবু শক্তির কবিতায় চাঁদের এইসব চিত্রকল্প প্রথাগত আভরণধর্মিতার অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাত্রা অর্জন করেছে ভয়, সংশয়, বেদনা, বিপন্নতা ইত্যাদির সংকেতরূপে। উদ্ধৃত নির্বাচিত তালিকাটির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে কবিপ্রসিদ্ধ চাঁদকে কেবল দূরস্থিত সৌন্দর্যবর্ণনা কিম্বা বস্তুগত সাদৃশ্যনির্দেশের প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহার করেন নি। 'ফুলে ফেঁপে একাকার' অথবা 'জ্বলন্ত বাদুড় হয়ে' ঝুলে থাকা চাঁদ রোমান্টিক কবিকল্পনায় বর্ণিত শান্ত, স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দ্যোতক নয় ; তা কবিমানসের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব ও আর্ত বিপন্নতাবোধের দৃশ্য-প্রতীক, এলিয়টের শব্দবন্ধে—'অবজেক্‌টিভ কোররিলেটিভ' (Objective Correlative)। প্রদত্ত তালিকার (৫) ও (৭) নং উদ্ধৃতিতে চাঁদের মায়াবী, নমনীয় সৌন্দর্যের পরিবর্তে নজরে পড়ে

ফ্যানটাসি তথা অধিবাস্তবতার ব্যঞ্জনা। পরিচিত অনুষঙ্গ ভেঙ্গে শক্তি চাঁদকে বললেন 'প্রবল কুচক্রী' ; যে চাঁদ তার লাবণ্যকুহকে সর্বদা মানুষকেই ফাঁদে ফেলে থাকে, আধুনিক মানুষ সেই রোমান্টিক আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে 'প্রবল কুচক্রী' চাঁদকে ধরে ফেলেছে তার উঠোনের পাতা ফাঁদে। আবার যে চাঁদ তার শুভ্র রূপে প্রেমিকার অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হয়ে থাকে, সেই চাঁদের দিকে চেয়ে, তার গায়ে কলঙ্ক দেখে আধুনিক কবির মনে হলো প্রেমিকার কঙ্কালের কথা : চাঁদের 'কলঙ্ক' কিছু ধ্বনিবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে হয়ে গেলো প্রিয় নারীটির 'কঙ্কাল'। 'অনন্ত কুয়ার জলে' পড়ে থাকা চাঁদ কিম্বা পথে টলতে থাকা 'চাঁদের লণ্ঠন'ও ঠিক কবিতার চেনা চাঁদ নয়। আকাশে শক্তি যখন দেখেন 'চাঁদের অসংখ্য চালাঘর', তখন মনে হয় চিরাচরিত স্বপ্নাবেশ ছেড়ে কবি দারিদ্র্যশোভন চালাঘরের ছবির মধ্যে দিয়ে বাস্তবের কঠোর সত্য-প্রতিমাই দেখছেন মাথার ওপরে। চাঁদকে নারীরূপে দেখার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, কিন্তু ১৪ নং উদ্ধৃতিতে আকাশে চাঁদের শায়া শুকানোর ছবিটিতে শক্তি ছাপোষা এক নারীর অতি তুচ্ছ নিত্যকর্মটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা কবিতায় অবশ্যই ব্যতিক্রমী। রোমান্টিক লিরিক কবিতার অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ চাঁদ শক্তির কবিতায় বারবার ধরা পড়েছে নানা রূপ ও ভঙ্গিমায়। *সুন্দর এখানে একা নয়* কাব্যে মেঘশয্যায় অবসন্ন ও বিস্রস্ত চাঁদ—'আজানুলম্বিত হয়ে মেঘে/যেন চাঁদ আলুথালু....' (**পাথর পাথরখণ্ডগুলি**)। আবার *ভাত নেই, পাথর রয়েছে*-র **পোড়াতে চাই** কবিতায় মধ্যরাতের চাঁদের ছবিটি এসেছে একটি তুলনাত্মক চিত্রকল্পে উপমান রূপে, যেখানে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য সংকেতটি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত— 'রাজনীতি ভাষ্যকার নেমন্তন্ন খাবে এসে মাঝরাতে চাঁদের মতন।' *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* গ্রন্থের নাম-কবিতায় চাঁদ যেন হয়ে উঠেছে কবির মগ্ন-চৈতন্যের রহস্যময় সংকেতবার্তা—'এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে/চাঁদ ডাকে : আয় আয়'। *'কক্সবাজারে সন্ধ্যা'* সংকলনের নামকবিতাটির প্রথম স্তবক শক্তির বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে প্রবল চন্দ্রাসক্তির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ—'চাকমার পাহাড়ি বস্তি, বুদ্ধমন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে/ডাকহরকরা চাঁদ মেঘের পল্লীর ঘরে ঘরে/শুভেচ্ছা জানাতে যায়, কেঁদে ফেরে ঘণ্টার রোদন/চারদিকে। বাঁশের ঘরে ফালা ফালা দোচোয়ানি চাঁদ—/পূর্ণিমার বৌদ্ধ চাঁদ, চাকমার মুখশ্রীমাখা চাঁদ।' এই উদ্ধৃতির চিত্রকল্পগুচ্ছে এবং ইতোপূর্বে উদ্ধৃত বহু চিত্ররূপে শক্তি চাঁদকে দেখেছেন মানুষের নানা মূর্তি ও ভঙ্গিমায়, দেখেছেন নিছক চাঁদের পরিচিত রূপে নয় ; চিত্রকল্পনির্মাণে এই 'mythopoeia'-র সন্ধান পাওয়া যাবে শক্তির 'মেঘ', 'বৃষ্টি', 'গাছ', 'পাথর' ইত্যাদি বিষয়/প্রসঙ্গ অবলম্বনে গড়ে ওঠা অসংখ্য শব্দচিত্রে। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় শক্তি যে এইসব প্রতিমা সৃষ্টি করেন নি তা বলাই বাহুল্য ; 'হট্‌রাপেটা চাঁদ', 'ভুল চাঁদ', 'ট্যারা চাঁদ', 'বাঘের মুড়োর মতন' চাঁদ ইত্যাদি ছবিতে কবিপ্রসিদ্ধ চাঁদকে আমরা পাই না। আবার ষাট দশকের গোড়ার দিকে লেখা একটি অগ্রন্থিত রচনায় এক মানবিকীকৃত চিত্রকল্পে শক্তি দেখেছিলেন চাঁদকে এইভাবে—'অঘ্রাণের মাটির ভিতর হতে ভেসে আসে চাঁদ/লালা ও জ্যোৎস্নায় মাখা/অসহায় উলঙ্গ অনাথ তরল শিশুর মতো' (**ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)। মানবিকীকরণের আর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায় *সুন্দর রহস্যময়* সংকলনের **পাখি আর পোড়া পাতা** কবিতায়—'পর্তুগিজ চাঁদ কালো জলে দু-হাতে সাঁতার কাটে।' এইভাবে একটি ক্লিশে-শব্দ ও চিত্রকল্প তার দৃশ্য-রূপের সীমানা পেরিয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়।

তাঁর বাল্য ও কৈশোরের নিবিড় স্মৃতিলালিত প্রকৃতি ও পল্লীনিসর্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার চিত্রকল্পের অন্যতম প্রধান উৎস। কলকাতা মহানগরীর উদ্দাম ও বিপুল জীবনপ্রবাহে লিপ্ত হয়েও শক্তি অরণ্য-পাহাড়-নদী-আকাশের অপ্রতিরোধ্য টানে আমৃত্যু তাড়িত হয়েছেন। মেঘ-বৃষ্টি-ঝরনা-বৃক্ষ-ফুল-পাখি ইত্যাদি উপকরণ ও অনুষঙ্গে শক্তির কবিতায় চিত্রিত হয়েছে প্রকৃতির রূপ ও স্বরূপের নানা বৈশিষ্ট্য :

(১) ঈশানকোণে অমনোযোগে/মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে/দুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন (**জুলেখা ডবসন,** *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*)।

(২) এখনো বরষা কোদালে-মেঘের ফাঁকে/বিদ্যুৎ-রেখা মেলে (**আনন্দ-ভৈরবী,** *ঐ*)।

(৩) চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে (**কোনোদিনই পাবে না আমাকে,** *ঐ*)।

(৪) আজ আমার সারাদিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা—তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ' (**আজ আমি,** *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)।

(৫) উঁচুমতন আকাশ, তাতে মেঘ যেন চৌদোলা (**ভিতরে জড়িত থাকেন সন্ন্যাসী,** *ঐ*)।

(৬) পিছলে পড়ে পিছলে পড়ে পাতায়/আকাশ থেকে ছেঁড়া মেঘের ছাতা (**তামার পয়সা,** *সুখে আছি*)।

(৭) মাছরাঙাদের মতো ওড়ে পেটিকোট (**এই বাংলাদেশে ওড়ে ....,** *ঐ*)।

(৮) ঝর্নার সজল পৈতে ছেঁড়া যায় গা থেকে তোমার/পাহাড়.... (**ঝর্না শুধু যাবে বলে,** *ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

(৯) সমুদ্রের জল এসে চেপে ধরে সনির্বন্ধ হাত– -/যেতে হবে (**এখানে আকাশ এসে মুখ দ্যাখে,** *অস্ত্রের গৌরবহীন একা*)।

(১০) এখান থেকে চোখে পড়ে মৃদঙ্গ-ভাঙা নদীর একটা পাশ... (**মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে,** *জ্বলন্ত রুমাল*)।

(১১) তখনই যবের শিসের মতো পথভ্রষ্ট অনিশ্চয়তা এসে আমাদের/কাছে ঝুঁকে পড়ে বাড়িয়ে দিয়েছিলো হাত (**এমনও দিন গেছে,** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

(১২) নদী যেমন বসতি ভাঙে নখরে/ভিতরে ভয় তেমন করে ভাঙছে (**ভিতরে ভয়,** *ঐ*)।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত, নির্বাচিত তালিকা, মোটামুটিভাবে শক্তির প্রথম কুড়ি বছরের গ্রন্থিত ও অ-গ্রন্থিত রচনাগুলি থেকে বাছাই করা কিছু নমুনা। এইসব শব্দচিত্র পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র ভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বোঝাতে তথা বাহ্যিক সজ্জার প্রয়োজনেই কবি এগুলি নির্মাণ করেন নি। নিছক আভরণধর্মিতা বা চিত্রলতা রসোত্তীর্ণ চিত্রকল্পের কুললক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে না। একটি সার্থক চিত্রকল্প কবিমানসের এক গভীর ও বহুস্তর অভিজ্ঞতার গূঢ়-সংবেদনী বাক্-সংগঠন, যার স্থানিক ও ইন্দ্রিয়বেদী আবেদন পরিপুষ্ট হবে কবিতার সামগ্রিক অনুষঙ্গে। *জুলেখা ডবসন*-এ ঝোড়ো আকাশ আর আক্রান্ত অরণ্যের উদ্দামতা ও বিপর্যয়, কিম্বা *আনন্দ-ভৈরবী*-র উদ্ধৃত পংক্তিদুটিতে বর্ষার মেঘনিবিড় আকাশে বজ্রশিখার সংকেত কেবল সজ্জামূলক দৃশ্যরূপ বর্ণনা নয়। অনুরূপভাবে, কবি যখন ঝরে যাওয়া ফুলের নির্মম দৃশ্য বর্ণনায় লেখেন 'চন্দ্রমল্লিকার মাংস', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চেনা ফুলের ঝরে পড়ার ছবিটির আড়ালে তিনি কোনো এক নারীসৌন্দর্যের নিষ্ঠুর অপঘাতের করুণ অনুভবেরই অভিব্যক্তি দিতে প্রয়াসী। মানুষের ভিতরে ভয়ের ভাঙনকে কবি যখন বিধ্বংসী নদীর দাপটে ঘর ভাঙার চিত্রকল্পে

ধরতে চান (**উদ্ধৃতি ১২**) তখন খরস্রোতা নদীর শব্দচিত্রটি এক পাশবিক জিঘাংসার অনুষঙ্গ বহন করে আনে। আবার সমুদ্রতরঙ্গের বন্ধুতাপূর্ণ আন্তরিক ভঙ্গি এবং যবের শিসের নতশির সান্নিধ্যমুদ্রা (যথাক্রমে **উদ্ধৃতি ৯ ও ১১**) মানবিক সহমর্মিতার অনবদ্য বাক্‌প্রতিমা হয়ে ওঠে। এছাড়া পেটিকোটের সঙ্গে মাছরাঙাদের বর্ণময় উড়ানের সাদৃশ্য (**উদ্ধৃতি ৭**) কিম্বা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনার সঙ্গে ব্রাহ্মণের উপবীতের চমকপ্রদ সাদৃশ্য (**উদ্ধৃতি ৮**) তুলনাত্মক চিত্রকল্প নির্মাণে শক্তির অনায়াস দক্ষতার নিদর্শন।

আলোচ্য নমুনা তালিকাভুক্ত পাঁচটি পদ্যাংশে মেঘের ছবি বিধৃত আকাশের উন্নত ও বিস্তৃত ফটোফ্রেমে। 'চাঁদ' ও 'জ্যোৎস্না'র মতো 'মেঘ'-ও শক্তির কবিতায় এক পুনরাবৃত্ত চিহ্ন। বালক নিরুপমের পল্লী সংসর্গের আবেশ-অনুভবকে আশ্রয় করে রচিত তাঁর আত্মজৈবনিক আখ্যান *কুয়োতলা-য়*' শক্তি লিখেছিলেন 'কোদালে মেঘে'র কথা[৩২] ; **আনন্দ-ভৈরবী**-তে সেই 'কোদালে মেঘের ফাঁকে' বরষার তড়িৎ-আলিম্পন স্মৃতিবাহিত এক অনবদ্য দৃশ্য চিত্রকল্প (**উদ্ধৃতি ২**)। 'চাঁদ' ও 'জ্যোৎস্না'র মতো কবিতায় বহু ব্যবহৃত 'মেঘ' শক্তির হাতে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার অনাড়ম্বর অভিনবত্বে সার্থক চিত্রকল্পের অবয়ব ও ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে—'আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ' (**উদ্ধৃতি ৪**), 'মেঘ যেন চৌদোলা' (**উদ্ধৃতি ৫**), 'আকাশ থেকে ছেঁড়া মেঘের ছাতা' (**উদ্ধৃতি ৬**) ইত্যাদি। আকাশপথে ধীর সঞ্চরমান মেঘের এইসব দৃষ্টিনন্দন কল্পদৃশ্য থেকে আলাদা **জুলেখা ডবসন** কবিতায় বর্ণিত ঝোড়ো আকাশে মেঘের বিপর্যয়গ্রস্ত অস্থিরতার চিত্রকল্প—'ঈশানকোণে অমনোযোগে/ মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে' (**উদ্ধৃতি ১**)। আবার মেঘের মন্থর চলনভঙ্গিটি উপমার চমৎকারিত্বে আমাদের মুগ্ধ করে **অবনী বাড়ি আছো**-র সেই বিখ্যাত পংক্তিতে—'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।' মেঘময় আকাশে আলো-অন্ধকারেব মিশ্র দৃশ্যপটটি আধুনিক চিত্রকরের দক্ষতায় শক্তি রচনা করেছিলেন *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* গ্রন্থের **কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো...**' কবিতার এই চরণগুলিতে—'মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার/রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো/কঙ্কালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ...'। 'রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো' এক বিরল ও সাহসী বাক্‌প্রতিমার দৃষ্টান্ত ; 'মোচাকৃতি' বোঝাতে 'কনিফেরাস' শব্দটির ব্যবহার এবং কাব্যসৌন্দর্যের তোয়াক্কা না করে রূপসী নারীর বাহুমূলের এমন অসঙ্কুচিত উল্লেখ ('রূপসীর বগলের....') সম্ভবত শক্তির মতো এক শুচিবায়ুহীন কবির কাছ থেকেই প্রত্যাশিত। উদ্ধৃতির তৃতীয় পংক্তিতে দুটি উপমান—কঙ্কালের পাঁজর ও নতুন ভয়েল—স্পষ্টতই পরস্পরের বিপরীতধর্মী, অথচ শক্তি একই উপমাবিন্যাসে এদের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। শক্তির অপরাপর কবিতাগ্রন্থগুলিতেও মেঘের নানা শব্দচিত্র, মেঘকে আশ্রয় করে নির্মিত অনেক ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্প নজরে পড়বে। কয়েকটি ক্ষেত্রে চাঁদ ও মেঘ রয়েছে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, যেমন, 'চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়/.... কেবল মেঘেরা তাকে তৃণাঞ্চলে ঢাকে/যেন তালি-তাপ্পি দেওয়া গরিবের কানি!' (**চাঁদ, তুমি থেকো**/ *ঈশ্বর থাকেন জলে*), 'পোড়া চাঁদের আকাশে মেঘ ঘুমের ভিতর ফাটছে' (**দশমী**/ *অস্ত্রের গৌরবহীন একা*), 'কুয়াশা, মেঘের ফাঁদে চাঁদ' (**কষ্ট হয়**/**ঐ**) ইত্যাদি। চাঁদের লুটিয়ে পড়া কাপড় তার আলুলায়িত জ্যোৎস্না, যার প্রাচুর্যের বিপরীতে শক্তি ছেড়াখোঁড়া মেঘকে চমৎকার তুলনা করেছেন উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগে—'যেন তালি-তাপ্পি দেওয়া গরিবের কানি!' বজ্রগর্ভ আকাশে মেঘের দাপাদাপি চিরাচরিতভাবেই কবিতার উপকরণ। শক্তিও মেঘ

ও বিদ্যুতের উজ্জ্বল যুগলবন্দীর ছবি এঁকেছেন, যেমন, 'মেঘের ভেতরে ছোটাছুটি করছে বিদ্যুৎ' (**পথ তোমার জন্যে**/*জ্বলন্ত রুমাল*) কিম্বা 'তীব্র বিদ্যুতের মতো মেঘের ভিতরে/তুলার ভিতরে অগ্নি জ্বলে' (**বৃক্ষের দীর্ঘতা/ঐ**)। তবে মেঘে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের এইসব চিত্ররূপ অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ এবং এদের আড়ালে অবশ্যই অনুভূত হয় 'ধনধান্যপুষ্পেভরা'র সেই পঙক্তিটি— 'কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে'। *ভাত নেই, পাথর রয়েছে* কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতার প্রথম পংক্তিটিই বৃষ্টি ও বজ্রগর্ভ মেঘের ছবি, গ্রাম্যতার স্পর্শযুক্ত—'বছর-বিয়োনী মেঘ বৃষ্টি দেয়, বজ্রপাত দেয়।' মেঘ-বৃষ্টি-চাঁদকে চিত্রিত করতে শক্তি বারবার মানবিকীকৃত বাক্প্রতিমা ব্যবহার করেছেন। 'বছর-বিয়োনী মেঘ' সেরকম একটি উদাহরণ। মানবিক উৎসকে আশ্রয় করে মেঘের চিত্রকল্প রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা **ভাত নেই, পাথর রয়েছে** কাব্যের '**মেঘ, কতো ভালোবাসা**' কবিতার এই লাইনগুলি—'অন্ধ ও বিষণ্ণ মেঘ ঘুরে ঘুরে দ্যাখে কী ভেঙেছে!/....মানুষের ঘরবাড়ি, মানুষের পাথর পুকুর/সর্বনাশ করে গেছে অন্ধ ও বিষণ্ণ মেঘ, রাগে!' শহর কলকাতায় বসবাসের সামান্য অভিজ্ঞতার আশ্রয়েও শক্তি মেঘ-বৃষ্টির চিত্রকল্পে আনেন অভিনবত্ব—'বৃষ্টি পড়ে মনে-মনে পাহাড়তলিতে পড়ে বেগে/ মেঘ যেন ভিস্তি, তবু, ভরা জল শতচ্ছিন্ন মেঘে' (**সারাদিন পথে**/*মানুষ বড়ো কাঁদছে*)।

নমনীয় আর্দ্রতার নানা নিবিড় অনুষঙ্গে 'বৃষ্টি' শক্তির কবিতায় এক পুনরাবৃত্ত চিহ্ন, এক শীতল শুশ্রূষার চিত্রকল্প। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র অনেকগুলি কবিতাতেই বৃষ্টির উল্লেখ আছে; তাপজর্জর অস্তিত্বের দাহ উপশমে, প্রকৃতির খেলাঘরে সজল ছন্দের ঝঙ্কারসৃষ্টিতে 'বৃষ্টি' কবির একান্ত প্রার্থনার বস্তু—'টবের ফুলগুলোকে দাও বৃষ্টি পেতে, শিকড় বসাতে/টবেরই ঝামায়' (**টবের ফুলগুলোকে দাও**) এবং 'এমন সময় আবার এলো তেমন বৃষ্টি মাঠে/ক্ষেতের পর ক্ষেত ফুরালো, খামার, জঞ্জাল' (**নিমন্ত্রণ**)। যে কবির মধ্যে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলো 'পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধু এক পাড়া-গাঁ', যাঁর স্বভাব-চৈতন্যে নিহিত ছিলো এক রোমান্টিক আকুলতা, বৃষ্টির অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় দৃশ্য, ধ্বনি ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়ানুভবে অন্তর ও বাহিরের সংযোগ-অন্বেষণের চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে—'বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো/কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল/ নেই নিকটে—হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে/....বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা/ দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা/হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে/ আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে/ কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে/ ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!' (**যখন বৃষ্টি নামলো**, *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*)। বহির্জগতের দৃশ্যমান বস্তুর সাদৃশ্যে কবি এখানে পরিস্ফুট করলেন অন্তর্জগতের সঘন, সিক্ত, আলোড়িত সুষমা। নদীর কূল ছাপানো, গৃহস্থের প্রাঙ্গণ ভাসানো বৃষ্টি মানুষের আর্ত অনুভবের প্রতীকচিহ্নে পরিণত হলো। শালের জঙ্গলে যে বৃষ্টিকে শেষ হয়ে যেতে দেখেন কবি কোনো এক শান্ত আষাঢ়সন্ধ্যায়—'আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে' (**এবার হয়েছে সন্ধ্যা**, *ধর্মে আছো...*), তেমনই বৃষ্টির শব্দ কবির স্মৃতিমেদুর আর্ত হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হয়—'এখনো বুকের মাঝে ঘনঘোর শব্দ ওঠে শ্রাবণধারার' (**এখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস**, *ধর্মে আছো....*)। **অবনী বাড়ি আছো** কবিতায় শক্তি অবিরাম বৃষ্টিপাতে সজল শ্যামল এক দেশের কথা বলেন—'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস'। এ বৃষ্টি জীবনমরুতে তাপদগ্ধ পথিকের বহুকাঙিক্ষত তৃষ্ণার জল নয়, বরং মানস-ভূমিতে জায়মান চেতনার অনিঃশেষ ধারাবর্ষণ।

তাঁর কবিতারচনার আদিপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির বাক্‌প্রতিমাগুলি প্রসঙ্গ, অনুভব ও আঙ্গিকের কোনো ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে আমরা একটি বাছাই-তালিকা প্রস্তুত করতে পারি :

(১) সারাবেলা বৃষ্টিতে বিষণ্ণ হয়ে এলো ... (**অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে**)।

(২) মনে পড়ে স্টেশন ভাসিয়ে বৃষ্টি রাজপথ ধরে ক্রমাগত/ সাইকেল-ঘন্টির মতো চলে গেছে... (**মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়**, *প্রভু নষ্ট হয়ে যাই*)।

(৩) গাছের পাতার থেকে বৃষ্টি নেয় ধুলোকে সরিয়ে (**যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে**/*অস্ত্রের গৌরবহীন একা*)।

(৪) আজ একটা গোটা দিন বাড়ি থেকে বেরুনো হয়নি/উবুশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, নড়ছে গাছের মাথা/বাতাসে হিম আর ছন্নছাড়া জলকণা ঝাপ্‌টে পড়ছে জানলায় (**নিচে নামছে**, *জ্বলন্ত রুমাল*)।

(৫) শিশু শালের পাড়ায় রাঙামাটি হাঁ করে গিলছে/বৃষ্টি, যতদূর দৃষ্টি যায়—কী রকম/ গা-ছমছমে সবুজ... (ঐ)।

(৬) বুকের ভিতর যে-পথগুলি চেতন-রুক্ষ/লাগুক তাতে বৃষ্টি-ভরা কিশোর-দুঃখ (**কিশোর দুঃখ**, *কবিতার তুলো ওড়ে*)।

(৭) কেন বৃষ্টি হয়/তোমার বুকের কাছে ভেসে আসে যাবার সময় সন্ধ্যাবেলা (**কেন বৃষ্টি হয়**, *ঐ*)।

(৮) বৃষ্টিও হয়েছে বুড়ো—এবার এসেছে অসময়ে/হাতে লাঠি, কুঁজো পিঠ—দৃষ্টিও আচ্ছন্ন ছিলো তার (**বৃষ্টিও হয়েছে**, *উড়ন্ত সিংহাসন*)।

(৯) বৃষ্টি কি এখনো পড়ছে? গাছপালা প্রসন্ন মেঘের/স্পর্শ পেয়ে ধুয়ে নিচ্ছে ধুলো ক্লেদ কাঠের গ্রন্থনা?/বৃষ্টি কি এখনো পড়ছে? তোমার ঘরের ছাদে, মনে?/বৃষ্টি কি এখনো পড়ছে অযচ্ছল পাহাড়ে ও বনে?/ কল্যাণের মতো সুস্থ, ধুয়ে নিতে অযত্ন অসুখ/ মানুষের, বৃষ্টি পড়ে, সংসার সমুদ্রে ঝরে জল (**সারাদিন পথে**, *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)।

(১০) ছোটবেলা থেকে আমি বৃষ্টির উৎক্ষিপ্ত ছাঁট থেকে/কত যে কী পেয়ে গেছি—কাঁচপুঁতি হীরক মারবেল.... (**অর্থাৎ আবার বৃষ্টি**, *ঐ*)।

(১১) চাইনি, হঠাৎ বৃষ্টি, টগবগিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের/মতো বাজলো টিনশেডে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো ফুল।/....বৃষ্টি এলো, বৃষ্টিতে ভাসিয়ে চললো গলি—/গলির ভিতরে গল্প, কাঁথাকানি, আঁশ খোসা সবই/...বৃষ্টি থেকে বৃষ্টির চড়ুইভাতি তার,/কলকাতার কাজে লাগে, মরাঘাস—তারও কাজে লাগে।/...কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি একটু রাত করে শুলো। (**কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি**, *ঐ*)।

(১২) বাহিরে বৃষ্টির শব্দে মনে পড়ে তোমাকে আমার/মনে পড়ে বৃষ্টি হতো দূর ছোটনাগপুর পাহাড়ে... (**বাইরে বৃষ্টির শব্দে**, *পরশুরামের কুঠার*)

(১৩) গাছপালা ভরে ধুলো, ফুলগুলো মাটিতে ঝরেছে/কোথায় কখন বৃষ্টি হবে/পাতা ফুল হৃদয় জুড়োবে/কোথায় কখন বৃষ্টি হবে ? (**বৃষ্টি হবে**, *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল*)।

(১৪) বৃষ্টিতে ভেজে সবার সকল কিছু/আমিও তখন মাথা করে রাখি নিচু/কিন্তু বৃষ্টি আমায় ভেজাতে চায় না.... (**ছিন্নবিচ্ছিন্ন**, *আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দতন্তুজাল*)।

(১৫) বৃষ্টির ভিতরে কিছু অভিমান আছে।/জলে প'ড়ে ঠোঁট ফোলায়, করে লুকোচুরি,/ ক্ষেতে ও খামারে প'ড়ে সোঁদা গন্ধ তোলে।/ কেন তার অভিমান? পতনে-পীড়নে? (**আমার কোনো অভিমান নেই,** *আমি একা বড়ো একা*)।

(১৬) সমুদ্রতীরের স্বার্থ দেখে না সংক্রান্ত বৃষ্টিধারা/সে কেবল ভাঙে-চোরে, দিয়ে দেয় অর্ঘ্য সমুদ্রকে/মাটিকে আদর করে, সিক্ত করে, সেঁধোয় ভিতরে.... (**সমুদ্রতীরের স্বার্থ,** *আমি ছিঁড়ে ফেলি*)

উপমা যদি কবিতার সারাৎসার নাও হয় তবু উপমার মধ্যে দিয়ে কবি যে তাঁর বর্ণনাকে বিস্তার দান করেন, সম্পর্করহিত দুটি রূপকে চকিতে এক অভাবনীয় সাদৃশ্য দিয়ে আভাসিত করেন তৃতীয় একটি রূপের ব্যঞ্জনা, তার নান্দনিক তথা অনুভবী কিছু মূল্য তো আছেই। রাজপথ ধরে বৃষ্টিধারার 'সাইকেল-ঘন্টির মতো' চলে যাওয়া (**উদ্ধৃতি ২**), অবিরত বর্ষণমুখর একটি দিনে বন্ধ জানলার কাঁচে 'ছন্নছাড়া জলকণা'র ঝাপটে পড়া (**উদ্ধৃতি ৪**), রাঙামাটির 'হাঁ করে গেলা' বৃষ্টিকে (**উদ্ধৃতি ৫**), শহরের টিনের চালে 'টগবগিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো' বৃষ্টি (**উদ্ধৃতি ১১**) ইত্যাদি তুলনাত্মক চিত্রকল্পে সেই অভাবনীয় বিস্তার বাক্‌প্রতিমার ঘনত্বে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অসময়ে আসা বৃষ্টিকে এক অশক্ত, ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধের রূপে (**উদ্ধৃতি ৮**) এবং অন্যত্র তাকে এক ঘোর অভিমানী শিশুর আদলে (**উদ্ধৃতি ১৫**) ভেবেছেন শক্তি দৃশ্যপ্রতিমার অভিনবত্বে। চিত্রকল্প কিভাবে কবির কল্পনায় জারিত হয়ে গড়ে তোলে 'প্রত্যক্ষের সঙ্গে লগ্নতা'[৩৩] তার নজির শব্দের এইসব সাহসী সৃজনীবিন্যাস। গাছ, পাতা, ফুলের মালিন্য দূর করে দেয় যে বৃষ্টি তাকেই প্রতীকী অর্থে মানুষের দুঃখ ও গ্লানির মালিন্য উপশমকারী প্রাণজ শক্তি রূপে দেখেছেন কবি (**উদ্ধৃতি ৩, ৬, ৯, ১৩**)। বৃষ্টির জন্যে এই বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছিলো বিষ্ণু দে'র **জল দাও** কবিতার শেষ পংক্তিতে—'জল দাও আমার শিকড়ে' ; তুলনীয় হপকিন্সের 'Send my roots rain'. আবার মাটিতে আছড়ে পড়া বৃষ্টির আগ্রাসী ভঙ্গির মধ্যে শক্তি দেখেছেন এক আসক্ত প্রেমিক পুরুষকে (**উদ্ধৃতি ১৬**) ; কখনো বা বৃষ্টির শব্দের অনুষঙ্গে কবির স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে প্রেমিকার মুখচ্ছবি ও দূর পাহাড়ের বর্ষণস্নিগ্ধ রূপ (**উদ্ধৃতি ১২**)। আলোচ্য তালিকার বাইরে থেকে গেলো বৃষ্টির আরো অনেক ছবি, বারবার শক্তির কবিতায় ঘুরে ফিরে আসা বৃষ্টির নানা অনুষঙ্গ, প্রতীকী উল্লেখ। 'বৃষ্টি' শক্তির কবিতার অন্যতম চাবি-শব্দ।

চিত্রকল্পনির্মাণে শক্তির অন্যান্য প্রিয় বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পাথর', 'গাছ', 'শব্দ', 'নগরজীবন' ও 'নারীদেহ'। তাঁর প্রায় চার দশকব্যাপী কবিতাচর্চায় চিত্রকল্পের বিপুল সম্ভারে এই বিষয়গুলিকে পুনরাবৃত্ত চিহ্নরূপে দেখা যায় নানা প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গে। 'পাথর' একটি চাবি-শব্দের মতো, ব্যবহৃত হয়েছে শক্তির দুটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণে—*এই আমি যে পাথরে* এবং *ভাত নেই, পাথর রয়েছে*। *এই আমি যে পাথরে* গ্রন্থনামটি এসেছে **মৃত্যুর বিষয়ে** কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তি থেকে, '...এই আমি যে পাথরে শুয়ে/মৃত্যুর বিষয়ে কিছু কথা বলে যাবে।' এই বাক্‌চিত্রে 'পাথর' মৃত্যু ও অপূর্ণতার অনুষঙ্গে বিষাদ বেদনার সংকেতবহ। এই গ্রন্থের অন্যত্র পাথর এসেছে প্রাকৃতিক দৃশ্যরূপের বর্ণনায়, অন্য কোনো উপাদানের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ হয়ে—'বাদামের পাতা ঝরে পাথরের বুকে' (**বাদামের পাতা তুমি**) ; 'একদিন, শৈশবে, সমুদ্র ছিলো কাছে, আজ আছে গভীর বনের প্রান্তে/পাথরে লুটিয়ে শাড়ি, আকাঁড়া কিশোরী যেন' (**একদিন, শৈশবে, সমুদ্র**) ; 'ফুলগুলো ফুটেছে পাথরে' (**জানালা আর দুয়ারগুলি**)। এই সব

সরল বর্ণনাত্মক শব্দচিত্রে পাথরের তাৎপর্য যেন কিছুটা গৌণ বলেই মনে হয়। *ভাত নেই, পাথর রয়েছে* গ্রন্থনামে এবং এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় প্রাণহীন জড়ত্বের প্রতীকরূপে পাওয়া যায় পাথরের নানা উল্লেখ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে পাথরের পুনরাবৃত্ত প্রয়োগের এই উদ্দেশ্যটি বোঝা যাবে—

(১) ...শুধু মানুষ পাথর নয় ব'লে/পরিত্রাণ পেয়ে যায়। অথচ পাথরে যদি মারো/ঘা দাও, অমনি বগা ফোঁস করে.... (**ভাত নেই, পাথর রয়েছে**)।

(২) ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে/মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো (**ছেলেটা**)।

(৩) দুঃখের আগুন তাকে পোড়াতো না/পাখির মতন কেউ ওড়াতো না/নদীর জলের মতো খোঁড়াতো না/ সে এক পাথর থাকত বসে (**একাকী জনতা**)।

(৪) ভালোবাসা তার কাছে ভূমি থেকে পাথরের মতো (**ভালোবাসা, তার কাছে**)।

(৫) স্থিরতার বেড়াজালে বন্ধ কিছু পাথরের কাছে/পাথরেরই পরিত্রাণ আছে (**পাথরের পরিত্রাণ**)।

(৬) পাথর দেখে ভয় পেয়েছে।/ মানুষটা কি পাথর নিজেই? (**মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে**)।

বস্তুতপক্ষে সত্তর দশকে প্রকাশিত শক্তির কাব্য সংকলনগুলিতে পাথরের প্রসঙ্গ ও শব্দচিত্র বেশ নিয়মিতভাবেই লক্ষ্য করা যায়। *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি* গ্রন্থের **একবার তুমি** কবিতায় পাথরকে বলা যেতে পারে চিত্রকল্পরসায়ন তথা বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীয় উপাদান—'একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—/দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে/পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল/নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল/...বুকের ভিতরে কিছু পাথর থাকা ভালো—ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়....।' ফ্যানটাসির ছোঁয়া লাগা দৃশ্যকল্পনায় পাথর এখানে তার শব্দার্থের সীমা ছাড়িয়ে এক সংকেতচিহ্নে পরিণত। *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় পাথরের প্রসঙ্গ রয়েছে। দ্রুত-অপসৃয়মান শৈশবস্মৃতির আর্ত আবেগ ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—'পাথরে পাথর মেরে চলে যেতে চাচ্ছে ছেলেবেলা' (**পাথরে পাথর**)। আবার অন্যত্র একটি একক গাছের গুরুভার নিঃসঙ্গতা বোঝাতে উপমানরূপে ব্যবহার করেছেন পাথরকে 'যে গাছ কেবলি একা, স্পষ্ট পাথরের মতো ভারি/আমি কবিতাকে তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি' (**তার কাছাকাছি**)। মানুষের কায়িক শ্রমের দুঃসহতা ও ক্লান্তি বোঝাতে শক্তি বারবার পাথর ভাঙার প্রসঙ্গ এনেছেন। *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*-র **এবার হয়েছে সন্ধ্যা** কবিতায় সেই শ্রম ও শ্রান্তির অবসানে সান্ধ্য মন্থরতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিলো—'এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর/পাহাড়ের কোলে/... তোমারও তো শ্রান্ত হল মুঠি/অন্যায় হবে না—নাও ছুটি...।' **সুখে আছি** কাব্যগ্রন্থের **আর কী ভাবে** কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তিতে সেই শ্রম ও শ্রান্তির বেদনা ফুটে উঠেছে—'আর কী ভাবে, মানুষ, আমি তোমার জন্য ভাঙবো পাথর।' অন্য একটি রচনায় পাথর হয়েছে বিনষ্টি, ক্ষয় ও মৃত্যুর প্রতীকচিহ্ন—'কবিতার খুব কাছে এসে গেছে নষ্ট ফুলগুলো/যন্ত্রণায় ভারি হয়ে, মৃত্যুতে পাথর হয়ে গেছে' (**কবিতার কাছে**)। *ঈশ্বর থাকেন জলে*-র **মানুষের গল্প** শীর্ষক কবিতায় এলোমেলো জলের ঘূর্ণিতে নৃত্যরত নুড়িপাথর অস্তিত্ববিলোপের দৃষ্টিবিভ্রম হয়ে কবিকল্পনায় ধরা দিয়েছে—'ঘূর্ণিঘাটে জল এলোমেলো/অসংখ্য পাথর তারই সঙ্গে নাচে/হয়ে ওঠে জল।' আবার অন্য একটি কবিতায় পাথর হয়েছে হৃত শৈশবের মনোবেদনার অনুষঙ্গে দহনের চিত্রকল্প—'এখন ভরা

রোদের চড়ায় পাথর পুড়ছে' (**বন্ধ দ্বারে**)। *ছিন্নবিচ্ছিন্ন*-এ বেশ কয়েকটি পদ্যাংশে পাথর এসেছে হৃদয়বেদনার ভার ও জড়ত্বের ব্যঞ্জনা বহন করে—'হারিয়ে যারা যাচ্ছে এবং হারিয়ে যারা আসছে/ তাদের বুকে ভাসছে পাথর, তাদের বুকেই ভাসছে' কিম্বা 'সুন্দরের গান শুধু সুন্দরই শুনেছে/আমরা পাথর হয়ে পড়ে আছি নদীর ওপারে।' উত্তরবাংলা ও বিহারের নদী-জঙ্গল-পাথরে অবিরত ঘুরে বেড়িয়েছেন যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় পাথর কেবল ভূ-প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যপটের অন্যতম নয়—'পাথর বুকের কাছে এসে পড়ে আছে/খণ্ড খণ্ড কতগুলি পাথরের প্রধান সংসার/জ্বালা যন্ত্রণার শেষ কথা নিয়ে..../একাকী এসেছে কেউ, কেউ খুবই অন্যমনাভাবে..../যেন চাঁদ আলুথালু, যেন তার দীর্ঘ অবসাদ/গায়ে মেখে পড়ে আছে পাথর পাথরখণ্ডগুলি.../ফলত আমার কোনো নির্জনতা নেই.../মানুষের মধ্যে থেকে পাথরেরও মধ্যে থেকে খুব/একেকটি সন্ধ্যায় বড় কষ্ট পাই' (**পাথর পাথরখণ্ড গুলি**, *সুন্দর এখানে একা নয়*)। *পরশুরামের কুঠার* সংকলনের **হাতছানি, নীল হাতছানি** কবিতার সংলগ্ন গদ্যটীকায় শক্তি স্মৃতিচারণার মতো লিখেছিলেন—'একসময় ধলভূমগড়ে দৌড়ে বেড়াতে গিয়ে ফিরিঅলাকে পাথর ফিরি করতে শুনেছিলুম। সেই থেকে মাঝে মাঝেই, কলকাতায় দুপুরবেলা, হঠাৎ তার ডাক শুনি। এখানে পাথর বিক্রি ভালোই হতো!'[৩৪] পর্যটনপ্রিয় কবির স্মৃতি-রক্ষিত সেই পাথর কবিতায় স্থান পেয়েছে এইভাবে— 'নৌকায় অনেককাল ভাসা হলো/এখন স্থগিত/ঘাটের সিঁড়ির মতো হয়ে/যাবো—পাথর! পাথর!' (**হাতছানি, নীল হাতছানি**)

আশি দশকে প্রকাশিত শক্তির কাব্যগ্রন্থগুলিতেও পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ ও চিত্রকল্পরূপে পাথর এসেছে। *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল* কাব্যের **চেনা পাথরের জন্যে** কবিতায় পাথরের জড় রুক্ষতার পরিবর্তে পাই প্রেম ও প্রকৃতির মাধুর্য ও শক্তির ব্যঞ্জনা—'একটি চেনা পাথর পড়ে আছে/পরনে তার অসংখ্য মৌমাছি/ভিতরে মৌ-কী জানি কার কাছে/ভালোবাসার অমল মালাগাছি?/একটি চেনা পাথর পড়ে আছে/ পাথর, ওকে নাম দিয়েছে ওরা/ ভয় ক'রে তার শক্তি আগাগোড়াই/ঝর্ণা বলে ডাক দিলে প্রাণ বাঁচে।' পাথরে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে পাথরের মতো করে মানুষকে এবং মানুষের মতো করে পাথরকে দেখেছেন শক্তি। অনেক ক্ষেত্রে আবার অরণ্য ও সমুদ্র, গাছ নদী-ঝর্না ইত্যাদির সংশ্রবে পাথরের নানা রূপ ও ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করেছেন কবি। ধরা যাকএই লাইনগুলি, যেখানে বসে থাকার স্থির ভঙ্গিমায় মানুষই যেন প্রস্তর প্রতিমা—'তোমার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক ছেদ করে দেবো—যদি দেখি.../বসে আছো যেভাবে পাথর বসে থাকে গা ছড়িয়ে পাথরের ভেতর...' (**আমিই তোমাকে বসতে শিখিয়েছি**, *অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল*)। পাথর কেবল শুষ্কতা ও স্থবিরতার প্রতীক নয়, শক্তির পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো প্রস্তরগর্ভ থেকে উৎসারিত ঝর্নার ছবি, জলপ্রবাহের টানে পাথরের গড়িয়ে চলার জঙ্গম প্রেরণা—'পাথর ফাটিয়ে ঝর্না ছুটছে/কলকলিয়ে, পাথর/ গড়িয়ে চলেছে বড়োসড়ো জলের দিকে' (**শালবনে**, *আমি একা বড়ো একা*)। ভাবনাকে চিত্রকল্পের মূর্ততা দিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডসমূহের ছবি এঁকেছেন শক্তি অন্য একটি রচনায়—'মানুষের ভুলগুলি পাথর খণ্ডের মতো ছড়িয়ে রয়েছে—ঘাসের ভিতর ডুবে আছে কেউ, কেউ ঝর্নাজলে,/...পুড়ে ও পাথর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে (**ছড়িয়ে রয়েছে**, *ঐ*)। আবার কোথাও বা পাথর প্রাণহীন জড়ত্বের প্রতীক না হয়ে বিশালত্ব ও স্থৈর্যের ইতিবাচক তাৎপর্য আভাসিত করেছে—'প্রকৃত পাথর হতে পারা খুব সহজে ঘটে না/কেউ কেউ পারে শুধু নুড়ি হতে ...'

(**ভয় আমার পিছু নিয়েছে,** *সুন্দর রহস্যময়*)। *এই তো মর্মরমূর্তি* কাব্যের **বুকের মধ্যে** কবিতাটিতে তো হৃদয়ে লালিত ভালোবাসার স্মৃতিভারকেও শক্তি উল্লেখ করেছেন পাথরের চিত্রকল্পে—'ভালোবাসার পাথর সারা বুকে,/তন্ময়তার মধ্যে ছিলাম সুখে,/ভালোবাসার পাথর সারা বুকে!' মানবিকীকরণের অসামান্য সারল্যে আমাদের মুগ্ধ করেছে এই জাতীয় দৃশ্য চিত্রকল্প—'পাথর নদীর কাছে চুপ করে আছে' (**পাথর নদীর কাছে,** *হেমন্ত যেখানে থাকে*)।

অরণ্যপ্রেমী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'গাছ' অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ, একটি চাবি-শব্দ, যাকে ঘিরে রয়েছে এক আশ্চর্য মমতা, এক অকৃত্রিম নিভৃত আকুতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পাথর' যেমন স্তব্ধতা ও শুষ্কতার প্রতীক, 'গাছ' কিন্তু তেমন নয় ; নাগরিক অস্তিত্বের অপূর্ণতা, মেধার ভিতর অহর্নিশ বাড়তে থাকা শ্রান্তির অবসান হয় কবি যখন অরণ্যের বৃক্ষ-লতা-গুল্মে এক সমগ্রের সন্ধান পান। মানুষকে গাছ হিসেবে দেখা, তার গুণগুলিকে বৃক্ষের প্রতিমা-বৈশিষ্ট্যে বর্ণনা করা, নিষ্পাপ স্বপ্নের উপমা খোঁজা অরণ্য-উদ্ভিদে, গাছের ছায়ায় খোঁজা জীবনের যন্ত্রণামোচন—শক্তির কবিতায় এ সবের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে :

(১) একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে/বাস্তুর নিকটে আছে.../পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির মতন কেশপাশ/এলিয়ে রয়েছে ছায়া (**ঐ গাছ,** *পরশুরামের কুঠার*)।

(২) তুমি যেন গাছ, যার ডাল এসে পড়েছে মাটিতে/ছায়া নিয়ে, মায়া নিয়ে, পরিচ্ছন্ন ফুল পাতা নিয়ে (**তুমি যেন গাছ,** *ঐ*)।

(৩) একটি মধ্যবয়স গাছে নিজেকে বিন্যস্ত/ করে দেখেছি দীর্ঘকাল, শাখার মতো আপন/ কেউ কিছু নেই গত আমার মনুষ্য-সংসারে (**ভালোবাসার প্রাধান্য,** *সুখে আছি*)।

(৪) এখন তোমার/বাগানে যাবার পালা—কিছুদিন গাছ হয়ে থাকো/শিকড় যেখানে যায়, তুমি যাও (**সকলের চেয়ে বেশি অহংকার নিয়ে,** *ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

(৫) গাছের ভিতরে যদি যেতে পারি একবার জীবনে/...বহুদিন থেকে এই সামান্য বাসনা নিয়ে আমি/জঙ্গলে গিয়েছি রাতে, অন্ধকারে। হারিয়ে গিয়েছি/ কোনো শিকড়ের হাত ধরে যেতে চেয়েছি ভিতরে (**ও গাছ, আমাকে নাও,** *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)।

(৬) ...পাশে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ গাছ কাঙালের মতো/আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রাণ/শিকড় মুষ্টিতে মেখে (**পাথর নদীর কাছে,** *হেমন্ত যেখানে থাকে*)।

(৭) সোনালি সুতোর ভারে নিচু হয়ে ছিলো একটি গাছ (**শিকড়ের আশেপাশে,** *মন্ত্রের মতন আছি স্থির*)।

(৮) গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও/ আমার দরকার শুধু গাছ দেখা/ ... গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার/আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার (**আমি দেখি,** *অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল*)।

(৯) এখনো নিঃসঙ্গ কেন ভিড়ের মাঝখানে?/ ভিড় তো তোমাকে চায়, অরণ্যও চায়।/ সেখানে কি একটি গাছ একা থাকে, অবসন্ন থাকে? (**এখনো নিঃসঙ্গ কেন?** *কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে*)।

(১০) গাছ সবই দ্যাখে আর অধিকন্তু, তারই বেশি দেখা/মানুষের চেয়ে, তার পাতার সহস্রতম চোখ (**দুজনের জন্যে,** *কক্সবাজারে সন্ধ্যা*)।

(১১) হে দেবদারুর বিস্তার—আমি শুনতে পাচ্ছি/ তোমার মধ্যে ভাঙছে ঢেউ, আলো খেলছে অলস,/নির্জন ঘণ্টা বাজছে (**হে দেবদারুর বিস্তার,** *জঙ্গল বিষাদে আছে*)।

(১২) দেবদারু তোমার সঙিন তুমি তুলে ধরো আকাশচুম্বনে (**সমাপ্ত,** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

এইসব বাক্‌চিত্রে 'গাছ' পবিত্রতা, সৌন্দর্য, স্নেহ, মায়া, প্রাণময়তার প্রতীকরূপে বিধৃত ; মানবিক নানা বিভঙ্গে, কবির প্রাণবাসনার ইঙ্গিত হয়ে, গাছ ও তার শিকড়-শাখা-পত্রগুচ্ছ কবির কাছে আবেগ-অনুভবের নিভৃত আমন্ত্রণলিপি। গাছকে মানুষের মতো আর মানুষকে গাছের মতো করে দেখার অভ্যাসটি শক্তি উপমা উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তির সাবলীলতায় ব্যক্ত করেছেন এইসব ছবিতে অনুচ্চার লাবণ্যে। হয়ে উঠেছেন নিভৃত পরিবেশবাদী।

শব্দ-সচেতন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলি কবিতায় (গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত রচনা মিলিয়ে আনুমানিক পঁচিশটি) 'শব্দ'ই হোলো বিষয়—শব্দের প্রাণ ও শক্তি, শব্দের ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যু, শব্দের ক্ষমতা-অক্ষমতা ইত্যাদি। *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যের **ক্ষমা করো** কবিতাটি শব্দের উদ্ভব, বিস্তার ও যন্ত্রণার কথা বলে এইভাবে—'রোজ বৃষ্টি হয়—অনবরত, টুপটাপ টুপটাপ/শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শব্দের সমুদ্রে/ যেখানে শব্দের চেয়ে রঙ বড়ো/রঙের চেয়েও বড়ো মাধুর্য/ সেখানে মূল শব্দ উঠে আসে/উপকূলের বালুতে রাখে বুকের দাগ/মুখ লালায় দেয় ভরিয়ে/কাঁধে মাথা রেখে বলে:/ক্ষমা করো আর বাজতে পারি না।' এরপরই উল্লেখ করতে হয় *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* কাব্যগ্রন্থটির, যেখানে বেশ কয়েকটি শব্দ-সম্পর্কিত কবিতা আছে। **যেভাবে শব্দকে জানি** কবিতায় শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে শক্তি সুতোর টানে আকাশে ঘুড়ি ওড়ানোর চিত্রকল্প বেছে নিয়েছেন—'শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে/আমার পেট্‌কাটি চাই...'। এই কবিতারই শেষ চার পংক্তিতে শক্তি শব্দকে দেখেছেন অবোধ আদুরে শিশুর চিত্রকল্পে, স্বীকার করেছেন শব্দের মরণশীলতা—'শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে হিসি করে বুকে/খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ,/ তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, নুঙ্কু নতমুখ—এভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে!' অন্য একটি কবিতায় অভিব্যক্ত শব্দের ওপর শক্তির অনাস্থা ; শব্দ যেন স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াতে পারে না, প্রতারণা করে—'শব্দ শুধু শব্দ এবং শব্দ মানেই সাশ্রু কুমীর!' (**শব্দ শুধু শব্দ**) শব্দের ব্যাপারে অমিতব্যয়ী ও খেয়ালী কবি **পেতে শুয়েছি শব্দ** কবিতায় লেখেন—'শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি/যেন আপন পোড়াকপাল, যেন মুখঢাকানি চেলি।' শব্দ ঠিক কি বস্তু? কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নানা সাদৃশ্যবাচক সম্ভাবনার কথা বলেন—'শব্দ নাকি মোহর? ফাঁকি? শব্দ নাকি জানী?/শব্দ শতরঞ্চ এবং শব্দ কাঁথাকানি/ তা যদি হয় শব্দ তাকে করেছি মহাজব্দ/এবং পেতে শুয়েছি শব্দ—করো মরণে টানাটানি।' শব্দ-বিষয়ক খুব অভিনব রচনা **ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ**—'আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে.../যে আমি একদিন তাকে আগাপাছতলা পেটাতাম/উত্তাল রাস্তার মধ্যে, কিংবা কানাগলিতে ঢুকিয়ে/ কষে গোবেড়েন দিয়ে রক্তচক্ষু ভ্রূমধ্যদলিত/করতাম...' পরিশীলিত তৎসম শব্দের ফাঁক-ফোকর দিয়ে অক্লেশে ঢুকে পড়েছে নিতান্ত কথ্য বা গ্রাম্য শব্দ এবং শব্দ ও কবির পূর্বতন সম্পর্কটি লাভ করেছে এক কৌতুকোজ্জ্বল বাক্‌চিত্রের মাত্রা।

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭২ ; সেই থেকে পরবর্তী কুড়ি বছরের বেশী সময়ে 'শব্দ' নিয়ে শক্তির ভাবনায় ছেদ পড়েনি। কয়েকটি নির্বাচিত বাক্‌প্রতিমা থেকে এই অনুক্রমের একটি ধারণা পাওয়া যাবে :

(১) শব্দে হাত রেখেছি নিশ্চয়/যদি পারি ক্রমিক সাজাতে (*ছিন্নবিচ্ছিন্ন*, ৩৫ সংখ্যক)।

(২) গাছের পাতার মতো শব্দ এসে জমেছে উঠোনে (**পাতার পাহাড়**, *এই আমি যে পাথরে*)।

(৩) শব্দের নিজস্ব কিছু ক্ষিদে আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি আছে/...শব্দ যেন হাওয়া খায়, ভাত খায়, মাছ মাংস খায়/...স্তূপকরা অন্নে-শস্যে, শব্দের বিষণ্ণ গন্ধ আছে।/তবুও কয়েকটি শব্দ হাসিখুশি, স্তব্ধ কোনোটি বা/ যুগলে মানায় কাউকে, অন্যে বসে নিভৃতে, বিরহে/এইসব সহজাত শব্দেরা কখনো করে খেলা/মানুষের শিশুদের মতো মাঠে, সমুদ্রের তীরে.... (**মিশে গেছি শব্দের সহিত**, *ঐ*)।

(৪) ওখানে কি শব্দ ছিলো? কলকাতার ধনসম্পদের/মতন স্বচ্ছন্দ শব্দ কিংবা মধ্যবিত্ত ও মর্কুটে/ ছেঁড়া কাথা, শব্দ ছিলো? লটারির স্বপ্নের গোলাপি/শব্দ ছিলো ঘামে ভিজে, ছাতা পড়ে নরম নৈরাশে? (**জানি না কোথায় শব্দ**, *হেমন্ত যেখানে থাকে*)।

(৫) শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে/....শব্দ এমন যখন তখন শট্‌কে পড়েন দূরে/ হয়তো ভাবেন, পারলে যাবেন এড়িয়ে রোদ্দুরে (**শব্দ গেছে**, *কবিতার তুলো ওড়ে*)।

(৬) শব্দ কি মিনার? শব্দ, মুখাপেক্ষী হলো তোমাদের?/শব্দ কি স্বয়ং নয়? নষ্ট চাঁদ, বালুতে প্রোথিত?/শব্দ গুলিসুতো—তার কাজ আছে, বিষণ্ণতা আছে/ শব্দ কি সেলাইকলে ছুঁচের অক্ষম ব্যবহার! (**এই পক্ষী**, *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল*)।

(৭) ছেলেবেলার শব্দ তুমি আমার দিকে তাকালে না (**ছেলেবেলার শব্দ, তুমি** ; *কক্সবাজারে সন্ধ্যা*)।

(৮) উত্ত্যক্ত হয়েছি আমি শব্দের আক্রান্ত জ্বরে, মোহে!/চিত্র অন্তর্হিত, আমি কীভাবে সে শব্দকে সাজাবো/...এতোল বেতোল খেলা খেলি আমি শব্দ নিয়ে শুধু (**জেগে থেকে না খেলার অপরাধ গ্লানি**, *জঙ্গল বিষাদে আছে*)।

(৯) শুধু কবিতার মৃত্যু দেখে কবি আরেক বিমূঢ় /শব্দের প্রকাণ্ড তাল নিয়ে বসে, কাটাকুটি খেলে (**একটি কবিতা যেন**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

(১০) শব্দের ভিতরে আমি বৃষ্টিপাত দেখি আগাগোড়া/মাটির উঠোনে যেন ঘাস-ব্লেড, যেন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর হাতের টান গভীরতা ঘুমন্ত শেলেটে/...শব্দ যেন বাস্তু-ফেলে রেখে-আসা শূন্য নদীঘাট/নয়, যেন আরো কিছু.../... যেন শব্দ বিজন চৌধুরী/নাম্নী শিল্পীর টান, ক্ষিপ্র রেখা... (**শব্দের ভিতরে**, *ঐ*)।

'শব্দ' কবিতার মৌল উপকরণ, যার ভেতরে থাকে কবির ভাবনার অভিজ্ঞান। সেই 'শব্দ' নিয়ে বাক্‌চিত্রের এমন ধারাবাহিক বৈচিত্র্য উপকরণ সম্পর্কে নির্মাতার সচেতন আগ্রহ প্রমাণ করে। শব্দের স্পর্শানুভূতি, ক্ষুৎকাতরতা, আনন্দ ও বিষাদের মানবিক বৈশিষ্ট্যসমূহে চিহ্নিত শব্দেরা, মাঠে ও সমুদ্রতটে ক্রীড়াচপল শিশুদের মতো শব্দেরা, গাছের ঝরে যাওয়া পাতার মতো পুরনো শব্দগুচ্ছ, বাল্যের স্মৃতিবাহিত শব্দের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি উৎকলিত পদ্যাংশগুলিতে রসঘন সাবলীলতায় পাঠককে মুগ্ধ করে। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১০ নং

পদ্যাংশের নিবিড় পর্যবেক্ষণ-নির্ভর প্রতিমাগুচ্ছ—প্রকৃতি, মানবিক সরলতা ও শিল্পবিভঙ্গ, সব পরস্পর সমন্বিত হয়ে গেছে উৎপ্রেক্ষার সুচারু বিন্যাসে। শব্দ বিষয়ক ভাবনা কিভাবে একটি কবিতার অবয়বে চিত্রকল্পের দৃশ্যসৌন্দর্য ও মূর্ততা সৃষ্টি করে তার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন *কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে* কাব্যের **চলো দেখে আসি** কবিতাটি: 'শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে/বর্ণমালা ঘরদুয়ার। কিছু কিছু নিয়ে বনভূমি/...অমরত্ব চাই বলে অধিকাংশ শব্দ তোলে দাবি,/অঘোষিত শব্দ চোখ মুদে থাকে পাতার আড়ালে।/ অক্ষর কোথাও দীঘি, খানাখন্দ, পাঁকের পুকুর/নদী এ-শহরে নেই, পাহাড়-পর্বত আছে টিলা...।' শব্দের এই পার্বত্য শহর যেমন কবির কল্পনায় মানব বসতির এক চিত্ররূপ, তেমনি আবার শক্তির বাল্য ও কৈশোরের গ্রামজীবনের কিছু কিছু চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শব্দের এই আদর্শ নগরচিত্রণে।

বোদ্‌লেয়ার, টি এস এলিয়ট কিম্বা সমর সেনকে যেভাবে নাগরিক বাস্তবতা ও চেতনার কবি বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সামগ্রিকভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে হয়তো সেভাবে নগরবাস্তবের কবির অভিধা দেওয়া যাবে না। কলকাতা শহরে যদিও কেটেছিলো শক্তির প্রায় চারদশক ব্যাপী কবি-জীবন; যদিও 'কৃত্তিবাস' ও কৃত্তিবাসী কবি লেখক বান্ধব সঙ্ঘ, গিনসবার্গ ও হাংরি প্রজন্মের উত্তেজনা, সত্তর দশকের রাজনীতিসংকুল বাতাবরণ, আনন্দবাজারে কর্মজীবন ইত্যাদি শক্তির কবিতায় নানাভাবে উপস্থিত, তবু শক্তি প্রধানত নিসর্গ প্রকৃতির গুণগ্রাহী, অরণ্য-পাহাড়-সমুদ্র-নদী-মেঘ-জ্যোৎস্নার এক স্বতঃস্ফূর্ত বিবরণদাতা ও ভাষ্যকার। তবে কলকাতা মহানগরীর পথ-ঘাট, পানশালা, কফিহাউস আর আড্ডার আবেষ্টনী, তার অন্তর ও বাহির, উদ্দামতা-ক্লৈব্য-জিঘাংসা-জুগুপ্সার নানা আলো-আঁধারি-সর্পিলতা শক্তির কবিতায় চিত্রকল্পের যেসব নিদর্শন উপস্থিত করেছে তার কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। কলকাতা শহরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এই অস্থির ও পর্যটনপ্রিয় কবিব্যক্তিত্ব কাছে ও দূরে আর যেসব ছোট-বড়-মাঝারি শহরে ফেলেছিলেন পদ্য ও মদ্যের দুরন্ত ছাউনি, সেইসব শহরগুলির অনেক বাক্‌চিত্রও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* গ্রন্থে সংকলিত শক্তির **আদিরচনা খ** পর্বভুক্ত (রচনাকাল : ১৯৫৫-৫৭) **ভ্রমণকাহিনী** নামক কবিতাটিতে পাই একটি চমৎকার সাদৃশ্যবাচক চিত্রকল্প—'উন্মত্ত আঙুলে বাঁধি হোল্ডঅল কলকাতা শহর'। এই পর্বেরই অন্য একটি কবিতা **শিল্পবোধ**-এ 'ঠাসবুনোন মস্তান শহর' কথ্য শব্দের খেয়ালি সমন্বয়ে দৃশ্য ও স্পর্শের ঈষৎ কৌতুকময় শব্দচিত্র। কলকাতার দিনরাত্রি শাসন করা বেপরোয়া জীবনযাপনের মুহূর্তগুলি প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে ১৯৬২-তে লেখা এইসব পংক্তিতে—'বহুকাল কলকাতার পানবিড়ি খেয়ে বেঁচে আছি/...টুকঁরো টাকরা সন্ধ্যা কাটে ছবিঘরে মাদ্রাজি মেয়ের/নির্লজ্জ উদর দেখে ফিরে আসি গলিতেই ফের' (**স্থাবর**)। মহানগরের স্থূলতা ও ক্লৈব্যের অবক্ষয়িত চেহারাটি বোদলেয়ার ও এলিয়টের নগরজীবনচিত্রণের স্মৃতি নিয়ে ফুটে ওঠে প্রেমহীনতা, যৌনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার আত্মপ্রক্ষেপময় চিত্রকল্পে :

(১) সহজ কাচের গর্ভে যুবতীরা রূপাকাটা মাছ/ ছিনাল দোকানে পার্কে রেস্তোরাঁর চতুর কাজলে (**রূপক**)।

(২) গোপনের মদের মুরগীর গন্ধ কাফেময় একান্ত কলকাতা (**পৃথিবীর শেষদিনে**)।

(৩) বিশজন বীট-কবি মুহুর্মুহু চুম্বন ছোটায় (**বারোটি বছর**)।

(৪) সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে চলে গেছি যেখানে যাবার—/চারজন ন্যাংটো হয়ে বেশ্যাকেও করেছি লাঞ্ছিত (**বহুদূর ভালোবেসে**)।

অগ্রন্থিত অন্য কয়েকটি রচনায় উপমা ও সমাসোক্তির ব্যবহারে শক্তি বিদ্যুৎঝলকের মতো তৈরি করেছেন শহর কলকাতার দৃশ্যানুষঙ্গবাহী চিত্রকল্প :

(১) একবার হ্যারিসন গিয়ে দেখে আসি তুমি হাঁটো কিনা/ প্রথম ট্রামের মতো সাংঘাতিক চাঞ্চল্যবিহীন (**পৃথিবীর শেষদিনে**)।

(২) চাকা ঘষটে চলে ট্রাম/ ... রাস্তা জুড়ে দিগবিদিকে চলে বাস/ ট্যাক্সি ফোঁড় তুলে চলে কাঁথার মতন/কলকাতার পাকা পথে/ অলিগলি ভরাট রিকশায় (**দুপাশে, সমাধি চিরে**)।

(৩) মাছের চোখের মতো রেস্টুরেন্টে নিবিড় যুবক (**মালির হাতের**)।

শক্তির গ্রন্থবদ্ধ বিপুল সংখ্যক কবিতা থেকে নাগরিক জীবন ও অভিজ্ঞতানির্ভর কিছু চিত্রকল্পের নমুনা এবারে পরীক্ষা করা যেতে পারে :

(১) সেনেটের শত প্রান্তে মেথি খোঁজে ইঁদুরের শ্রেণী (**সেনেট ১৯৬০,** *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*)

(২) পার্কে পুড়ছে মন্দার এক ঠেঙে (**সময় হয়েছে,** *ধর্মে আছো...*)।

(৩) পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ, ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে (**সে বড়ো সুখের সময় নয়,** *সোনার মাছি খুন করেছি*)।

(৪) মৃত্যু, তুমি রাসবিহারীর ট্রামলাইন (**উড়ন্ত সিংহাসন,** *ঐ*)।

(৫) চৌরঙ্গির দশফুট উঁচু দেয়ালের মতো পোস্টারে ভরে গিয়েছি আমি (**কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ,** *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*)।

(৬) লণ্ঠনরহস্য থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবো ব'লে/এসেছি সদর স্ট্রীটে, গাড়ি-বারান্দার নিচে নীল/সাঁতারু মাছের মধ্যে খেলা করে অবাধ কিশোর/ভিখিরির, তারো নীচে কলকাতার হাঁ-করা পাতাল/শুয়ে আছে... (**৯৭ সংখ্যক,** *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)।

(৭) কলকাতায় স্পষ্ট কোনো পথ নেই, বিশেষত রাতে/গির্জার সংলগ্ন গলি ভরে ওঠে গুঁড়ো ও করাতে (**কলকাতা কলকাতা,** *প্রভু নষ্ট হয়ে যাই*)।

(৮) মিছে এবং মিছে, নিছক মিছেই/রাজনৈতিক মানুষ নাচে মনুমেন্টের নিচে (**জনগণের জন্যে,** *সুখে আছি*)।

(৯) রক্তে ও চোখের জলে ভেসে যাবে গাঙ্গেয় কলকাতা.../শিরার সড়ক খুলে ঢালা হবে প্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ/জ্বলবে ও জ্বালাবে তাকে এবং কলকাতা জ্বলে যাবে (**আমি সহ্য করি,** *ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

(১০) কলকাতায় চলে এলুম প্রাণপণ ফাঁকা থেকে একটা ঝাঁকার মধ্যে যেন (**মিষ্টিগুড়ের ইস্টিশানে,** *অস্ত্রের গৌরবহীন একা*)।

(১১) ময়দানে পার্কের কোণে নারী আসে স্বাগত জানাতে/নিশিনাট্য দ্রুত করে ছুটে যায় গলিতে উদ্বেগ/কলকাতা বিষণ্ন হয়ে শুয়ে থাকে গাছের ভিতরে (**একা একা আমার কলকাতা,** *আমি ছিঁড়ে ফেলি...*)।

(১২) মানুষ ডালহৌসির মুষ্টি থেকে আঙুলের ফাঁকে পড়ছে ছড়িয়ে (**নামছে মেঘ, ঐ**)।

(১৩) কলকাতার রাস্তায়/ভিখিরিরা ইঁট পেতেছে, তিজেলে সিদ্ধ হচ্ছে ভাতের সঙ্গে ছাই পাঁশ/আনাজ কোনাজ-বাজারকুড়ন্তি যা কিছু পাওয়া (**মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ,** *কবিতার তুলো ওড়ে*)।

(১৪) মনুমেন্টের নিচে, অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বাংলাভাষা.../হিংস্র দুটি হাত ঘোরে মানুষের কণ্ঠ পাবে বলে (**সেই দুটি হাত ছোটে,** *পরশুরামের কুঠার*)।

(১৫) বাংলোর বদলে যত বদখত বাড়ির সুমুখে/কলকাতার, বৃষ্টি এলো, বৃষ্টিতে ভাসিয়ে চললো গলি/গলির ভিতরে গল্প, কাঁথাকানি, আঁশ খোসা সবই/মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরের গুমোট, অগোছালো/কাগজের রীতিনীতি... (**কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি,** *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)।

(১৬) শামপানে ফেড়েছে, ও কে, কলকাতার গলি? (**যাবার সময়,** *আমি চলে যেতে পারি*)

(১৭) গলির ঘুমন্ত পিঠ মাড়িয়ে-মাড়িয়ে/ গোল্লাছুট ফিরে আসা কুকুর তাড়িয়ে—এভাবে কি যাবে দিন? এভাবে কি যাবে? (**এভাবেই যাবে?,** *মন্ত্রের মতন আছি স্থির*)।

(১৮) ময়দানের ঘাস ছিঁড়ে ঝড় ঢুকবে আনন্দবাজারে (**এখনো নামেনি বৃষ্টি ;** *ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে*)।

এইভাবে ষাট, সত্তর ও আশির দশকের কলকাতা মহানগরীর বহিরঙ্গের দহন, ক্ষয়, নিষ্ঠুরতা ও মত্ততা এবং তার অন্তর্ভূমির বেদনা, বিকার ও শূন্যতা শক্তির কবিতায় আত্মজৈবনিক নানা অনুষঙ্গে বাক্‌চিত্রের মূর্ততা পায়। উগ্র-বাম রাজনৈতিক সন্ত্রাসতাড়িত কলকাতা, মনুমেন্টের নীচে রাজনীতির হাতছানিতে উদ্বেল জনমণ্ডলী, মধ্যরাতে রাজপথে টলমল পদবিক্ষেপে নেশাগ্রস্তের পথচলা, ময়দান ও পার্কের অন্ধকারে যৌনাচারের ফন্দি-ফিকির, শহরের পথে ভিখারির দুমুঠো অন্নের বেপরোয়া বন্দোবস্ত, ডালহৌসির দৈনন্দিন আবর্তে ছড়িয়ে পড়া মানুষের দঙ্গল, কলকাতার অলি-গলিতে শ্বাসরুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন ইত্যাদি শক্তির প্রিয় শহর কলকাতার একটি আর্ত চিত্রালেখ্য তুলে ধরে উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলিতে।

প্রেম ও যৌনতা শক্তির কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়, একটি পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। সেই সূত্রে নারীদেহের নানা অঙ্গ-বিভঙ্গ তাঁর বিভিন্ন সময়ের বহু রচনায় একক ও গুচ্ছ প্রতিমার চিত্ররূপে মূর্ত হয়ে আছে। *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* শীর্ষক সংকলনটিতে আদি ও উত্তরপর্বে রচিত বেশ কিছু কবিতায় নারীদেহ ও যৌনকামনাকেন্দ্রিক চিত্রকল্পের বাহুল্য আমাদের নজর এড়ায় না :

(১) ...সারাক্ষণ মাস্টার উসখুস করে ঘরে/তরুণী বধূর স্তনে দাঁত ব'সে আউরে ওঠে বুক (**নিষিদ্ধ অঙ্গার, আদিরচনা ক,** *অগ্রন্থিত শক্তি*)।

(২) স্তনের চন্দনস্তূপ গলে যাবে মুখের গহবরে/অন্যবিধ চিহ্নগুলি রক্তাপ্লুত, উদগত মীনান্তক যোনিকূপ/সংযুক্তির শীর্ষবিন্দু... (**উরু,** *ঐ*)।

(৩) অন্ধকার স্তনভার তপ্ত মগ্ন প্রস্রাবের স্রোতে/সিক্ত হই মত্ত সিংহ, সিক্ত হোক সিংহের চিবুক (**ষোড়শপদী, ঐ**)।

(৪) একমুষ্টি শিবফুল পঞ্চদশী বালিকার যোনি/লোভী কুকুরের জিহ্বা স্পর্শ করে তরল ত্রিকোণী/প্রস্রবণ মাখে মুখ সারারাত্রি দাঁতাল পাথর (**পাপিষ্ঠ, ঐ**)।

(৫) রক্তের প্রস্রাব মাখে দুই হাতে প্রসবিনী নারী (**রাত্রিকে বিশ্বাস নেই, ঐ**)।

(৬) রমণী মর্ষণ করে নিজহস্তে স্তনদল তার (**সোনার পুতুল, ঐ**)।

(৭) ঘনিষ্ঠ হয়েছে নারী তার সঙ্গে অরণ্যের মিল/অস্পষ্ট চিলের মতো চোখদুটি, কোমল মৃণাল/রেখেছে শরীর ঘিরে শোভাতুর কামার্ত পুরুষ/অনায়াস স্পর্শসুখে পুড়ে পায় অঙ্গারের হাল (**দৃশ্যান্তরের ছলনা, ঐ**)।

(৮) বাগানে অনেক গাছ পোয়াতির বুকের মতন ঝর্নার পীযূষে সিক্ত (**শিকার কাহিনী, ঐ**)।

(৯) ...ক্রুদ্ধ দাঁত মেরে দাগড়া দাগড়া কুরে/স্তনের ভেলভেট বৃত্ত... (ঐ)।

(১০) তোমার যৌবন যখন গ্রাম, প্রেম কারুকরুণ নদী, তখন/আমি বিদ্ধ হতে পারি রোহিত মাছের মতো মসৃণ/ মেয়ের শরীরে (দৃশ্যান্তর, আদিরচনা খ, *অগ্রন্থিত শক্তি*)।

(১১) ... সেই স্বৈরিণীর কাদার শরীর নগ্ন করি...। আসন্ন গর্ভিণীর মতো অলস উরুযুগ ভেঙে মুড়ে রেখেছে উদরের পর, পৃথুল স্তন তার তীক্ষ্ণ, নাভিকন্দে তীব্র আতরের গন্ধ আর সে যেন এক আরণ্যক গুহার অন্ধকারমুগ্ধ চোখে আমাকে বিদ্ধ করে। (পরভৃৎ, *ঐ*)।

(১২) বহুব্রীহি মাঠ তোমার শরীর। ...অন্ধকার উরুর পর আমি কখন মত্ত যুবক সমুদ্রের জোর। (তিন তরঙ্গ, *ঐ*)।

(১৩) স্তনভূমি পর্ণপ্রসন্ন শাখার মতো মসৃণ (শুকসারী, *ঐ*)।

(১৪) তার স্তন উপাধান। ...বিপুল বয়স মুছে মুছে কঠিন কর্কশ হয়েছে হাতের তালু, নাকের ত্বক, কপোল, যোনিরোম। ... উদরে রুক্ষ রেখার অমসৃণ প্রচ্ছদ... (তার, *ঐ*)।

(১৫) কঠিন শীতে শিলা হয়েছে শরীর, রোমাঞ্চিত তনুরুহে ছেয়েছে দেহের মৃন্ময় গোচর, স্তনশীর্ষ তীক্ষ্ম সুতীক্ষ্ম নির্জন শাখার মতো... (রাহু, *ঐ*)।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭-র মধ্যে লেখা এই আদি পর্বের পদ্যাংশগুলিতে নারীশরীরের এতো প্রবল বাসনাতাড়িত উল্লেখ, যৌনক্রীড়ার এতো অসংকোচ অনুপুঙ্খ বোদ্‌লেয়ার-লরেন্স-বুদ্ধদেব বসুর ক্রমপর্যায়ে যুবক-কবি শক্তির প্রণয় ও যৌনতাবিলাসের সংরক্ত ক্ষেত্রভূমিটি আমাদের কাছে উন্মোচিত করে। এখানে উদ্ধৃত পনেরোটি পদ্যাংশের মধ্যে দশটিতে নারীত্ব ও যৌনকামনার বিশিষ্ট সম্পদ-চিহ্নরূপে স্তনের উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে (৮) নং উদ্ধৃতিতে ঝর্নার জলধারায় সিক্ত গাছকে স্তন্যদায়িনীর দুধে আর্দ্র বুক এবং (১৫) নং উদ্ধৃতিতে তীক্ষ্ম স্তনচূড়াকে নির্জন বৃক্ষশাখার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। (১৩) নং পংক্তিটিতেও সুডৌল স্তনভূমির মসৃণতার স্পর্শানুভূতি সৃষ্টি করেছে 'পর্ণপ্রসন্ন শাখা'র দৃশ্য-উপমান। (৯) নং উদ্ধৃতির 'স্তনের ভেলভেট বৃত্ত' দৃশ্য প্রতিমা হলেও তার আড়ালে থাকে স্পর্শসুখের ব্যঞ্জনা। (২) নং পদ্যাংশের 'স্তনের চন্দনস্তূপ' দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ও স্পর্শের এক মিশ্র অনুভূতির সন্ধান দেয়। (৬) নং পংক্তিটিতে জনৈকা রমণীর আত্মরতির মর্ষকামী চিত্ররূপ ফুটে ওঠে। প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের কবিরূপে অচিরেই যে কবি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিলেন তাঁরই আদিপর্বের অগ্রন্থিত রচনায় যৌনলিপ্সা ও সম্ভোগের এতো বিশদ ও প্রত্যক্ষ উল্লেখ হয়তো পাঠককে কিছুটা বিস্মিত করবে, অধিকাংশ চিত্রকল্পে যৌনাচারের উদগ্রতা আহত করবে মধ্যবিত্ত নীতিবোধকে। (১), (৩), (৫), (৯) ও (১১) নং পদ্যাংশগুলিতে অবাধ যৌনতা ও নারীদেহের যে সব চিত্রমালা পাই তাতে নাগরিক জীবনের অবক্ষয় ও কবিস্বভাবের অন্তর্নিহিত 'ম্যালিগন্যান্সি' যেমন আছে, তেমনি বোদ্‌লেয়ার-লরেন্স-এলিয়ট ও শক্তির পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধদেব বসুর রচনার প্রতিচ্ছবিও অলক্ষ্য নয়। আবার (১০), (১২) ও (১৫) নং উদ্ধৃতিগুলিতে যৌনকামনার প্রতিমাসমূহে অলঙ্কারের সার্থক ও নান্দনিক প্রয়োগে শক্তি সৃষ্টি করেছেন শরীর বাসনার এক সংরক্ত ফ্যানটাসি। 'রোহিত মাছের মতো মসৃণ' অথবা 'বহুব্রীহি মাঠ'-এর মতো নারীদেহ চিত্রকল্প নির্মাণ দক্ষতার চমকপ্রদ নিদর্শন। (১১) নং পদ্যাংশে এক স্বৈরিণী ও (১৪) নং পদ্যাংশে এক প্রবীণার স্তন, উদর, উরু, যোনিদেশের যে বিবরণ পাই, চিত্রকল্পের অভিনব ফ্যানটাসিধর্মিতায় তা আমাদের চমৎকৃত করে। (৭) নং উদ্ধৃতির পংক্তিগুলিতে প্রণয়-সান্নিধ্যের মুহূর্তে নারীদেহ অরণ্যের সাদৃশ্য অর্জন করে।

শক্তির শেষ দশ বছরের কবিতার দিকে তাকালে নারীদেহ ও যৌনবাসনার বেশ কিছু শব্দচিত্র নজরে পড়বে। *কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে* (১৯৮৩) কাব্যের **রক্তের ভিতরে দোল দুর্গোচ্ছব** কবিতায় একটি অসামান্য উপমা ও তার কিঞ্চিৎ বিস্তারে শক্তি নারীদেহের ভাস্কর্যপ্রতিম উজ্জ্বলতাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে দেহজ বাসনার প্রকটতা প্রশমিত হয়ে এক আবেগময় নমনীয়তা আভাসিত হয়েছে—'দুই সহোদর উরু দুটি মোমবাতির মতন/অবাধ, জ্বলন্ত, যেন পরিচয় ছিলো!' অন্য একটি কবিতায় চুম্বনের গভীরতা ও তীব্রতা ব্যক্ত হয়েছে—'একটি চুম্বনে তুমি প্রাসাদের ভিত খুঁড়ে ফেলো' (**একটি চুম্বনে**)। *কক্সবাজারে সন্ধ্যা* (১৯৮৪) গ্রন্থের **শিশুকালের তৃষ্ণা** কবিতাটিতে এক দরিদ্র ও ভগ্নস্বাস্থ্য নারীর স্তনবৃন্তের যে ছবি পাই তাতে যৌন আকর্ষণ বা ফ্যানটাসির চিহ্ন নেই, আছে স্থূল বাস্তবতার ছাপছোপ—'তার পরণে ছেঁড়া জামা। মধ্যে থেকে/দু-মুঠো বাজবরণ লতার মতন পাংশু/স্তনের বোঁটা বেরিয়ে আছে শিশুর জন্যে/শিশু তো নয়, নাছোড়বান্দা পুরুষ, খোঁড়া।' *এই তো মর্মরমূর্তি* (১৯৮৭) কাব্যের **রমণী** নামক কবিতার প্রথম পংক্তিতেই পাই কামনাতাড়িত নারীর সমর্পণের ভঙ্গি—'রমণী ভারি কামকাতর, এলায়ে পড়ে আছে'। এই গ্রন্থেরই **তপশ্চারিণী**-তে যৌন সংসর্গ আর প্রেমের পার্থক্যটি ধরা পড়েছে প্রেমিক পুরুষের চিত্ররূপ কল্পনায়, কিছু পরাবাস্তবতার ছোঁয়াও যেন লেগেছে বাকপ্রতিমায়—'জবরদস্তি যৌনাচার, তবু যেন অনিচ্ছুক প্রেম?/স্তনের বৃন্তের রোম নিয়ে জেগে থাকা সারারাত/জঙঘার উপরে দুই হাঁটু ছিঁড়ে ঘাস গজিয়েছে।' একই সংকলনভুক্ত **কুয়াশায়** কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে চুম্বন ও স্তনস্পর্শের গভীর সংরাগ বিধৃত হয়ে আছে—'ভোরবেলা চুম্বনের শীত ওষ্ঠে লাগে/দুটি করতলে করে সে-মুখ স্থাপন/আবার চুম্বন করি সেই ওষ্ঠাধরে/তখন উষ্ণতা পাই, শরীরে উন্মুখ/হয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়েরা/তখনি শালের ভিতরের বুকের মধ্যে দুটি হাত রাখি/ও কিছু বলে না, শুধু অন্ধের মতন/ চোখ বুজে স্থির থাকে পাথরের মতো।' **আমাকে জাগাও** (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থের **কিশোরবেলার ঘুম** শীর্ষক কবিতায় কৈশোরের চুম্বনস্মৃতি ও সেই স্মৃতির তাড়নায় অস্থির যৌবনের দেহবাসনার ছবি আছে—'কিশোরবেলার ঘুম ভেঙে গেছে হঠাৎ সন্ধ্যায়,/ তোমাকে সহস্র নামে ডেকেছি সন্ধ্যায়,/ধরেছি ও-মুখ সাজ করতলে, চুম্বন করেছি,/ সেই স্মৃতি মনে করে হয়েছি পাগল।/ হয়েছি অশ্বের মতো তেজী আর স্বেদেও ডাগর, /ধরেছি তোমার দুটি স্তন এক কঠিন আবেগে।' এই সংগ্রহের অন্য একটি কবিতায় নারীদেহ ও যৌনমিলনের ছবি এক স্বপ্নময় আবেগ ও প্রাকৃতিক সংসর্গে আশ্চর্য মিথুন মূর্তির চিত্রভাষ্য হয়ে ওঠে—'কাঁকর লেগেছে স্তনে, মাথা ভর্তি কাঁকরের ফুল,/দুহাতে সরাই সব, তোমার স্বপ্নের মতো দেহ—/বাহুগন্ধে নুনজল.../ আকাশমণির ঝাড় অদূরে দেয়াল তুলে ধরে/ আমরা আড়ালে শুয়ে দুই মূর্তি এক হয়ে থাকি' (**একাত্ম**)। তাঁর মৃত্যুর আগের বছর প্রকাশিত *জঙ্গল বিষাদে আছে* কাব্যসংকলনে মালবিকা নাম্নী জনৈকা নারীর প্রতি শক্তি তাঁর প্রবল আসক্তির কথা বারবার ব্যক্ত করেছেন, যে মালবিকা 'এক নিষ্ঠুর কিশোরী' , যার সঙ্গে এক অসম সম্পর্কের অপ্রতিরোধ্য টানে কবি বাঁধা পড়েছেন। মালবী তাঁকে ভীষণ উন্মত্ত করে, 'কেটে টুকরো টুকরো করে খায় ও চিবোয়' (**ভীষণ উন্মাদ করে**)। সন্ধ্যায় মালবিকা এলে কবি সান্নিধ্যের প্রথম পাঠ সম্পন্ন করেন—'ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে সুদীর্ঘ চুম্বন করে আসি' (**তবে তাই হোক**)। অতঃপর মালবিকার দেহসম্পদের চৌম্বকশক্তি বৃদ্ধের বাসনাকে এতদূর উদ্রিক্ত করে যে বাকচিত্রে বিকারের চিহ্ন ফুটে ওঠে—'মালবিকা স্তন দাও, দুই স্তনে মাখামাখি করি'

(**প্রেম দিতে থাকো**)। জঙ্গলের আদিম আরণ্যক পরিমণ্ডলে মালবিকার সঙ্গে তাঁর দুর্মর আসক্তির অকপট ভাষ্যে আমরা আদিপর্বের শক্তি ও তাঁর চিত্রকল্পের সন্ধান পেতে থাকি— 'মালবীর কোলে মাথা.../ একটি চুম্বন দিই ওর ঠোঁটে— এঁকে, /মেহগিনি-বাহু দিয়ে সুকণ্ঠ জড়াই/ স্তনদুধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে মুখটি ভেজায়,/ আমি স্তনে মুখ রাখি' (**জঙ্গলে এমন খেলা**)। কিশোরীর দেহবল্লরী বয়স্ক কবির ঘোর-লাগা কল্পনায় যৌন ফ্যানটাসির এক বিচিত্র জগৎ নির্মাণ করে— 'তোমার বুকের পাশে শুয়ে থাকবে বিপুল আক্রোশে,/ স্তনদুটি শঙ্খনাদ করে উঠবে ঘুমন্ত কামড়ালে,/নাভিগর্ভে আঙুলের রক্ত ও প্রপাত পড়বে ঝরে—এ বয়েসে সব কাজ করতে পারি প্রেমে ও সম্মোহে' (**তোমার সন্তান আমি দিয়ে যাবো**)। জঙ্গলের আদিমতায় বৃদ্ধের অসম্ভব ভোগবাসনা নারীশরীরের রূপ-ঘ্রাণ-স্পর্শের ইন্দ্রিয়ভারাতুর চিত্রকল্প গড়ে তোলে—'আমি এক কিশোরীর সঙ্গে আছি, করো না বঞ্চনা,/ ...আমি ঐ কিশোরীর সর্বাঙ্গ পোড়াবো!/ ...তারপরে ভোগ করবো অশ্রুসিক্ত কপোল তাহার, /তীরন্দাজী দুটি স্তন, নাভির গোলাপগন্ধ আর/জানি না কী করে খাবো ওষ্ঠাধর, আশ্চর্য মাতাল! (**শিকার করেছি**)।

তাঁর কবিতারচনার আদিপর্বে শক্তির অগ্রন্থিত কবিতাসমূহে নারীদেহ ও যৌনবাসনাকে ঘিরে ইন্দ্রিয়াসক্তির যে ফ্যানটাসি রচিত হয়েছিলো তার কাছাকাছি সময়ে লেখা ও প্রকাশিত তাঁর আত্মপ্রকাশ সংকলন *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র অনেকগুলি কবিতায় তেমন কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। 'যোনির মাড়ির খিল হাট করা' (**জন্ম এবং পুরুষ**) কিম্বা 'বেশ্যার মতন শাদা উচ্ছ্বসিত ফোলা উরু বেঁকে' (**হে গান হে নৈঋত**) জাতীয় বাক্যাংশে নাগরিক রিরংসা ও অবক্ষয়ের প্রকটতা পাঠকের রুচি ও প্রত্যাশাকে আহত করবে। কয়েকটি কবিতায় শক্তির চিত্রকল্পে নারীর স্তন ও বক্ষসৌন্দর্যের চমৎকার কাব্যমাধুর্যমণ্ডিত উল্লেখ পাই—'বক্ষোদেশ স্রোতপীড়িত ভাণ্ড' (**অবিশ্বাস্য**), 'স্তনের কৃশতা হয় বনানীর মতন উজ্জ্বল' (**স্বকৃত আলেখ্য**), 'স্তনের শাঁসের মতো অন্তঃপল্লী তোমার প্রাণের সংবেদনা' (**বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে**) ইত্যাদি। অপর একটি কবিতা **দ্বিধাহীন**-এ শক্তি যে নারীদেহ বাসনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তাই তাঁর শেষপর্বের কবিতায় মালবিকা নাম্নী নারীর সাহচর্যে বারবার উচ্চারিত হয়েছে—'সামান্য স্তনের উঞ্চে তৃপ্তি পাবে অদ্ভুত বৃদ্ধেরা'। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে, যেমন *ধর্মে আছো..., সোনার মাছি...,* ও *হেমন্তের অরণ্যে...* নারীদেহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো বাক্‌চিত্র নজরে পড়ে না। চুম্বনের দু-একটি উল্লেখ কিংবা যৌনতার প্রতীকী কিছু অনুষঙ্গ থাকলেও মনে হয় শক্তি নারীশরীর ও সংরক্ত বাসনার যে চিত্রকল্প বুদ্ধদেব বসু এবং বীট ও হাংরি কবিতার প্রভাবে প্রায় নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন তা থেকে অনেকটাই মুক্ত হয়েছেন। পঞ্চাশের শেষ থেকে শুরু করে ষাট দশক-এর বহু বিচিত্র ও বিতর্কিত ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে লেখা তাঁর ১০১টি সনেটের সঙ্কলন *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০-এর মে মাসে। এই সঙ্কলনের অনেকগুলি রচনায় (কমপক্ষে ১০টি) শক্তি নারীদেহ ও যৌনতার প্রসঙ্গ ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। তবে এর মধ্যে কেবলমাত্র একটি শব্দচিত্রে কবিকল্পনার সম্পন্নতায় উত্তরণের চিহ্ন আছে—'ফেনার উৎসবে/ বহু জলচারিণীর উত্তাল আপেল দেখিয়াছি' (**৭৬ সংখ্যক**)। অন্যত্র সমাজবিধি লঙ্ঘনকারী নিষিদ্ধ যৌনাচারের চিত্র পাই, **২৭, ৩৩, ৩৪, ৯৪ সংখ্যক** সনেটগুলিতে। নাগরিক স্বেচ্ছাচারের তুমুল দিনরাত্রির স্বীকারোক্তিমূলক ভাষ্য পাই **৮০ সংখ্যক** চতুর্দশপদীর এই দুঃসাহসিক পংক্তিগুলিতে— 'আমরা কি কোনোদিন কুকুরেরও সমান হব

না/আমরা কি কোনোদিন আদুল গায়ের কায়িকতা নিয়ে চেয়ে দেখিব না মেয়েমানুষের আশাতীত/রঙিন মলাটগুলি, বগলের নম্র মাংসগুলি...?' বেপরোয়া আত্মজীবনকে এভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করার প্রতিভা ও সাহস 'কৃত্তিবাস' ও হাংরি প্রজন্মের স্বেচ্ছাচার শাসিত ষাট দশকেই নিহিত ছিল বলে মনে হয়। শোভনরুচি পাঠকের শ্রুতিকে আহত করা 'মেয়েমানুষ' জীবনানন্দেও বারবার এসেছিলো। ৮৭ সংখ্যক রচনায় শক্তি যে স্তন্যদাত্রীর মূর্তিতে নারীকে দেখেছেন—'দাও বক্ষ দাও, দুগ্ধ পান করি, বালক তোমার....'—তারই অনুরূপ চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায় প্রায় তিন দশক বাদে *জঙ্গল বিষাদে আছে*-র ইতোপূর্বে উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলিতে। বালকের মত খেলাচ্ছলে নারীদেহকে আশ্রয় করে যে প্রৌঢ় কবি আরণ্যক সহবাসের বাক্‌চিত্র নির্মাণ করেছেন, কবিতারচনার প্রারম্ভিক পর্বেই সেই বাসনার উচ্চারণ ছিল অকপট।

ঈশ্বর থাকেন জলে-র **যৌন ছড়া** কবিতার নামকরণেই বিষয়ের স্পষ্টতা রয়েছে। নর-নারীর জৈবিক সম্পর্কের এক চমৎকার ও চটুল বাক্ প্রতিমা এ কবিতায় সার্থক হয়েছে অন্ত্যমিলের অনায়াস প্রয়োগে—'ডোঙায় চড়বো—তুমি আমার সঙ্গে গেলে/কালকা-মেলে/অনেক বগি/তুমি আমার তাল-ডোঙাটি, আমিই লগি।' এই কবিতাতেই শক্তি নারী-পুরুষের মিলনভঙ্গি -মাকে দিয়েছেন শব্দের চমকপ্রদ ছন্দময় বিন্যাস—'মিথ্যেভাষণ করব শুধুই সঙ্কে হলে/বলবো, দুপুর/যখন দু-থাক শরীর হচ্ছে উপুর্যপুর।' এরই কিছু পূর্বে প্রকাশিত *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*-র একটি কবিতায় বেশ কিছুটা অকারণেই এবং বাহ্যত প্রচলিত শালীনতায় আঘাত দিতেই শক্তি লিখেছিলেন—'উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত' (**পোকায় কাটা কাগজপত্র**)। সাধারণভাবে পাঠকদের কাছে নিভৃত রোমান্টিক প্রেম ও অনুচ্চার বাসনার কবিরূপে স্বীকৃত হলেও শক্তি বরাবরই কমবেশি নারীদেহ ও যৌন সাহচর্যের ছবি এঁকেছেন ইন্দ্রিয়ময় আবেগে। সদ্যযৌবনার স্তনসম্পদের একটি উপমাবাচক চিত্রকল্পের উল্লেখ করে শক্তির সংস্কারমুক্ত নারীদেহ বিষয়ক চিত্রকল্পসমূহের বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি—'বাতাসার মতো স্তনে দুটি ডেয়োপিঁপড়ের সোহাগ/মাখা, এই কিছুদিন আগে ওকে আঁচিল বলেছি!' (**শোন, এই পাথর পুড়েছে,** *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)। শক্তির আত্মজৈবনিক আখ্যান *কুয়োতলা*-য়, 'অতিরিক্ত দেহপরবশ' নিরুপম নামক বালকটির অভিজ্ঞতা যে ধরনের শরীরময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল তারই সম্প্রসারণে নাগরিক জীবনবৃত্তের প্রেম ও যৌনতার চিত্রকল্পে নারীদেহ ও কামক্রীড়ার ফ্যানটাসিধর্মিতা এক রহস্যময় মাত্রা লাভ করেছে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, গিন্‌স্‌বার্গ ও হাংরি আন্দোলন ইত্যাদিও এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার মানচিত্রে নারীদেহ তথা যৌন ঈপ্সার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে জীবনানন্দের কবিতায়। জীবনানন্দের কবিতার কাছে তাঁর ঋণের কথাও বারবার স্বীকার করেছিলেন শক্তি। তবে রক্তমাংসের নারী-শরীরের প্রতি কামনা-বাসনার যেসব দেহভিত্তিক চিত্রকল্পের প্রাধান্য শক্তির কবিতায় নজরে আসে তেমনটা সাধারণভাবে জীবনানন্দের কবিতায় দেখি না। এক মুগ্ধ বিষণ্নতায় মণ্ডিত 'ইতিহাস সময় ও প্রকৃতির সুদূর ও রহস্যময় ছায়ায় আলোয়' উদ্ভাসিত,[৩৫] অতীতের ধূসরতা ও হেমন্তনিসর্গের করুণ সৌন্দর্যের পটভূমিকায় কুয়াশাচ্ছন্ন নারীমূর্তিরা জীবনানন্দের কবিতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপযৌবনের দেহজ লিপ্সাকে অতিক্রম করে যেন নারীত্বের এক 'আর্কিটাইপ' রূপে দীপ্তিমতী, যেন সভ্যতা ও পৌরুষের কেন্দ্রস্থ চালিকাশক্তি :

(১) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য

(নামকবিতা/*বনলতা সেন*)

(২) দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা ;/....স্তন তার/করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার! (**শঙ্খমালা**/*বনলতা সেন*)

(৩) শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন (**শ্যামলী**/*বনলতা সেন*)

(৪) হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন/শুয়ে আছে, শুয়ে আছে—শাদা হাতে ধবধবে স্তন/রেখেছে ঢেকে!... সেই জল-মেয়েদের স্তন/ঠাণ্ডা, শাদা—বরফের কুঁচির মতন! (**পরস্পর**/*ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

(৫) মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে/হরিণেরা আসিতেছে। (**ক্যাম্পে**, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

(৬) হেমন্তের রৌদ্রের মতন/ফসলের স্তন/আঙুল নিঙাড়ি (**পিপাসার গান** /*ঐ*)

(৭) রং তার কেমন তা জান অই টস্‌টসে ভিজে জামরুল,/নরম জামের মত চুল তার, ঘুঘুর বুকের মত অস্ফুট আঙুল (**এইসব ভাল লাগে**/*রূপসী বাংলা*)

(৮) কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো : /পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন ,/ খোঁপার ভিতরে চুলে:/নরকের নবজাত মেঘ/পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ (**গোধূলি সন্ধির নৃত্য**/*সাতটি তারার তিমির*)

উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়েও এটুকু বোঝা যায় যে নারীদেহ ও যৌনমিলনের স্পৃহাতাড়িত যে শরীর-রহস্য-সৃজন শক্তির চিত্রকল্পগুলিকে অনুপুঙ্খের বৈশদ্য দিয়েছে তেমনটা জীবনানন্দের কবিতায় নেই। কিম্বা বলা যায় যে, শক্তির কবিতায় যখন দেহের প্রাধান্য, জীবনানন্দে তখন প্রাণ তথা আত্মার প্রাধান্য। নারীশরীরের উপভোগ্য পশরার চাইতে জীবনানন্দ স্পষ্ট করতে চেয়েছেন নারীসত্তার বর্ণোজ্জ্বল অন্তঃসার।

একটি বাক্য বা বাক্যাংশে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির আলঙ্কারিক নৈপুণ্যে একটি সার্থক চিত্রকল্প নির্মাণ এবং তার মাধ্যমে আবেগ-অনুভবকে মূর্ত করে তোলা তো কবির প্রকরণজিজ্ঞাসার মূল কথা। কখনো কখনো কবি পরপর কয়েকটি চিত্রকল্পের সংযোজন ও বিন্যাসে গড়ে তোলেন একটি কবিতার সমগ্র অনুভব, যখন চিত্রকল্পসমূহের স্বতঃসিদ্ধতায় কবিতার বিষয় বা ভাবনা মূর্ততা পায় এক বিশেষ আঙ্গিকে। শক্তির *হে প্রেম...* কাব্যের **তির্যক** কবিতাটি বাক্‌প্রতিমার অন্তর্বয়নে গড়ে ওঠা এমন এক আঙ্গিকের উদাহরণ—'কঞ্চির মাথায় একটি ঝিঁ ঝি বসে/ বেলা যায়, তেরছা দূর তাজপুরের মাঠে/পুকুরে রক্তের সর পড়ে/ গাভিন গরুর মতো কালো ছায়া ফলের বাগানে...../সব রাখা যায়, সব থাকে/শীতল কৌটোর মধ্যে পুরোনো চিঠির পাকে-পাকে/তোমার আদর স্পর্শ।/.. সে যেন রাত্রির পাখি/বাদলে ভেঙেছে দুটি ডানা/নড়বার শক্তি নেই, ভয়/রাত্রি ভেঙে গেল ভোর যদি/ইস্টিশান-মাস্টারের মেয়ের মতন মনে হয়।' পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম চিত্রময়তায় একটি গ্রামীণ দৃশ্যপট রচনা করে, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে ও অন্ত্যমিলের আংশিক ব্যবহারে কবি এখানে পৌঁছেছেন শেষ দুই পংক্তির অভাবনীয় তুলনাত্মক চিত্রকল্পে। একটি জটিল ও বহুস্তর অনুভবকে বিশদ ও গভীর অভিব্যক্তি দিতে কবিকে যেতে হয় চিত্রকল্প থেকে চিত্রকল্পে। *ধর্মে আছো...র'* **অবনী বাড়ি আছো?** কবিতার একটি নমুনা থেকে দেখা যাবে কিভাবে শক্তি পরপর তিনটি শব্দচিত্রকে ব্যবহার করে কবিতাকে নিয়ে গেছেন পরাবাস্তব রহস্যব্যঞ্জনার দিকে— 'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/এখানে মেঘ গাভীর মত চরে/পরাঙমুখ সবুজ নালিঘাস/দুয়ার চেপে ধরে।' তিনটি দৃশ্য প্রতিমার গ্রন্থনে শক্তি এখানে

তুলে ধরেছেন অবিরল বৃষ্টিস্নাত, মেঘমেদুর, আবেগরুদ্ধ এক কল্পবাস্তবের ছবি যা চলচ্চিত্রের এক সার্থক কম্পোজিশন। অবিরাম বৃষ্টিপাতের প্রথম ছবিটি সহজ বিবৃতিনির্ভর। দ্বিতীয় পংক্তিতে একটি উপমাবাচক চিত্রকল্পে গাভীর মন্থরগতিতে চরে বেড়ানোর ভঙ্গিটি আরোপিত হয়েছে আকাশে সঞ্চরমান মেঘপুঞ্জে। যদি এই দৃশ্যপ্রতিমা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের **যেতে নাহি দিব** কবিতার এই পংক্তিগুলি—'শুভ্র মেঘখণ্ড/মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত/সদ্যোজাত সুকুমার গো-বৎসের মত/নীলাম্বরে শুয়ে', তবে পরবর্তী শব্দচিত্র—'পরাঙমুখ সবুজ নালিঘাস/দুয়ার চেপে ধরে' অবশ্যই জীবনানন্দের কবিতার পরাবাস্তবতার সান্নিধ্যে নিয়ে যায় আমাদের, যেখানে চিত্রকল্প মগ্নচৈতন্যের গূঢ় সঙ্কেতচিহ্ন হয়ে ওঠে। পরাবাস্তব রহস্যের স্পর্শ বিশেষভাবে অনুভূত হয় **হে প্রেম...** গ্রন্থের **ছায়ামারীচের বনে** কবিতার দুটি স্তবকে— 'হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও/ যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে-দূরে/আরো বহুদূরে কুয়োতলা কালোজল—/ হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে ঘুরে। কী ধার উজল অবিরত টিলা পড়ে/টিলা নয় যেন বঁড়শি, টিয়ার দাঁত।/ অচল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ, জড়ে/বাঁধা থাকে মৃত ভায়োলিন, বাড়ে রাত।' উদ্ভট কল্পনা, আপাত সঙ্গতিহীন শব্দসজ্জা, যুক্তি-পরম্পরার উৎক্রম এই পংক্তিগুলিকে এক প্রতীকী অস্বচ্ছতা দিয়েছে। ছন্দ, অন্ত্যমিল ও গড়নের যথাযথ পরিকল্পনার চিহ্ন থাকায় লাইনগুলিকে স্বয়ংক্রিয় রচনার উদাহরণ হিসেবে নিশ্চয় দেখানো যাবে না ; তবে উট কি অর্থে 'গভীর ধমনী', বা 'গভীর উট' কিম্বা 'অবিরত টিলা পড়ে' বা 'বাঁধা থকে মৃত ভায়োলিন' বলতেই বা কবি কি বোঝাতে চাইছেন, চিত্রকল্পের এই প্রহেলিকা আমাদের সালভাদর দালি'র ছবির উদ্ভট আলো-আঁধারির কথা মনে পড়িয়ে দেয় না কি? 'মতো 'মতন', 'যেন' ইত্যাদি তুলনানির্দেশক শব্দ ব্যবহার করে উপমা-উৎপ্রেক্ষার অলঙ্করণে বর্ণনার বিস্তার, ভাবনা ও অভিজ্ঞতাসমূহের ইন্দ্রিয়ঘন রূপনির্মাণ প্রথাগতভাবে কবিতার সারাৎসার বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে শক্তির আগ্রহ ছিল এত বেশি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলনামূলক চিত্রকল্পের আতিশয্যে পাঠকের শ্বাসরুদ্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। উপমাসর্বস্বতার ঘেরাটোপে পাঠকের আটকে পড়ার নিদর্শন হিসেবে **হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান** গ্রন্থের **আমায় পথ থেকে পথে** কবিতাটি উল্লেখ করা যায়। 'মতো' শব্দটি ব্যবহার করে শক্তি এখানে রচনা করেছেন ন'টি উপমা যার মধ্যে 'উটের মতো সতৃষ্ণ হলুদ গ্রীবা' অবশ্যই অস্বস্তিকর জীবনানন্দ-অনুকৃতি। তুলনায় 'একসময় অ্যাশট্রের মতো চেহারা ছিল আমার' কিংবা 'চৌমাথার কাছে পুলিশের মতো কর্তব্যপরায়ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম' জাতীয় উপমায় লক্ষ্য করা যায় হাল্‌কা চালের উদ্ভাবনী চমক। তবে যেখানে শক্তি তুলনামূলক চিত্রকল্প নির্মাণে এই আতিশয্য নিয়ন্ত্রণ করে একটি ভাবনাকে একাধিক পরপর চিত্রোপমায় ভেঙে ভেঙে পরিস্ফুট করেছেন সেখানে তাঁর প্রকরণ-সার্থকতা নিয়ে সন্দিহান হবার উপায় থাকে না—'বাকি হাস্যকর শাদা কাগজের উপরে নখর চালানো নৌকার *মতো*/ গাধার ক্ষুরের *মতো*, হাঁসের ভাসার *মতো* এইসব খঞ্জের আহ্লাদ' (**পৃথিবীর শেষদিনে**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*) মেধা ও মননের জটিলতার পরিবর্তে আবেগের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণই শক্তির কবিতার প্রধান ও প্রাথমিক আকর্ষণ। সেই আবেগমণ্ডিত সহজিয়া অনুভবের অভিব্যক্তি তাঁর কবিতায় সার সার উপমার মর্মধ্বনিতে। উদাহরণ রূপে বেছে নেওয়া যেতে পারে *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যের **একদা এবং আমি** কবিতাটির এইসব পংক্তি—'বন্দী আমি তোমার আঁচলের *গিঁঠে চাবির মতো, খুচরো*

পয়সার মতো, বন্দী আমি তোমার শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে *অলঙ্কারের মতো, চুলের মতো,* তোমার শরীরের আবহাওয়ায় *নির্জন জলের মতো, হাওয়ার মতো*/বাথরুমের সাবধানী *দেয়ালের মতো*/বিষম গরম, অভিজ্ঞতায় ডাক্তার, *পাপোশের মতন* সহিষ্ণু.....।' উপমার এই অনর্গল সারিবদ্ধতা থেকে বোঝা যায় যে শক্তি তাঁর কবিতায় আবেগের সহজ উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান নি।

'মতো' আর 'মতন' ব্যবহার করে শক্তি যেমন একটি ভাবনার সমগ্রতা দেখাতে চেয়েছেন গুচ্ছ উপমার সমাহারে, তেমনি একক চিত্রকল্পনির্ভর অনুরূপ অসংখ্য পংক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতার পর কবিতায়। উদাহরণস্বরূপ একটি নির্বাচিত তালিকা গঠন করা যেতে পারে:

(১) তুমি তো নিয়েছো স্বর্ণ, *গোক্ষুরের মতো* হিংস্র যুবা

(**তরণী এবং যাত্রী চলেছে,** *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*)।

(২) *মেঘের মতন ঠাণ্ডা* সাঁতারু দুজন শোল (**সুনিভৃত, সুনিভৃতি,** *হে প্রেম.......*)।

(৩) ব্রিজের তলায় তুমি *বাঘের মতন* (**এখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস,** *ধর্মে আছো....*)।

(৪) চেতনা *মেঘের মতো* ভাসে (**ছুটি ছুটি একান্তই ছুটি, ধর্মে আছো.......**)।

(৫) ...ও যেন আমার,/ যৌনতায় সাড়া দেয় *রূপসীর উরুর মতন* (**অনন্ত নক্ষত্রবীথি, তুমি.....**)।

(৬) গরুর বাঁটের থেকে *স্খলিত দুধের মতো* তোমাকেও মনে পড়ে অর্গলবিহীন

(**অতিদূর দেবদারুবীথি,** *তিন তরঙ্গ*)।

(৭) হৃদয়ের কাছে এসে বসেছে সুপারি গাছ *গরাদের মতো*

(**উটের মধুর আরব এসেছে কাছে,** *তিন তরঙ্গ*)।

(৮) তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল *ভেড়ার পেটের মতন*

(**হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান,** *হেমন্তের অরণ্যে.....*)।

(৯) *সোনালি ফলের মতো* দিন, তাকে রাত্রি টুকরো করে/শাণিত বঁটিতে

(**৯০ সংখ্যক,** *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)।

(১০) .... মৃত্যু এসে দাঁড়াবে এখানে/ *পুলিশের মতো* স্পষ্ট (**মুহূর্তে শতাব্দী,** *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)।

(১১) *গাছের পাতার মতো* শব্দ এসে জমেছে উঠোনে (**পাতার পাহাড়,** *এই আমি যে পাথরে*)।

(১২) *বাতাসার মতো স্তনে* দুটি ডেয়োপিঁপড়ের সোহাগ মাখা

(**শোনো, এই পাথর পুড়েছে,** *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)।

(১৩) এখন *নদীর মতো কথা* শব্দ হয়ে ফোটে (**এরপর ওখানে রাখে না,** *পরশুরামের কুঠার*)।

(১৪) *খরগোসের মতো মুখে* রোদ্দুর ঠোকরায় ঘরে প'ড়ে (**ভিক্ষা চায়,** *ভাত নেই পাথর রয়েছে*)।

(১৫) বিষণ্নতা *বিড়ালের মতো* থাকে আলুথালু শুয়ে/আগুনের কাছাকাছি

(**বিষণ্নতা ছিলো,** *আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল*)।

(১৬) মন কি এখনো আছে *ছাই-মাজা বাসনের মতো* গভীর উজ্জ্বল?

(**ভালো থেকো,** *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)।

(১৭) চতুর্দিকে ভাঙা, ভাঙা, দুঃসহ ভাঙন..../*নড়বড়ে দাঁতের মতো* জানলা ঝুলে আছে

(**জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয়,** *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)।

(১৮) হঠাৎ পৌঁচেছি ট্রেনে।/*লাইন ছুঁচের মতো* স্টেশন বুনেছে (**হঠাৎ,** *আমাকে জাগাও*)।

(১৯) *বকের নলির মতো* শীর্ণ শাদা পথ (**অন্ধমুনির স্ত্রী**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

(২০) আমি বিদ্ধ হতে পারি *রোহিত মাছের মতো* মসৃণ/ মেয়ের শরীরে (**দৃশ্যান্তর**, *ঐ*)।

তুলনাবাচক চিত্রকল্পের এই নির্বাচিত তালিকা থেকে এমন সিদ্ধান্ত অসমীচীন হবে না যে উপমার মধ্যে দিয়ে, দৃশ্য-শ্রুতি-স্পর্শ-ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়বেদ্যতায়, তাঁর অনুভব ও অভিজ্ঞতার ঘনতাময় ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে শক্তির উল্লেখযোগ্য আসক্তি ছিল। উপমানির্ভর বাক্‌প্রতিমার প্রাচুর্যে তাঁর কবিতার জগৎ বিশেষভাবে অধ্যুষিত। লক্ষণীয় যে এই তালিকাভুক্ত চিত্রকল্পগুলিতে উপমান-পদ রূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসেছে শক্তির বিশেষ প্রিয় প্রকৃতি তথা গ্রামীণ প্রতিবেশের নানা রূপ ও উপাদান, যেমন, মেঘ, নদী, গাছের পাতা, ফল, মাছ, ভেড়া, খরগোস, বক ইত্যাদি। কলকাতা মহানগরীর নাগরিক অস্তিত্বের মধ্যে কবি হয়ে ওঠা শক্তির ভেতরে বরাবরই এভাবে জাগরূক থেকেছে সেই এক 'পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধ পাড়াগাঁ'। এছাড়া শক্তির মধ্যে বাস ছিল যে ছাপোষা গৃহস্থের সে কেমন কাব্যিক উপমানের ললিত লাবণ্য পরিহার করে কখনো কখনো অসঙ্কোচে নির্মাণ করেছে বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত, বেখাপ্পা তুলনা—*'গরুর বাঁটের থেকে স্খলিত দুধের মতো'* অনর্গল স্মৃতি (উদ্ধৃতি ৬), *'ছাই-মাজা বাসনের মতো গভীর উজ্জ্বল'* মন (উদ্ধৃতি ১৬), *'নড়বড়ে দাঁতের মতো ঝুলে থাকা জানলা'* (উদ্ধৃতি ১৭), রেললাইনের *'ছুঁচের মতো স্টেশন'* বোনা (*উদ্ধৃতি ১৮*)। আবার উপমানের সন্ধানে গোত্রান্তরে চলে গেছেন শক্তি *উদ্ধৃতি ৫, ১০ ও ১২-তে* ; বিশেষত স্তন ও স্তনবৃন্তের সাদৃশ্যমূলক চিত্ররূপ নির্মাণে (*বাতাসার মতো স্তনে দুটি ডেয়োপিঁপড়ের সোহাগ মাখা)* এবং মৃত্যুকে *'পুলিশের মতো স্পষ্ট'* দেখায় আমরা যে কৌতুক বোধ করি তা মনে করিয়ে দেয় সপ্তদশ শতকের 'মেটাফিজিক্যাল' কবি ডান ও মার্ভেল-এর চিত্রকল্প রচনার অভিনবত্ব। এজরা পাউন্ড ও তাঁর সঙ্গীদের চিত্রকল্পবাদী (Imagist) আন্দোলনের কিছু প্রভাবও শক্তির বাক্‌প্রতিমাগুলির ইন্দ্রিয়ঘনত্বের পশ্চাদ্‌ভূমি বলে মনে করা যেতে পারে। শক্তির কবিতা মূলত আত্মপ্রক্ষেপময় ও স্বীকারোক্তিমূলক। আলোচ্য তালিকাভুক্ত *(১০)* নং উদ্ধৃতি-তে ব্যবহৃত উপমান 'পুলিশ' সেদিকেই নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত স্তরে এবং বেপরোয়া জীবনযাপনের সুবাদে শহর কলকাতার পুলিশের সঙ্গে শক্তির ছিল নিত্য যোগাযোগ। পুলিশ ও পুলিশকুকুরদের কথা তাই শক্তির কবিতায় শব্দচিত্রের উপকরণে পরিণত হয়েছে :

(১) কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি

(**সে বড়ো সুখের সময় নয়......**, *সোনার মাছি খুন করেছি*)।

(২) প্ল্যাটফর্ম দৌড়ে গেল পিছনে পুলিশের মতো (**অলৌকিক পশ্চাদভ্রমণ**, *ঐ*)।

(৩) কুচকাওয়াজ-অন্তে গাইলো পুলিশেও রবীন্দ্রসঙ্গীত! (**৩৩ সংখ্যক**, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)।

(৪) আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করেছিলাম পুলিশের মতো/আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য/লাকি-মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার

(**আমরা সকলেই**, *পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি*)।

(৫) চৌমাথার কাছে পুলিশের মতো কর্তব্যপরায়ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি

(**আমায় পথ থেকে পথে**, *হেমন্তের অরণ্যে......*)।

আবার 'মতো' কিম্বা 'মতন'-এর আসক্তি উপেক্ষা করে আরো ঘনসংবদ্ধ বিবৃতি, উপমার প্রত্যক্ষ তুলনা থেকে রূপক-সমাসোক্তি-উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে চিত্রকল্পকে আরো ব্যঞ্জনাময় করে তোলার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে শক্তির কবিতায় :

(১) গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি (**ঝর্না**, *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*)।

(২) সেনেটের শতপ্রান্তে মেথি খোঁজে ইঁদুরের শ্রেণী (**সেনেট ১৯৬০**. *ঐ*)।

(৩) ....চোখে তাম্রনীবি/বার-বার খুলে যায়, কুয়াশা, ভয়াল লালরেখা/ফুলের বোঁটায় পাংশু মাতৃমুখ' (**উৎক্ষিপ্ত কররেখা**, *ঐ*)।

(৪) স্মৃতির ভিতরে মৌরলা-চঞ্চল/এনেছিলে পরিবেশ

(**ব্রিজ-যমুনার জল**, *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*)।

(৫) টেলিফোনে ক্রূর/বেজে ওঠে স্খলিত ঘুঙুর (**আছে আছে সে এখানে আছে**, *ঐ*)।

(৬) সে কি জানিত না, আমি তারে যত জানি/আনখ-সমুদ্দুর (**আনন্দ ভৈরবী**, *ঐ*)।

(৭) হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ, (**কোনদিনই পাবে না আমাকে**, *ঐ*)'

(৮) ফসফরাসের কাঁথা গড়ো তাঁতঘরে (**ছিন্নপাতার সাজাই তরণী**, *ঐ*)।

(৯) সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ

(**স্মরণিকা**, *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*)।

(১০) খাদে ডায়না, অলক্ষ্য ধুনুরি/ মেঘের সাম্রাজ্য ধোনে (**পিছনে যাবার রাস্তা নেই**, *ঐ*)।

(১১) অন্ধকারে ক্যানাফুল সবুজ পাৎলুন হয়ে উদাসীন মিটিঙে বসেছে (**মধ্যাহ্নের দোষে**, *ঐ*)।

(১২) হোগলাবনে মটকা মেরে পড়ে আছে রোদ্দুর (**এবার আসি**, *ঐ*)।

(১৩) ঠোঁটের উপরে বন্দরে বোমারু বিমান তুমি/অবিরাম অতি অবিরাম

(**চাইবাসা ১৯৬২**, *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)।

(১৪) ডাবের নৃমুণ্ড পড়ে ইতস্তত (**কিশোরগঞ্জে মামার বাড়ি**, *সুখে আছি*)।

(১৫) ডোঙায় চড়বো-তুমি আমার সঙ্গে গেলে/কালকা মেলে/অনেক বগি/তুমি আমার তাল-ডোঙাটি, আমিই লগি (**যৌন ছড়া**, *ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

(১৬) আকাশে তৈরি হচ্ছে পেঁজা তুলার লেপ (**শীত আসছে**, *জ্বলন্ত রুমাল*)।

(১৭) ঝড়ে হঠাৎ ভেঙে পড়লো তোমার মুখের জলপ্রপাত

(**স্থাপন করি মুখটি হাতে**, *এই আমি যে* **পাথরে**)!

(১৮) হরিৎ ডালপালাহীন গাছের জঙ্গলে/কথা বলে মাছ (**বাহিরের বড়ো**, *হেমন্ত যেখানে থাকে*)।

(১৯) কোথাও দেখিনি আমি দোপাটির ছায়ায় রয়েছে/কেঁচোর স্মারক-স্তম্ভ

(**মনে হয়, কিছুই দেবে না**, *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)।

(২০) অনেকদিন বাদে প্যারাসুটে তার পুরাতন ভালবাসা নেমেছে উঠানে

(**বাইশ বছর ধরে**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

এই বাছাই-তালিকায় উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলি শক্তির শব্দচয়ন ও পংক্তিগঠনে স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতা, তাঁর স্বতোৎসারিত আবেগ-অনুভূতির স্মরণীয় উচ্চারণ। পল্লী প্রকৃতির নানা রং ও রূপের সৌন্দর্য তাঁর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান হয়ে ফুটে উঠেছে অধিকাংশ চিত্রকল্পে। পর্যবেক্ষণের

নিবিড়তায় সহজ পল্লীনিসর্গের টুকরো টুকরো ছবি শব্দের আশ্চর্য রহস্যময় কারুকার্যে যেভাবে ধরা পড়েছে তা থেকে গভীর বা মৌলিক কোনো দর্শনভাবনা তথা কোনো গূঢ় অভিপ্রায়ের সূচীমুখ হয়ত আবিষ্কার করা যাবে না, তবে আবেগশাসিত কবিকল্পনার খেয়ালি নির্মাণ-দক্ষতার ঈর্ষণীয় নজির হিসেবে এইসব শব্দ-চিত্র পাঠককে চমৎকৃত করবে। একথা ঠিক যে শক্তির অনেক কবিতাতেই ভাবনার সমগ্রতা তথা বিষয়নিষ্ঠ শৃঙ্খলা তেমন নেই যেমন রয়েছে চিত্রকল্পের নতুনত্বে আকর্ষক পংক্তিরচনার প্রবণতা। তবু শব্দ ও অলঙ্কারের নতুন নতুন চমক তৈরি করে কাব্যশরীরে আলোড়ন সৃষ্টি আধুনিক কাব্যপ্রকরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং এ কাজে শক্তি বরাবরই এক ধরনের সৃজনী কৌতুক উপভোগ করেছেন বলে মনে হয়। বন্দরে অবিরাম আক্রমণে নিয়োজিত বোমারু বিমানের চিত্রকল্পে চুম্বন (উদ্ধৃতি ১৩) কিম্বা যৌন মিলনের চিত্রকল্পরূপে তালডোঙা ও লগির কৌতুককর উল্লেখ (উদ্ধৃতি ১৫) শক্তির শব্দচয়ন, বিন্যাস ও ছন্দসিদ্ধির চমৎকার উদাহরণ। টেলিফোনের বেজে ওঠার সঙ্গে 'স্খলিত ঘুঙুর' (উদ্ধৃতি ৫), সুপারি গাছের খসে পড়া পাতার সঙ্গে পাখির 'ডানা' (উদ্ধৃতি ৯), ইতস্তত পড়ে থাকা ডাবের খোলার সঙ্গে 'নৃমুণ্ড' (উদ্ধৃতি ১৪), আকাশে জমে ওঠা মেঘের মধ্যে হাওয়ার তৎপরতাকে ধুনুরির লেপ তৈরির দৃশ্যরূপ (উদ্ধৃতি ১০ ও ১৬) এবং অনেকদিনের পুরোনো ভালবাসার সঙ্গে প্যারাট্রুপারের সাদৃশ্য (উদ্ধৃতি ২০) শক্তির বাক্‌প্রতিমার অভিনবত্বের কয়েকটি স্মৃতিধার্য উদাহরণ। বাস্তবতার সীমানা পেরিয়ে কখনো কখনো যে শক্তি উঁকি মারতে চেয়েছেন পরাবাস্তবতার উদ্ভট অনুষঙ্গ-চিহ্নিত জগতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে উদ্ধৃতি ১৮-তে। প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত উপকরণগুলিকে অভিনব আলঙ্কারিক প্রয়োগে ইন্দ্রিয়ঘনত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তির দক্ষতার প্রমাণ মেলে এই সব প্রতিমার অপ্রত্যাশিত নির্মাণে : উদ্ধৃতি ৭, ৮, ১১, ১২। 'ফসফরাসের কাঁথা', ' কেঁচোর স্মারকস্তম্ভ', 'ক্যানাফুলের সবুজ পাৎলুন' ইত্যাদি চিত্রকল্প শক্তির কবি-স্বভাবের পর্যবেক্ষণপ্রিয়তা ও খেয়ালি কল্পনার চমকপ্রদ নিদর্শন।

বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প মানেই অলঙ্কার, এ'কথা আধুনিক কবি ও সমালোচকেরা স্বীকার করেন না, যদিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধ্রুপদী সাহিত্যালোচনায় অলঙ্কারকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলে মনে করা হয়েছে। চিত্রকল্পের মৌল ধর্ম প্রত্যক্ষতা এবং সে কারণে তার অবস্থান উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তির নানা বৃত্তে। চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি আমাদের যে-সব দৃশ্য দেখান, যে-সব শব্দ শোনান, যে-সব গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শের অনুভূতি প্রদান করেন, সেইসব কল্পচিত্রসৃষ্টিতে অলঙ্কারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শক্তির চিত্রকল্প-সংগঠনে উপমার নজরকাড়া প্রাধান্যের কথা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকৃতি ও মানব-প্রতিবেশের অজস্র উপাদান কি সাহসী দক্ষতায় তিনি ব্যবহার করেছেন, সে কথাও বলা হয়েছে। এখানে আরো কয়েকটি নমুনা উদ্ধার করে শক্তির বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক উপমার বিস্তার ও ব্যঞ্জনাসিদ্ধি সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা করা যেতে পারে :

(ক) প্রকৃতি/নিসর্গজাত :

(১) মুখখানি কে ভাসাও জলজ লতার মতো স্নিগ্ধ (**শৈশব স্মৃতি**, *হে প্রেম...*)।

(২) কেঁপে ওঠে রাতের করাত (**ফুটবল**, *ধর্মে আছো...*)।

(৩) পুরানো ঘৃতের মতো রোদ্দুর মিশেছে নালি-ঘাসে (*অনন্ত নক্ষত্রবীথি...*)।

(৪) ওই ঘোড়াগুলি জেব্রাগুলি/অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন/চরিয়া বেড়ায় ওরা (**৩৭ সংখ্যক,** *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)।

(৫) ছোটো-ছোটো ইস্টিশান বাবুই-এর বাসার মতো নিটোল আর নিঃসীম (**অলৌকিক পশ্চাদভ্রমণ,** *সোনার মাছি খুন করেছি*)।

(৬) নিচে জ্বলন্ত কাতানের মতন ঢেউ (**আজ আমি,** *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)।

(৭) মাছেদের মন আছে, স্মৃতি আছে, এমারল্ড ঘর/আছে নাকি?

(**পঁয়ত্রিশ বছর পর, ঘুরে আসে ;** *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)।

(৮) তরমুজের লাল কাটা ফলার মতন ধরণী-সবুজ চাঁদ (**তুমি আছো-***ভিতের* **উপরে আছে দেয়াল,** *পরশুরামের কুঠার*)।

(৯) ঘাটের রানার মতো মসৃণ গারস্থি দেবে পুঁইমাচা দেবে কাঁচা হলুদের মতো গাই

(**ভয় আমার পিছু নিয়েছে,** *সুন্দর রহস্যময়*)।

(১০) আমাকে জাগাও তুমি গোলাপের মতো/আমূল কাঁটায় ছন্ন গোলাপের মতো (**আমাকে জাগাও,** *আমাকে জাগাও*)।

রূপ-রং-স্পর্শের কমনীয় প্রকৃতি শক্তির এ জাতীয় আবেগঘন, উপমাবাচক প্রতিমায় যেভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়পরবশ কবিসত্তাকে উন্মোচিত করে তাতে মনে হয় তাঁর *কুয়োতলা* উপন্যাসের বালক নিরুপমের মনোলীন জগতের শরীরময়তার ঘোর শক্তি কাটিয়ে উঠতে চান নি।

(খ) মহানগর/নাগরিক বাস্তবতা বিষয়ক :

(১) কবিতার সুতো ঐ নাগরিক পলাশের পাংশু জিভ রক্তের মতন

(**একটি কবিতা খুঁজে,** *অস্ত্রের গৌরবহীন একা*)।

(২) .....চাই ভাত, নিদেন এক টুকরো রুটি/কোষ্ঠীর কাগজের মতন ছিন্নভিন্ন, হলুদ

(**আমি চাই,** *এই আমি যে পাথরে*)।

(৩) ট্যাক্সি ফোঁড় তুলে চলে কাথার মতন/কলকাতার পাকা পথে

(**দুপাশে, সমাধি চিরে,** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

(৪) মাছের চোখের মতো রেস্টুরেন্টে নিবিড় যুবক (**মালির হাতের,** *ঐ*)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহানগরী কলকাতার ঘটনাবহুল জীবনবৃত্তে প্রায় কিংবদন্তির মতো কবি-ব্যক্তিত্ব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কয়েক সহস্র কবিতার বিশ্লেষণে কিন্তু নাগরিক বাস্তবতা থেকে আহৃত তুলনাত্মক চিত্রকল্পের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তদুপরি এখানে উৎকলিত পদ্যাংশগুলিতে মহানগর-কেন্দ্রিক যে উপমাগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাতেও সমসময় ও সামাজিক বাস্তবের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-রূঢ়তার যথেষ্ট প্রতিফলন নজরে পড়ে না। উপমাবাচক বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে মহানগর ও নাগরিক জীবন-অভিজ্ঞতা শক্তির কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় নি। তবে এই তালিকার **১ নং উদ্ধৃতির** উপমাটির সন্ধানী প্রত্যক্ষণে ধরা পড়ে শক্তির নির্মাণকলার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য উপমাটিকেই বলা যায় সমগ্র কবিতাটির বীজ যা ক্রমশ অঙ্কুরিত হয় এবং গোটা কবিতাটিই যেন নিবেদিত হয় 'কবিতার সুতো'র ওই বীজ-উপমার কাছে। কবিতার প্রথম পংক্তির 'সুতো'র উপমা ফিরে আসে নবম পংক্তিতে এবং গড়িয়ে যায় স্তরান্তরে। শেষ দুই পংক্তিতে আবার ফিরে আসে কবি, পলাশ ও কবিতার সুতো। 'সুতো'র উপমাটি যেন অনিঃশেষ বয়নে নির্মাণ করে কবিতার সমগ্র ভাবরূপ।

'উপমা'র মতো আর এক সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার, 'উৎপ্রেক্ষা'র প্রয়োগেও শক্তি চমকপ্রদ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ধরা যাক্ *ছিন্নবিচ্ছিন্ন* গ্রন্থের **৩০ সংখ্যক** পদ্যাংশে এই দৃশ্যমান চিত্রকল্পটি— 'একদল ভেড়া চলে ঘাসের ভিতরে/যেন ছুঁচ ফোঁড় তোলে পাড়ের কাঁথায়/কিংবা পাখি উড়ে যায় মেঘের ভিতরে/একদল ভেড়া যেন কেবলি পশম/কেবলি কাপাসতুলা হাওয়া লেগে ওড়ে।' এই উদ্ধৃতির প্রথমে ঘাসের ভিতরে চরে বেড়ানো একদল ভেড়াকে বর্ণনা করেছেন পাড়ের কাঁথায় ছুঁচের ফোঁড় তোলার মতো সহজ গার্হস্থ্য চিত্রের সঙ্গে তাকে তুলনা করে, একটি বাচ্য উৎপ্রেক্ষায়। তারপর মেঘের ভেতরে পাখির উড়ে যাওয়ার উল্লেখে দৃষ্টি সরে যায় আকাশে এবং পরবর্তী দুটি পংক্তিতে দ্বিতীয় বাচ্য উৎপ্রেক্ষায় 'একপাল ভেড়া' উপমিত হয় দুটি সমতুল উপমান 'পশম' ও 'কাপাসতুলো'র সঙ্গে। একই গ্রন্থের **৭২ সংখ্যক** পদ্যাংশে সম্ভাবনাবাচক শব্দ (যেন/বুঝি) উহ্য রেখে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষায় উপমানের সংশয়কে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি—'কপালের ওপর খাড়া চুল, মাথা ভর্তি উকুন/উলুবনে রাশি রাশি রাক্ষুসে পিঁপড়ে।' শক্তির অপরাপর সংকলনগুলি থেকে কিছু নির্বাচিত নমুনা সংগ্রহ করে উৎপ্রেক্ষার নির্মাণে কবির শব্দচেতনা ও বিন্যাসবৈচিত্র্যের আরো বিশদ ধারণা করা যেতে পারে :

(১) পশ্চিমাছটায় ঘন কেশ যেন উন্মোচিত ঝর্না (**শৈশবস্মৃতি,** *হে প্রেম...*)।

(২) শুকতারা পুবে/আমারই অস্তিত্ব যেন আছে মেঘে ডুবে (**অন্ধকারে,** *ধর্মে আছো....*)।

(৩) লেবুবনে ভ্রমরই শাম্পান (**অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি....**)।

(৪) মৃত্যু থেকে পার নেই,/যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে (**একদা এবং আমি,** *সোনার মাছি খুন করেছি*)।

(৫) সাবলীল সিঁড়ি যেন পাট-খোলা ঢেউ সমুদ্রের (**সেই রাক্ষসী,** *পাড়ের কাঁথা...*)।

(৬) আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়/যেন আমি মাটি, যেন পড়ো ঘর, পুকুরের পাঁক/ যেন আমি সমস্ত নিষ্ফল চেষ্টা শিল্পপথিকের, যেন ভ্রষ্ট রাজনীতি/যেন আমি সকল নির্ভুল অঙ্কে গোলযোগ... (**আমি সহ্য করি,** *ঈশ্বর থাকেন জলে*)।

(৭) আশ্চর্য সোনালি সুতো নিশিদিন রয়েছে জড়ায়ে/যেন ভবিতব্য, যেন রক্তের প্রত্যক্ষ অভিমান (**আশ্চর্য সোনালি সুতো,** *কবিতার তুলো ওড়ে*)।

(৮) সেখানে রুপোলি মাছ বালুকায় ধুলোয় পেতেছে/ছিন্নভিন্ন রূপ যেন ভাঙা আয়না নিকটে ও দূরে (**ভালো লাগে,** *ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি*)।

(৯) ঘরের বাইরে রোদ মিছিমিছি দ্রুতপায়ে হাঁটে/যেন আপিসের শেষে মাইনে আছে (**আমি চাই,** *ভাত নেই পাথরে রয়েছে*)।

(১০) মেঘ এসে পড়ে থাকে কুকুরকুণ্ডলী/তাড়ালে যায় না' (**দুঃখের অখণ্ড চাপ, আমি চলে যেতে পারি**)।

(১১) বিষণ্ণতা যেন এক খেলাঘর দেয়ালের পাশে (**কী পায়? আনন্দ পায়,** *অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল*)।

(১২) কানাগলি রাত কেটে যেন ছোটা সংশ্লিষ্ট বিড়াল (**যে কথা আমার মতো,** *আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল*)।

(১৩) কপাল জুড়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ফণা দুলছে (**পাতাল সিঁড়ি,** *এই তো মর্মর মূর্তি*)

(১৪) শব্দের ভিতরে আমি বৃষ্টিপাত দেখি আগাগোড়া/মাটির উঠোনে যেন ঘাস-ব্লেড, যেন ছেঁড়া খোঁড়া/শিশুর হাতের টান গভীরতা ঘুমন্ত শেলেটে... (**শব্দের ভিতরে**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)।

(১৫) হ্যারিকেন দোলে যেন ল্যাব্রাডর স্রোতে (**চাইবাসা ১৯৬৫**, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোঃ*)।

উৎপ্রেক্ষা-নির্ভর এইসব দৃশ্য চিত্রকল্পে শক্তির উপমানসমূহ এসেছে নিসর্গ প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে শক্তি একাধিক সংশয়বাচক সাদৃশ্যের উল্লেখে উন্মোচন করেছেন এক একটি ভাবনান্তর (*উদ্ধৃতি* ৬, ৭, ও ১৪)। ৯ *নং উদ্ধৃতি*-তে নাগরিক কবি 'রোদ'কে দেখেছেন দ্রুতপায়ে হেঁটে চলা অফিসযাত্রীর কল্পরূপে ; এখানে উৎপ্রেক্ষার আধার সমাসোক্তি অলঙ্কার। নাগরিক অস্তিত্বের অনুভব টের পাওয়া যায় 'কুকুরকুণ্ডলী' মেঘ এবং 'কানাগলি রাত কেটে' বেড়ালের ছুটে যাওয়ার ছবিতে।

চিত্রকল্প নির্মাণে আর এক আলঙ্কারিক কৌশল সমাসোক্তি—বর্ণনীয় বিষয় বা বস্তুতে আরোপিত হয় উপমানের প্রতীতি, বিশেষত লৌকিক বস্তু বা প্রাণীর ওপর মানবীয় ক্রিয়া ও অনুভবের আরোপ, যা বাচ্য বস্তু বা বিষয়কে দেয় মধুর ব্যঞ্জনা ও বিস্তার। পল্লীনিসর্গ ও মানবজীবনের অনুভবী পর্যবেক্ষক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে সমাসোক্তি কিভাবে প্রতীয়মানের ব্যঞ্জনা আভাসিত করে দেখা যাক্ :

(১) সমস্বরে/বাজে বন্ধ ঘরে/অর্গান-জড়ানো এলোমেলো/অন্ধকারে বেড়ালের থাবা করে বেলো (**আছে আছে সে এখানে আছে**, *ধর্মে আছো...*)।

(২) জলপিপিদের কান্না ফেটেছে তুফানে (**অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি...**)।

(৩) ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুটে ওঠে (**অবসর নেই-তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না**, *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)।

(৪) এ-বছর শীতকালে কলকাতায় মৌসুমী শিল্পের/প্রদর্শনী হয়েছিলো, ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার আখাম্বা গতর কেড়ে নিয়েছিলো আদি পুরস্কার (**৩৩ সংখ্যক**, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)।

(৫) চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড় (**চাঁদ, তুমি থেকো**, *ঈশ্বর থাকেন জলে*)

(৬) যেখানে পাথরে ঝর্না শুয়ে/ছড়িয়ে চুলের রাশি ; চোখ বুজে রয়েছে পাথর/ঝর্নার সর্বাঙ্গে কোনো আবরণ নেই (**একা থাকি**, *কবিতার তুলো ওড়ে*)।

(৭) এক ঝাঁক পেঙ্গুইন দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলে (**একা একা**, *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)।

(৮) জালে রুপো জ্বলছে, মাতাল/টলছে সী-গালের ঝাঁক (**এইখানে বড় সুখ**, *আমি ছিঁড়ে ফেলি..*)।

(৯) পাহাড়ে পা মুছে নামে সন্ধ্যা (**পাহাড়ে পা মুছে**, *এই তো মর্মর মূর্তি*)।

(১০) পাতা জেগে থাকে, বাগিচা বিস্তৃত করে রাখে (**পাতা ও ফুলের গল্প**, *ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে*)।

এই উদ্ধৃতিগুচ্ছ থেকে সেই এক সরল সত্য প্রতিষ্ঠা পায় যে শক্তি সেইসব বাক্‌চিত্রে উজ্জ্বল ও উত্তীর্ণ যেখানে তিনি দৃশ্য প্রতিমার বস্তুরূপে যুক্ত করেছেন প্রকৃতির এক-একটি নির্বাচিত উপাদান—পাখি, ফুল, চাঁদ, ঝর্না, পাহাড় ও উদ্ভিদ। উদ্ধৃতি (৩), (৫) ও (৬)-এর চিত্রকল্পগুলিতে নারীদেহের আকর্ষক ভঙ্গিমায় কবি দেখেছেন যথাক্রমে 'ইস্টিশান', 'চাঁদ' ও 'ঝর্না'কে। উদ্ধৃতি (৪)-এ 'ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার আখাম্বা গতর' শব্দ বিন্যাসে শক্তির

শুচিবায়ুহীনতা, উপমেয় বস্তুতে বিসদৃশ অপ্রস্তুতের প্রতীতি নির্মাণের প্রবণতা প্রমাণ করে। উদ্ধৃতি (৬)-এ পাথরের ওপর শুয়ে থাকা আলুলায়িত ঝর্নার নগ্নিকারূপ প্রণয়ীযুগলের একান্ত মিলনের সংরক্ত বাক্‌চিত্র। (৮) নং *উদাহরণে* রূপোলি উজ্জ্বলতা ও নেশাগ্রস্ত উন্মাদনার ছবিতে যেমন ঘোর লাগে, তেমনি আবার *(৯)* ও *(১০)* নং উদ্ধৃতি-তে পাহাড় বেয়ে সন্ধ্যার নেমে আসা ও বাগান জুড়ে পাতার জেগে থাকার ছবি এক শান্ত অথচ গভীর অনুভবের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে।

উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনায় গড়ে ওঠে রূপক অলঙ্কার ; উপমেয় উপমানের রূপ ধারণ করে এবং এ দুয়ের অতিসাম্য দেখাতে কবি আরোপ করেন কাল্পনিক অভেদ। রূপকের বেশ কিছু সার্থক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে শক্তির কবিতায় এবং এইসব উদাহরণেও শক্তির মূলাধার প্রকৃতির দৃশ্যমান জগতের রূপলাবণ্য :—

(১) সুপারি-গরাদে ঘেরা এ অঞ্চলে উড়েছে মোরগ (**অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে**)।

(২) শব্দের ঝর্নায় স্নান করে ওরা (**শব্দের ঝর্নায় স্নান**, *সুন্দর এখানে একা নয়*)।

(৩) অবাধ সুপারি-স্লেজ পাড়ি দেয়, মধ্যাহ্ন-প্ল্যাটফর্ম, (**উজ্জ্বল বিধবা**, *উড়ন্ত সিংহাসন*)।

(৪) মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ (**মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ**, *কবিতার তুলো ওড়ে*)।

(৫) মাছরাঙা শাখা জুড়ে দোল খায়/কামনা কর্তাল বাজে (**কবিতার মতো স্নিগ্ধ বৃষ্টিপাত**, *আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল*)।

(৬) মানুষের ভয় নেই ঐ ঢেউসাপ নিয়ে আর (**একটিমাত্র ঢেউ, ঐ**)।

(৭) মেঘের বিমান যাচ্ছে উড়ে (**জানলা থেকে মুখ বাড়ালে**, *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)।

(৮) আকাশের ছিটমহলে মেঘের মতন জমে আছে (**বৃষ্টি হবে হয়তো বৃষ্টি**, *তোমাকে জাগাও*)।

উদ্ধৃতি (৫)-এ দৃশ্যমান নিসর্গের অনুষঙ্গে 'কামনা কর্তাল' এই শ্রাব্যরূপকটি বাদে বাকি সবকটি চিত্রকল্পেই মাটি ও আকাশের দৃশ্য-উপাদান উপমেয়-উপমানের অভেদাত্মক অনুরঞ্জন সৃষ্টি করেছে। দুটি ক্ষেত্রে (**উদ্ধৃতি ১ ও ৩**) শক্তির অলঙ্কারের উপাদান তাঁরই বাল্যস্মৃতিতাড়িত উপাখ্যান 'কুয়োতলা'য় বিশেষভাবে উল্লেখিত সুপারি গাছ। অপরাপর উদ্ধৃতিগুলিতে এসেছে ঝর্না, চাঁদ, ঢেউ আর মেঘের মতো তাঁর অতি প্রিয় প্রকৃতি নিসর্গের উপাদানসমূহ। দুটি ভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে অভেদকল্পনায় কিভাবে একটি স্বতন্ত্র রূপের জন্ম হয় 'সুপারিস্লেজ' (উদ্ধৃতি ৩) ও 'ঢেউসাপ' (**উদ্ধৃতি ৬**) তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

উপমা-রূপক-সমাসোক্তির ইন্দ্রিয়ঘন দৃশ্য-প্রত্যক্ষতায় একটি কবিতার সমগ্র দেহাবয়বটি কত সাবলীল ও সুচারুভাবে নির্মিত হতে পারে শক্তির *আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল* কাব্যান্তর্গত **একটিমাত্র ঢেউ** তার এক অনবদ্য নিদর্শন :

সমুদ্রের হাতছাড়া হয়ে গিয়ে একটিমাত্র ঢেউ
আমার উঠোনে এসে শুয়ে আছে সাপের মতন
কিলিবিলি জ্যোৎস্নায়। মেঘরাত্রে তাকে দেখে কাঁপে
চোরের মতন চাঁদ কোনোদিন পাতার আড়ালে
মানুষের ভয় নেই ঐ ঢেউসাপ নিয়ে আর
কেননা মানুষ তাকে পংক্তি ভেঙে আসতে দেখেছিলো
চমৎকার দল ভেঙে, ছন্দ ভেঙে একা একা এই
উঠোনের একপাশে খুব ক্লান্ত নারীর মতন।।

শক্তির অনেক সেরা রচনার মতো এ কবিতাটিও বিষয় বা উদ্দেশ্যপ্রধান নয়, বরং প্রকৃতির নির্জন রহস্যময়তানির্ভর চিত্রকল্পমালার নিপুণ বয়নে নির্মিত এক আঙ্গিক প্রধান রচনা। প্রথম পংক্তিতে সমুদ্র বহন করে মানবিক প্রতীতি ('সমুদ্রের হাতছাড়া হয়ে গিয়ে')। দ্বিতীয় লাইনে সমুদ্রের একটি দলছুট ঢেউকে কবি কল্পনা করলেন ভিন্নধর্মী বস্তু সাপের সাদৃশ্যে। তৃতীয় পংক্তিতে উপমাটি সম্প্রসারিত হয়ে জ্যোৎস্নায় আরোপ করেছে সরীসৃপবিভঙ্গ 'কিলিবিলি জ্যোৎস্না'। জ্যোৎস্নার সূত্র ধরে অতঃপর এসেছে পাতার আড়ালে কাঁপা চাঁদের ছবি এবং 'চোরের মতন চাঁদ' উপমাটিতে যুক্ত হয়েছে সমাসোক্তির মানবিক প্রতীতি। জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারি সর্পিলতায় শুয়ে থাকা ঢেউ দেখে ভয় পাওয়া চাঁদের প্রসঙ্গে এসেছে পঞ্চম পংক্তিতে মানুষের 'ঐ ঢেউসাপ' দেখে ভয় না পাওয়ার প্রসঙ্গ। কবিতা শেষ হয়েছে সমুদ্র তরঙ্গমালা থেকে দলছুট হয়ে আসা ঐ ঢেউয়ের সঙ্গে 'উঠোনের একপাশে খুব ক্লান্ত নারীর' তুলনা দিয়ে। চিত্রকল্প ও অলঙ্কার সমার্থক না হলেও কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণে অলঙ্কারের উপযোগিতা বিষয়ে যে সংশয় প্রকাশ করা চলে না, শক্তির এই আট লাইনের রচনাটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ কবিতাটির আঙ্গিককে দিয়েছে এমন এক চিত্রকল্পনির্ভর সুষম গড়ন যা থেকে কোনো স্থির ও নির্দিষ্ট বিষয় বা ভাবনার আঙ্গিক-নিরপেক্ষ নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ।

ছন্দ-প্রকরণ

১৯৯৪-এর শেষদিকে, অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, এক সাক্ষাৎকারে কবিতার নির্মাণে ছন্দের উপযোগিতা বিষয়ে শক্তি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাকেই আমরা তাঁর ছন্দচিন্তার সার সংক্ষেপ বলে গ্রহণ করে তাঁর ছন্দমনস্কতার পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি—'ছন্দে লেখাটা কবিতার ক্ষেত্রে অনিবার্য। আর যে শুরু করবে, সে যেন ছন্দে শুরু করে। তার পরে ছন্দ ভেঙে গদ্যে আসতে পারে।......ছন্দে শুরু করতে বলার একমাত্র কারণ হচ্ছে, শব্দের ওজন সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন কবি। ..... সেই সঙ্গে তাঁর কান পরিষ্কার রাখাটাও জরুরি। সেই জন্যই ছন্দের কথা বলি আমি'।[৩৬] এর অনেক বছর আগে ১৯৭৮-এ ছন্দ-বিষয়ক একটি ব্যক্তিগত ভাষ্যে প্রায় একই কথা বলেছিলেন শক্তি—'লেখার ব্যাপারে কবিকে সাধারণত ছান্দসিক হবার দরকার করে না। তবে, যদি কেউ হন, তাতে কারও কোনো ওজোর আপত্তি খাটে না।.......ছন্দ-জ্ঞান থাকলে তবেই ছন্দ ভাঙা যায়। বিহ্বলভাবে ছন্দভাঙার আমি ঘোর বিরোধী। ......অনুশীলনকামী মাত্রের প্রতি আমার সাদর নির্দেশ হল—অন্তত একশটা সনেট লিখুন।'[৩৭]

দীর্ঘ চার দশক ধরে ছন্দের নানা শৃঙ্খলা ও প্রথাসিদ্ধ ছন্দবন্ধন থেকে নানাভাবে সরে আসার যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন শক্তি তাতে করে সমকালীন বাংলা কবিতার মানচিত্রে ছন্দশিল্পী বলে তাঁর একটি নিশ্চিত আসন তৈরি হয়েছে। একালের অন্যতম কবি-ছন্দশাস্ত্রবিদ্ শঙ্খ ঘোষের মতো ছন্দতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তথা অনুশীলনের কোনো গ্রন্থবদ্ধ বিবরণ যদিও আমরা শক্তির কাছ থেকে পাইনি, কিন্তু শঙ্খের সুপরিচিত **ছন্দের বারান্দা** (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৭১) গ্রন্থটির কথা মনে রেখে লেখা *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* কাব্যসঙ্কলনের ভাঙা গড়ার চেয়েও

মূল্যবান কবিতাটি আমাদের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে, যেখানে ছন্দ ভাঙার প্রস্তাবনা মিশ্রবৃত্তের বিলম্বিত লয়ে কথ্য চালে কবিতার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে—

কে জানে কেমন করে *ছন্দের বারান্দা ভাঙা হবে?*
মিস্তিরি মজুত, কাছে শাবল গাঁইতি সবই আছে।
লোকবল আছে, *আছে ভাঙনের নিশ্চিত নির্দেশ,*
ভাঙার ক্ষমতা আছে, প্রয়োজনও আছে।
বারান্দাও জেনে গেছে ; *সবাই ভাঙনে নয় দড়!*
ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি-প্রথা আছে,
এবড়োখেবড়োভাবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে
গায়ে আর লোকে বলবে, একেই তছনছ করা বলে।
অশিক্ষাও বলে কেউ, বলে, মূর্খ, ভাঙা শিখতে হয়—
অপরূপভাবে ভাঙা, গড়ার চেয়েও মূল্যবান
কখনো-সখনো!

ছন্দশাস্ত্রের তত্ত্বগত আলোচনার চেয়ে ছন্দের ভাঙা-গড়া বিষয়ে একটি সার্থক কবিতা রচনা কিছু কম উল্লেখের দাবি রাখে না। বাংলা কবিতার জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের ছন্দচর্চার পথ ধরে যে বিশেষ ছন্দোরীতি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে সেই মিশ্রবৃত্তের সহ্যশক্তি ও স্থিতিস্থাপকতাকে তাঁর পূর্বসুরি ও সমকালীনদের মতোই আবেগ-গভীরতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ-আধার করেছিলেন শক্তি। কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির স্বাভাবিক স্পন্দন বজায় রেখে, চলিত গদ্যে, মিশ্রবৃত্তের মন্দলয়ের পূর্ণতা কিভাবে অর্জিত হতে পারে শক্তির এই পংক্তিগুলি তার চমৎকার নিদর্শন :

মানুষ যখন কাঁদে মানুষের সাধ্য কি, থামায়? ৮ + ১০
নদীর নিকটে গিয়ে কাঁদে, কাঁদে পাথরের পাশে ১০ + ৮
মাঠের ভিতরে গিয়ে কাঁদে একা, *চোখ তুলে* আকাশে— ১২ + ৬
সাধ্য কি, থামায় তাকে? একা কাঁদে, সংঘে কি কাঁদে না? ৮ + ১০

(জামা কতদিনে ছেঁড়ে/ *ভাত নেই পাথর রয়েছে*)

১৮ মাত্রার পূর্ণ পংক্তিতে লেখা এই কবিতাংশে ধীর লয়ের তান প্রধান মিশ্রবৃত্তে মানুষের দুঃখ-বেদনার আবেগ-ঘন অভিব্যক্তি দিয়েছেন কবি। অন্ত্যমিল ও পংক্তির অন্তর্গত মিলের ব্যবহারে, ছেদ-চিহ্নের প্রয়োগে কথ্যভাষার স্পন্দনকে মূর্ত করে তোলায় শক্তির দক্ষতার এটি একটি নমুনা। বিশেষ লক্ষণীয় যে তৃতীয় পংক্তির 'চোখ তুলে' শব্দদুটিকে ছন্দসন্ধিতে জুড়ে, 'চোখ্‌তুলে' রূপ দিয়ে, কবি তাকে তিন মাত্রায় সঙ্কুচিত করে মিশ্রবৃত্তের ছন্দসমতা রক্ষা করেছেন। দীর্ঘ পর্বের উচ্চারণ মন্থরতা মিশ্রবৃত্তে শব্দধ্বনির চেয়ে স্পষ্টতর যে অনুরণন সৃষ্টি করে আবেগগম্ভীর প্রকাশের পক্ষে তা বিশেষ উপযোগী এবং শক্তি তাঁর কবিতারচনার সমস্ত পর্বে মিশ্রবৃত্তের এই উপযোগিতার সদ্ব্যবহার করেছেন :

(১) বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে। ৮ + ১০
হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, পায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর ৮ + ১০

(নিয়তি/ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*)

(২) আমার বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, ধরিতে দিব না ১২ + ৬
নিন্দুকে, বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, আমি ধরিব না ১২ + ৬
(৭ নং কবিতা/*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)

(৩) মাথার ভিতরে শান্ত অগ্নি তাকে পাগল করেছে ১২ + ৬
সে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো ১২ + ৬
(শিকড়ের মতো, একা/*সুন্দর এখানে একা নয়*)

(৪) সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল ৮ + ১০
পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল ৮ + ১০
(বিড়াল/*যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*)

(৫) শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি। ৮ + ১০
এতো দীর্ঘ প্রাণ ছিল, বস্তুত তা আধো-অন্ধকারে ৮ + ১০
(শব্দের ভিতরে ছিলে/*এই তো মর্মর মূর্তি*)

মিশ্র বৃত্তের মন্থর চলনকে আশ্রয় করে গভীর ও আবেগময় অভিব্যক্তির স্বরগ্রাম এভাবেই অর্জন করেছেন কবি। সেইসঙ্গে ছন্দের বহিরঙ্গের ভিতরে বাক্‌ছন্দের অন্তঃস্পন্দন কবিতাকে দিয়েছে স্বাভাবিক গতি ও সজীবতা। এই সব উদাহরণে মুখ্যত চলিত ভাষা ব্যবহার করা হলেও কোথাওকোথাও সাধু ভাষারীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় (উদ্ধৃতি ২)।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে আঠারো মাত্রার পংক্তিবিন্যাস শক্তির বিশেষ প্রিয় রীতি হলেও দশ বা চোদ্দ মাত্রার চরণে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য কিছু কম ছিলো এমন নয়। নিচের কাব্যাংশটিতে দশমাত্রার মিশ্রবৃত্তের ব্যবহার পাঠককে মুগ্ধ করবে :

বাতাসে চন্দনগন্ধ, ঢেউ
চাঁদোয়ার মর্মে, তারো নিচে
শরীর-শূন্যই আছে কেউ
হাত রাখা অমল পিরিচে
কিছু, যা এখনো স্বচ্ছ নয়
কিছু, যা এখনো স্বচ্ছ নয়!

(আমাকে সৌভাগ্য দাও পিতা/*উড়ন্ত সিংহাসন*)

আবার আঠারো মাত্রার পংক্তিবিন্যাসের প্রারম্ভে চোদ্দ মাত্রার পংক্তি বসিয়ে মিশ্রবৃত্তের স্থিতিস্থাপকতা সার্থকভাবে পরীক্ষা করেছেন শক্তি :

দুঃখের তমোঘ্ন অগ্নি আমাকে সাজাতো ৮ + ৬
কখনো সাহসীরূপে, কভু ভিতুভাবে ৮ + ৬
দুঃখের তমোঘ্ন অগ্নি আমাকে সাজাতো! ৮ + ৬
কখনো সাজিয়েছিলো রাজরূপে, পারিষদহীন ১২ + ৬
পাটরানী চলে গেছে অন্য কোনো প্রেমের সন্ধানে........ ৮ + ১০

(তার জন্যে সুখে থাকবো/*জঙ্গল বিষাদে আছে*)

মিশ্রবৃত্তে শক্তি চমৎকার মুক্তক লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ নীচের কবিতাটি উদ্ধার করা যায় :

কবিতাকে তার খুব কাছাকাছি মন্দিরের দ্বার খুলতে হবে
কবিতার কাজই এই, অমাবস্যা জড়তা ঘুচিয়ে
হাতে তুলে নেওয়া চাঁদ
অর্থাৎ জ্বলন্ত পর্দা দিঙরেখাবিস্তৃত.....
জানি না কী নাট্য স্টেজে?
জানি না মুঠির মাটি কোন্ শস্যে দুঃখের ব্যাধির
মতন হলুদ.......
কবিতা প্রকৃত কাজই জানে
জ্ঞান সব তার আর মন্দিরের সম্পর্কে শয়ান!

(কবিতাকে তার খুব কাছাকাছি/ *ভাত নেই পাথর রয়েছে***)**

এখানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পংক্তিতে বাইশ মাত্রা থেকে ছ'মাত্রার পরিসরে ছন্দকে বিন্যস্ত করেছেন কবি।

কলাবৃত্ত তো বটেই, দ্রুতলয়ের দলবৃত্ত ছন্দোরীতির চেয়েও মিশ্রবৃত্তে শক্তি বেশি কবিতা লিখেছেন এবং মিশ্রবৃত্তে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ নজরে পড়ে এখানে উদ্ধৃত একটি প্রশ্নবহুল, সংলাপধর্মী ছোটো কবিতায়—

পাখির প্রস্তুত গান পাতার আড়ালে—
কিছু কি হারালে? দুঃখ?
সূক্ষ্ম কারুকাজ করা ব্যথা?
সম্পর্কে জড়তা—এইসব?
পাখির প্রস্তুত গান পাতার আড়ালে—
কিছু কি হারালে? কিছু?
ক্ষুদ্র, তীব্র, নিচু? **(আড়ালে/** *সুন্দর এখানে একা নয়***)**

সাত পংক্তির ক্ষুদ্র রচনায় চোদ্দ, দশ, আট ও ছয় মাত্রার পরিসরে লাইনগুলি বিন্যস্ত। ধীর লয়ের তানপ্রধান মিশ্রবৃত্ত এখানে কবিতার অন্তর্লীন আবেগের সঙ্গে একাত্ম।

চতুর্দশপদী কবিতার রচয়িতা হিসেবে একালের বাংলা কবিতায় শক্তির রয়েছে এক বিশিষ্ট স্থান। কমবেশি দেড়শোটি সনেট লিখেছেন শক্তি এই মিশ্রবৃত্ত ছন্দে। চোদ্দটি চরণে আঠারো মাত্রার পংক্তিতে চতুর্দশপদী লিখেছেন শক্তি মিশ্রবৃত্তের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী :

(১) ফুলের বিছানা দেখে মনে হল শূন্যতা যাবাব
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই। পরশকাতর.......... **(১ নং)**

(২) অনেক শেফালি আমি দেখিয়াছি, এ-জীবনে আর
দেখিতে চাহি না কোনো শেফালিরে, শেফালি দেখুক..........**(৩১ নং)**

(৩) দ্যাখোরে মরেছে লোকটা পা গলিয়ে মায়ার ফিকিরে,
পুরোনো চটির মত তছরূপী সংসারের মোট.... **(চর্তুদশপদী কবিতাগুচ্ছ, ১১ নং,** *পাড়ের কাঁথা.....***)**

আবার চতুর্দশপদীর প্রচলিত ছন্দোরীতির সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কবিতার শেষে বাড়তি কিছু জোর ও নিশ্চয়তা আনতে চেয়েছেন **৯৯ সংখ্যক** সনেটটিতে :

কবিতার সত্যে আমি এক ঝলক মিথ্যার বাতাস
লাগাই, কী পাল্টে যায়, কবিতার সত্য একদিনে?....

এইভাবেই ত্রয়োদশ পংক্তি পর্যন্ত আঠারো মাত্রার সমদৈর্ঘ্যসম্পন্ন চরণ। কিন্তু চতুর্দশ পংক্তিটি দীর্ঘতর, বাইশ মাত্রার, শেষ দুটি চরণে অন্ত্যমিলের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেও কবি পংক্তিটিকে সম্প্রসারিত করেছেন—

বিপুল, অমিততেজা, জাঁহাবাজ সত্যের ভ্রূকুটি
আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি। ৪ + ৮ + ১০

কলাবৃত্তের মধ্যম লয়ের চালে এমন এক বৃত্তধর্মী অনুবর্তন আছে এবং তার নির্দিষ্ট গতিক্রম এত রীতিনিষ্ঠ যে মিশ্রবৃত্ত রীতির তুলনায় এই ছন্দোরূপে স্বাচ্ছন্দ্য কম। মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্তের চেয়ে কলাবৃত্তে শক্তির প্রবণতাও বোধহয় সে কারণে কম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র **চতুরঙ্গে** কবিতাটিতে ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন পাই :

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না ৬ + ৬ + ৬
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী, সেদিকে যাবো না মিথ্যা
বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কি
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

উদ্ধৃত দুটি স্তবকের পংক্তিগুলি ছয়মাত্রার তিনটি করে পর্বে লিখিত। কথ্যরীতির চলিত গদ্যে লেখা হলেও অন্বয়ের বিচ্যুতিগত কারণে কবিতার ভাষা গদ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। পর্ব থেকে পর্বে, পংক্তি থেকে পংক্তিতে ভাববস্তুর সংক্রমণে পাঠক অনুভব করেন এক ধরনের মোচড় যা কলাবৃত্তের নৃত্যপর প্রবহমানতায় পাঠককে প্রাণিত করে গভীর অর্থব্যঞ্জনার দিকে। রুদ্ধদলের স্পষ্টতা ও পূর্ণপর্বের গতিক্রম কলাবৃত্তকে থেমে থেমে চলার যে প্রবণতা দেয়, শক্তি তাকেই চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন বেদনা ও অভিমান প্রকাশ করার কাজে। বিশেষ লক্ষণীয়, দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তির 'এই অপরূপ পৃথিবী' অংশটি। 'এই অপরূপ', ছয়মাত্রার পর্বের সঙ্গে 'পৃথিবী' এই তিনমাত্রার উপপর্বটিকে ছেদচিহ্ন (,) দিয়ে আলাদা করে নিয়েছেন। যদিও পর্বের মধ্যে ছেদ ব্যবহারে ছন্দের গতিক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এক্ষেত্রে পুরো পংক্তিতে গতিক্রমের তেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।

ছয় মাত্রার কলাবৃত্তে শক্তির প্রথম দিকের অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি বিশেষ জনপ্রিয় রচনার প্রথম স্তবক উদ্ধার করা যেতে পারে :

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি ৬ + ৬ + ২
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা ৬ + ৬ + ২

উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল ৬ + ৬ + ২
আনন্দ-ভৈরবী। ৬ + ২

(আনন্দ ভৈরবী/ *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*)

পাঁচটি স্তবকবিশিষ্ট এই কবিতায় প্রতিটি স্তবকের প্রথম তিনটি পংক্তি সমদৈর্ঘ্যসম্পন্ন—দুটি ছয়মাত্রার পূর্ণ পর্বের সঙ্গে একটি দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। চতুর্থ পংক্তিতে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। স্মৃতিমেদুরতা ও আবেগার্ত হৃদয়বেদনা এই কবিতার মূল সুর। শক্তি তাই পূর্ববর্তী উদ্ধৃতির লয় ও গমক কমিয়ে দিয়ে এই কবিতায় কলাবৃত্তের গতিক্রমে বিষণ্ণতার প্রয়োজনীয় ছোঁয়াটুকু লাগিয়ে দিয়েছেন। *মানুষ বড়ো কাঁদছে* কাব্যগ্রন্থের **মালা নেই** শিরোনামের কবিতাটিতে এই ছয় মাত্রার কলাবৃত্তের নিয়মিত ও সুচারু প্রয়োগে শক্তি ভাববস্তু ও ছন্দের যে পরিপূরকতা দেখালেন তাতে বোঝা গেলো যে, কবিতারচনার উত্তরপর্বেও কলাবৃত্তের ধ্বনিপ্রধান বিস্তার তাঁকে মাঝে মাঝে আকৃষ্ট করেছে :

ঝর্নার মতো ঝরে পড়ে তার হাসি ৬ + ৬ + ২
নুড়ি পাথরের সম্পদ তাকে চেনে ৬ + ৬ + ২
নদীতীরে কোন্ কুহকী বাজালো বাঁশি ৬ + ৬ + ২
আমি ঝর্নার পরবাসী চাঁদবেনে! ৬ + ৬ + ২

সাত মাত্রার কলাবৃত্ত শক্তি অনেক কম ব্যবহার করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যবহার যুক্তবর্ণবর্জিত। *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে* শীর্ষক দীর্ঘ আলেখ্য কবিতার একটি চূর্ণ পদ্যাংশে এই সাতমাত্রা পর্বের কলাবৃত্তের নিদর্শন পাই :

কোথায় রাখি তাকে ৭
দুহাতে ঢাকি থাকে ৭
হরিণী-মায়া মোর বনের নিরজনে ৭ + ৭
তখন যদি পথে ৭
পড়িত শাখা হতে ৭
হুহুংকারে-ভরা ঘাতক দশজনে— ৭ + ৭
কোথায় রাখি তাকে ৭
দুহাতে ঢাকি থাকে ৭
হরিণী-মায়া মোর বনের নিরজনে। ৭ + ৭

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি সঙ্কলনভুক্ত দীর্ঘ কবিতা **কথোপকথন**-এর একটি পূর্ণ অংশে যুক্তবর্ণাশ্রিত সাত মাত্রার কলাবৃত্তের একটি নমুনা পাশাপাশি উল্লেখ করা যায়, যেখানে যুক্তবর্ণবহুল রুদ্ধদলের এক চমৎকার ধ্বনিতরঙ্গময় গতিক্রম জেগে উঠেছে :

মরি না লজ্জায়, ৭
বেঁচে থাকি, আর ৬
স্নিগ্ধ পারাবার। ৭
দেখি কি গর্জায় ৭
এই যে দরজায় ৭

ত্রস্ত কালো ঘোড়া ৭
সর্বনাশ, জোড়া ৭
দেহের ভর চায়। ৭
আমি কি সুন্দর ৭
বরং তুমি কালো ৭
সর্বনাশ ভালো... ৭

দ্বিতীয় পংক্তিতে সাতের জায়গায় ছয় মাত্রা থাকলেও এটি সাতমাত্রায় প্রসারিত হতে পারে, যদিও পাঠকের কানে এক মাত্রার ঘাটতি কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক মনে হবে।

পাঁচ মাত্রার চালের কলাবৃত্ত ছন্দে শক্তি লিখেছিলেন তাঁর বহুপঠিত **অবনী বাড়ি আছো?** (*ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*) কবিতাটি। পূর্ণ ও ভাঙা পর্বের মিশ্রণে কিভাবে কলাবৃত্তে মুক্তধর্মী রচনায় সার্থকতা অর্জন করা যায় এখানে তার প্রমাণ মিলবে :

দুয়ার এঁটে/ঘুমিয়ে আছে/পাড়া ৫ + ৫ + ২
কেবল শুনি/রাতের কড়া/নাড়া ৫ + ৫ + ২
'অবনী বাড়ি/আছো'? ৫ + ২

বৃষ্টি পড়ে/এখানে বারো/মাস ৫ + ৫ + ২
এখানে মেঘ/গাভীর মতো/চরে ৫ + ৫ + ২
পরাঙ্‌মুখ/সবুজ নালি/ঘাস ৫ + ৫ + ২
দুয়ার চেপে/ধরে— ৫ + ২
'অবনী বাড়ি/আছো'? ৫ + ২

প্রতিটি পংক্তির শেষে দুই মাত্রার ভাঙা পর্ব রয়েছে এবং পাঁচ মাত্রার প্রতিটি পূর্ণ পর্ব আসলে তিন ও দুই মাত্রার সমষ্টি। বিজোড় ও জোড় সংখ্যক মাত্রায় গড়া পাঁচমাত্রার এই চালে কলাবৃত্তের যে মসৃণতা তা কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চার মাত্রার চালের শ্বাসাঘাতপ্রধান দ্রুত লয়ের দলবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবল পক্ষপাত আর কোনো কবির আছে বলে মনে হয় না। বাংলার লৌকিক জীবন তথা লোককবির ছড়া, কবিগান ইত্যাদি থেকে এই দলবৃত্ত জায়গা করে নিয়েছিল শিষ্ট কবিতার পরিশীলিত ও জটিল প্রকাশভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্তকে উল্লেখ করেছিলেন 'স্বাভাবিক ছন্দ'রূপে এবং *ক্ষণিকা* ও *পলাতকা* থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত কত বিচিত্র সম্ভাবনায় এই লৌকিক ছন্দকে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রোত্তরকালে পঞ্চাশের কবিরা (শক্তি ছাড়াও শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ) দলবৃত্তের ছন্দোবন্ধটিকে বহুমুখী প্রসারতা দিয়েছিলেন। শক্তির কবিতার বিষয় ও অনুভবে লৌকিক তথা গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ, গ্রামীণ মানুষের মুখের কথা, পল্লী প্রকৃতির দৃশ্যরূপ ইত্যাদি প্রবল ও প্রায়-অনিবার্যভাবে উপস্থিত। কবিতাকে তিনি বলেছেন 'পদ্য' ; ছন্দের মিলে শ্রুতিসুখকর কবিতা কবিসভার পর কবিসভায় শুনিয়ে পাঠককে বিভোর করেছেন শক্তি। বাঙালির সাধারণ উচ্চারণের দ্রুত স্পন্দন ধরা পড়ে যে ছন্দোরূপে সেই দলবৃত্তের ছোট ছোট ধ্বনিস্পন্দে তাই শক্তি খুঁজে পেয়েছেন হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করার বিচিত্রমুখী আঙ্গিক। অতি-নিরূপিত ও 'ছড়ার

ছন্দ' বলে দলবৃত্তের গুরুত্ব একালের বাংলা কবিতায় হ্রাস পেয়েছে অথবা লঘু চালের দ্রুত লয়ের ছন্দ বলে এই রীতিতে ভাবগম্ভীর অভিব্যক্তি অসম্ভব—এ জাতীয় অভিমত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় দলবৃত্তের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের সামনে অসার বলে মনে হয়।

চলিত ভাষার সঙ্গে দলবৃত্তের আত্মিক যোগ আছে এবং লঘু কৌতুকের মেজাজ এই ছন্দোরীতির দ্রুত চার মাত্রার চালের আঙ্গিকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় সে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ছড়ার আদলে কৌতুকী মেজাজে লেখা বেশ কিছু পদ্যে শক্তি দলবৃত্তের এই হাল্‌কা চালের সদ্ব্যবহার করেছেন :

(১) মেঘলাদিনে/দুপুরবেলা/যেই পড়েছে/মনে ৪ + ৪ + ৪ + ২
চিরকালীন/ভালবাসার/বাঘ বেরোলো/বনে..... ৪ + ৪ + ৪ + ২
(আমি) দেখতে পেলাম,/কাছে গেলাম,/মুখে বললাম/: খা (২) + ৪ + ৪ + ৪ + ১
আঁখির আঠায়/জড়িয়েছে বাঘ,/নড়ে বসছে/না। ৪ + ৪ + ৪ + ১

(বাঘ/*প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)

(২) বহুকালের/সাধ ছিল তাই/কইতে কথা/বাধছিলো ৪ + ৪ + ৪ + ৩
দুয়ার খুলে/দেখিনি—ওই/একটি পরমাদ ছিলো ৪ + ৪ + ৪ + ৩
যখন তুমি/দাঁড়াও এসে ৪ + ৪
আন্ধারে রোদ/দুরে ভেসে ৪ + ৪
হাসির ছটা/ভুলিয়ে গেলো/ভিতরে কেউ/কাঁদছিলো ৪ + ৪ + ৪ + ৩

(একটি পরমাদ/*প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)

(৩) একটু কথা/কইলে ভালো ৪ + ৪
একটু সবুর/সইলে ভালো ৪ + ৪
এক মুহূর্ত/রইলে ভালো ৪ + ৪
নইলে কিছুই/পাচ্ছো না। ৪ + ৩ **(৩৬ সংখ্যক/*f***

(৪) সর্বনাশের/আশায় ৪ + ২
(আমি) পোড়াচ্ছি এই/বাসা। (২) + ৪ + ২
(কিন্তু,) পুড়েও পুড়ছে/না (২) + ৪ + ১
নকল যত/খবরদারির ৪ + ৪
মধ্যে আছেন/বাঘ-শিকারী........ ৪ + ৪
জুড়েও জুড়ছে/না ৪ + ১
কপাল আমার/কপাল। ৪ + ২
(ফলে,) হয় না কোনোই/রফা! (২) + ৪ + ২

(হয় না কোনোই রফা / *উডন্ত সিংহাসন*)

(৫) দু'গণ্ডা লোক/দু'গণ্ডা পোক/নেবুঘাসের/রসে ৪ + ৪ + ৪ + ২
পটাক্ করে/চুল্লু মারে/নিসর্গ-সন্ন্যাসে! ৪ + ৪ + ৪ + ২

(শিকার-কাহিনী/*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)

(৬) তামাভরণ/যেটুক ছিলো/স্যাকরাবাড়ি/গ্যালো ৪ + ৪ + ৪ + ২
চার খেজুর/গাছের রস/মোল্লাবাড়ি / পেলো ৩ + ৩ + ৪ + ২
পরার কানি/হাতের পাণি,/মড়ার কাঠ/কই? ৪ + ৪ + ৩ + ১
ছেলেপুলের /বুক না তো ও,/ডোঙার ওপর/ছই! ৪ + ৪ + ৪ + ১

(সুর্দশন পোকা/ *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো***)**

(১) নং উদ্ধৃতিতে লঘু চপল কৌতুকপরতার মেজাজটি দলবৃত্তের চারমাত্রার টুকরো টুকরো ধ্বনিস্পন্দে পর্বের সঙ্গে পর্ব জড়িয়ে অন্ত্যমিলের অভিঘাতে চমৎকার জমে উঠেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অপূর্ণ পর্বের একদল শব্দ 'খা' ও 'না' দীর্ঘ উচ্চারণে প্রসারণের গুরুত্ব পেয়েছে। (২) নং নিদর্শনে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পংক্তির শেষে রয়েছে তিন মাত্রার একটি করে অপূর্ণ পর্ব, যদিও তার ফলে ছন্দের গতিভঙ্গি ব্যাহত হয়নি। তৃতীয় ও চতুর্থ দুটি ছোট পংক্তি নির্মিত হয়েছে দুটি করে চারমাত্রার পর্বে। পূর্ববর্তী নমুনাটির মতো এই পদ্যাংশেও অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। আর লক্ষ্য করার বিষয় গ্রামীণ/লৌকিক শব্দের স্বচ্ছন্দ ও নিপুণ প্রয়োগ— 'কইতে', 'পরমাদ', 'আন্ধারে'। ছড়ার আঙ্গিকে, দলবৃত্তের কিছু স্বতন্ত্র আদর্শে লেখা তৃতীয় উদ্ধৃতিটি। (৪) নং কবিতাটিতে দলবৃত্তের ছন্দোরীতিতে অন্ত্যমিল ও পংক্তিবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য রকমফের করেছেন কবি। প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে শুরুতেই একটি করে অতিপর্ব আছে ; শেষ পংক্তির গোড়ায় অনুরূপ একটি অতিপর্ব। দ্বিতীয় স্তবকটি ছাড়া অন্য দুটির প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি করে অপূর্ণ পর্ব এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠ পংক্তির শেষে অপূর্ণ পর্বের একদল শব্দ 'না' দলবৃত্তের নিরূপিত আঙ্গিকের মধ্যেও বৈচিত্র্য এনেছে। কথ্যরীতির কিছুটা অশিষ্ট/গ্রাম্য চালে দলবৃত্তের কৌতুকী মেজাজ চমৎকার ধরা পড়েছে পঞ্চম উদ্ধৃতির দুটি মিত্রাক্ষর চরণে। চার মাত্রার তিনটি পূর্ণ ও দুই মাত্রার একটি ভাঙা পর্বে লেখা এই দুটি পংক্তিতে কথ্য বাগভঙ্গির জীবন্ত উচ্চারণ টুক্‌রো ছবিতে যেভাবে ফুটেছে তা দলবৃত্তের স্বতঃস্ফূর্ততা মূর্ত করে তোলে। গ্রামীণ বাগভঙ্গির সজীবতায় (৬) নং পদ্যাংশের পূর্ণ-অপূর্ণ পর্বের মিশ্র চালে গড়ে ওঠা এক জোড়া মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে বক্তার বেদনার আন্তরিক অভিব্যক্তি।

যদিও কবি-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ দলবৃত্তের ছন্দোরীতি সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন—'এই কৃত্রিম শ্বাসাঘাতজনিত ছন্দস্পন্দনির্মাণ এবং অতি নিরূপিত বৈচিত্র্যহীন পর্বসন্নিবেশই স্বরবৃত্তের মস্ত দুর্বলতা',[৩৮] এবং মিশ্রবৃত্তের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছুটা অনৈতিহাসিকভাবেই উচ্চারণ করেছেন—'রবীন্দ্র পরবর্তীদের পক্ষে ছড়ার ছন্দের আকর্ষণ যে আর বেশি রইল না তার কারণ এখন বোঝা যায়',[৩৯] তবুও একেবারে হাল আমলের কবিতা পর্যন্ত দলবৃত্তের প্রসার উপেক্ষণীয় নয়। দলবৃত্তের স্বাভাবিক ধ্বনিসঙ্কোচ মেনে নিয়ে ছোট ছোট ধ্বনিস্পন্দে যে কোনো অনুভব বা ভাবনাকে প্রকাশ করা যায় এবং ভাবানুসারে এই ছন্দের লয়কেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তা আরো অনেকের মতো শক্তিও করে দেখিয়েছেন:

(১) সারা শরীর/জুড়ে তোমার/বিষ পিঁপড়ে/ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন/জামরুলে, ঐ/নীল ভিজোনো/গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম/যেমন চাষা/ছড়িয়েছিলো/পুরুষ্টু বীজ

ক্ষেত ভরে যায়/শস্য ওঠে,/তোমার শস্য/শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে/হঠাৎ কেন/বিষ-পিঁপড়ে/ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো?/কারণ আছে?/তালসুপুরি/গাছের কাছে
কারণ ছিলো/কারণ আছে। **(বিষ-পিঁপড়ে/ *সোনার মাছি খুন করেছি*)**

(২) সকাল থেকে/আমার ইচ্ছে
এক ধরনের/সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই
ভালো এবং/মন্দ যত
হয় না আমার/মনোমতো
ওসামু দাজাই **(স্বেচ্ছা/ *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*)**

(৩) ছেলেটা খুব/ভুল করেছে/শক্ত পাথর/ ভেঙে
মানুষ ছিলো/নরম, কেটে,/ছড়িয়ে দিলে/পারতো।
অন্ধ ছেলে,/বন্ধ ছেলে,/জীবন আছে/জানলায়!
—পাথর কেটে/পথ বানানো,/তাই হয়েছে/ব্যর্থ।
(ছেলেটা/ *ভাত নেই, পাথর রয়েছে*)

(৪) 'রাত দুপুরের/শ্মশানচিতা/আমাকে দাও/কোল—'
বলতে-বলতে/টলমলিয়ে/লোকটি ঢুকে পড়লো
যেখানে শোক/চাপা এবং/মাপা কথার/ভিড়ে
ফুলগুলি সব/ছড়িয়ে আছে,/জড়িয়ে আছে/মালায়
লোকটি দেখায়/দুহাত তুলে/শুকানো ডাল/পালা। **(আমাকে দাও কোল/ *ঐ*)**

(৫) তোমার দেহ/যেথায় মেঘের/ভার
বাছুর হয়ে/ওষ্ঠ রাখি/আর
বিশাল উরু/অন্ধকার/ঘরে। **(ভৌতিক/ *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)**

এইসব পদ্যাংশে দলবৃত্তের চারমাত্রা পর্বের গতিভঙ্গির নানা রকমফের আছে। (১) নং উদাহরণে শেষ পংক্তিটি বাদ দিলে পূর্ণ পংক্তিতে পর্বসমতা রয়েছে। স্বাধীন মিলবিন্যাসে বক্তব্য থেকে বক্তব্যে মোচড় দিয়ে কবি চলে যাচ্ছেন স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গিতে নিজস্ব ভাবনাকে চারিত করে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দুটি করে চারমাত্রার চালের মিত্রাক্ষর চরণের পর একটি করে এক পর্বের হ্রস্ব পংক্তি। (৩) ও (৪) নং নমুনা দুটিতে তিনটি পূর্ণ ও একটি ভাঙা পর্বের সমাহারে ছন্দের গতিভঙ্গি ও লয়ে কবিতার চলমান জীবনের স্পন্দমানতা চমৎকার ফুটে উঠেছে। পঞ্চম নিদর্শনটিতে নারীদেহ ও মিলনের অভিজ্ঞতা দুটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্বের সমতায় দৃশ্যরূপের প্রত্যক্ষতা পেয়েছে ছোটো ছোটো ধ্বনিস্পন্দে, পর্বের সঙ্গে পর্ব জুড়ে গিয়ে। বাংলা ভাষায় 'স্বাভাবিক ছন্দ' হিসেবে দলবৃত্তকে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ তার যে সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, শক্তির এইসব পদ্যাংশে সেই সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নিরূপিত ছন্দের প্রচলিত রীতিতে লিখতে লিখতে ছন্দোরীতির মধ্যে কিভাবে ছন্দভাঙার খেলা খেলেন কবিরা, শক্তির কবিতা থেকে তার একটি নিদর্শন এখানে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে:

ফুরালো দিন/ফুরালো বেলা ৪ + ৫
সকল অর্থে/ভাঙলো মেলা ৪ + ৪
সমাচ্ছন্ন/ত্রাসে ৪ + ২
হৃদয় বলে/দেখতে চাই না ৪ + ৪
ও অপরূপ/স্ফটিক পান্না ৪ + ৪
কেন যে মিছে/আসে। ৫ + ২

[সখা/ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*]

গোটা কবিতাটি চার মাত্রার দুটি এবং চার মাত্রার পূর্ণ ও দু'মাত্রার ভাঙা পর্বের একটি চরণের ত্রিপদীবন্ধে রচিত। চতুর্দল পর্ব-বিন্যাসের এই সামগ্রিক ছন্দ-কাঠামোর মধ্যে শক্তি কিন্তু মাঝে মাঝে পঞ্চদল পর্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন : 'ফুরালো বেলা', 'কেন যে মিছে'। এই মিশ্রণের ফলে ছন্দপতন ঘটেছে তা কিন্তু বলা যাবে না। উচ্চারণের সম্প্রসারণে বাড়তি এক মাত্রা পাঁচ মাত্রার পর্বগুলিকে ছয় মাত্রার ওজন দিচ্ছে। বিশুদ্ধ দলবৃত্তের মেজাজ তাই খানিক বদলে গেছে। দলবৃত্তে আর একটি রীতিলঙঘনের উদাহরণ পরীক্ষা করা যেতে পারে :

খুকু, আমি সাধ্যমতো ছবিগুলো এঁকেছিলাম........দুয়ার ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ২
জ্যোৎস্না, তাঁবুর পাশে ইতস্তত পোড়া কয়লা, কাঁটার লতা ২ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪
আমরুলের পুঞ্জ পুঞ্জ নীল অম্লতা সমস্তই এঁকেছিলাম.......... ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪

[চিত্রশিল্প অনন্তকাল/ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*]

এই পদ্যাংশের শেষ পংক্তির শুরুতে আমরুলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে যে চার মাত্রার পর্ব ধরা হয়েছে, রুদ্ধদলের সেই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ দলবৃত্তের প্রচলিত রীতিসম্মত নয়। এই সম্প্রসারণের ফলে 'পুঞ্জ পুঞ্জ নীল অম্লতা'র স্বরূপটি যেন 'আমরুল' নামটির উচ্চারণে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। যদি কোনো পাঠকের মনে হয় যে এটি কথ্যরীতিতে গদ্যছন্দে লেখা কবিতা, সেক্ষেত্রেও 'আমরুলের পুঞ্জ পুঞ্জ নীল অম্লতা'কে কথ্যগদ্যে মেলানো কঠিন হবে। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শক্তির গদ্য-কবিতা নিছক গদ্যে লেখা এমন বলা মুশকিল। শব্দের নির্বাচন ও বিন্যাসে কথ্যগদ্যের ভেতর প্রায় সর্বদাই বাজে কবিতার সুর। এখানেই বোধহয় গদ্য-কবিতার বিশিষ্ট নির্মাতা কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে শক্তির এক উল্লেখনীয় পার্থক্য রয়েছে।

নিরূপিত ছন্দ ও তার রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শক্তির প্রবল আগ্রহ স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যে, তাঁর অগ্রজ ও সমকালীন কবিদের মতো শক্তিও গদ্য কবিতার চর্চা করেছেন। সংখ্যায় কম হলেও কথ্য গদ্যে বেশ কিছু চমৎকার কবিতা পাঠককে উপহার দিয়েছেন তিনি। চল্লিশের কবিদের মধ্যে সমর সেন, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে পঞ্চাশের কবিদের গদ্যকবিতার প্রতি আগ্রহের যে সাধারণ সংযোগসূত্র, শক্তির মতো ছন্দের নেশায় মশগুল কবির ক্ষেত্রেও তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। নমুনা হিসেবে উদ্ধার করছি *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যের বিখ্যাত কবিতাটির একটি অংশ :

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতর বুক
আর কিছু নয়—(আরো অনেক কিছু?)—তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে।
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়।
'হ্যান্ডস্ আপ্'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার
কালো গাড়ি..........….

(সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়)

ছোটো-বড়ো নানা মাপের পংক্তিতে লেখা এই গদ্যরীতির রচনায় কোনো এক মদ্যপের টালমাটাল পায়ে মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার প্রয়াস এবং তার অসংলগ্ন ভাবনাচিন্তার চিত্ররূপ পাই। প্রতিটি পংক্তিতে রয়েছে এক বা একাধিক ছোট ছোট বাক্‌পর্ব ; রয়েছে শব্দের পুনরাবৃত্তি ও শব্দসমূহের বহুল ধ্বনি-অনুপ্রাস, যাতে এক ধরনের শ্রুতিসুখকরতা পাঠককে তৃপ্তি দেয়। এখানে যদিও মিলের ছন্দ নেই, যদিও আছে মুখের কথার চাল, তবু একে একেবারে প্রাত্যহিক উপযোগিতার নিরেট গদ্য বলে কখনো মনে হয় না। কথ্য তথা বাচিক গদ্যের পদবিন্যাসের কিছু বদল করে, শব্দগুচ্ছের সুচিন্তিত প্রয়োগে এক শ্রুতিসৌষম্য এই গদ্যের মধ্যে সঞ্চার করা হয়েছে যা কাব্যিক উপলব্ধি ও প্রকাশের উপযুক্ত।

সোনার মাছি খুন করেছি কাব্যের অন্যান্য রচনা থেকে আরো দু'একটি নমুনা উদ্ধার করছি যেখানে কবিতার গদ্যভাষা কথ্য গদ্যের ব্যবহারিক তাৎক্ষণিকতার চাপ থেকে মুক্ত, শ্রুতিবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র :

(১) রুমাল ওড়াও তুমি পথে-পথে
পয়সা ছড়াও তুমি পথে-পথে
চুল খুলে দাও তুমি পথে-পথে **(পুনর্বিবেচনা)**

(২) এমনও দিন গেছে সকালসন্ধ্যায় কেবলি নির্নিমেষ আঁখি আমাদের
এমনও দিন গেছে একটিমাত্র ভাষাকে উলোটপালোট করে—
এমনও দিন গেছে, রাজমিস্তিরির কাছে গিয়ে বলেছি—
বাড়িটা পাকা করে দাও.......... **(পশ্চাদভূমি)**

(১) নং উদ্ধৃতিতে শক্তি প্রতি পংক্তির শেষে 'পথে-পথে' ব্যবহার করে অন্ত্যাবৃত্তির আশ্রয়ে সমান্তরলতা সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া রয়েছে পংক্তির ভেতরে মিলের ছোঁয়া—'ওড়াও', 'ছড়াও', 'খুলে দাও'। দ্বিতীয় নমুনাটিতে 'এমনও দিন গেছে' বাক্‌পর্বটি পরপর পংক্তির শুরুতে উচ্চারিত হয়ে আদ্যাবৃত্তির সমান্তরলতায় কবিতায় সঞ্চার করেছে শ্রুতিসৌষম্য। এছাড়াও 'নির্নিমেষ আঁখি' শব্দবন্ধটিও ভীষণভাবে কাব্যিক রোমান্টিকতায় নিষিক্ত। গদ্য কবিতার গদ্য দুটি ক্ষেত্রেই বাচিক গদ্যের তাৎক্ষণিক ও আটপৌরে রীতি ও মেজাজের থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। কথ্য ভঙ্গিতে লেখা এই কবিতায় এক পথিক যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে :

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হা হা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ!
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন?....
সব দিকেই যাওয়া চলে
শুধু যেতে-যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না
তাকালেহ চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ! **(যেতে-যেতে/ *সোনার মাছি খুন করেছি*)**

পথিকের এই আত্মকথনধর্মী কথ্য চাল ও গ্রাম্য বাগ্‌বন্ধে চিহ্নিত গদ্যে কিন্তু মিশে রয়েছে হৃদয়ের গভীর আততি। ভাব ও অর্থ অনুসারে ঝোঁক পড়েছে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ওপর। ভাবপ্রবাহ ও অর্থের শৃঙ্খলা থেকে ফুটে উঠেছে এ গদ্যের অন্তর্লীন স্বরগ্রাম।

প্রচলিত কথ্য শব্দাবলী ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, মৌখিক সংলাপের সুর ও ভঙ্গি বজায় রেখে, বাগ্‌ধারার চমৎকার প্রয়োগে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে ধরনের গদ্যকবিতার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শক্তিকেও তারই অনুগামী বলে মনে হয় :

সবাই বলতো পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও
চলো
পাচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে
মারের ডগায় সদাসর্বদাই এগিয়ে যেতে পারবে
চলো.........
যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
উড়ো চাল চুড়ো বাড়ি

ঐ তো বদু বুড়োর ছিলো
আজ নেই?
না।
না মানে কব্‌লা-কসরৎ দিগ্‌বিদিক করে
মাগ-ভাতারে বদু বুড়ো সাপটে খুইয়েছে সবই.........

[এবার আসি/ *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*]

প্রধানত চলিত/গ্রাম্য শব্দবহুল মৌখিক রীতির এই গদ্যের থেকে একেবারেই আলাদা একই সঙ্কলনভুক্ত অন্য একটি গদ্যকবিতার ভাষা যা অনেক শান্ত, মার্জিত ও আবেগময় :

আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে
অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন
তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই..........

[হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান]

কথ্যভঙ্গি, বাগ্‌ধারা, কিছুটা অশিষ্ট/গ্রাম্য শব্দাবলী ইত্যাদির প্রতি বিভিন্ন সময়ে আগ্রহ বোধ করলেও বক্তব্যকে সরাসরি মৌখিক রীতিতে উপস্থাপিত করা শক্তির স্বভাব-কবিধর্ম ছিলো বলে মনে হয় না। বরং গদ্যের শরীরী রূপের ভেতরে কবিতার সুর ও ইঙ্গিতময়তাকে সঞ্চারিত করাই তাঁর কবিকৃত্য :

(১) মনে পড়ে অবিনাশ থলকোবাদের সেই বাংলোটির কথা
আমরা সবাই মিলে সেখানে নির্জন হতে গেছি
কিন্তু ভয়ঙ্কর শব্দে নির্জনতা ছিন্নভিন্ন হলো।

(টিলার ওপর সেই বাড়িটির কথা/*সুন্দর রহস্যময়*)

(২) এখন জঙ্গল খুব উপদ্রুত নয়।
মানুষের ভয়ে সব পশুপাখি
অধিক অধিকতর জঙ্গলের দিকে সরে গেছে।
মানুষের সাধ্য নয় সে-গভীরে যাওয়া
প্রাণভয়, কুশলতা অপেক্ষাও বড় (জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন/*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*)

এই শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর গদ্যকবিতার ভাষা-ভঙ্গি সমর সেন, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের থেকে ভিন্ন গোত্রের। নিরূপিত ছন্দের রীতিনিষ্ঠ আঙ্গিক না থাকলেও গদ্যভাষার অন্তঃপুরে সুরের রেশ ও আবেগের স্পন্দন কবিতার আত্মাকে সজীব করে রেখেছে।

রূপরীতির বৈচিত্র্য

বিষয় ও প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য এবং অনেক ক্ষেত্রে আপাত-বিষয়হীনতা, শব্দ প্রকরণে দুঃসাহসিক চালচলন, ছন্দের নিপুণ কারিগরি ও অনেক ক্ষেত্রে ছন্দশৃঙ্খলার ভাঙচুর ইত্যাদি ছাড়াও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অতিপ্রজ কবিপ্রতিভার আর এক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর নানা কাব্যরীতির সার্থক

ও প্রত্যয়ী প্রয়োগ। সনেটের মতো সুসংবদ্ধ ও মিতায়তন লিরিক রীতির পাশাপাশি ছোট-বড় নানা মাপের কাঠামো, দীর্ঘ আখ্যানধর্মী কবিতা, কাব্যনাটক, গদ্যকবিতা ইত্যাদি সকল শাখাতেই শক্তির স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি।

সাধারণ্যে শক্তির প্রথম মুদ্রিত কবিতা হিসেবে পরিচিত **যম** (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত **কবিতা** পত্রিকার চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত) একটি সনেট। পেত্রার্কীয় সনেটরীতির অনুসরণে এ কবিতাকে শক্তি ভাগ করেছেন আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে। অষ্টকের মিলবিন্যাস (কখ খক কখ খক) পেত্রার্কের 'Octave'-এর অনুরূপ ; কিন্তু ষট্‌ক অংশে পেত্রার্কের 'Sestet'-এর মিলবিন্যাস কিছু পরিমার্জন করেছেন কবি (কখগ কখগ)। বন্ধুদের সঙ্গে বৈঠকি বিতর্কের সূত্রে গদ্যলেখক শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক ধরনের খেয়ালি অহঙ্কারে যে কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন অগ্রজ কবি বুদ্ধদেবের কাছে সেই কবিতাটি মৃত্যুদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত একটি সুসংহত চতুর্দশপদী। প্রচলিত পেত্রার্কীয় রীতির কাব্যাঙ্গিক আশ্রয় করলেও এক্ষেত্রে 'ষট্‌ক' অংশে তাঁর পরিমার্জনা সনেটের প্রথানুগ ঘনসংবদ্ধ কাঠামোর মধ্যেও তাঁর কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। কবিতারচনার একেবারে আদিপর্বে শক্তির এই প্রকরণমনস্কতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলনের **আদিরচনা পর্বে** (রচনাকাল ১৯৫৫-৫৭) **যম** বাদে অন্য যে ১০৫টি রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তার মধ্যে ২১টি চতুর্দশপদী কবিতা। এছাড়া অন্য ১০টি রচনা 'সনেট' নামে অভিহিত না হলেও বিষয় ও প্রকরণের ঘনবদ্ধতা ও সুমিতির কারণে কার্যত সনেট পদবাচ্য। এগুলির মধ্যে ৮টি কবিতা ষোলো পংক্তির (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে জর্জ মেরেডিথ তাঁর 'Modern Love' কাব্যে ষোলো পংক্তিতে সনেট রচনা করেছিলেন) এবং ২টি পনেরো পংক্তির রচনা। কবিতারচনার প্রারম্ভিক অনুশীলন পর্বে তরুণ কবির 'সনেট' রীতির প্রতি এই স্পষ্ট পক্ষপাত তাঁর প্রতিভার অন্তর্লীন সংযম ও শৃঙ্খলার পরিচায়ক।

প্রারম্ভিক পর্বে রচিত এই সনেট ও সনেটপ্রতিম কবিতাগুলির স্তবক ও মিলবিন্যাসরীতি পরীক্ষা করলে প্রথমেই নজরে আসে যে প্রথাসিদ্ধ পেত্রার্কীয় (৮ + ৬ বিন্যাস : কখ খক কখ খক, গঘ গঘ গঘ/গঘঙ গঘঙ), শেক্‌স্‌পীয়রীয় (৪ × ৩ + ২ বিন্যাস : কখ কখ, গঘ গঘ, ঙচ, ঙচ, ছছ) কিংবা স্পেনসারীয় (৪ × ৩ + ২ বিন্যাস : কখ কখ, খগ খগ, গঘ গঘ, ঙঙ) রীতিতে একটিও সনেট লেখেননি শক্তি। স্তবক ও মিলবিন্যাসে নানা ধরনের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সনেট-আঙ্গিক নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এখানে প্রদত্ত সারণী থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে :

ক্রম	কবিতার নাম	স্তবক বিন্যাস	মিল বিন্যাস	মন্তব্য
১.	নিষিদ্ধ অঙ্গার	৪+৪+৪+২	কখ কখ, গঘ, গঘ, ঙচ ঙচ, ছজ	শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির ৩টি চৌপদী, কিন্তু শেষে সমিল দ্বিপদী নেই।
২.	পাপিষ্ঠ	৪+৪+৬	কখ খক, গঘ ঘগ, ঙচ ছঙ চজ	পেত্রার্ক ও শেক্‌স্‌-পীয়ারের রীতির জটিল মিশ্রণ।

ক্রম	কবিতার নাম	স্তবক বিন্যাস	মিল বিন্যাস	মন্তব্য
৩.	দুটি উপমা	৮+৬	কখ কখ গঘ গঘ, কঙগকঙগ	দুটি শেক্স্পীয়রীয় চৌপদী জুড়ে অষ্টক তৈরি হয়েছে ; ষট্ক কোনো রীতি অনুসারী নয়।
৪.	কেঁদেও পাবে না তাকে	৬+২+৬	কখ খক গগ, ঘঘ, ঙঙ খখ চচ	প্রথম চার পংক্তি পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে, বাকি সবই সমিল দ্বিপদী।
৫.	অসাধারণ	৮+৬	মিলহীন	————
৬.	যমজ	৮+৫+১	কখ খক গঘ ঘগ, ঙচ ছচজ, ঝ	অষ্টক অংশে পেত্রার্ক ও শেক্স্পীয়ারের মিল বিন্যাসের মিশ্রণ ; ষট্ক ভেঙে একটি পংক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
৭.	চতুর্দশপদী	৬+৮	কখ গক খগ, ঘক খগ কখ গঘ	অষ্টক ও ষট্ক স্থান-পরিবর্তন করেছে ; মিলবিন্যাস কোনো রীতি অনুসারী নয়।
৮.	ভ্রমণকাহিনী (২)	৪+১০	কখ কখ, গঘঙগঘঙচছ চছ	১ম স্তবক একটি শেক্স্পীয়রীয় চৌপদী, ২য় স্তবক প্রথা-বিবর্জিত।
৯.	কুণ্ঠিত ফুলগুলি	৪+৩+৫+২	কখ কগ, গখক, ঘখঘঙঙ, খঘ	স্তবক ও মিলের কাঠামোয় স্বাতন্ত্র্যধর্মী।
১০.	প্রতিবিম্ব	৮+৪+২	কখ কগঘঙচচ, ছজঝঝ, ঞঞ	স্তবক বিন্যাস ও শেষের সমিল দ্বিপদী পেত্রার্ক ও শেক্স-পীয়ারের মিশ্রণ সূচিত করলেও, মিলবিন্যাসে প্রথানুগত্য নজরে পড়ে না।

ক্রম	কবিতার নাম	স্তবক বিন্যাস	মিল বিন্যাস	মন্তব্য
১১.	ষোড়শপদী	৮+৮	কখ খক গঘ গঘ, ঙচঙচ ছছ ছজ	দুটি অষ্টকের প্রথমটি একটি পেত্রার্কীয় ও একটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় চৌপদীর মিশ্রণে তৈরি; দ্বিতীয়টিতে রয়েছে দুটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় চৌপদী।
১২.	আত্মহত্যা	৪+৪+৭	কখ গখ, ঘঙচঘ, ছজঝঞজ ঝঞ	স্তবক ও মিলের বিন্যাসে কোনো বিশেষ রীতির স্পষ্ট অনুসরণ নেই।

১৯৭০-এ প্রকাশিত *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-তে মোট ১০১টি সনেট সঙ্কলিত হয়েছিল। 'বাংলা চতুর্দশপদীর প্রথম প্রণেতা মাইকেল মধুসূদনে' উৎসর্গীকৃত **যে শিল্প ঐকিক নয়....** কবিতাটি *হে প্রেম.........* কাব্যগ্রন্থের **সদর স্ট্রীট** শীর্ষক সনেটের সামান্য সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ। বাকি ১০০টি চতুর্দশপদী আনুমানিক ১৯৫৫/৫৬ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী দীর্ঘ ১৩-১৪ বছরের উত্তাল ও ঘটনাবহুল জীবনযাপনের বিভিন্ন মুহূর্তে রচিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শক্তির বন্ধু ও তাঁর *পদ্যসমগ্র*-র সম্পাদক সমীর সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ—'ভাবতে অবাক লাগে, এক ধরনের এই সনেটগুলি রচনা করার মানসিক অখণ্ডতা তিনি কী করে এত বছর ধরে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনেতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন কী তুমুল ও ঘটনাবহুল ছিল তাঁর জীবনের এই বছরগুলি! ... এত সব উত্তাল তরঙ্গের নিভৃত অন্তরে, গুণিকণ্ঠের বিচিত্রদ্যুতি সুরসৃষ্টির অন্তরালে তানপুরার অনাহত ধ্বনির মত এই আপাত-অনুচ্ছল, কিন্তু দৃঢ়পিনদ্ধ লাবণ্যে পরিপূর্ণ কবিতাগুলি তিনি একটি একটি করে রচনা করে গেছেন। এই ১০১টি সনেটের মধ্যে দুটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির রচনা (২ ও ৬১ সংখ্যক) বাদ দিলে আর কোনো শুদ্ধ প্রথানুগ চতুর্দশপদী নেই। মিলবিন্যাসে শেক্‌স্‌পীয়রীয় চৌপদীর প্রতি কবির অনুরাগ সহজলক্ষ্য হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পেত্রার্কীয় মিলের কাঠামো আংশিকভাবে ব্যবহার করেছেন শক্তি ; আবার অনেক সময় দুই রীতির নানা পরীক্ষাধর্মী মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। মিলহীন সনেটের সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। সবকটি সনেটই একটিমাত্র অভঙ্গ স্তবকে নির্মিত। স্পেনসার ও শেক্‌স্‌পীয়ারের মত সমিল দ্বিপদী দিয়ে সনেট শেষ করেছেন শক্তি মোট ১২টি কবিতায়। চতুর্দশপদীর প্রকরণ-শৃঙ্খলার দায় স্বীকার করে নিয়েও শক্তি কবি-প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ততা কিভাবে প্রকাশ করেছেন, সনেট রীতির কিছু বৈচিত্র্য থেকে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে :

ক্রম	কবিতাসংখ্যা	মিল বিন্যাস	মন্তব্য
১.	(১)	কখ কখ কগ কগ ঘঙঙঘ কগ	প্রথম চার পংক্তি শেক্‌স্‌পীয়রীয় চৌপদী ; অবশিষ্টাংশে নানা মিশ্র বিন্যাস।

ক্রম	কবিতাসংখ্যা	মিল বিন্যাস	মন্তব্য
২.	(৭)	কক খগ খঘ ঙঙ কক চছ জক	কোনো মিলবিন্যাসরীতির অনুসারী নয়।
৩.	(১১)	মিলহীন	————
৪.	(১৮)	কখ কখ গঘ গঘ ঙচ ছঙ ঙজ	প্রথম দুটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় চৌপদী বাকি পংক্তিগুলিতে ব্যতিক্রমী বিন্যাস।
৫.	(২৬)	কখ গখ ঘঙ চছ চজ জঘ ঝঝ	শেষ দুই পংক্তি সমিল দ্বিপদী; পূর্ববর্তী পংক্তিমালায় নির্দিষ্ট সনেটরীতি অনুসৃত হয়নি।
৬.	(৬৫)	কখ খক গক কগ ঘঙ ঘঙ কক	প্রথম চার পংক্তি পেত্রার্কীয় রীতিতে, শেষ দু পংক্তি শেক্‌স্‌পীয়রীয় সমিল দ্বিপদী মধ্যবর্তী অংশে মিশ্র রীতি।
৭.	(৭০)	কখ খক গঘ ঘগ ঙচ ঙচ ছজ	প্রথম চার পংক্তি পেত্রার্কীয় রীতিতে, তৃতীয় চৌপদীটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় বিন্যাসে।
৮.	(৮৬)	কখ খক গঘ ঘগ ঙচ চঙ চঙ	প্রথম চারটি পংক্তি পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে ; বাকি অংশে শেক্‌স্‌পীয়রীয় বিন্যাসের কিছু আদল লক্ষ্য করা যায়।
৯.	(৯১)	কক খখ গগ ঘঘ ঙঙ চচ ছছ	সাতটি অন্ত্যমিলযুক্ত দ্বিপদীর অন্তর্বয়নে সনেটের অবয়বটি নির্মিত।
১০.	(৯৬)	কখ কক গগ কক ঘঙ ঘচ চছ	ব্যতিক্রমী বিন্যাসরীতি ; তিনটি সমিল দ্বিপদী অষ্টকের অংশটিকে বিবৃতির স্পষ্টতা ও দার্ঢ্য দিয়েছে।

কবিতা রচনার শুরু থেকেই 'সনেট' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয় লিরিকরূপ— 'প্রকৃতপক্ষে পদ্যলেখা যখন এবং যেদিন শুরু করি, বিধিবদ্ধ চতুর্দশী দিয়ে করেছিলুম।'[৪১] যদিও এ কথা তাঁর প্রথম প্রকাশিত সনেট যম সম্পর্কেই বলা, উত্তরপর্বে চতুর্দশপদী রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমান্য করেছিলেন শক্তি। বলা যায় যে ইউরোপীয় এই ফর্মের নিহিত সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা ও তাঁর কবিস্বভাবের স্বেচ্ছাচারিতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের নজির হয়ে উঠেছে এইসব চতুর্দশপদী কবিতামালা। কোথাও আবার চতুর্দশপদীর পরিপাটি বিন্যাসে শক্তির বিষাদঘন স্মৃতিমেদুর গীতিময় সংহতি প্রায় স্তবের শান্ত শুদ্ধ নিবেদনে পরিণত হয়েছে—'আর কোনোদিন আমি তোমায় ডাকবো না এইভাবে/আজকের মতন আর কোনোদিন

নৈরাশার ভারে/মুখ থুবড়ে পড়বো না ; কোনোদিন কোনোদিন আর/ তোমায় ডাকবো না আমি এইভাবে হৃদয়েশ্বরী।' (চতুর্দশপদী ৬/*পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)। শক্তির *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র আগে ও পরে প্রকাশিত কাব্যসঙ্কলনগুলিতেও কিছু কিছু সনেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-তে ৫টি, *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*-তে ৪টি, *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি* গ্রন্থে ১৫টি (এর মধ্যে ৬টি পুনর্মুদ্রিত), *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* কাব্যে ১০টি, *সুখে আছি*-তে ৪টি, *মানুষ বড় কাঁদছে* সঙ্কলনে ১০টি *কক্সবাজারে সন্ধ্যা*-য় ৬টি এবং *জঙ্গল বিষাদে আছে* গ্রন্থে ৬টি চতুর্দশপদী কবিতা রয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থিত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনার মধ্যেও নিয়মিতভাবে শক্তির সনেটচর্চার বহু নিদর্শন মেলে। এইসব সনেটের মধ্যে দু-একটি নির্দিষ্ট রীতির রচনা থাকলেও (উদাহরণস্বরূপ *পাড়ের কাঁথার* ১১ সংখ্যক সনেটটি) শক্তি স্তবক-বিভাজন ও মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত ছক অনুসরণ করেন নি। এইসব রচনায় অন্ত্যমিলের নানা রকমফের, (৪+৪+৩+৩) কিংবা (৪+৬+৪) কিম্বা (৭+৭) স্তবক-বিভাজন, অমিল সনেট কাঠামোর শেষে সমিল দ্বিপদী (*প্রভু নষ্ট হয়ে যাই* কাব্যের **মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়**) ইত্যাদি শক্তির কবি-স্বভাবের সঙ্কেত বহন করে।

'কাব্যনাটক' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আর এক প্রিয় ও অনুশীলিত আঙ্গিক। প্রকাশ কর্মকার চিত্রিত *সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার* (১৯৮৬) গ্রন্থে শক্তির মোট ছটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাব্যনাটক সঙ্কলিত হয়েছে। এছাড়া **পদ্যসমগ্র**-র দ্বিতীয় খণ্ডে **মনে রেখো** এবং *জঙ্গল বিষাদে আছে* (১৯৯৪) সঙ্কলনের **কিছুক্ষণ** কাব্যনাটকের নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য। *সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, শক্তির হাতে কাব্যনাটকের নির্মাণ প্রসঙ্গে সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'কবিতা ও গল্পের মধ্যবর্তী দেওয়ালটা ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে—এ কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের আঙুল আসলে নিবদ্ধ থাকে সেইসব গল্পের দিকে, আত্মার দিক থেকে যা-কিনা কবিতার সমধর্মী। কিন্তু এর উল্টোটাও যে সত্য হয়ে উঠতে পারে, গল্পের বীজ থেকেও যে ফোটানো যেতে পারে কবিতার স্বমহিম ফুল, সেই পরীক্ষারই বহুবর্ণ কিছু নমুনা এবার তুলে ধরলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার এই নতুন কাব্যগ্রন্থে।'[৪২] আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত ছটি কাব্যনাটক অমিল মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে লেখা ; কখনো বা ব্যবহৃত হয়েছে প্রবহমান ছন্দ ; সংলাপ মূলত বাকছন্দনির্ভর। নারী-পুরুষের ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ সম্পর্কের জটিলতাকে আশ্রয় করে কবি কবিতার রহস্যমণ্ডিত, অন্তর্মুখী, ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষায় চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত-সঙ্কটের চিত্রাঙ্কন করেছেন সংলাপের আঙ্গিকে লেখা এই কবিতাগুলিতে। কবিতার অনন্য ইঙ্গিতময় ভাষায় এক একটি গূঢ় কাহিনীকে নাটকের সংক্ষিপ্ত ও প্রচ্ছন্ন আঙ্গিকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন শক্তি। নাট্যদ্বন্দ্বের সূচীমুখ তীব্রতা এইসব রচনায় নেই; চরিত্রচিত্রণেও পূর্ণতা ও নাটকীয়তার অভাব রয়েছে। আত্মা তথা বাহ্য প্রকরণে, জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতার অন্তর্লীন উচ্চারণে এই কাব্যনাটকগুলি মূলত কবিতায় সমর্পিত।

একা গেলো কাব্যনাটকটির বিষয় এক নারী ও দুই পুরুষের ত্রিকোণ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির স্মৃতি-বেদনা-অনুতাপ। নারী জনৈকা মৃন্ময়ী ; দুই পুরুষ মৃন্ময়ীর স্বামী দিব্য ও তার প্রাক্তন প্রেমিক দীপক। দিব্য-মৃন্ময়ীর ছিমছাম সাজানো সংসারে ছিল যথেষ্ট আনন্দ। সেই আনন্দের মাঝেই মৃন্ময়ীর মৃত্যু সৃষ্টি করে এক শূন্যতা। মৃন্ময়ীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে চলে এসেছে দীপক আর নাটকের শুরু আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় পীড়িত দীপকের তীব্র আত্মধিক্কারে—

'চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে/গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে/তেমন বাসিনি ভালো, ভুল হয়ে গেছে/বিসর্জন দিতে আজ গরম পাথর/বুক ভেঙে ওঠে.....।' এই মৃতা মৃন্ময়ী দীপকের ভালবাসার নিজস্ব নারী, যাকে মৃত্যু-শয্যায় দেখে দীপক আত্মগ্লানি ও ভাবাবেগে বিচলিত বোধ করে—'শান্ত শব দেহ/মুখশ্রী সিঁদুরে/গরবিনী/শুয়ে আছে/একাকী, আগুনে ছাই হবে ব'লে/আছে, জীবন বিচ্ছিন্ন/মাটি-প্রতিমার মতো/মৃন্ময়ী, যথার্থ নাম!' প্রিয় নারীর মৃত্যুতে আর্ত ও বিহ্বল প্রেমিক পুরুষ ছোট মাপের কয়েকটি পংক্তিতে তাঁর হৃদয়ের অন্তর্লীন প্রবাহকে কিভাবে এক ছত্র থেকে অন্য ছত্রে বাহিত করেন, রক্তক্ষরণের জ্বালা কিভাবে সঞ্চারিত করেন স্বগত-উচ্চারণে, তা উদ্ধৃত পংক্তিমালায় বিশেষ লক্ষণীয়। মৃত্যুশায়িতা মৃন্ময়ীকে চুম্বন করে দীপক, স্খলিত পায়ে চলে যায় চিতাপার্শ্ব থেকে। সূত্রধরের মতো কবি দীপকের এই আবেগতাড়িত কার্যক্রম নির্দেশিত করেন বন্ধনীচিহ্নে। উপস্থিত মৃন্ময়ীর আত্মীয়-পরিজনের ধিকৃত চিৎকার, রুষ্ট কটু-কাটব্য শোনা যায়। মৃন্ময়ীর স্বামী দিব্য এক ব্যতিক্রমী চরিত্র; সে দীপক ও মৃন্ময়ীর হৃদয়-রহস্যের গোপন কথাটি জানতো ; দিব্য মুখ খোলে দীপকের সমর্থনে, ক্ষিপ্ত পরিজনদের নিরস্ত করে—'এখানে গোলমাল নয়, ও ঠিকই করেছে/অধিকার বোধে ঠিকই চুম্বন করেছে/.....ওকে শক্ত চেনা, শিকড় কীভাবে বুঝবে/উচ্চ বৃক্ষচূড় ?...../আজ একাকী হলো/ও আর মৃন্ময়ী ছিল প্রকৃত দুজন/মনে মনে।' এরপর চলচ্চিত্র বা নাটকের 'flash back' -এর ঢঙে শক্তি সংক্ষেপে আভাসিত করেন দিব্য-মৃন্ময়ীর সংসারে দীপকের আসা-যাওয়া ও অবসর যাপনের একটি খণ্ডচিত্র। অতীত থেকে নাট্যকাহিনী বর্তমানে ফিরে এলে আমরা দিব্য ও দীপককে মৃন্ময়ীর স্মৃতিভার চিহ্নিত শূন্য সংসারের বেদনার আবহে আরো কিছুটা নিবিড়ভাবে দেখি। মৃত্যুর পরে মৃন্ময়ী ছড়িয়ে আছে সর্বত্র ; দিব্য দগ্ধ হয়, মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি ও স্মারকসমূহ তাকে পোড়ায়। তবু সে এক ব্যক্তিগত, অন্তর্লীন দহনপর্বে পুড়তে থাকে ; মৃন্ময়ীকে হারানোর বেদনা সে অন্য কারোর সঙ্গে ভাগ করতে চায় না। দীপক একবার তাকে প্রশমিত করতে বলেছিল—'দিব্য, কেন নিজেকে জ্বালাবে?' দিব্যর উত্তর ছিল সহজ কিন্তু ব্যঞ্জনাগর্ভ—'জ্বলতে দাও, জ্বলছে মৃন্ময়ী'। মৃন্ময়ী হঠাৎ চলে গেলেও 'দাগ রয়ে গেছে' ; সেই দাগ দেখে যন্ত্রণায় নিজেকে গুটিয়ে রাখে দিব্য। পুড়ে খাক হয়। যখন বেঁচে ছিলো মৃন্ময়ী তখন কি দিব্য তাকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি? সেই কারণেই কি সে বলছে—'পাপক্ষালন হোক, যদি হয়, অন্যথা করো না'? মৃন্ময়ী ছিল এমন এক নারী যার ছিল সানন্দ ও সৌন্দর্যময় সংসারের অফুরন্ত বাসনা। সে একা থাকতে চাইতো না ('একা কোনো কিছু আমার লাগে না/ভালি') ; অথচ সবকিছু ফেলে রেখে চলে গেলো সে একাই—'বড় বেশি বাঁচতে চেয়েছিলো বলে/চলে যেতে হলো। যেতে এ ভাবেই হয়/চাও বা না চাও/একা গেলো, দোসর নিল না।' দিব্যর এই স্বগত উচ্চারণ, মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় শূন্যতার উপলব্ধিতে শেষ হয় শক্তির কাব্যনাটকটি। *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো*-র নাম-কবিতায় যে কবি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিলেন 'একাকী যাব না অসময়ে', তাঁর সৃষ্ট চরিত্র দিব্য অসময়ে এই অনিবার্য, নিঃসঙ্গ যাত্রাকে জীবনের সত্য বলে মেনে নেয়।

চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মঞ্চনির্দেশ, নাট্য-পরিস্থিতির বাস্তবতা, গল্পের পূর্ণতর বিন্যাসে দ্বিতীয় কাব্যনাটক **বাইশ বছর পরে** বিশেষ আকর্ষণীয়। এই কাব্যনাটকে আছে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়ানো দুই নারী-পুরুষ, সুতপা ও বিশ্বজিতের 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো'র গল্প। বাইশ

বছর আগে তাদের দুজনের যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিলো এখন তা সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এক ধূসর স্মৃতি। নাটকের শুরু হয় সুতপার ভাই অমিতাভ বিশ্বজিতের আপিসে কোনো এক কর্মব্যস্ত বিকেলে উপস্থিত হলে। অমিতাভ আসায় বিশ্বজিতের বাল্যস্মৃতি, 'কিশোর বেলার প্রেমের' স্মৃতি জাগ্রত হয়। বিশ্বজিৎ 'বাড়ির খবর' জানতে চাইলে অমিতাভ জনান্তিকে বিশ্বজিতের কৌতুহলের মূল বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়—'এখনো ভোলোনি?/বাড়ির খবর মানে, জানতে চাও, সুতপা কেমন?/কী যে লাভ শুনে, ভাল আছে!/ভালই থাকবার জন্য জন্মেছিল।—/ তাই ভাল আছে, এ কথা যাবে না বলা।/খুব ব্যথা পাবে।/কিশোর বেলার প্রেম খুবই ব্যথা পাবে।' পূর্বতন প্রেমিকা ভাল আছে জানলে কেন কষ্ট পাবে বিশ্বজিৎ? হয়তো পাবে এই ভেবে যে তাকে ছাড়াও সুতপা ভাল থাকতে পারে। দু-এক দিনের জন্যে এসেছে সুতপা, যদি বিশ্বজিৎ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বিশ্বজিৎ-সুতপার দেখা হলো বাইশ বছরের সময়-ব্যবধান পেরিয়ে। বিশ্বজিৎ একজন কবি ; মদ্যপানের টেবিলে বসে স্বাস্থ্যপানরত কবি বিশ্বজিৎকে শক্তিরই প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। অমিতাভর স্ত্রী অনীতা কবি বিশ্বজিতের অনুরাগী! সশরীরে কবিকে দেখে সে অস্থির ও রোমাঞ্চিত হয়। অমিতাভ অনীতার সঙ্গে বিশ্বজিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে—'তোমার লেখার ভক্ত হনুমতীও-ও একজন।/দ্যাখো সশরীরে আজ তোমার সম্মুখে—দেবী, পদ্য হচ্ছে.........?' শক্তি হঠাৎ এমন সব পংক্তি রচনা করতে পারেন বিষয় তথা প্রেক্ষিতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যেগুলি অনুরণিত হতে থাকে। 'দেবী, পদ্য হচ্ছে?' তেমনি এক আশ্চর্য পংক্তি। বাইশ বছর আগে বিশ্বজিতের প্রেমের খাঁচায় ধরা না দিয়ে ভুল করেছিল সুতপা, এমন এক উপলব্ধির কথা সে বলে—'বিশ্ব, মনে করো পাখি ভুল করেছিলো/ সেদিন খাঁচাটি ছেড়ে।/বিশ্বস্ত বাসার সমাদর ছেড়ে পাখি/ভুল করে বনে...গিয়েছিলো।' বিশ্বজিৎ সংযতভাবে সুতপার কথার উত্তরে 'বিষণ্ণ, স্মারক সেই সময়'কে জাগানোর ব্যাপারে নিরাসক্তি দেখায়। তার কৈশোরের প্রেমিকা, এখন পরস্ত্রী, সুতপার স্মৃতিরোমন্থন ও অশ্রুপাত দেখে বিশ্বজিৎ ; এখন তার কিছু করণীয় নেই। সে শুধু এই অকস্মাৎ সাক্ষাতের ভাল লাগার অনুভূতি সম্বল করে রাখতে চায়। সে সুতপাকে আশ্বস্ত করে এক পরিণত জীবনবোধের প্রত্যয়ে—'যা কিছু এসেছি ফেলে/ তার জন্যে ভারি কষ্ট হয়/—কিন্তু যা পেয়েছো, তা তো কম নয় সুতপা, কখনো/আক্ষেপ করো না,/তাতে কষ্ট বাড়ে।/আক্ষেপবিহীন বাঁচা প্রকৃতই বড়ো/সব কিছু চেয়ে পেলে/ কোনো লাভ নেই। না-পাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে দিগ্বিদিকে যাবে/জীবনের ধর্ম এই'। অনেকটা রবার্ট ব্রাউনিং-এর বিখ্যাত নাটকীয় একোক্তি *দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার*-এর প্রেমে প্রত্যাখ্যাত যুবকটির মতো বিশ্বজিৎ ; দুঃখ বা ক্ষোভকে বিশেষ আমল না দিয়ে সে স্মৃতিভারাতুর ও অশ্রুসজল সুতপাকে শোনায় অনিঃশেষ ভালবাসার অঙ্গীকার—'এলে দেখা হবে, যদি ডাকো/চিতা থেকে উঠে আসবো/যদি তুমি ডাকো।' সহনশীলতা ও মৃত্যুহীন ভালবাসার এই আশ্বাস চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি-স্মৃতিমেদুরতাকে অতিক্রম করে যাওয়া বিশ্বজিতের যন্ত্রণার ভরকেন্দ্র।

এই কাব্যনাটকে গল্পের বীজ বা কাহিনীসূত্র অনেকটাই উদ্‌গত। কাহিনীসূত্রের আভাসে দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভ্যন্তর আলোকিত। বিশ্বজিৎ ও সুতপার মানসিক সঙ্কট-পীড়ন উদ্ভাসিত হয়েছে কবিতার আবেগময় বিশ্লেষণে। বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত নাট্যনির্দেশনার অংশগুলিতে দৃশ্যরূপের কিছু প্রয়োগ মূলত শ্রুতিনির্ভর কাব্যনাটককে কিঞ্চিৎ দৃশ্য বাস্তবতা দিয়েছে। নাট্যদ্বন্দ্ব এখানেও তেমন তীব্র নয় ; কবিতা এখানেও চরিত্র ও পরিস্থিতির অন্দরমহলে ঢোকবার একমাত্র উপায়। 'জনান্তিক' বা 'aside'-এর ব্যবহার নাট্য-আঙ্গিকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তী রচনা **একাকী** নিরুপম ও তপতীর প্রেম, তপতীর অন্য এক পুরুষে আসক্তি এবং ফলশ্রুতিতে প্রত্যাখ্যাত নিরুপমের অস্তিত্ব বিলোপের এক বিষাদান্ত ত্রিভুজ কাহিনী। নাট্যদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত এ নাটকেও তেমন নেই। একে বরং সংলাপ কবিতা বলাই সঙ্গত। যে নির্জন কবরখানায় দেখা ও কথা হতো নিরুপম ও তপতীর সেই 'মৃতের ময়দান'-এর এক সজীব ও সুন্দর চিত্রাঙ্কন দিয়ে কবিতার শুরু : 'দেবদারুবীথির ছল ভেঙেছে উইলো ও সিলভার ওক।/ঝাউ ইতস্তত, আছে নানান ক্রোটন, নেবুঘাস...../মাঝখানে পথ গেছে দুপাশের কবর সাজিয়ে/ দেয়াল পর্যন্ত, মানে আধমাইল নিস্তব্ধ দুপুর।/রঙিন ঝিঁঝি ও প্রজাপতি বসে ফুলে ও পাতায়/দুরন্ত, পাখায় করে ব্যতিব্যস্ত মৃতের ময়দান।' জীবন-মৃত্যুর এমন যুগলবন্দীর প্রেক্ষিতেই তপতী-নিরুপমের বাক্যবিনিময় শোনা যায় স্বরভঙ্গি ও প্রসঙ্গের বৈপরীত্যে—

'—তপতী, ঘাসের বীজ থেকে ঘাস গজাতে দেখেছো?

—ছত্তিরিশ নম্বর বাসে কী প্রচণ্ড ভিড় ছিলো কাল!'

একেবারে কথ্যরীতির বাক্‌ছন্দনির্ভর সংলাপ ; দুটি মানুষ-মানুষীর ঘরোয়া অভিজ্ঞতার কথা। এভাবেই গড়ে ওঠে গল্পের ছক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই কাহিনীর নিরুপম শক্তির আত্মজৈবনিক আখ্যান *কুয়োতলা*-র বালক নিরুপমেরই সাবালক ও শহুরে প্রতিরূপ, যার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিলেখায় শক্তির আত্মপ্রক্ষেপ চোখে পড়ে। শক্তির প্রেমের কবিতা ও নিরুপমের কাহিনীতে যেমন নারীদেহের রোমাঞ্চ ও যৌনতার নানা চিত্রকল্প পাই তেমনি এ কাব্যনাটকেও রয়েছে চুম্বন ও স্পর্শের গোপন ও তাপিত স্মৃতি। দৃশ্য-প্রতিমার চমকপ্রদ ইন্দ্রিয়ঘনত্বে নিরুপমের স্মৃতিতে চিত্রিত হয় আকাঙ্ক্ষিত নারীর স্তন ও স্তনবৃন্তের ছবি—'বাগানের জ্যোৎস্না আসে গুটি গুটি গোসাপের মতো/ঘরে, বামপ্রান্তে দুটি সর্বনাশা মোমের নরম/বল, মেটে খয়েরের এক পোঁচড়া কে তাতে লাগাল?'

নির্জন কবরখানায়, মাইকেল-মূর্তির অদূরে, তপতীকে বসিয়ে রেখে দেশলাই আর তপতীর আব্দার মতো বাদাম ও ঝালনুন কিনে আনতে যায় নিরুপম। ফিরে আসতে একটু দেরি হয়ে যায় তার এবং সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে যখন বকুল-গুঁড়ির আড়াল থেকে সে তপতীকে দেখে ঠিক তার মতো এক 'অতি নিরুপম'এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। তপতী আর 'অতি-নিরুপম' কবরখানা ছেড়ে চলে গেলে নিরুপম ভাবে অস্তিত্ব বিলোপের কথা। শেষ পংক্তিগুলিতে প্রত্যাখ্যাত নিরুপমের অস্তিত্ব বিলোপের বাসনা বাস্তবায়িত হয়—'দ্যাখে ডালাখোলা সামনের কবরখানি/ অন্যথা করে না, সোজা ঢুকে যায়—/ঝাঁপ বন্ধ করে,/একাকী, ভূ-মধ্য থেকে,/শিয়রে বাদাম, ঝালনুন।' জীবনকে অগ্রাহ্য করে যে নিরুপম আত্মবিলোপের পথ বেছে নেয় সে কিন্তু মাথার কাছে রেখে যায় জীবনের পথ্য, বাদাম ও ঝালনুন।

স্বীকারোক্তি কাব্যনাটকের বিষয়ও ত্রিকোণ প্রেম এবং তজ্জনিত মানসিক সঙ্কট তথা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। হেমেন্দ্র, তার বন্ধু অতীন্দ্র ও অতীন্দ্রের স্ত্রী মনীষা এই নাটকের তিন প্রধান চরিত্র। এছাড়া রয়েছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জনৈক মধ্যবয়সী ডাক্তার যিনি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর আতুরাশ্রমটি চালান। আর উল্লেখ করা হয়েছে হিমঘ্ন নামে মনীষার এক পূর্বতন প্রেমিকের যার বিয়ারের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল অতীন্দ্র। হিমঘ্ন তাই এক ধরনের অনুপস্থিত চরিত্র বা 'absentee character'.

শক্তির সব কাব্যনাটকগুলিই মূলত শ্রুতিনাটক, দৃশ্যরূপের স্পষ্টতা বা কাহিনীবিন্যাসের নাটকীয় দ্রুত গতি সেভাবে নজরে আসে না ; মনে হয় শক্তি এই রচনাগুলির বাচিক অভিনয়ের দিকটিই ভেবেছিলেন। তবু **স্বীকারোক্তি** নাটকের প্রারম্ভিক অংশে ডাক্তারের আতুরাশ্রমের চেহারাটি দৃশ্য ও শ্রুতি নির্ভর বর্ণনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর সংলাপের যে বিন্যাস পাওয়া যায় তাতেও প্রতিটি চরিত্রের জন্যে নির্দিষ্ট অংশগুলি সু-চিহ্নিত। মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে পাত্র-পাত্রীদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মঞ্চসজ্জা, আলো ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় এই নাটকে নাটকের বাহ্য আঙ্গিক অনেক স্পষ্ট।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে বন্ধু অতীন্দ্রকে নিয়ে এসেছে হেমেন্দ্র ; সঙ্গে মনীষা। হেমেন্দ্রর প্রতি মনীষার আসক্তি এবং তাদের দৈহিক সম্পর্ক অতীন্দ্রর মানসিক অসুস্থতার কারণ। স্ত্রী মনীষা ও বন্ধু হেমেন্দ্র, তার বিশ্বাসের দুই ভিত্তিভূমিই এভাবে প্লাবিত হওয়ায় এক রাতে দু'বার আত্মহননের চেষ্টা করেছিল অতীন্দ্র। এখন অতীন্দ্র মৌন, আর্ত ; চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে শক্তি অতীন্দ্রর ছবি আঁকেন—'অতীন্দ্র সম্মতি দেয়, মাথা নেড়ে, বাক্স্ফূর্তি নয়।/ কাছে দূরে চেয়ে আছে অত্যন্ত একাকী/নিভন্ত লণ্ঠন যেন, খসে পড়া বকুলের ফুলের মতন/অসহায় ছন্নছাড়া।' ডাক্তার অতীন্দ্রকে নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলতে চলে গেলে, মনীষা হেমেন্দ্রকে যা বলে তা থেকে আমরা অতীন্দ্রর মনোরোগ এবং এই নাটকের ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের রহস্য টের পেয়ে যাই—'বোধ করি জেনে গেছে, আন্দাজ করেছে/আত্মনির্বাসিত হতে এসেছে এখানে/এবং বলেছে, যদি হেম সঙ্গে যায়/তবে যাবো। নতুবা যাবো না/এতেও কি তুমি বলবে, অতী অত নিচে/নামাতে পারে না মন?/এ তো শুধু মন নয়, দেহও জড়িত— ।'

ডাক্তার অতীনকে পরীক্ষা করতে গিয়ে টের পান হেমেনের প্রতি মনীষার আকর্ষণকে কেন্দ্র করে অতীন-মনীষার দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা-সঙ্কট। অন্যদিকে ডাক্তার এসব গোপন কথা জেনে ফেলবেন ভেবে হেমেন ও মনীষা ভয় ও উৎকণ্ঠায় অস্থির। ডাক্তারের সঙ্গে তার কথোপকথন থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সন্দেহ-কাতরতা ও আত্মনিগ্রহের প্রবণতা অতীনের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অতীনের মনে রয়েছে এক গভীর ক্ষত ; সে মনীষাকে পেতে চেয়ে হিমঘ্নকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলো। সেবার হেমেন বাঁচিয়েছিলো অতীনকে, বাঁচিয়েছিলো হত্যার সাক্ষী মনীষাকে। এবার অতীন ডাক্তারের কাছে সব ফাঁস করে দিলে কি হবে? মনীষার কাতর প্রশ্নের উত্তরে হেমেন তাকে আশ্বস্ত করে—'কিছু একটা করতে হবে,/রণকুশলীর হাতে ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে!' মনীষার জন্য হেমেন বন্ধু অতীনকে বরাবরের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেবার ওষুধ তৈরি রেখেছে।

এ নাটক এখানেই শেষ, খানিক অসম্পূর্ণভাবে ; নাট্যদ্বন্দ্বের নিরসন হয় না, আখ্যানভাগ তার বাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছোয় না। তবে চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ, দৃশ্যপটের পরিবর্তন, অভিনয় ও আলোকসম্পাত বিষয়ক নির্দেশাবলী ইত্যাদি বিচার করলে বলা যায় যে, কাব্যনাটকগুলির মধ্যে **স্বীকারোক্তির** নাট্যগুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখের দাবি রাখে। প্রেমের ত্রিভুজ/চতুর্ভুজ নিয়ে লেখা শক্তির কাব্যনাটকগুলির মধ্যে **স্বীকারোক্তি** অবশ্যই ব্যতিক্রম। এ নাটকে মনীষার প্রেমিকপুরুষেরা পরস্পরের সঙ্গে মানসিক সংঘাতে অস্থির ; সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা তাদের কখনো হতাশ কখনো বা নির্মম করে তোলে। কাঙ্ক্ষিত নারীকে পাওয়ার পথ নিষ্কণ্টক করতে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। অতীন্দ্র ও হেমেন্দ্র তাদের বন্ধুত্বের থেকে বেশি তাড়িত

হয় প্রেমিকার প্রতি আসক্তিতে। বিশেষ করে হেমেন্দ্র তার জান্তব নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে স্বগতকথনে—'পকেটে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, মনিও দেখেছে/এখন নছোলা করছে।'

জন্মদিনের মঞ্চে সংলাপের ঢঙে বিবৃত এক কবিকাহিনী, মূলত আত্মপ্রক্ষেপময়। কবি ও তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা অনসূয়া এ নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রী। প্রথম ১৫টি পংক্তিতে কবির পঞ্চাশতম জন্মদিনের আলোকিত মঞ্চের একটি মিতভাষ্য সহজ কথ্যরীতিতে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তা কবির সম্বন্ধে বলতে উঠে কোনো এক নারীর কথা বলেন যে, 'যুবক কবির প্রেমাকাঙক্ষা ছিন্নভিন্ন' করেছিলো। বক্তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় 'জনৈকা'র। তিরিশ বছর আগেকার স্মৃতি রোমন্থন করে সেই নারী জানায় যে তার জন্যে কবি তাঁর জীবনযাপন তছনছ করলেও কখনো তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেন নি এবং সে কারণে কবির আত্মনিগ্রহের দায় তার ওপর বর্তায় না। এই কবি নিরুপম তাঁর অসংখ্য প্রেমের কবিতার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন অনসূয়াকে আর অনসূয়া প্রবল অনুরাগে পড়েছে ও শুনেছে কবির সেইসব কবিতা। আজ পঞ্চাশতম জন্মদিন উদ্‌যাপনের মঞ্চে উপস্থিত কবিকে অনসূয়া জানায়—'সত্যি কথা বলি নিরুপম/আমাকে চাওনি তুমি, কবিতায় আমাকে চেয়েছো/এ তো খুব শ্লাঘনীয় আমার নিকটে।' তাকে নিয়ে এতো লিখেছেন কবি ; অনসূয়ার এ এক দম্ভ, সুখ, পরম প্রাপ্তি। প্রত্যুত্তরে কবি তাঁর কিশোর-প্রেমের স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাব্যের সেই মেয়েটিকে দেখেন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ; অতীত ও বর্তমান যেন মিলেমিশে যায় কবির স্বীকারোক্তিতে। জন্মদিনের বাসরে তাঁর কবিতা শুনতে ও তাঁকে দেখতে আসা অনসূয়াকে কবি নিরুপম তাঁর মনের কথাটি বলেন—'....ভাবতে ভাল লাগে/এতোদিনে তুমি-আমি বিচিত্র মিলনে....../বিষণ্ণ জীবননাট্য মিলনান্ত হলো আজ......।' এ নাটকের সংলাপে আবেগময়তা ও কবিতার সৌন্দর্য যতো আছে, নাটকীয়তা ততো নেই। পাঠযোগ্যতা সম্পর্কে যতটা নিঃসংশয় হওয়া যায়, অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্কে ততটাই সংশয় থাকে।

আলোচ্য সঙ্কলনের শেষ কাব্যনাটক বা সংলাপাত্মক কবিতা **যাওয়া যায়?** আয়তনে সংক্ষিপ্ততম। এখানেও একটি নারী (অনুরাধা) ও দুই পুরুষের (সৌমিত্র ও অনুপ) ত্রিকোণ প্রেমকাহিনী। অনুরাধার স্বামী পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। মৃত্যুর পরেও সৌমিত্র অনুরাধার কাছে জীবন্ত সত্তা, জাগ্রত তার স্মৃতি। অনুরাধা ও অনুপের অন্তরঙ্গতার খবর রাখতো সৌমিত্র, কিন্তু ঈর্ষা বা বিদ্বেষে সে কখনো পীড়িত হয়নি ; বরং সে চেয়েছিলো তাদের অটুট বন্ধুত্ব। শক্তির কাব্যনাটকগুলির নায়ক/প্রেমিক পুরুষেরা বেশিরভাগই সহিষ্ণু ও উদারহৃদয়। সৌমিত্র ও অনুপ তার ব্যতিক্রম নয়। সৌমিত্রর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অনেক দেরিতে হলেও আসে অনুপ এবং অনুরাধার কথা শুনে বোঝে সৌমিত্রর স্মৃতি তাকে ঘিরে রেখেছে : 'এসো, দীর্ঘদিন পথ চেয়ে বসে আছি/ তোমার সময় হল এতোদিনে/আসার সময় হল এতোদিনে/কতোদিন গেছে, তাও জীবন্ত রেখেছি/দ্যাখো, মুখখানি দ্যাখো, দেখে তৃপ্তি পাও'। এসব কথায় বিস্মিত ও আহত বোধ করে অনুপ। প্রধানত তারই স্মৃতিমুখর স্বগতকথনে আমরা জানতে পারি সৌমিত্র কিভাবে অনুরাধা-অনুপের মনের মিল বজায় রাখতে চেয়েছিল ; তার দাবি ছিল অনুরাধার দেহে ; শুধু যদি অনুরাধা তাকে অসম্মান থেকে বাঁচায় তো সৌমিত্র তাদের দুজনকে নিয়েই সাংসারিক স্বর্গসুখ রচনায় রাজি ছিল। এখন সৌমিত্রর অকালমৃত্যু অনুপ ও অনুরাধার মধ্যে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান তৈরি করেছে। অনুরাধা এখন সপুত্র থাকে বিদেশে ; হয়ত অপেক্ষায় আছে অনুপের;

কিন্তু অনুপের মনে কাজ করে সূক্ষ্ম বিবেকদংশন—'সেদিনের পরে যেতে পারিনি এখনো/যাওয়া যায়?' এই প্রশ্নচিহ্নেই নাটকের সমাপ্তি। স্বল্পায়তন এই নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব দানা বাঁধবার সুযোগ নেই। অনুরাধার দেহ ও মনের দুই দাবিদার স্বামী সৌমিত্র ও দয়িত পুরুষ অনুপের চরিত্রগত বৈপরীত্য এখানে আখ্যানভাগের কেন্দ্রবিন্দু। সংলাপের অংশগুলি পৃথকভাবে চিহ্নিত ও যথাযথভাবে বণ্টিত হয়নি। সংলাপ, একোক্তি ও ভাষ্যের বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলি মিলেমিশে রয়েছে। অনুপের স্বগতভাষ্যে অতীতের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, 'ফ্ল্যাশব্যাকে'র কৌশলে। আগাগোড়াই নাটকে প্রেম ও আসক্তি তথা নারীর স্বভাব স্বরূপের উদ্ভাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে কবিতাই শক্তির অন্যান্য নাটকের মতো এ নাটকেরও প্রাণ ; পংক্তি বা তার অংশবিশেষকে পুনরাবৃত্ত করে, অন্ত্যাবৃত্তির প্রয়োগে, কবিতার মতো চিত্রকল্পমণ্ডিত ভাষায় এ নাটককে জীবন দিয়েছেন কবি।

জন্মদিনের মঞ্চে কাব্যনাটকে বিবৃত কবিকাহিনী কিছু পরিমার্জিত হয়ে ফিরে এসেছে **মনে রেখো** শীর্ষক নাটকটিতে [পদ্যসমগ্র (২)-এর অন্তর্ভুক্ত]। আত্মপ্রক্ষেপ, স্মৃতিমেদুরতা ও স্বীকারোক্তিমূলক প্রতিবেদন যদি শক্তির কাব্য-কবিতার প্রধান কয়েকটি লক্ষণ বলে মনে করি, তবে **মনে রেখো** একটি দৃষ্টান্ত। এ নাটকে কবিতাপাঠের মঞ্চে উপস্থিত চল্লিশোর্ধ্ব নীলাঞ্জন সেন শক্তির কথাই মনে পড়িয়ে দেয় ; সে 'অবনী বাড়ি আছো', 'আমি স্বেচ্ছাচারী' ইত্যাদি কয়েকটি বহুপঠিত 'পদ্য' পাঠ করে। নাটকের শুরুতে নীলাঞ্জন কবিতা পড়তে শুরু করে এবং একটি মেয়ে মঞ্চে উঠে আসে, অভিযোগ জানায় যে নীলাঞ্জনের কবিতা তার আগেকার গভীরতা ও রহস্যসৃজন ক্ষমতা হারিয়েছে। এই মেয়েটি নীলাঞ্জনের চাইবাসা পর্বের কবিতারচনার প্রেরণা ও বিভাব। **জন্মদিনের মঞ্চে**-র জনৈকা অনসূয়া এবং এই মেয়েটি চাইবাসা পর্বে শক্তির প্রিয় বান্ধবী শীলার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সমীর রায়চৌধুরীর কথায় 'এই শীলা শক্তির কবিতায় তার দ্বৈধ, দ্বন্দ্ব, মনোকষ্টের ভার হয়ে থেকে গেছে।'[৪৩] কবিতাপাঠ স্থগিত রেখে নীলাঞ্জন তার প্রিয় নারীটির সঙ্গে স্মৃতিচারণায় লিপ্ত হয় ; দর্শকাসন থেকে কবিতাপাঠের দাবি উঠতে থাকে ক্রমাগত। নীলাঞ্জন সে দাবি পূরণ করে। এই পর্যন্ত এ একাঙ্কিকার প্রথম দৃশ্য। এরপর দৃশ্যান্তর হলে আমরা বেশ কিছু বছর আগেকার নীলাঞ্জনকে দেখি তার প্রেমিকার সঙ্গে ত্রিকোণ সম্পর্কের জটিলতা প্রসঙ্গে বোঝাপড়া করতে। জনৈক দেবাংশুকে নিয়ে তাদের টানাপোড়েন, মনোবেদনা। নাটকের এই দ্বিতীয় দৃশ্যে চলচ্চিত্রের 'ফ্ল্যাশব্যাক' আঙ্গিকে শক্তি ফ্যানটাসির ছোঁয়া এনেছেন নাট্যকাহিনীতে। দৃশ্যটি শেষ হয় যখন প্রথম নীলাঞ্জন তার স্বগতকথন থেকে চলে যায় কবরখানার ডালাখোলা শবাধারে, **একাকী** কাব্যনাটকের প্রত্যাখ্যাত, বিরহী নায়ক নিরুপমের মতো। দুটি দৃশ্যে বিন্যস্ত **মনে রেখো** নাটকটিতে মঞ্চসজ্জার বিবরণ, আবহসঙ্গীতের ব্যবহার, স্বগতোক্তির প্রয়োগ, পর্দার ওঠা-নামা ইত্যাদি বিচার করলে মনে হয় কাব্যনাটকের বিষয়গত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নাট্য প্রকরণের দিকটি এখানে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানত শ্রুতিনাটকের লক্ষণযুক্ত হলেও পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় এই কাব্যনাটকের মঞ্চে উপস্থাপনযোগ্যতা বেশি।

শক্তির কবিজীবনের শেষদিকে প্রকাশিত *জঙ্গল বিষাদে আছে* গ্রন্থে সঙ্কলিত **কিছুক্ষণ** কাব্যনাটকের আর একটি নমুনা। শক্তির প্রধান সব গদ্য-পদ্য রচনার মতো এখানেও কবির ব্যক্তিজীবন নাটকের বিষয় ও সংলাপে বিজড়িত। এ নাটকের গল্প মহীন ও সীমা নামে এক

দম্পতির। তাদের একটি মেয়ে তিতির, যে নামের আড়ালে শক্তির মেয়ের (তিতি) নামটি লুকিয়ে আছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার মহীন, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব যার কাছে দায়, শৃঙ্খলা এক অসহ্য শৃঙ্খল। সীমা এক সাধারণ নারী, স্বামী-কন্যা নিয়ে 'সংক্ষিপ্ত সংসার'-এর আকাঙ্ক্ষা যার ভেঙে দিয়েছে অস্থির, বেপরোয়া মহীন। সীমা চলে গেছে মহীনকে ছেড়ে তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। শক্তি চট্টোপাধায়ের পারিবারিক জীবন, শক্তি-মীনাক্ষী-তিতি'র বাসাবদলের গার্হস্থ্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, এ নাটক তাদের কাছে প্রায় সর্বাংশে আত্মজৈবনিক। নাটকের শুরুতে রয়েছে মহীনের বিষাদ ও শূন্যতাবোধের বার্তাবহ একটি চতুর্দশপদী, ঘরের সীমা ছাড়িয়ে সীমার চলে যাওয়ার কারণে এক স্বগতভাষ্য। এরপর ভৃত্য প্রতাপকে চায়ের ফরমাশ করে মহীন যখন তার সীমা-হীন সংসারের একাকিত্বে শ্বাসরোধকারী শূন্যতাকে অনুভব করতে থাকে, তখনই অকস্মাৎ হাজির হয় পুরনো বন্ধু প্রবাসী দীপঙ্কর যে বিদেশিনী স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে বেড়াতে এসেছে। এই দীপঙ্করই মহীনকে নিয়ে যায় তার বাড়িতে ; সীমা ও মহীনকে ডাকে; সীমা ও তিতিরকে ফিরিয়ে আনতে চায় মহীনের শূন্য সংসারে। স্বল্পায়তন এ নাটক শেষ হয় কিছুটা অসমাপ্ত অবস্থায় ; সম্ভাব্য মিলনান্ত পরিণতির কোনো নিশ্চয়াত্মক সঙ্কেত ছাড়াই। আগেকার কাব্যনাটকগুলির মতো কবিতাই এখানে মুখ্য ; নাটকের দ্বন্দ্ব বা উৎকণ্ঠা তেমন নেই। কবিতার যথার্থ আশ্রয়েই এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহীন রচনার ভরকেন্দ্রটি চিহ্নিত করে দেয়—'আসলে, শৃঙ্খলে আমি বড় ব্যথা পাই/প্রতিদিন একই বাড়ি আমাকে টানে না/একই পথে ফিরবো কেন আমি দৈনিক অভ্যাসে?/অথচ বিরুদ্ধ স্রোত ঘোরতর মারে/আমাকে বিক্ষত করে, ভূতগ্রস্ত করে/—এভাবে কি বাঁচা যায়?' মহীন নামটির সঙ্গে যেমন জীবনানন্দের কবিতার অনুষঙ্গ মনে আসে, তেমনি অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতার বাইরে এক বিপন্নতার আবর্তে যেন শক্তির মহীনকে আবিষ্কার করি আমরা। স্বগতকথন ও সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে শক্তি এখানে বেশ কিছু আবহধ্বনি প্রয়োগ করেছেন, যেমন কাক ও পায়রা'র ডাক, শিশিবোতল কাগজঅলার হাঁক, বাসনকোসনের আওয়াজ, গাড়ি/বাসের হর্ন ইত্যাদি, যাতে করে শ্রুতিনাটকের একটি বাস্তব আবহ আভাসিত হতে পারে।

নানা মাপের ও নানা রীতির লিরিকে শক্তির অনায়াস দক্ষতার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, শোক কবিতা 'এলেজি'র বেদনাবিধুর লাবণ্যে শক্তির কবিপ্রতিভা সর্বদাই খুঁজে পেয়েছে গভীর স্মরণীয় উচ্চারণ। 'মৃত্যুময় বেঁচে থাকা'র স্মারক অভিজ্ঞতা-অনুভব ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতায়। শুধু নিজের মৃত্যু নয়, তাঁর পারিপার্শ্বিকের মৃত্যু নিয়েও শক্তির ভাবনা ছিল প্রবল। মৃত্যু-প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে এবং এ ব্যাপারে সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদারের অভিমত যথার্থ যে 'প্রয়াত শ্রদ্ধেয় প্রিয়জনের উদ্দেশে এত বেশি এলিজি আর কোনও বর্তমান সময়ের কবি লেখেন নি।'[৪৪] ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে সমীর সেনগুপ্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল শক্তির চুয়াল্লিশটি এলেজির একটি সংগ্রহ। কবিতার নীচে প্রদত্ত রচনাকালের হিসেবে প্রথম এলেজিটি ১৯৫৮ (আনুমানিক)-তে ও শেষটি ১৯৯২-এ লেখা হয়েছিল। তাঁর বাল্যকালে প্রয়াত পিতা বামানাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে কবি জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে বেদনা ও শ্লেষের মিশ্রণে এক স্মরণীয় এলেজি লিখেছিলেন শক্তি **সুখে থেকো, পিতরৌ!** মৃত পিতার উদ্দেশে উচ্চারিত এই সন্তপ্ত উচ্চারণে ব্যক্তিগত আবেগ বিহ্বলতা কিছু নেই ; আছে সন্তানের শিকড় অন্বেষণের পালা, পিতৃস্মৃতিচারণের সুযোগে। যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার

আগেই মাতৃগর্ভে অবসিত হয়েছিলো তাকে নিয়ে লিখেছিলেন এক অসামান্য শোককবিতা 'নষ্টজাত সন্তানের জন্য'। এছাড়া আত্মীয়-বন্ধু, অগ্রজ ও সমসাময়িক কবি-লেখক-শিল্পীদের স্মৃতিতে অবিরাম 'এলেজি' রচনা করেছেন শক্তি। এ প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, আমীর খাঁ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখের স্মৃতিতে রচিত কবিতাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এলেজিতে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু ও তজ্জনিত বিদায়বেদনা এক গভীর ও সামগ্রিক স্মৃতিভারাতুর শূন্যতার আন্তরিক উচ্চারণে পরিণত হয়। শোকাবেগের আর্দ্রতা বা আতিশয্য নয়, বিষাদের গুঢ় লাবণ্যে কবিতা ব্যক্তিগত সন্তাপের সীমা অতিক্রম করে পৌঁছে যায় ট্র্যাজিক উপলব্ধির স্তরে :

(১) এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে/বালিশের ঝালরের ওপর তোমার হলুদ চুলের রাশি/লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো/....তুমি একটি মাত্র ডুব-সাঁতারের দীর্ঘ নিশ্বাসে পার হলে অকূল জল/জীবনের বেদনা মরণের বেদনার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হলো।.../তোমার কবিতার ভিতরে, অমানুষিক পরিশ্রম ছিল/অথচ লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে... [**স্মরণিকা (কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতি)**, *হেমন্তের অরণ্যে....*]

(২) আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে যেতে পারোনি তুমি এখনো/এখনো তুমি বুকে জারুল, মুখে চন্দনে-ফুলে রয়েছো ঢাকা/আগুনের ছুরি স্পর্শ করছে তোমার পিঠ/ তোমার লাগছে/ শ্মশানের কোনো দরজা নেই—তাহলে বন্ধ করে দিতুম/..... চারিদিক দিয়ে আগুন ঢুকে পড়েছে/ ভেলা তোমার সেই আগুনে ভেসে যেতে চায়.........।

[**ঐ যে তিনি : সতীনাথ ভাদুড়ী স্মরণে** ; *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*]

(৩) বৃক্ষের দীর্ঘতা বন ছেড়ে চলে গেলো/পাথর রইলো পড়ে, গুল্ম গাছ কিছু/....প্রকৃত কি ছেড়ে গেলো, জড়িয়ে থাকলো না/তাঁর দীর্ঘ নাদময় মর্মান্তিক স্বর/ভুবন ছাড়িয়ে ঐ আকাশ অবধি—/ধন্য মানুষের বোধে, হৃদয়ে, মেধায়/তীব্র বিদ্যুতের মতো মেঘের ভিতরে/তুলার ভিতরে অগ্নি জ্বলে......এইভাবে।

[**বৃক্ষের দীর্ঘতা (শ্রদ্ধেয় আমীর খাঁ সাহেবের স্মৃতির প্রতি)** *জ্বলন্ত রুমাল*]

(৪) তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি, ছায়া পেতো, স্বচ্ছলতা পেতো/.... নষ্ট ফল, ভিতরে গভীর কীট—মানুষের সকল হৃদয়ে ছোটো ও সংক্ষিপ্ত দুঃখ/ কিন্তু তুমি, প্রান্তর যেমন সীমাহীন, পারহীন সমুদ্রের আলেখ্য যেমন/তেমনই অব্যর্থ...।

[**এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি**, *পাতাল থেকে ডাকছি*]

অগ্রজ বা সতীর্থ বন্ধুর মৃত্যুতে লেখা প্রথাগত শোককবিতা হিসেবে এইসব রচনাকে সেভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ব্যক্তিগত বেদনা, বিলাপ, ক্ষয়-ক্ষতি ছাপিয়ে কবিতা উত্তীর্ণ হয়েছে সামূহিক ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায়।

এলেজি রচনার ক্ষেত্রে শক্তি যেমন 'চতুর্দশপদী'র মত প্রিয় কাব্যরীতি ব্যবহার করেছেন, তেমনি কোথাও কোথাও কিছুটা বিস্তৃততর পরিসরে লিরিকের গীতিময়তাকে পূর্ণতর অভিব্যক্তি দিয়েছেন। **ঋত্বিক, তোমার জন্য** (*আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল*) এবং **দাঁড়াবার জায়গা** (*কক্সবাজারে সন্ধ্যা*), সনেটরীতিতে লেখা দুটি স্মরণ কবিতা। **প্রীতিভাজনেষু** (*অঙ্গুরী তোর*

হিরণ্যজল) এবং **উৎসবে** (*আমাকে জাগাও*) সনেটপ্রতিম দুটি রচনা। তুলনায় **এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** (*সোনার মাছি খুন করেছি*) এবং **তুমি আছো, সেইভাবে আছো** (*প্রচ্ছন্ন স্বদেশ*) কিছুটা বিস্তৃত পরিসরে বিধৃত।

ছোট ও মাঝারি মাপের লিরিকের স্বচ্ছন্দ ও স্মরণযোগ্য রূপনির্মাণে শক্তির জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হলেও কিছুটা আখ্যান তথা বিবরণধর্মী দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও সাফল্য কম নয়। হয়তো দীর্ঘকবিতা কেবলমাত্র বাহ্যরূপ বা আয়তনের বিস্তার দিয়ে বিশেষিত হতে পারে না ; তার ভাববস্তুরও যথার্থ বিস্তৃতি থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শক্তির দীর্ঘ কবিতা বলতে আমরা কেবল আয়তন ও গঠন বিন্যাসের বাহ্যরূপটিই বিচার করব, এমন মত সর্বসম্মত হবে না। হয়তো *পরশুরামের কুঠার* (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার শেষে শক্তি যা লিখেছিলেন তাই ঠিক— 'বস্তুত যে কোনো লেখকের পদ্যই দীর্ঘ কাব্য—তিনি লেখেন টুকরো টুকরো করে, এই মাত্র।' তবে এখানে মৌলিক বিতর্কসূত্রটি উহ্য রেখে কবিতার বাহ্য আকার ও আয়তনের নিরিখে শক্তির দীর্ঘ কবিতাগুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-য় দুটি কিঞ্চিৎ বড় মাপের রচনা সঙ্কলিত হয়েছিলো—**উৎক্ষিপ্ত কররেখা** এবং **বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে**। প্রথমটিতে মোট ৬৩ পংক্তি ; তাতে বিভিন্ন মাপের ২১টি খণ্ড। বিভিন্ন সময়ে লেখা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পদ্যাংশ জুড়ে একটি সমগ্রের কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছেন কবি এবং তাঁর নিজের পাদটীকায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে— 'পুরানো দিনে প্রণীত কখনো বা এদেরই পরিপূর্ণ দেহ ছিল।....নানা সময়ে নানা পদ্য শুরু করেছিলাম—এগোয়নি। লিখিত টুকরোগুলোর কয়েকটি তুলে দিয়ে নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ করেছি মাত্র।'[৪৫] **বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে** শীর্ষক কবিতাটির ১১০টি পংক্তি অসমভাবে বণ্টিত হয়েছে ১৫টি স্তবক বা খণ্ডে। *পদ্য-সমগ্র*-র সম্পাদক শ্রীসমীর সেনগুপ্ত এটিকেই 'শক্তির প্রথম গ্রন্থভুক্ত দীর্ঘকবিতা'[৪৬] বলে উল্লেখ করেছেন। একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে* শক্তির দীর্ঘ কবিতাগুলির মধ্যে দীর্ঘতম। বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্তর জলপাইগুড়ির কাঠের বাসাবাড়িতে ১৯৬৫-র শীতকালে কোনো একদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবিরাম লিখে ৬৩২ পংক্তির এই সুদীর্ঘ পদ্য-আখ্যান শেষ করেছিলেন শক্তি এবং সমীর সেনগুপ্তকে লেখা এক পত্রে অমিতাভ জানিয়েছেন যে 'গোটা লেখায় মার্জনা, কাটাকুটি বলতে প্রায় কিছুই'[৪৭] ছিল না। চর্যাপদ থেকে উদ্ধৃত একটি চার ও একটি এক পংক্তির টুকরো বাদ দিলে মোট ৮৮টি স্তবক রয়েছে এই কবিতায়। একটি দিনে একটানা ভূতগ্রস্তের মতো অনর্গল লিখে এত বড় একটি কবিতার সম্পূর্ণ রূপ দেওয়াকে অমিতাভ ওই পত্রে 'অলৌকিক' ও 'দুর্লভ সৃজন' বলে অভিহিত করেছেন। পর্যটনপ্রিয় কবির উত্তরবঙ্গ-ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ভ্রাম্যমাণতার কাঠামোয় নির্মিত এই দীর্ঘ কবিতার উপকরণ। পর্যটক-পর্যবেক্ষকের উত্তম পুরুষ বিবরণে দেখতে দেখতে পথচলার এক ইন্দ্রিয়ময়, স্মৃতিমেদুর ভাষ্য এই কবিতা।

এর পরেও শক্তি বেশ কিছু দীর্ঘ পর্যবেক্ষণধর্মী, আত্মপ্রক্ষেপময় স্বগতকথনমূলক ভাষ্য রচনা করেছেন, কখনো বা গদ্যরীতিতে, কথ্য ঢঙে। বিশেষত তাঁর জঙ্গল-পাহাড়ে অবিরাম ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে। শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা ও বিপর্যয় থেকেও জন্ম নিয়েছে দীর্ঘ আত্ম-উন্মোচন। বারবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, গার্হস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের সীমা

লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচরণের সংস্থান শক্তিকে দীর্ঘ কবিতার কাছে নিয়ে গেছে। স্বেচ্ছাচারী ও সতত সঞ্চরণ অভিলাষী শক্তির মেজাজেই ছিল দীর্ঘ সংস্থাপন; তাই কবিতার বিষয় ও রীতিতে তার প্রক্ষেপণ পড়েছে।

সোনার মাছি খুন করেছি-র **অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ, পুনর্বিবেচনা** এবং **পশ্চাদ্‌ভূমি** এই তিনটি কবিতাতেই শক্তির দীর্ঘ কবিতার বহু বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। পরিক্রমারত কবির স্মৃতিমধুর ধারাভাষ্যে বাস্তব ও কল্পনা মিলে মিশে গেছে। স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রাম্যমাণ কবি মানুষ ও প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন নিবিড় চিত্রকল্পে। *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতাও দীর্ঘ কবিতার লক্ষণযুক্ত—**কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ, এবার আসি** এবং **সমাধিফলকের স্মৃতি**। এদের মধ্যে প্রথমটি *তিনতরঙ্গ* নামক সংকলনে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো; এক অতীত স্বপ্নজগতে মানসভ্রমণের মগ্ন চিত্রমালা এই কবিতায় পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। **এবার আসি** একেবারে আটপৌরে কথ্য রীতির গদ্যে লেখা ন্যারেটিভধর্মী রচনা ; অনেকটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথ্য গদ্য চালে, গ্রাম্যতাগন্ধী শব্দ, বাগ্‌ধারা ও বাচনভঙ্গি অনুসরণে লিখিত, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের অভ্যাসবর্জিত। এখানেও ন্যারেটিভ বিন্যাসটি গড়ে উঠেছে পথ চলতে থাকা জনৈক যাত্রীর আবেগ-অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে। **সমাধিফলকের স্মৃতি** ১৩টি পদ্যাংশে বিভক্ত ১৪৫ পংক্তির কবিতা। ছন্দ ও অন্ত্যমিল বর্জিত হলেও এই কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্মৃতিমণ্ডিত রহস্যবিধুরতার এক চোরা স্রোত। মাঝে মাঝেই দুই বা ততোধিক পংক্তির শুরুতে বা শেষে শাব্দিক পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সমান্তরলতা সৃষ্টি করেছেন কবি। স্থান-কাল-পাত্রের বহুমাত্রিকতায় প্রয়াসী হয়েছেন স্মৃতিমেদুরতা ও রহস্যসৃজনে। গ্রাম্য পথিকের কথ্য চালে নয়, এখানে ভাবনা-ঋদ্ধ কবিমনের স্তরভেদ ধরা পড়েছে গূঢ়, উন্মোচক গদ্যে।

বিষয়ের বিস্তার, কাব্যবীজের সংস্থাপনা, আকার ও আঙ্গিকের গঠনসুষমা ইত্যাদির নিরিখে আমরা যদিও দীর্ঘ কবিতার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞার সন্ধান করে থাকি, তবুও অনেক সময় দু-চার স্তবকের একটি কবিতার মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে দীর্ঘ কবিতার আভাস বা প্রকৃতি। সেভাবে দেখলে শক্তির অনেক রচনাই দীর্ঘ কবিতার প্রকৃতি ও রূপের লক্ষণযুক্ত। *সোনার মাছি খুন করেছি*-র **যেতে যেতে,** *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*-র **আমরা সকলেই,** *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যের নামকবিতা ইত্যাদি অনেক অনতিদীর্ঘ কবিতার অন্তঃপুরে দীর্ঘ কবিতার ভাব ও আঙ্গিকের পর্যাপ্ত আয়োজন রয়েছে। শক্তির কবিতারচনার শুরু থেকেই দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। *তিনতরঙ্গ* নামক যৌথ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ, ১৩৭২) তিনটি দীর্ঘ কবিতা—**অতিদূর দেবদারুবীথি, আমাদের ঘর নাই—আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে** এবং **উটের মধুর আরব এসেছে কাছে**—পরে *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল। *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়* সংগ্রহে শক্তির প্রারম্ভিক পর্বে লেখা বেশ কয়েকটি দীর্ঘ রচনা নজরে পড়বে—**শিকার কাহিনী** (আদিরচনা ক), **ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা** (ডিসেম্বর, ১৯৬২), **পৃথিবীর শেষদিনে** (অক্টোবর, ১৯৬২) **চিত্র ও কবিতাপ্রদর্শনী** (সেপ্টেম্বর, ১৯৬২), **মৃত্যুদিনে-জন্মদিনে** (সেপ্টেম্বর, ১৯৬২) ইত্যাদি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন* শতাধিক খণ্ড কবিতার একটি সূত্রবদ্ধ পরিবেশন। বিভিন্ন আকার ও আয়তনের লিরিকগুচ্ছের এই বিন্যাসকে অবশ্য একটি দীর্ঘ কবিতা বলা যাবে না এবং এর কয়েকটি পদ্যাংশ

স্বতন্ত্র কবিতারূপে অন্য সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। এই সময়েই *সুখে আছি* কাব্যের **এই বাংলাদেশে ওড়ে......,** *ঈশ্বর থাকেন জলে*-র **বিদায়বেলা,** *অস্ত্রের গৌরবহীন একা* গ্রন্থের **প্রতিক্রিয়াশীল** প্রভৃতি রচনার কিছুটা বিস্তারধর্মী স্বগতভাষ্যে শক্তির কথা বলার অভ্যাসটি চিহ্নিত করা যায়। মনে হয়, দেশ, সমকাল, স্মৃতি ও চৈতন্যের সঙ্কট ও বিপন্নতার নানা আবেগ-অভিজ্ঞতা ভীড় করে আসছিল কবির মনে ; দীর্ঘ কবিতার খানিক ঢিলেঢালা ও বিস্তৃত পরিসরে কবি সে সবের আত্মপ্রক্ষেপময় ভাষ্য রচনা করেছেন। এইসব রচনা ততখানি কাহিনীমূলক নয়; তবে পথচলার অভিলাষ, সঞ্চরণশীল আঙ্গিক কবিতাগুলির আকার ও বিন্যাসে এক জায়মানতার মাত্রা যুক্ত করেছে :

(১) স্টেশন আমার বড়ো ভাল লাগে/পাখি ভালো লাগে/অবিরাম ময়না নয় অবিরাম কাকাতুয়া নয়/আমার সামান্য ঘুঘু পাখিটিকে বড়ো বেশ লাগে/....ঝুলনের মেলা দেখে সেবার ফিরছিলাম সাতজন, দুজন হারিয়ে গেল পথে পথে মাধবীলতায়/ছজন হারিয়ে গেল অতি পরিচিত ছয়জন/ছিটের জামার নাম ধরে আমি ডাকলাম অনেক/মুখচ্ছবি ধরে আমি ডাকলাম হাজার বছর (**বিদায়বেলা**)।

(২) বড়ো ভালো লাগে এই পৃথিবীর মূঢ়তার দ্যোতক ইস্কুলে/ছুটি-লেগে-থাকা ঘর, হাইবেঞ্চ, পেটা ঘণ্টাধ্বনি/বড়ো ভালো ভাঁটফুল, তীব্র গন্ধে বৃষ্টিতে মুখর/ভাঙা সাতমহাল ওই বড় মানুষ বোসবাবুদের/ঝিল, তার পানাফুল, আমলকি ও অর্বুদ বকুল/হাটের ধুলোয়/বড়ো ভালো সব ঐ যাতে হিম ন্যাপ্‌থল মাখানো। (**প্রতিক্রিয়াশীল**)।

শক্তির স্বভাবের এই সদা চলমানতার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কবিতার আকার ও ভঙ্গির বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। নাগরিক গার্হস্থ্যের স্থির চতুঃসীমা পেরিয়ে স্বেচ্ছাচারী ভবঘুরের মতো জীবনমায়াকে প্রত্যক্ষ করার অভীপ্সাই শক্তিকে বারবার দীর্ঘ কবিতার রূপরীতির কাছে নিয়ে গেছে :

'চলে যাচ্ছি/এক চোখ পিছনে, অন্য চোখ সামনে, গাছপালা/মুঠোভরা বৃষ্টিজল দুদিকে রাস্তার/....চলো, চলে যাই/এক চোখ পিছনে, অন্য চোখ সামনে/মাঠে নাড়া পুড়ছে/হাতাহাতি করছে/আগুন আর হাওয়া/ওদিকে চাওয়া/মানেই দুঃখ, মানে মৃত্যু/তার চেয়ে যে-চোখ ছুটছে, তাকে ধরো/সড়গড় চলচ্ছবি/কিছু-না-কিছু দেবেই....' (**চলে যাচ্ছি চলো**/*এই আমি যে পাথরে*)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত ও নীরদ মজুমদার চিত্রিত সুন্দর রহস্যময় নামক সংগ্রহে শক্তির তিনটি দীর্ঘ কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে—**ভয় আমার পিছু নিয়েছে, পাখি আর পোড়া পাতা** এবং **টিলার ওপর সেই বাড়িটির কথা**। প্রথমটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৭-এর মার্চ-এপ্রিলে যখন গুরুতর অসুস্থ শক্তি ছিলেন নীলরতন সরকার হাসপাতালের রোগশয্যায়।[৪৮] কবিতার শিরোনামেই স্পষ্ট সঙ্কেত আছে যে ভয়তাড়িত কবিমানসের স্বীকারোক্তিমূলক এই রচনা ; সঙ্কটের জটিলতায়, সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে কবি ক্রমাগত খনন করেছেন তাঁর মানসভূমির গূঢ় স্তরগুলি। জঙ্গল আর গাছ-পাথরের কথা, ভয় ও ভালোবাসায় ঘেরা মানুষের গার্হস্থ্যের কথা, হাসপাতালের ঘর আর তার জানলা দিয়ে দেখা শহরের ছবি, এসব কিছুকে অবলম্বন করে এ কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয় ভয়ঙ্কর ভয়ের অনুভব, জীবনের প্রতি প্রবল ভালবাসার সঙ্গে মৃত্যুবোধের এক বিপন্ন শিহরণ। কবিতার কোথাও কথা হয় নিজের সঙ্গে, আবার কোথাও বা কোনো এক নারী সামনে এসে দাঁড়ায় ; স্বগতভাষ্যের মাঝে সংলাপধর্মী একটি অংশে স্মৃতিবিধুরতা এক খণ্ড নাট্য-আবহ রচনা করে—

'—কিছু নেই, যা আছে তোমাকে দিলে কিছুই থাকবে না।
—কিছু দাও। খুদকুঁড়ো দাও। এতদিন বাদে এসে তোমার দরোজা থেকে এমনি ফিরে যাবো?
—ফিরে যাও। উচ্ছিষ্ট দেবো না। ফেরার অব্যেস আছে। আগেও ফিরেছো।'

পাখি আর পোড়া পাতা এই সঙ্কলনভুক্ত আর একটি রহস্যবিধুর, আবেগার্ত দীর্ঘ রচনা। গল্পের কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান আছে, আছে অরণ্যপ্রেমী কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভব ; রক্তমাখা, ব্লীচিং পাউডার-গন্ধ-মাখা তুলোর মধ্যে ভয় ও মৃত্যুর বোধ এবং তার পাশাপাশি ভালোবাসার পিছুটান। খোলা-ভাঙা ডিমের মতো চাঁদ, আলতাপাটি শিমলতা, কালো জলে দু-হাতে সাঁতার কাটা পর্তুগিজ চাঁদ, ঘুমন্ত শালুকফুল ইত্যাদি মিশে থাকে সেই পিছুটানে। ছ'টি অসম আয়তনের স্তবকে বিভক্ত এই কবিতায় রয়েছে সহজ গদ্যের ছাঁদে লেখা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পংক্তি ; কখনো চিত্ররূপমণ্ডিত, আবার কখনো বা বিবৃতিমূলক। এ কবিতাতেও নিজের ভিতর ও বাহির অনুসন্ধানের ফাঁকে সব কথা বলেন কোনো এক 'তুমি'-র উদ্দেশে ; হয়তো বা সে কবিরই এক ভিন্ন নাগরিক সত্তা, যাকে সরিয়ে রেখে কবি এসেছেন জঙ্গল-মহালের সুন্দর রহস্যময় অন্তঃপুরে। টিলার ওপরের এক অলৌকিক বাড়ি, চাইবাসায় সমীর রায়চৌধুরীদের বাড়ি, ছিলো শক্তির প্রিয় স্মৃতিগুলির অন্যতম। **টিলার ওপর সেই বাড়িটির কথা** শক্তির চাইবাসাপর্বের জীবনস্মৃতির এক আবেগমেদুর আলেখ্য।[৪৯] বন্ধু সমীর এ কবিতায় হয়েছেন অবিনাশ, যার উদ্দেশে এই স্মৃতিলেখা, যার সঙ্গে যৌবনযাপনের আশ্চর্য সব খুঁটিনাটি ভাগ করে নেওয়া। সমীরের টিলার বাড়ির সামনে নিমগাছ, পেছনে ইঁদারা, ছড়ানো-ছিটোনো ওঁরাওদের বস্তি, ভাঁটিখানা, লুপুংগুটুর ঝর্না, সারাণ্ডার পাহাড়-জঙ্গল, বোরো-নদী, থলকোবাদের বনবাংলো— এ সবই ভেসে উঠেছে শক্তির কবিতায়। চাইবাসার যৌবন-যাপনের ছোটখাটো সব গোপনীয়তার সুলুকসন্ধান চিত্রকল্পের স্বাভাবিক রহস্যময়তায় তুলে ধরেছেন শক্তি এই স্মৃতিভাষ্যে। তবে স্মৃতিতাড়িত এই আত্ম-উন্মোচন মোড় নিয়েছে কবিতার শেষাংশে, থলকোবাদের বনবাংলোয় কাটানো জ্যোৎস্নারাতের স্মৃতি যখন কবিকে সন্ত্রস্ত করে তাঁর অক্ষম, অপূর্ণ বার্ধক্যে :

'জীবনের সেই রাত শয়তানের মতো ক্ষিপ্র পিছু
নিয়েছে আমার.........
কিছুই করার নেই, অশক্ত অক্ষম
যৌবন আমার, আমি বৃদ্ধ, অগোছাল—
সংসার আমার নেই, উড়োপুড়ো মেঘ
আমার আকাশ জুড়ে শুধু খেলা করে......
টিলার উপরে সেই বাড়িটি দেখার
আজ বড়ো ইচ্ছা হয়........
শুনেছি, ভেঙেছে বাড়ি টিলার ওপরে
একদার সেই বাড়ি, জানো, অবিনাশ!'

স্মৃতিমেদুর, আত্মপ্রক্ষেপময় রোমান্টিক কবিতার মর্মস্থলে সর্বদাই রণিত হয়ে থাকে বিষাদের এক প্লুতস্বর। সেই অর্থে এলেজির আর্তি বেজেছে শক্তির এইসব দীর্ঘ কবিতার তন্ত্রীতে।

সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার গ্রন্থে ছ'টি কাব্যনাটকের সঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে পাঁচটি দীর্ঘ কবিতা। প্রেম, পর্যটন ও অরণ্যনিসর্গ শক্তির এই কবিতাগুলির মর্মবস্তু। স্মৃতিচারণ ও তার রোমাঞ্চ এবং পর্যটকের চলমানতা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ এইসব কবিতার আঙ্গিক। চিত্রকল্পের রহস্যময় লাবণ্য এই আঙ্গিকের পুষ্টি জুগিয়েছে অকৃপণভাবে। **আবার দোলের দিন, দু'দশক পরে** কবিতাটি দীর্ঘ দু দশকের ব্যবধানে বয়ঃসন্ধির এক একান্ত গোপনীয় স্মৃতির পুনর্নির্মাণ ; কোনো এক বসন্তোৎসবে চুম্বন ও শরীর-সান্নিধ্যের দেহপরবশ অভিজ্ঞতার আগ্নেয় মুহূর্তের স্বগতভাষ্য। গল্পের একটি বীজ অঙ্কুরোদ্‌গমের অপেক্ষায় থাকলেও শক্তি ঠিক গল্প বলায় তেমন আগ্রহী নন। চিত্রকল্পের পর্যাপ্ত আয়োজনে, প্রতীকী রহস্যসৃজনে শক্তি কবিতাকে নিয়ে যান প্রায় পরাবাস্তবতার জগতে— 'তামা ও ভরণে মেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে/.....আমাদের দুজনের দুটি হাত ধ'রে/আমাদের দুজনের চার হাত ধ'রে/ জ্যোৎস্নার ভিতরে টানে।/ সে-টান সমগ্রে এসে লাগে আর সমগ্রকে খায়/খসে যায় বাঁধা চুল, ডালে ফুল, খসে যায় পাতা/কী আনন্দে চোখ থেকে জল ঝরে আঠার মতন/কী আনন্দে বুক ভরে বৃষ্টি পড়ে আঠার মতন।' শব্দ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি করে, একটি পংক্তিকে (যেটি আলোচ্য কবিতার শিরোনাম) বিভিন্ন স্তবকের শুরুতে বা শেষে ধ্রুবপদের মতো ব্যবহার করে শক্তি এই দীর্ঘ সংস্থাপনের মধ্যে শ্রুতিসুখকর এক কাব্যময়তা সঞ্চার করে দেন। **সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার** কবির কিশোর বয়সের এক সুখস্মৃতির ছন্দোবদ্ধ কাব্যরূপ। একটি অণু-গল্পের মতো। প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অতীত স্মৃতি-বিন্দুটি ফিরে দেখা। অনুচ্চার স্বগতকথন ছন্দের দোলায় এক শান্ত বিষণ্ণতায় রমণীয় হয়ে উঠেছে। শহরের গার্হস্থ্য ও কর্মক্ষেত্র ফেলে রেখে শক্তি বারবার গেছেন জঙ্গলের আরণ্যক জীবনে। নির্জনতা, অন্ধকার ও বন্যতার গর্ভে গাছেদের সাহচর্যে এসে বারবার নাগরিক জীবনের শঠতা, নীচতা ও অপূর্ণতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন কবি। **ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে** অরণ্যচারী কবির সেই ভাবনা ও অভিজ্ঞতার স্পষ্ট বাণীরূপ। এই কবিতায় একটি স্থির ও স্বচ্ছ প্রতিপাদ্য বিষয় আছে এবং একটি সুগ্রথিত কাঠামো সেই বিষয়টিকে নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠা করেছে: 'মানুষ সুরক্ষা করে গুদোমে গোলায়/ধান চাল ও সুকীর্তি, ব্যাঙ্কে টাকাসিকি।/গাছের শিকড়ে শুধু মাটি লেগে থাকে,/ক্ষুরে ও থাবায় থাকে লেগে জলঘাস—/বাঘের মস্তিষ্কে কোনো হরিণীর স্মৃতি/আর কিছু নয়, ওরা চায় না মুনাফা/কেনা-বেচা নেই বলে ওদের বাজারে,/ দোকানে ভেজাল নেই খাদ্যাখাদ্যে কোনো/ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে./ঝর্নায় জঙ্গলে।' শক্তির জীবন ও সৃজনে যে সিংভূম বহু ভূ-কম্পনের ভরকেন্দ্র, সেই সিংভূমের অরণ্য-প্রকৃতি নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতা **এ সেই সিংভূম, যার জঙ্গলে পাহাড়ে**। এ কবিতাতেও সেই যাত্রার ধ্বনি; পাহাড় আর জঙ্গলের চড়াই-উৎরাই, নদী-ঝর্না-বৃক্ষ-লতাগুল্মের সান্নিধ্যে, মহুয়ার ঘোরে চলতে থাকা লুপুংগুটু আর রোরোর কোল ঘেঁষে। আর এই যাত্রাপথের বিবরণীর ফাঁকে ফাঁকে মানবজীবন বিষয়ক সহজ অথচ অসামান্য কিছু অনুভব—'চলি, আলুথালু পায়ে, যেভাবেই চলি/তাও যাওয়া/আমি এভাবেই যাই, গিয়ে থাকি, কোথাও পৌঁছাই। /সাধারণ্যে বলে বটে, যেখানে যাবার কথা সেখানে যাইনি—/জীবনে কি ঘটে না তা?/ যেরকমভাবে আছি, যেরকম থাকবো ভাবি—থাকা যায়?/ কেউ কি পেরেছে?' **জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন** এর আগেই *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ* গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল। এখানেও সেই ভ্রমণের অনুষঙ্গ, ডুয়ার্সের অরণ্যস্মৃতি। পর্যটন ও পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রিয়তম ব্যসন ; আলোচ্য কবিতাটিও জঙ্গল-পাহাড়ের নিসর্গ ও মানুষের

মধ্যে দিয়ে চলমানতার আঙ্গিকে রচিত। পথ চলার বিবরণ, এক নির্জন নিসর্গভূমির নিবিড় চিত্ররূপ এবং নিসর্গচিত্রের সূত্র ধরে মানুষ সম্পর্কে একান্ত আপন অনুভবময় কিছু পংক্তি— 'মানুষের ভয়ে সব পশুপাখি/অধিক অধিকতর জঙ্গলের দিকে সরে গেছে।/মানুষের সাধ্য নয় সে-গভীরে যাওয়া'। দীর্ঘ ভ্রমণ, জঙ্গল-পাহাড়ের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি, বন্ধু সঙ্গী বা সহযাত্রীর সাহচর্যের নানা অনুষঙ্গ, আত্ম-উন্মোচক ভাষ্যরচনার প্রবণতা ইত্যাদি শক্তিকে বারবার দীর্ঘ কবিতার কাছে নিয়ে গেছে। একেবারে শেষ পর্বের কাব্যসংকলনগুলিতেও বেশ কয়েকটি দীর্ঘ রচনা রয়েছে— **সেগুন মঞ্জরী থেকে শুধু বৃষ্টি পড়ে** (*এই তো মর্মর মূর্তি*), **জঙ্গল বিষাদে আছে** (ঐ), **কুয়াশায়** (ঐ), **আমি তো পাথর-তুমি জানো** (*ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে*), **বিজয়া দশমী বড় শারীরিক** (ঐ), **সাতান্ন বছর পরে** (*জঙ্গল বিষাদে আছে*)। এর মধ্যে **সেগুন মঞ্জরী থেকে শুধু বৃষ্টি পড়ে** কবিতাটির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে শক্তির দীর্ঘ কবিতার রীতি-প্রকরণগত কিছু ধারণা করা যেতে পারে :

(১) ১০৭ পংক্তির কবিতা ; ৫টি অসম আয়তনের স্তবকে বিভক্ত (১১ + ৪১ + ৩২ + ৭ + ১৬ পংক্তি)।

(২) হেসাডি ও সন্নিহিত অঞ্চলের অরণ্য ও উপজাতি মানুষের জীবন এবং শান্তিনিকেতন ও কলকাতার স্মৃতিচিত্র ও অনুভব এ কবিতায় বর্তমান ও অতীতের টানাপোড়েনে বিধৃত।

(৩) 'বৃষ্টি' শক্তির আরও অনেক কবিতার মতো এখানেও এক বিশেষ চিহ্ন এবং চিহ্ন শব্দটি (২৪বার ব্যবহৃত) পুনরাবৃত্ত হতে হতে কবিতায় ভাবনা ও আঙ্গিকের নিশ্চিত বয়নসূত্র।

(৪) পুনরুক্তি ও সমান্তরলতা এ কবিতার প্রধান প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য—পরপর দুই বা ততোধিক পংক্তির শুরুতে, শেষে ও মাঝখানে শব্দ বা শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তি, একটি পংক্তিকে পরপর বা সামান্য ব্যবধানে পুনঃপ্রয়োগ ইত্যাদি।

(৫) মাঝে মাঝে মাত্র ২টি শব্দের একেকটি বাক্য/পংক্তি।

(৬) কবিতার কেন্দ্রে একটি গল্পের আবছা আকর্ষণ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রূপরীতির ব্যবহার বিষয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করবো তাঁর গদ্যরীতিতে লেখা কিছু কবিতার নমুনা পরীক্ষা করে। শক্তি কবিতাকে বলতেন 'পদ্য', তাঁর ছন্দমনস্কতা ছিল সেই পদ্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ও শক্তি। তবু তিনি গদ্যভাষায়, কথ্যরীতিতে, মিলের ছন্দ বর্জন করে কবিতা লিখেছেন। কথ্য ভঙ্গি, গ্রাম্য তথা লৌকিক শব্দের প্রয়োগ, বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ওপর ঝোঁক আর তার সঙ্গে তীব্র হৃদয়াবেগ মিশিয়ে কবিতার উপযোগী এক চমৎকার শৈল্পিক গদ্য উপহার দিয়েছিলেন শক্তি *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যগ্রন্থের **যেতে যেতে** কবিতায় :

'যেতে যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হা হা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ।
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন?
সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি

পানাপুকুর, শ্যাওলা-দাম, হরিণমারির চর—
....যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই—'

সাধারণ কথ্যগদ্যের এই ভাষা ও আঙ্গিক কিন্তু তাৎক্ষণিক বাচিক গদ্যের থেকে স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। এ গদ্যের ভেতরে ছন্দের এক সূক্ষ্ম প্রবাহ আছে। গ্রাম্য শব্দ (ঠাট্টা-বট্‌কেরা, গাঁ-গেরাম), আটপৌরে শ্লেষ (একাদশ পংক্তি), ভাব ও অর্থ অনুসারে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ওপর ঝোঁক (র্তখনই চর্বুক, চিঁড় র্হা হা) ইত্যাদি এই ভাষাকে দিয়েছে শিল্প-সৌন্দর্য। একাদশ পংক্তির গ্রাম্যতাময় শ্লেষের পর 'যাত্রী তুমি' এই প্রায়-রাবীন্দ্রিক শব্দবন্ধ এবং তার পরে 'এই তো চাই'-এর মতো লঘুকথন কবিতাটিকে এক দোলাচলে চিহ্নিত করেছে।

১৯২২-এ প্রকাশিত *লিপিকা* থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর *পুনশ্চ* এবং তার পর একেবারে শেষ পর্বের অতীন্দ্রিয়বাদী বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন নিরূপিত ছন্দের কাব্যাঙ্গিকের পাশাপাশি। তিরিশের বাংলা কবিতায় সমর সেন, তাঁরও আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সমকালীনদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু গদ্যভাষায় কবিতাকে সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় গদ্যরীতিকে নিজস্ব মর্যাদায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র সহ আরও অনেকে। এই ধারাবাহিকতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যকবিতার ভাষা ও শৈলী পর্যালোচনা করা যেতে পারে। লৌকিক বাক্-রীতির অনুসরণ ও গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারে শক্তি অবশ্যই তাঁর পূর্বসুরিদের অনুগামী, বিশেষ করে তাঁর অব্যবহিত অগ্রজ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের—'সবাই বলতো পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও/চলো/পাচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে/মারের ডগায় সদাসর্বদাই এগিয়ে যেতে পারবে/চলো.... যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে/উড়ো চাল চুলো বাড়ি/ওই তো বদু বুড়োর ছিলো/আজ নেই?/না।/না-মানে কব্‌লা-কসরৎ দিগ্‌বিদিক করে/মাগ-ভাতারে বদু বুড়ো সাপটে খুইয়েছে সবই....' (**এবার আসি,** ***হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান***)। গোটা কবিতাতেই রয়েছে সহজ কথ্য ভঙ্গি, গ্রামীণ মানুষের মুখের শব্দ, বাগ্‌ধারা ও প্রবচন ; তবু প্রায়ই নজরে পড়বে পরপর পংক্তিতে অন্ত্যমিল, একটি পংক্তিতে শব্দে শব্দে মিলের ছোঁয়া, অর্থাৎ গদ্যের ভাষার ভেতরে পদ্যের রং। বাচিক গদ্যের বাস্তবতার আড়ালে কবিতার স্পন্দন মুছে যায় নি।

কবিতার গদ্যে শব্দনির্বাচন ও পদবিন্যাসের রীতি ঠিক কেমন হবে, গদ্যের অন্তরালে কাব্যময়তা কতখানি থাকবে কি থাকবে না, সে বিষয়ে কোনো বিধিনিয়ম থাকতে পারে না। প্রচলিত লৌকিক বা অশিষ্ট শব্দের আশ্রয়ে যেমন মৌখিক রীতির গদ্য হতে পারে, তেমনি আবার শিষ্ট, শোভন, উপলব্ধির দ্যুতিময় গদ্যও কবিতার পক্ষে খুবই উপযোগী। যেমন, ধরা যাক ***এই আমি যে পাথরে*** সঙ্কলনভুক্ত ***জঞ্জালে পাক হচ্ছে*** কবিতার এই পংক্তি—' নেমন্তন্ন বাড়ি খেয়ে আইঢাই করতে করতে মাগভাতারে পথ/পাড়ি দিচ্ছে, মোটরে'। এরই পাশাপাশি উদ্ধার করা যেতে পারে মার্জিত ও সংহত গদ্যভাষার উদাহরণ—'আত্মসম্মানবোধের পাখ্‌না আস্তিনের ভেতরে লুকিয়ে রাখাই ভাল' (**মাঝে মাঝেই সর্বনাশিনী সাপের কামড়,** ***সোনার মাছি***

খুন করেছি)। আবার কোথাও শহুরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুটা অমার্জিত উষ্মায় ফুটে উঠেছে, যদিও কথ্য গদ্যের পদান্বয়ে ঈষৎ কবিতার ছোঁয়া থাকছে ক্রিয়াপদটি বাক্যের মাঝে ও কর্তৃপদ শেষে চলে যাওয়ায়—'কংগ্রেস মেয়ের গাল চেটে যাচ্ছে কম্যুনিস্ট ছোঁড়া' (**ডেলফির মন্দিরে যাব,** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)। কখনো বা শক্তি তাঁর কবিতায় গদ্যরীতিতে লেখা পংক্তিগুলি দৃশ্যতই গদ্যের মতো সাজিয়ে দিয়েছেন পরপর অনুচ্ছেদে—'সে এক যৌবনের নদী, এমাঠ ওমাঠ ঘুরে পাহাড়তলির পথ বেয়ে গ্রাম ঘুরে তার শীর্ণশীতল রেখা স্পর্শ করে। সে নদী নারী হয়' (**দ্বিজ,** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)। তবু এ গদ্যের ভেতরেও শব্দের রহস্য ও চিত্রময়তায় কবিতার বীজ শ্বাস নেয়, ডানা মেলে।

বিবিধ বৈশিষ্ট্য

সমান্তরলতা

শব্দ, শব্দগুচ্ছ অথবা বাক্যের পুনরুক্তির মাধ্যমে আবেগ ও অনুভবের তীব্রতা তথা স্পন্দন পাঠকের কাছে বিশেষভাবে পৌঁছে দেওয়া কবিতার এক বিশিষ্ট প্রকরণ-কৌশল, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে যাকে 'সমান্তরলতা' বা 'parallelism' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কখনো বা লক্ষ্য করা যায় ধ্বনি (sound) অথবা দল (syllable)-এর পুনরুক্তি। একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অথবা একটি পুরো বাক্য পরপর পংক্তিতে হুবহু পুনরাবৃত্ত হতে পারে এবং সেই সমান্তরলতা হবে কিছুটা যান্ত্রিক। আবার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কিছু পরিবর্তিত হয়ে বা ঘুরে ফিরে পুনরুক্ত হতে পারে কবিতার ভাব বা কাঠামোটিকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে তুলে ধরতে। এক বা একাধিক শব্দ দুই বা ততোধিক পংক্তিতে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে যে শব্দগত সমান্তরলতা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় 'শব্দাবৃত্তি' (anaphora)। আবার এই শব্দগত পুনরুক্তি পরপর পংক্তির গোড়ায় থাকলে হবে 'আদ্যাবৃত্তি' (epanaphora) এবং শেষে থাকলে 'অন্ত্যাবৃত্তি' (epistrophe)। কিভাবে একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কবিতার কাঠামোয় এক বা একাধিক স্তবকে পুনরুক্ত হচ্ছে এবং কিভাবে সেই পুনরুক্তির ফলে কবিতার বিভিন্ন ভাবের মধ্যে একটি ঐক্য বা সমগ্রতা নির্মিত হচ্ছে, সচেতন পাঠকের কাছে তা এক মূল্যবান অনুসন্ধান। কখনো বা পূর্ববর্তী চরণের একটি শব্দ পরবর্তী পংক্তিতে পুনরুক্ত হয়ে এবং অনুরূপ পুনরুক্তি সম্প্রসারিত হয়ে ধারাবাহিক সংযুক্তির কৌশলে কবিতার ভাববিন্যাসটি উন্মোচিত করে। আবার কখনো কখনো এক বা একাধিকবাক্য বা বাক্যাংশ কবিতায় নিয়মিতভাবে ঘুরে ঘুরে আসে যাতে করে কবিতার আবেগ-বিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্টতা পায়। ঐ 'ধুয়া' বা 'ধ্রুবপদ' (refrain) চমকপ্রদ সমান্তরাল বিন্যাসে চিনিয়ে দেয় কবিতার মর্মবিন্দু।

পুনরুক্তিময়তা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-প্রকরণের অন্যতম আপাতগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতা মূলত আত্মকথনধর্মী, স্বীকারোক্তিমূলক, আবেগময় ; সঙ্গীতময়তা ও ছন্দের চমৎকার কারুকার্যে মণ্ডিত। পুনরুক্তি তথা সমান্তরলতার নানা বৈচিত্র্যে শক্তির কবিতা কেবল আবেগ-অনুভূতির তীব্রতাই অর্জন করেছে এমন নয়, এই বিশেষ প্রকরণ-কৌশল তাঁর কবিতাকে দিয়েছে শ্রুতিসুখকর ও আবৃত্তিযোগ্য রচনার স্বীকৃতি যা তাঁর সমকালীনদের মধ্যে আর কেউ সেভাবে

দাবি করতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে একটি কবিতার সমগ্র ভাব কিম্বা অবয়বটিই রূপ পেয়েছে পুনরুক্তির কুশলী বিন্যাসে।

শব্দগত সমান্তরলতার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র **জরাসন্ধ** কবিতাটি। কথ্য গদ্যরীতিতে লেখা এই কবিতায় জননীর উদ্দেশে উচ্চারিত সন্তানের অভিমানাহত আর্তি ধরা পড়েছে একেবারে প্রারম্ভিক পংক্তির মর্মস্পর্শী অনুনয়ে—'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে'। এই বাক্যটিই হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে কবিতার সর্বশেষ পংক্তিরূপে। মধ্যবর্তী তিনটি স্তবকে শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্যাংশের পুনরুক্তি করা হয়েছে নানাভাবে, কখনো একই পংক্তিতে পরপর, আবার কখনো একটি পংক্তির ব্যবধানে। 'অন্ধকার' শব্দটি চোদ্দ লাইনে মোট আটবার ব্যবহৃত হয়েছে ; 'জরা' ও 'মৃত্যু' শব্দদুটিও একাধিকবার এসেছে। *প্রভু নষ্ট হয়ে যাই* গ্রন্থের **পেতে শুয়েছি শব্দ** শিরোনামের আট লাইনের কবিতাটিতে শক্তির শব্দাগ্রহ বিশেষ তীব্রতা পায় 'শব্দ' এই শব্দটিই ঘুরেফিরে আটবার ব্যবহৃত হওয়ায়। একইভাবে কেন্দ্রীয় বিষয় বা ভাবনাকে গুরুত্ব ও তীব্রতা দিতে শক্তি 'ভালোবাসা' শব্দটিকে মোট ছ'বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন *ভাত নেই, পাথর রয়েছে* সঙ্কলনভুক্ত **ভালোবাসা, তার কাছে** কবিতাটিতে। *আমি চলে যেতে পারি* সঙ্কলনের **মানুষ বিষয়ে** তিনটি সমিল দ্বিপদীর আশ্রয়ে ছয় পংক্তির একটি ক্ষুদ্র কবিতা, যেখানে 'মানুষ' শব্দটি মোট তেরো বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং বলা যায় যে গোটা কবিতাটিই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই চাবি-শব্দের পুনরাবৃত্তির ওপর। *আমি একা বড়ো একা* গ্রন্থভুক্ত **আমার কোনো অভিমান নেই** শীর্ষক কবিতায় 'অভিমান' এই বিশেষ্যপদটি আটবার ও একবার তার বিশেষণ-রূপ 'অভিমানী' ব্যবহৃত হয়ে কবিতার মূল ভাববস্তু ও মেজাজটি ধরতে সাহায্য করেছে।

একটি বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হয়ে সেই বাক্য বা বাক্যাংশের হুবহু বা ঈষৎ পরিবর্তিত পুনরাবৃত্তিতে একটি ভাববৃত্তকে পূর্ণতা দেওয়ার প্রকরণ-অভ্যাস স্বল্পায়তন লিরিকের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচলিত। শক্তির সমস্ত পর্বের রচনাতেই এ জাতীয় সমান্তরলতার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। একটি বাক্য থেকে উৎসারিত হয়ে কবিতার মূল ভাব তথা আবেগের অনুপুঙ্খগুলি আবার ওই বাক্যটিতেই ফিরে আসে। কখনো বা দু-একটি শব্দের বা যতি-চিহ্নের সামান্য বদল ঘটিয়ে সমাপ্তিসূচক বাক্যে ব্যঞ্জনা তথা স্বরভঙ্গির কিছু পার্থক্য করা হয়। নীচের নমুনা-সারণী থেকে বিষয়টির আন্দাজ করা সম্ভব হবে :

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	প্রথম পংক্তি	শেষ পংক্তি
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য	**যৌবন থেকে বামে**	যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি	কোন পরিবর্তন নেই
সোনার মাছি খুন করেছি	**এই বিদেশে**	এই বিদেশে সবই মানায়	,,
ঈশ্বর থাকেন জলে	**কেউ কি যাবে**	কেউ কি যাবে? কেউ কি চলে যাবে?	,,
কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে	**কখন, কীভাবে**	কিছুদিন ভুলে থাকা ভালো	,,

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	প্রথম পংক্তি	শেষ পংক্তি
এই তো মর্মরমূর্তি	**দু-চার রেখায়**	দুচার রেখায় জাগিয়ে দিল তন্ময়তার রূপ	
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো	**বনে বনে**	বনে বনে ওঠে কলরোল তার কলরোল	বনে বনে ওঠে কলরোল *শুধু* কলরোল
আমাকে দাও কোল	**জন্মদিনের মঞ্চে মৃত**	জন্মদিনের মঞ্চে মৃত মুখের পাশে ফুল	জন্মদিনের মঞ্চে *কেন মৃতের পাশে ফুল?*
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	**বিড়াল**	সুখের অ ত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল	সুখের অত্যন্ত কাছে বসে *অসুখী* বিড়াল
আমাকে জাগাও	**দশমী ও বিসর্জনে**	ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো	ভালোবাসা দিয়ে *আজই* তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো
জঙ্গল বিষাদে আছে	**গাছ কথা বলে**	গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি সন্ধ্যায় সকালে	গাছের ভিতর গিয়ে বসি আমি *গাছ কথা বলে*

শক্তির আর এক ধরনের সমান্তরলতার ঝোঁক অনেক কবিতায় নজরে পড়ে—একটি বাক্যের হুবহু বা ঈষৎ পরিবর্তিত পুনরুক্তি দিয়ে কবিতার শেষে স্বরগ্রামের বাড়তি মাত্রা আরোপ করা:

(১) *সে শুধু একাকী থাকে, একাকী এ-কলরব করে,/সে শুধু একাকী থাকে,* অবিরাম কলরব করে। **(সমুদ্রের পারে,** *এই আমি যে পাথরে***)**

(২) গান শোনালে না শুধু দূরে রইলে তপশ্চারিণী।/গান শোনালে না শুধু দূরে রইলে তপশ্চারিণী! **(তপশ্চারিণী,** *এই তো মর্মরমূর্তি***)**

(৩) বলো, ভালো আছো আর তোমার অসুখ সেরে গেছে/বলো, ভালোবাসো তাই তোমার অসুখ সেরে গেছে। **(বলো, ভালোবাসো/** *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো***)**

(৪) কিছু কি দেখার ছিলো বাকি?/কিছু কি দেখার ছিলো বাকি? **(বাকি,** *আমাকে জাগাও***)**

(৫) বেঁচে থাকতে দাও, কিছু অন্যথা করো না,/শুধু বাঁচতে দাও, কিছু অন্যথা করো না। **(অন্যথা করো না,** *জঙ্গল বিষাদে আছে***)**

উদাহরণস্বরূপ আরও উল্লেখ করা যায় *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*-র কবিতার পর কবিতায় শক্তির এই পুনরুক্তিসূচক সমাপ্তি —**বাগানে কি ধরেছিলে হাত, পারিপার্শ্বিক থেকে, এখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস, আজো আমি, কোনোদিনই পাবে না আমাকে, আমার ছিল একটি ক্ষেতের চাষ**। উল্লেখ করা যেতে পারে *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*-র **তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব** কবিতাটি। দশ লাইনের ছোট কবিতার শুরুতে ও শেষে বিশেষ লক্ষণীয় পুনরুক্তি :

> 'তুচ্ছ এইসব—এই জানলা কপাট গোরস্থান
> তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব, ভালোবাসা, ভালো-মন্দে বাসা
> তুচ্ছ, তুচ্ছ, এইসব জানলা কপাট গোরস্থান.........
> আমি যাই ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে
> আমি যাই ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে....।'

এছাড়াও কবিতার বিভিন্ন অংশে একটি বা দুটি বাক্যকে নানাভাবে পুনরাবৃত্ত করে সমান্তরলতার অনেক রকমফের করেছেন শক্তি। কিছু বাছাই করা নমুনা থেকে দেখা যেতে পারে কিভাবে ধ্রুবপদ বা ধুয়া (refrain)-র প্রয়োগবৈচিত্র্যে কবিতার ভাব-বিবর্তন ও তার অবয়বী নির্মাণের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন কবি :

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	সমান্তরলতার ধরন/বৈশিষ্ট্য
এই তো মর্মরমূর্তি	**মৃত্যু যেন**	*মৃত্যু যেন কানামাছি খেলে*, এই মূল অনুভব-বাক্যটি প্রথম স্তবকের শুরুতে ও শেষে এবং দ্বিতীয় স্তবক তথা কবিতাটির শেষে অর্থাৎ মোট তিনবার ঘুরে ঘুরে এসেছে।
ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে	**ধর্মের সোপানগুলি কাঁদে**	প্রথম দুটি পংক্তি—*ভক্তের পায়ের স্পর্শে/ ধর্মের সোপানগুলি কাঁদে*—প্রথম স্তবকের শুরুতে ও শেষে এবং তৃতীয় বা শেষ স্তবকের শেষে, মোট তিনবার এসেছে ও কবিতার আখ্যানভাগকে একটি সুষম বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছে।
জঙ্গল বিষাদে আছে	**মন্ত্র**	পাঁচ লাইনের দুটি স্তবকে বিভক্ত এই সংক্ষিপ্ত রচনায় দুজোড়া বাক্য দুবার করে চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। *মন্ত্র একটু ছেঁড়াখোঁড়া,/মন্ত্রের ভিতরে তুমি কে হে?* প্রথম স্তবকে দুবার এবং একটিমাত্র শব্দ বদলে *মন্ত্র একটু অগোছালো,/ মন্ত্রের ভিতরে তুমি কে হে?* দ্বিতীয় স্তবকে দুবার এসেছে। কার্যত পুনরুক্তির ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে কবিতার ভাববস্তু ও অবয়বী রূপ।
আমাকে জাগাও	**আর কিছু নেই**	সাতটি চরণের এই কবিতায় দুটি মূল অনুভব-বাক্য—*আমার সর্বস্ব আজ ভাঙা* ও *চারিদিকে অক্ষর অক্ষর* দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং পঞ্চম-ষষ্ঠ পংক্তি হিসেবে পুনরুক্ত হয়েছে।
এই আমি যে পাথরে	**পাতাল থেকে ডাকছি**	এই চতুর্দশপদীতে চারটি তিন পংক্তির স্তবক এবং সমাপ্তিসূচক দুটি পংক্তি। প্রথম ও চতুর্থ স্তবকের প্রথম দুটি লাইন—*পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?/পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে*

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	সমান্তরলতার ধরন/বৈশিষ্ট্য
		পাচ্ছো? পুনরুক্তিমূলক এবং দুটি বাক্যের মধ্যে তফাৎ কেবলমাত্র একটি শব্দের।
অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল	**বৃষ্টি হবে**	মালিন্য ও শুষ্কতার মধ্যে বৃষ্টির জন্যে আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে এ কবিতায় চারটি স্তবক (৪+৩+৩+৫)। ধ্রুবপদটি *কোথায় কখন বৃষ্টি হবে* প্রথম স্তবকে দুবার ও তৃতীয় স্তবকে আরো দুবার এসেছে। দুটি স্তবকেই দ্বিতীয় ব্যবহারে যুক্ত হয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। শেষ স্তবকে ধ্রুবপদটি পুনরুক্ত হয়েছে শেষ দুটি পংক্তিরূপে এবং এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় প্রয়োগে বাক্যটি প্রশ্নসূচক। এছাড়া শেষ পংক্তিতে বাক্যের পদক্রমে *কোথায় কখন* বদলে হয়েছে *কখন কোথায়।*
অস্ত্রের গৌরবহীন একা	**এবার আমি ফিরি**	বাক্য ও বাক্যাংশের নানা ধরনের সমান্তরলতা ষোল চরণের এই কবিতার ভাববস্তুর বয়নে বিশেষ প্রকরণমনস্কতার পরিচায়ক। দুটি প্রারম্ভিক পংক্তি *'এবার আমি ফিরি ফেরার কুতুহলে/এবার আমি ফিরি ফেরার কামনায়* চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিরূপে পুনরুক্ত হয়েছে। তৃতীয় পংক্তি *অনেক হলো দিন অনেক হলো বলে* একটি মাত্র শব্দ বদলে ফিরে এসেছে ষষ্ঠ পংক্তিরূপে। এছাড়াও শব্দাবৃত্তির অনেক নিদর্শন কবিতাটির পুনরুক্তিময় আখ্যানভাগটিকে আবেগের আশ্চর্য লাবণ্যে মণ্ডিত করেছে।
মানুষ বড়ো কাঁদছে	**দাঁড়াও**	তিনটি তিন পংক্তির স্তবকে বিভক্ত এই কবিতার গঠন-সুমিতি পুরোপুরি পুনরুক্তি-নির্ভর। *মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে দাঁড়াও,* এই ধ্রুবপদটি প্রতিটি স্তবকের শেষ পংক্তি। এরই অনুরূপ পংক্তি *মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও* দিয়ে কবিতার শুরু এবং বাক্যটি অষ্টম পংক্তিতে পুনরুক্ত।

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	সমান্তরলতার ধরন/বৈশিষ্ট্য
ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি	তার মমতা	তিন পংক্তির চারটি স্তবকের প্রতিটিই শুরু হয়েছে একটি বাক্যে—শুধু *নিজেকেই দেখবো—এই মনে করে। অন্যকে দ্যাখে না* বাক্যাংশটি প্রথম তিনটি স্তবকের শেষ পংক্তির গোড়ায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে।
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো	আজো আমি	কবিতার ধারক বাক্য *আজো আমি তেমনই আনাড়ি* মধ্যে ও শেষে প্রতি দফায় দুবার করে এসেছে। দু'বারই কোনো যতি-চিহ্ন ছাড়া। এছাড়া প্রথম স্তবকের শেষ দুটি পংক্তিতে রয়েছে কবির সহজ আবেগসূচক বাক্য *তোমাকে যে সকলেই চায়*-এর পুনরুক্তি। প্রথমে যতিচিহ্ন বর্জিত এবং পুনরুক্তিতে আবেগের সঙ্কেত বহনকারী বিস্ময়সূচক চিহ্নযুক্ত। আরো লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম বাক্য তার শব্দবিন্যাসের কিছু বদল ঘটিয়ে ফিরে এসেছে শেষ স্তবকের মাঝখানটিতে।
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য	চতুরঙ্গে	চার লাইনের চারটি স্তবকের কবিতার প্রথম পংক্তি *খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না* একটিমাত্র শব্দ বদলে পুনরুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় স্তবকের শেষে ও চতুর্থ স্তবকের গোড়ায়।
সোনার মাছি খুন করেছি	হাত বাড়ালে ধরতে পারি	চারটি স্তবকের এই কবিতা (৩+৫+৩+৫)। প্রারম্ভিক পংক্তি *(হাত বাড়ালে ধরতে পারি ছায়ার চেয়ে ঘনান্ধকার)*-র গোড়ার অংশ *হাত বাড়ালে ধরতে পারি* প্রতিটি স্তবকের শেষে আবৃত্ত হয়েছে। আরো খুঁটিয়ে দেখলে বিস্ময়কর পুনরুক্তি-শৃঙ্খলা নজরে পড়বে। তিন লাইনের প্রথম স্তবকটি দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের শেষভাগে হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে। মোট ষোলোটি পংক্তির মধ্যে নটি পংক্তি প্রথম তিন লাইনের পুনরাবৃত্তিজাত।

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	সমান্তরলতার ধরন/বৈশিষ্ট্য
প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই	**সে-তার প্রতিচ্ছবি**	চার লাইনের তিনটি স্তবকের প্রতিটিতে প্রথম পংক্তি ফিরে এসেছে শেষ পংক্তি হয়ে। এছাড়া তিনটি পুনরাবৃত্ত বাক্যের মধ্যেও লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে।
ভাত নেই, পাথর রয়েছে	**ছেলেটা**	প্রারম্ভিক পংক্তি *ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর* ভেঙে সপ্তম পংক্তিতে পুনরুক্ত হয়েছে। এরই সংশ্লিষ্ট একটি বাক্য *মানুষ, ছিল নরম, কেটে ছড়িয়ে দিলে পারতো* দুবার হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়েছে এবং দশম বা শেষ পংক্তিতে দুটি শব্দ পালটে ফিরে এসেছে কবিতার কাঠামোকে সম্পূর্ণতা দিতে।
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল	**নদীতীরে**	দুটি পংক্তি, *নদীর দিকে তাকিয়ে রইলে/ আমার দিকে তাকালে না* তিনটি অসম স্তবকের প্রতিটির শুরুতে এসেছে।

শব্দ, ব্যাকাংশ ও এক বা একাধিক বাক্যের নানাপ্রকার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতময় সুখাবেশ তৈরি করার ব্যাপারে শক্তির যে বিশেষ প্রবণতা তা এইসব উদাহরণ থেকে সহজেই প্রমাণিত হবে। পুনরুক্তিময়তা তাঁর কাব্য-প্রকরণের প্রধানতম পন্থা যা কবিতাপাঠের আসরে তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি একটি গোটা স্তবককেই, বিশেষত প্রারম্ভিক স্তবকটিকেই ঘুরিয়ে এনেছেন কবিতার শেষ স্তবকরূপে। তাঁর *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* কাব্যগ্রন্থের সাতটি রচনায় এই বিশেষ সমান্তরলতার উদাহরণ নজরে পড়ে :

(১) ইস্টিশান নতুন—রেলগাড়ি/ভেবেছিলাম শূন্যে দেবো পাড়ি/হঠাৎ এসে বল্লে—তুমি যাবে। **(ভেবেছিলাম)**

এই তিনটি পংক্তি হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে শেষ স্তবকরূপে। কেবলমাত্র যতি-চিহ্নের ছোট একটি পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম স্তবকের শেষে ব্যবহৃত পূর্ণচ্ছেদ বদলে শেষ স্তবকের শেষে আবেগসূচক চিহ্ন (!) বসানো হয়েছে।

(২) তীরে কী প্রচণ্ড কলরব/'জলে ভেসে যায় কার শব/ কোথা ছিল বাড়ি ?'/রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী' **(আমি স্বেচ্ছাচারী)**

এ কবিতাতেও প্রথম ও শেষ স্তবকদুটি হুবহু একে অন্যের মতো।

এ সঙ্কলনের আরো পাঁচটি কবিতায় এ জাতীয় পুনরুক্তি দেখা যায়—**বসন্ত আসে, আনন্দ-ভৈরবী, কে বাগানে?** (পাঁচ লাইনের পুনরুক্ত স্তবকে প্রথম দুটি পংক্তির ক্রম উল্টে গেছে), **মনে পড়লো** (প্রথম স্তবকটি প্রায়-অপরিবর্তিত রূপে একটিমাত্র শব্দ বদলে শেষ স্তবক হয়ে এসেছে), **ছুটি ছুটি একান্তই ছুটি**।

সোনার মাছি খুন করেছি কাব্যগ্রন্থের কথ্য গদ্যরীতিতে লেখা আত্মকথনধর্মী **যেতে যেতে** শীর্ষক কবিতায় ৩য় ও ৫ম স্তবকদুটি অনুরূপ সমান্তরলতার এক উল্লেখনীয় উদাহরণ। অনুচ্চ স্বগতকথনের সুরটি এই পুনরুক্তির তন্ত্রীতে বাঁধা—'যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার

টান থাকবে/এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়/তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম/যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে/এই তো চাই—।' শেষ স্তবকের পুনরুক্তিতে কেবল দুটি ক্ষেত্রে যতি-চিহ্নের বদল নজরে পড়ে—চতুর্থ পংক্তিতে 'যাত্রী তুমি'র পর কমা'র বদলে 'ড্যাশ' এবং পঞ্চম পংক্তির শেষে 'ড্যাশ'-এর বদলে পূর্ণচ্ছেদ। *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* সঙ্কলনের দুটি কবিতায়—**বাঘ ও শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি**—প্রারম্ভিক স্তবকের হুবহু পুনরুক্তি দিয়ে কবিতার ভাব ও আঙ্গিককে বিশেষ শ্রুতিগুরুত্বদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দুটি কবিতায় তিনটি সমান স্তবক বিভাজন এবং অন্ত্যমিলের বিন্যাসও একই ধরনের। পুনরুক্তি ছন্দের দোলাটিকে বিশেষভাবে শ্রুতিসুখকর করে তোলে। এই প্রসঙ্গে *ভাত নেই পাথর রয়েছে* কাব্যের **প্রেমের মড়া** কবিতাটির কথা বলা যায়। তিন লাইনের পাঁচটি স্তবকের এই কবিতায় প্রথম স্তবকটি শব্দ বা যতিচিহ্নের সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়াই পঞ্চম স্তবকরূপে পুনরুক্ত হয়েছে। আবার পুনরুক্তির এই কৌশলের ভেতরে লক্ষ্য করা যাবে আর এক সমান্তরলতা—পুনরুক্ত স্তবকটির প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিদুটিতে রয়েছে পুনরাবৃত্তি—'প্রেমের মড়া জলে ভাসে না, তাই বলে কি ডুবতে পারে/নীল সমুদ্রে সারাটি দিন কিংবা ধবল সাত পাহাড়ে—/প্রেমের মড়া জলে ভাসে না, তাই বলে কি ডুবতে পারে?' পুনরুক্তির এতো ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগে কবিতাকে ছন্দ, সুর ও উচ্চারণের বিশিষ্টতা দিতে গিয়ে শক্তি এক ধরনের 'লিরিক তারল্য' ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে কারণেই 'কবিতা'র বদলে 'পদ্য' ছিল তাঁর পছন্দের নাম, এমন অভিযোগ তাঁর সমালোচক তথা অনুজ কবিদের মধ্যে কেউ কেউ করেছেন।[৫০] এ কথার মধ্যে সত্যতা আছে যে শব্দ ও বাক্যের পুনরাবৃত্তিতে স্মৃতিধার্য ও শ্রুতিসুখদায়ক এমন একটি লিরিক অবয়ব গড়ে ওঠে যা পাঠকের চেয়ে শ্রোতা ও আবৃত্তিকারের সন্ধান করে বেশি। তবে কবিতার বাণিজ্যিক বিপণনের প্রয়োজনে শক্তি পুনরুক্তিসর্বস্বতার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, জনাকীর্ণ কবিতাপাঠের আসরে করতালি আদায় করতে হয়ে উঠেছিলেন 'কবি-নটেশ', এমন সমালোচনার অন্তরালে ঈর্ষাজনিত অতিশয়োক্তির কটুগন্ধ পাওয়া যায়। একটি-দুটি চাবি-শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে, ছন্দোবদ্ধ এক বা একাধিক পংক্তির পুনরুক্তিতে, শক্তি তাঁর বহু স্বল্পায়তন রচনায় যে আঙ্গিক সৃজনে আগ্রহী ছিলেন তা তাঁর প্রকরণ বা নন্দনভাবনার পরিপূরক। শব্দ ও ছন্দের সাবলীল দক্ষতায় অতিপ্রজ এই কবির নির্মাণভাবনায় পাঠযোগ্যতা একটি প্রাথমিক শর্তরূপে বিবেচিত হয়েছে, যদিও সর্বত্র ও সব কবিতার ক্ষেত্রে নয়। শক্তির পুনরুক্তি-বাহুল্যের কারণে যাঁরা তাঁর স্বভাবজাত কবিত্বের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁদের *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

একটি কবিতায় পর পর বাক্যের শুরুতে বা শেষে এক বা একাধিক শব্দের পুনরাবৃত্তি করে উচ্চারণে বাড়তি ঝোঁক সৃষ্টি শক্তির বিশেষ পছন্দ। *সোনার মাছি খুন করেছি*-র **পুনর্বিবেচনা** কবিতার প্রথম পাঁচটি বাক্যে আদ্যাবৃত্তির চমৎকার উদাহরণ পাই—'**তুমি কেন** যথেচ্ছাচারের কাছে আপনাকে সঁপেছিলে/**তুমি কেন** সিন্দুক থেকে রাঙাপাড় শাড়ি বের করেছিলে কাল রাতে/**তুমি কেন** আলিসার থেকে সবল কাকের মুহ্যমান নিস্পৃহ পতন দেখে শিউরে উঠেছিলে/**তুমি কেন** বনানীর ভিতরের হ্রদে দেখেছিলে একাগ্নটি পদ্মফুল/**তুমি কেন** বারবার টেলিগ্রাফ-তারের ভিতর দিয়ে দেখেছিলে মেঘ আমি জানি'। ঐ কবিতাতেই অব্যবহিত পরে নজরে পড়ে অন্ত্যাবৃত্তির প্রয়োগ—'রুমাল ওড়াও **তুমি পথে-পথে**/পয়সা ছড়াও **তুমি পথে-পথে**/চুল খুলে দাও **তুমি পথে-পথে**। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের এই নিয়মিত পুনঃপ্রয়োগ আবেগের

তীব্রতা সৃষ্টি ক'রে স্বরের এক বিশেষ নিবিড় আবহ তৈরি করে। আদ্যাবৃত্তির আরো কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে :

(১) **অনেকদিন তোমার** চিঠির ভিতরের ভাষার বিস্ফোরণ দেখিনি আমি/**অনেকদিন তোমার** মুখের উপর নাম ঘসে-ঘসে তুলিনি সুগন্ধ/**অনেকদিন তোমার** বুকের উপর দুটি কলসে ঢেউ দিতে পারি নি আমি/**অনেকদিন** জলে ভাসাই নি আমি তোমার মুখ/অনেকদিন রেলের ইস্টিশান থেকে ছেড়ে যায়নি গাড়ি/**অনেকদিন** হলুদ টিকেট বুকে করে ছুটে যায়নি নিশীথিনীর প্রান্তরের হাওয়া/**অনেকদিন তোমার** চিঠির ভিতরের ভাষার বিস্ফোরণ পাইনি আমি। **(পশ্চাদভূমি,** *সোনার মাছি খুন করেছি***)**

(২) **সূত্রপাত হয়েছিল** যেভাবে সমুদ্রে তোলপাড়/**সূত্রপাত হয়েছিল** যেভাবে সহসা হাত পোড়ে/**সূত্রপাত হয়েছিল** যেভাবে স্বপ্নের আক্রমণ/**সূত্রপাত হয়েছিল** যেভাবে বিক্রয় হয়ে যায়.... **(চাইবাসা ১৯৬২,** *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি***)**

(৩) **মানুষ** হেসে খেলে বেড়ায়, **মানুষ** কেবল কাঁদে/**মানুষ** দুঃখ-সুখে থাকে অনন্ত আহ্লাদে/**মানুষ** বড়ো একলা এবং **মানুষ** শুধুই দুজন/**মানুষ** ঘৃণা করে এবং **মানুষ** করে পূজন/**মানুষ** থাকে জঙ্গলে আর **মানুষ** থাকে ঘরে/**মানুষ** যেমন কাঁদায়, তেমন **মানুষ** আদর করে। **(মানুষ বিষয়ে,** *আমি চলে যেতে পারি***)**

(৪) **বাগান** ছিলো মুক্তোদাঁতের হাসি/**বাগান** যেন সুষমা পরকীয়া,/**বাগান** ছিলো বীজের আঁতুড়ঘর/**বাগান** যেন ক্ষণজীবীর বাঁশি।। **বাগান** বাঁচে জড়িয়ে ধরে ঘর,/**বাগান** দেখো বৃষ্টি হবার পর।/**বাগান** দেখো রোদের কশাঘাতে, /**বাগান** দেখো দিনের আলোয়, রাতে'।
(স্মারক মনোভূমি, *কক্সবাজারে সন্ধ্যা***)**

(৫) **একবার দাঁড়াও দেখি**—কথ্থক-স্ফূটিত যে দাঁড়ানো/**একবার দাঁড়াও দেখি** মঞ্জরীস্ফুরণ যে দাঁড়ানো/**একবার দাঁড়াও দেখি** প্রতিমা পাগল যে দাঁড়ানো/**একবার দাঁড়াও দেখি** মৃত্যুর মুহূর্তে যে দাঁড়ানো **(বাটার বল,** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়***)**

উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলির মধ্যে (৩) ও (৪) নং নমুনাদুটি বিশেষ লক্ষণীয়। (৩) নং উদ্ধৃতিতে 'মানুষ' শব্দটি প্রতিটি পংক্তির শুরুতে তো বটেই, এমন কি শুধু দ্বিতীয় পংক্তি বাদে বাকি সবকটি লাইনের ঠিক মাঝখানটিতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (৪) নং উদাহরণে দুটি স্তবকের মোট আটটি পংক্তির প্রত্যেকটির শুরুতে 'বাগান' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে ধারাবাহিক সমান্তরালতার আবর্তনচিহ্নরূপে।

'অন্ত্যাবৃত্তি'র নজিরও শক্তির কবিতায় কম নয়। *আমি চলে যেতে পারি* কাব্যের **আজকালের গপ্পো** কবিতায় 'অন্ত্যাবৃত্তি'র স্মরণীয় উদাহরণ আছে। দক্ষিণবঙ্গের এক দরিদ্র গ্রাম্য নারীর মুখের ভাষায় লেখা এ কবিতাটিতে আট লাইনের প্রথম স্তবকটির কেবল তৃতীয় লাইন বাদে বাকি সবকটি একইভাবে শেষ হয়েছে—'ধুলোতে ওই ঘূর্ণি, ঘোরে **সুদর্শন পোকা**/দূরের চিঠি কাছে আনাও **সুদর্শন পোকা**...'। গ্রাম্য কথ্যরীতির এ রচনায় **সুদর্শন পোকা** শব্দদুটির পুনরুক্তি আবেগ ও অবয়বের মধ্যে যেন এক যোগসূত্র। কবিতার শেষে শব্দাবৃত্তি শক্তির বহু রচনায় স্বরের একটি বাড়তি ঝোঁক তৈরি করে। *ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে* সঙ্কলনভুক্ত **অত্যাগসহন** কবিতাটি শেষ হয় 'অন্ত্যাবৃত্তি'তে— 'দেবতা কিন্নর পাও, **মনে রেখো মানুষের কথা,**/অত্যাগসহন, তুমি **মনে রেখো মানুষের কথা**'। পুনরাবৃত্ত বাক্যাংশটিই এ কবিতার মর্মমূল। *আমাকে জাগাও* কাব্যের নাম কবিতায় **জাগাও আমাকে** এবং **আমাকে জাগাও** এ দুটি বাক্যাংশ বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে

পরপর পংক্তির শেষে বা শুরুতে ; ধ্রুবপদের মতো বারবার উচ্চারিত হয়েছে এই মর্মময় বাসনা-মন্ত্র। কবিতাটির প্রথম আট পংক্তির শেষে আবৃত্ত হয়েছে **জাগাও আমাকে** ; **আমাকে জাগাও** দিয়ে শেষ হয়েছে ৩৭ থেকে ৪১নং পংক্তিমালা ; **জাগাও আমাকে** ফিরে এসেছে ৫৩নং পংক্তির শেষে। এছাড়া এ দুটি শব্দকে উল্টে-পাল্টে শক্তি বারবার বসিয়েছেন অন্যান্য বহু পংক্তির শুরুতে। শব্দাবৃত্তি কিভাবে একটি কবিতার আখ্যানভাগে ভাবনার একটি আবেগময় বলয় গড়ে তোলে আলোচ্য রচনাটি তার উৎকৃষ্ট নজির।

শব্দের অন্তর্গত ধ্বনি বা দল (syllable)-এর পুনরুক্তিও কবিতায় লক্ষণীয় বিষয়। শক্তির কবিতা থেকে ধ্বনিগত বা দলগত সমান্তরলতার বহু নিদর্শন সংগ্রহ করা যেতে পারে। ধরা যাক, *আমাকে দাও কোল* কাব্যের **হাতের কাঁচি** কবিতাটির এই দুটি ছত্র—'**কত কপাল** পুড়ছে আর **কতক** আধপোড়াই/বারান্দার **মাঠের মাঝে কাঠের** ঘোড়া চড়ছে।' উদ্ধৃতির প্রথম লাইনে 'কত', 'কপাল' ও 'কতক' শব্দগুলিতে এবং দ্বিতীয় লাইনে 'মাঠের', 'মাঝে' ও 'কাঠের' শব্দগুলিতে ধ্বনি/দলগত মিলের প্যাটার্ন নজরে পড়ার মতো। *প্রচ্ছন্ন স্বদেশ* গ্রন্থের **শিকার-কাহিনী** শীর্ষক কবিতার দুটি পংক্তিতে ধ্বনি/দলগত সমান্তরলতার কিছু অপ্রত্যাশিত নমুনা রয়েছে—'দু'গণ্ডা **লোক** দু'গণ্ডা **পোক** নেবুঘাসের **রসে**/পটাক্ করে চুল্লু মারে নিসর্গ-**সন্ন্যাসে**।' এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়বে *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র **ভ্রান্তি** কবিতাটির শেষ পংক্তি—'বাতাসে **তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার** শূন্য নদীতটে।' ধ্বনিগত ও দলগত পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে বিষাদ ও শূন্যতার চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন গুমরে ওঠে। ধ্বনি ও দলের এই বিশেষ পুনরাবৃত্তি আমাদের অবশ্যই মনে পড়িয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের **বনলতা সেন**-এর সেই বিখ্যাত পংক্তি—*চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা*। উড়ন্ত *সিংহাসন*-এর একটি কবিতায় এ-জাতীয় পুনরুক্তির অভাবনীয় নিদর্শন পাই—'আমার মতন একল্‌ষেঁড়ে **ভাগ** করে **মাগ** শুই' **(আমার মতন একলষেঁড়ে)**।

বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করবো শক্তির পুনরুক্তিময়তার একটি চূড়ান্ত উদাহরণ দিয়ে। *আমাকে জাগাও* কাব্যের **চেয়ে থাকো** কবিতাটি গড়ে উঠেছে কেবলই বাক্য, বাক্যাংশ ও দলের পুনরাবৃত্তিকে আশ্রয় করে :

> **কিছুদিন আমার** অসুখী **মুখপানে তুমি** চেয়ে **থাকো**
> **কিছুদিন আমার** সুখের **মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো**
> চেয়ে **থাকো** চোখ ফিরিও না, **অন্ধ** হবে, যদি **বন্ধ** করো
> চেয়ে-**থাকা**, দুঃখী মুখপানে, **চেয়ে-থাকা** পলক না ফেলে
> **কিছুদিন আমার ভোগের মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো**
> **কিছুদিন আমার রোগের মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো**
> **কিছুদিন আমার** সন্ন্যাসী **মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো**
> **চেয়ে থাকো**, চোখ ফিরিও না, **অন্ধ** হবে, যদি **বন্ধ** করো
> **চেয়ে থাকো**, খুব কাছ থেকে, **চেয়ে-থাকা** দূর থেকে নয়
> **তাতে কি তোমার পরাজয়?**
> **তাতে কি তোমারই পরাজয়!**

প্রথম দুটি পংক্তিতে যে আদ্যাবৃত্তি (*কিছুদিন আমার*) তাই আবার ফিরে এসেছে ৫, ৬ ও ৭নং পংক্তিগুলিতে। *মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো*, এই বাক্যাংশটি ১ ও ২ এবং ৫, ৬, ও ৭নং

লাইনগুলির শেষে অন্ত্যাবৃত্তির স্পষ্ট উদাহরণ। তৃতীয় পংক্তি— *চেয়ে থাকো, চোখ ফিরিও না, অন্ধ হবে, যদি বন্ধ করো* পুনরুক্ত হয়েছে অষ্টম পংক্তিরূপে। এছাড়া চরণটিতে দলগত সমান্তরলতার নিদর্শন দেখা যাচ্ছে—'অন্ধ' (অন্‌+ধ) ও 'বন্ধ' (বন্‌+ধ)। প্রথম দুটি পংক্তির শেষ থেকে *চেয়ে থাকো* চলে এসেছে তৃতীয় পংক্তির শুরুতে। চতুর্থ পংক্তির গোড়ায় ও মধ্যে *চেয়ে থাকা* পুনরুক্ত হয়ে বাক্যটিকে দুটি অংশে চিহ্নিত করেছে। ৫, ৬ ও ৭ নং পংক্তিগুলি প্রায় একে অন্যের মতন। *কিছুদিন আমার* দিয়ে শুরু এবং *মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো* দিয়ে শেষ। ৮ ও ৯ নং চরণগুলিতে শুরুতে শব্দাবৃত্তি এবং নবম পংক্তিতে *চেয়ে থাকো* আর *চেয়ে-থাকা*-র মধ্যেও পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্ম টান। কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তি প্রায়-অবিকল জোড়া লাইন, যতিচিহ্নের পার্থক্য নির্দেশ করে শক্তি কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী পংক্তির 'তোমার' শেষ পংক্তিতে একটি বাড়তি ঝোঁক অর্জন করেছে 'তোমারই' শব্দে ওই স্বরযোজনায়।

প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রবণতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রকরণ বিষয়ক আলোচনায় অপর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখের দাবি রাখে। সেটি হল তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রবণতা। দেশী ও বিদেশী কবি, লেখক, শিল্পী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নানা নাম ও রচনা-প্রসঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, লোকগাথা ও সমকালীন জীবনবৃত্তের নানা চিহ্ন ও প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে শক্তির কবিতায়। সাধারণ পাঠক ও তাঁর কবিতার ভাষ্যকারেরা যতই শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত রচনারীতির কথা বলুন না কেন, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে শক্তির আগ্রহ ও অনুশীলনের এইসব প্রমাণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের আবহে এইসব প্রসঙ্গ সংযোজিত করে ব্যঞ্জনা ও অনুষঙ্গের স্বতন্ত্র সচেতন মাত্রা।

দেশী ও বিদেশী কবি, লেখক ও শিল্পীদের নাম ও রচনার উল্লেখ রয়েছে শক্তির বহু কবিতায়। নিচের সারণীতে এই ধরনের প্রসঙ্গের একটি নমুনা তালিকা পাওয়া যাবে :

কাব্যগ্রন্থ	**কবিতার নাম**	**প্রসঙ্গ**
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য	**স্বকৃত আলেখ্য**	নাভির অমর পিণ্ড দাঁতে চেপে উদাস **বোদ্‌লেয়র/র‍্যাঁবোর** উৎক্ষিপ্ত অণ্ড গ্রাস করে কলঙ্কী **ভেরলেইন**।
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো	**জুলেখা ডব্‌সন**	চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে/মনোস্থাপন করি ভিক্ষে/তোমার জন্য **জুলেখা ডবসন**।
ঐ	**মনে পড়লো**	লেভেল-ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন/ এখন তুমি পড়ছো কি **হার্ট ক্রেন**?
সোনার মাছি খুন করেছি	**অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ**	দুঃখের নিষ্পন্ন তুমি বটফল নাকি?/**কীটসের হাইপেরিঅন**?
	উড়ন্ত সিংহাসন	তুমি শাদা তিমি, ছুটোও **আহেব্‌-এ**!
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান	**সমাধিফলকের স্মৃতি**	**মিল্টন মিল্টন** তুমি চোখ খুলে লেখো তো সনেট/তর্কাতীত অন্ধতার পরে।

কাব্যগ্রন্থ	কবিতার নাম	প্রসঙ্গ
পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি	**পোকায় কাটা কাগজপত্র**	এই মিলেতেই পদ্য মাটি, **অলোকরঞ্জন** হলে বাঁচাতেন/কিংবা **সুনীল** অ্যাংলো-সাক্সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	**কবিতা নং ৭ থেকে ১১ এবং ৪০ থেকে ৪২**	হুয়ান রামন হিমেনেথের 'প্লাতেরো' নামক গাধাটিকে নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলিতে 'প্লাতেরো'র সঙ্গে কবির কথাবার্তা যেন নিভৃত স্বগতকথন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য 'প্লাতেরো' বিষয়ে নবনীতা দেব সেনের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ '...হিমেনেথ-এর গাধা প্লাতেরোর মধ্যে শক্তি নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি শক্তিশালী চিত্রকলা খুঁজে পেয়েছিলেন।...সচেতন পুনর্ব্যবহারে শক্তির কবিতায় প্লাতেরো এক কাব্যিক মিথে পরিণত'[৫১]।
ঐ	**উৎসর্গ কবিতা**	শিরোনামে **মাইকেল মধুসূদন** ও দশম পংক্তিতে চারণকবি **মুকুন্দ দাস**।
ঐ	**কবিতা নং ৩৭**	**মহীনের ঘোড়াগুলি** মহীনের ঘরে ফেরে নাই।
সুখে আছি	**এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবো**	কবিতার নাম ও শেষ পংক্তিটি শেক্‌স্‌পীয়ারের বিখ্যাত কমেডি *অ্যাজ ইউ লাইক ইট*-এর তৃতীয় অঙ্কে সেলিয়ার গানের একটি ছত্র—**'Tongues I'll hang on every tree'**-র ভাষান্তরিত রূপ।
অস্ত্রের গৌরবহীন একা	**শরণার্থী বাংলাভাষা, পুনর্জন্মে**	কলকাতার গলি থেকে **আল মাহমুদ** বিদায় নিয়েছে, ওর শরণার্থী চোখ কোনোদিন দেখতেও হবে না।
পাতাল থেকে ডাকছি	**এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি**	...এসো এসো, কী খবর বলো, **সুনীল** কেমন আছে, **তারাপদ**, **আত্মীয়স্বজন?**
আমি একা বড়ো একা	**মোরগের গল্প**	তাতার থাকে **শরৎচাঁদের সামতাবেড়ে**।
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল	**ঋত্বিক, তোমার জন্য**	**ঋত্বিক**, তোমার জন্য তুচ্ছ কবি আর্তনাদ করে।
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	**দশবছর আগে-পরে**	**রামকিঙ্করের** গড়া মূর্তি বসে এখানে-সেখানে।
জঙ্গল বিষাদে আছে	**ব্লেকের তর্জমা**	কবে শেষ হবে বলো **ব্লেকের তর্জমা?**

অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়	**শব্দের ভিতরে**	যেন শব্দ **বিজন চৌধুরী**/নাম্নী শিল্পীর টান......।
ঐ	**কেবল অকারণে**	'তফাৎ যাও' হাঁকে পাগল **মেহেরালি**।
ঐ	**বসন্ত ১৩৬৯ (১)**	**রুবেন্স-গঠিত** নৌকা ভেসে চলে মন্দিরের দিকে।
ঐ	**বারোটি বছর**	**বিশজন বীট-কবি** মুহুর্মুহু চুম্বন ছেটায়।
ঐ	**পৃথিবীর শেষদিনে**	**বৃদ্ধ কাব্যনাট্যকার এলিয়ট**, কবিত্ব কি মর্মে না মেধায়?
ঐ	**আমার আড়ালে তুমি**	অলৌকিক/বিরল-গঠিত সেই **কোলরিজ -জাহাজের মতো**।

এই নমুনা তালিকায় পাওয়া নাম ও রচনার প্রসঙ্গগুলি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশী-বিদেশী সৃজনী ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্মের সঙ্গে সম্যক পরিচয় এবং সেই পরিচয়কে নিজের ভাবনা তথা আঙ্গিকের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার মতো শৃঙ্খলা ও অনুশীলন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যথেষ্টই ছিল। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রবণতায় তিনি বিষ্ণু দে থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের যথার্থ অনুসারী। **জুলেখা ডবসন** কবিতায় এই নামটি অন্ত্যানুপ্রাসে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ম্যাক্স বিয়ারবোমের প্রণয়কাহিনীর কিংবদন্তি নায়িকা জুলেখা ডবসন শক্তির এই কবিতার বিষয় ও ভাবনার সঙ্গে এত চমৎকার মিলে গেছে যে কেবল অন্ত্যমিলের প্রয়োজনেই নামটি এসে পড়েছে বলা যাবে না। **মনে পড়লো** কবিতার অনুরূপ অন্ত্যানুপ্রাস, 'ট্রেন'-এর সঙ্গে 'হার্ট ক্রেন' অনেকের কাছে দুর্বল ও হাস্যকর বলে মনে হলেও শক্তি নিজে অন্য একটি রচনায় এই অন্ত্যমিলসর্বস্বতার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে আত্মঘাতী হয়েছিলেন অসম্ভব অসুখী, অস্থির ও সুরাসক্ত মার্কিন কবি হার্ট ক্রেন। তাঁর মতো অস্থির ও সুরাসক্ত তিরিশোর্ধ্ব শক্তি একটি স্মৃতিমেদুর প্রেমের কবিতায় সেই হার্ট ক্রেনের নামটি শুধুই মিলের তাগিদে বসিয়েছিলেন? 'The imagination spans beyond despair'-এর মতো অব্যর্থ উচ্চারণের জন্মদাতা যে কবি তাঁর নামটি উল্লেখের অন্তরালে শক্তির অভীপ্সার কোনো চিহ্ন কি ছিলো না? কবি যদি সঠিক মুহূর্তে এমন একটি নাম/প্রসঙ্গ পেয়ে যান যা ভাবনা ও আঙ্গিকের এমন রাজযোটক মিল ঘটিয়ে দেয়, তাহলে কি আমরা তাকে কবির প্রকরণের সার্থকতা বলে মনে করবো না? ইংরেজ কবি কীট্‌স তাঁর 'হাইপেরিঅন' নামক কাহিনীকাব্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর দ্বিতীয় একটি কাব্যরূপ 'দি ফল অব হাইপেরিঅন'-ও অসমাপ্ত থাকে। নিজের কবিতার বিরূপ সমালোচনা ও বিশ্বমানবের বিপুল যন্ত্রণাবোধ কীট্‌সের এ দুটি রচনার প্রেক্ষিত ও ভাববস্তুর সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে তাতে করে শক্তির **অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ** কবিতায় 'হাইপেরিঅন'-এর প্রসঙ্গটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদ-এর নামটি দুবার এসেছে **শরণার্থী বাংলাভাষা, পুনর্জন্মে** কবিতায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে 'আল মাহমুদ' নামটি বাংলাভাষার মর্যাদা ও তার পুনর্জন্মের স্মারক হয়ে উঠেছে আলোচ্য কবিতায়। বারোক চিত্রকলার অগ্রণী শিল্পী রুবেন্সের প্রসঙ্গটি তাঁর চিত্রকল্প নির্মাণের কাজে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন শক্তি পূর্ববর্তী তালিকাভুক্ত **বসন্ত ১৩৬৯**-এর উদ্ধৃত পংক্তিতে। **পৃথিবীর শেষদিনে** কবিতাটিতে টি. এস. এলিয়টের প্রসঙ্গ এসেছে। ১৯৬২-তে লেখা

এই কবিতায় 'বৃদ্ধ কাব্যনাট্যকার এলিয়ট'-এর কাছে কবিত্ব বিষয়ে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছে তাতে হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে এলিয়টের পছন্দ জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রকৃতই এলিয়ট ওই সময়ে 'বৃদ্ধ' এবং আবেগ ও মননের মধ্যেকার টানাপোড়েন তাঁর কাব্যভাবনার অন্যতম প্রধান বিষয়। এক্ষেত্রেও প্রসঙ্গ উল্লেখে শক্তির উপলব্ধি ও প্রকরণ-দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। **আমার আড়ালে তুমি** কবিতার উদ্ধৃতাংশে ইংরেজ কবি কোল্‌রিজের বিখ্যাত রচনা 'দি রাইম অব দ্য এনশেন্ট ম্যারিনার'-এর ভৌতিক জাহাজ প্রসঙ্গটি এসেছে। এখানেও শক্তি তাঁর পঠন-পাঠন ও প্রকরণ দক্ষতার নজির রেখেছেন। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র উৎসর্গপত্রের বিখ্যাত পংক্তি 'প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার' বুদ্ধদেব বসুর বোদ্‌লেয়র-অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত। শক্তির **পদ্য সংগ্রহের** সম্পাদক সমীর সেনগুপ্তের কথায় 'এই অনুবাদের দ্বারা আপ্লুত ছিলেন শক্তি, সে-সময় শক্তির কণ্ঠে এ-গ্রন্থের নানা পংক্তির আবৃত্তি তাঁর পুরোনো বন্ধুরা অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন।' **স্বকৃত আলেখ্য** শীর্ষক রচনার দুটি পংক্তিতে বোদ্‌লেয়ার, র‍্যাঁবো ও ভেরলেইন—এর উপস্থিতি ঐ সময়ে ফরাসি কবিদের কবিতায় 'আপ্লুত' শক্তির মনটিকে প্রকাশ করেছে আদিম-প্রবল উন্মত্ততার চিত্রকল্পে।

শেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটন, ব্লেক প্রমুখ দূর অতীতের দিক্‌পাল কবিদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার জন্মলগ্নের প্রভাবশালী কবিব্যক্তিত্ব বোদ্‌লেয়র ও ভেরলেইন যেমন এসেছেন শক্তির কবিতায়, তেমনি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন সতীর্থদের মধ্যে অলোকরঞ্জন, সুনীল, তারাপদ প্রমুখ, এমনকি ব্যতিক্রমী বীট কবিরাও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছেন। বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে শিল্পী রামকিঙ্করের নাম ও তাঁর শিল্পকলা, বিজন চৌধুরীর তুলির টান। প্রিয় চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে লেখা হয়েছে পুরো একটি কবিতা। লেখা হয়েছে অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও। এইসব নাম ও রচনা-প্রসঙ্গ প্রায় সব ক্ষেত্রেই কবিতার ভাবনা তথা অনুভবের সঙ্কেত বহন করেছে। আঙ্গিক তথা প্রকরণের চাহিদা পূরণের জন্যেই এদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমন নয়। হার্মান মেলভিলের বিখ্যাত উপন্যাস *মবি ডিক*-এর রোমাঞ্চকর তিমি শিকার পর্ব ও ক্যাপটেন আহাব-এর প্রসঙ্গটি *সোনার মাছি খুন করেছি*-র **উড়ন্ত সিংহাসন** কবিতায় যেভাবে শক্তি ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর সচেতন দক্ষতার প্রমাণ মেলে। একই কথা বলা যায় *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যের **সমাধিফলকের স্মৃতি** কবিতায় মিলটন, তাঁর মহাকাব্যে বর্ণিত নরক ও তাঁর অন্ধত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গে।

তাঁর কবিতার নন্দনভাবনায় স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ততার কথা শক্তি বারবার বললেও এইসব প্রসঙ্গের কুশলী প্রয়োগ থেকে এমন সিদ্ধান্ত অনুমিত হবে না যে কবিতার নির্মাণে পঠন-পাঠন-উপলব্ধির যথার্থ ব্যবহারে শক্তির প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব ছিলো না। অভাব ছিলো না বলেই *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যের **কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ** কবিতায় *পাল্লাদাস* নাম-শব্দটি অনায়াসে ব্যবহার করেছিলেন—'পাল্লাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমায় সেই স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিলো/ এই তো গ্রীসদেশ।' অসংখ্য পরিচিত গ্রিক কবি-লেখক-দার্শনিক প্রমুখের নাম সরিয়ে রেখে শক্তি উল্লেখ করেছিলেন 'পাল্লাদাস' (Palladius)-এর, যাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৩ সালে গ্যালাশিয়ায়, যিনি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী ও ইতিবৃত্ত রচয়িতা, *Lausiac History* গ্রন্থের লেখক। নামটি যতই অচেনা ও অদ্ভুত বলে মনে হোক্ না কেন এ কবিতায় 'পাল্লাদাস' নাম ও প্রসঙ্গ যেন অবধারিতভাবেই এসে গেছে। এই কবিতারই শেষভাগে গ্রিক পাল্লাদাসের সূত্রে শক্তি প্রায় অবিশ্বাস্যভাবেই ব্যবহার করেছেন প্রাচীন গ্রিক শোকগীতির অনুষঙ্গবাহী শব্দ 'ডার্জ' (dirge)। *পাড়ের কাঁথা*

মাটির বাড়ি-র **পোকায় কাটা কাগজপত্র** কবিতায় প্রায়-অকস্মাৎ চলে এসেছে স্বল্প-পরিচিত একটি রাজবংশের প্রসঙ্গ— 'হোহেনজোলার্ন'। এই জার্মান রাজবংশ থেকেই এসেছিলেন প্রুশিয়া ও জার্মানির নৃপতিরা। এই গম্ভীর ও অচেনা 'হোহেনজোলার্ন'-এর সঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চপল ভঙ্গিতে অন্ত্যমিল ঘটিয়েছেন 'মার্টিন ও বার্ন' দিয়ে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ আধুনিকতার এক বিশিষ্ট উত্তরাধিকার। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে এ-ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ আগ্রহী নিরীক্ষক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও অতিকথা ও পুরাণের বেশ কিছু প্রসঙ্গ/অনুষঙ্গ আমাদের নজরে পড়বে। নিচে একটি সংক্ষিপ্ত বাছাই তালিকা উদ্ধৃত হল :

কাব্যগ্রন্থ	কবিতার নাম	প্রসঙ্গ
অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়	**মানুষ ভিখারি হতে ভালবাসে**	'তাহার নকল সাজ **ব্যর্থপ্রাণ জেরেমির মতো।'** বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত 'বুক অব জেরেমিয়া' এক হিব্রু দিব্যদর্শীর পুরাণকাহিনী। আসিরিয়ার পতন ও জেরুজালেমের ধ্বংসের যে ছবি এঁকেছিলেন জেরেমিয়া তাতে এই ভবিষ্যদ্বক্তাকে 'ব্যর্থপ্রাণ' বলে ভাবা যেতেই পারে। শক্তি নামটিকে ঈষৎ সংক্ষেপিত রূপে ব্যবহার করেছেন। খ্রিস্টিয় পুরাণের এই প্রায়-অজ্ঞাত প্রসঙ্গটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।
ঐ	ঐ	'একটি ভেড়ার পিছু-পিছু হেঁটে পেয়েছি তোমায়, **ডেলফির মন্দিরে নয়....।'** পারনাসাস পর্বতের ঢালে অবস্থিত ডেলফি ছিল এক প্রাচীন গ্রিক শহর। এখানে ছিল দেবতা অ্যাপোলোর মন্দির। ডেলফি শহর ও ডেল্ফীয় প্রত্যাদেশ গ্রিক অতিকথা তথা প্রাচীন গ্রিক নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। উদ্ধৃত পংক্তিতে যে 'ভেড়ার পিছু-পিছু' হাঁটার কথা রয়েছে সে প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে অ্যাপোলো মূলত ছিলেন মেষপালকদের পৃষ্ঠপোষক।

কাব্যগ্রন্থ	কবিতার নাম	প্রসঙ্গ
অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়	**একটি হৃদয় হইতে**	'আমাদিগের ভাষা কি **সলোমনের বিচার**?' খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের ইজরায়েল-নৃপতি সলোমন তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য বিশেষ যশস্বী ছিলেন।
ঐ	**আজিকে যে শান্তি**	'...তখন যে-আকস্মিকতার/ চারিত্র-গর্বই ছিল প্রিয় **প্রোমেথুসীয় বিকৃতি**!' গ্রিক পুরাণবৃত্তের এই আদৃত বিপ্লবী চরিত্রটিকে দেশ-বিদেশের বহু কবি-লেখকের মতো শক্তি ব্যবহার করেছেন, তবে বিশেষণপদরূপে।
ঐ	**পৃথিবীর শেষদিনে**	'মাইল মাইল হ্যারিসনে নেমেছিল **থেসিউস**।' গ্রিক পুরাণে এথেনীয় রাজকুমার বীর থেসেউসের বহু কীর্তির উল্লেখ আছে। দীর্ঘ হ্যারিসন রোডে থেসেউসের নেমে আসার এই উল্লেখে সেই পুরাণপ্রসঙ্গ যেন সমসময়ের প্রেক্ষিতে লগ্ন হয়েছে।
ঐ	**সমাপ্ত**	'**টিরিয়েল** পেয়েছিল জরার বিষাদ।' ইংরেজ কবি ব্লেকের অসম্পূর্ণ, আত্ম-উন্মোচক কাব্যগ্রন্থ 'টিরিয়েল' (আ. ১৭৮৯)-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র।
সোনার মাছি খুন করেছি	**এলেজি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়**	'প্রিয় **অর্ফিয়ুস**, আমার স্তবেই হলো হার'। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত কবি-চরিত্র তার বাদ্যসঙ্গীতে মুগ্ধ অরণ্যের পশুদের ; পাতালপুরী থেকে মুক্ত করে এনেছিলো প্রিয়তমা ইউরিডাইসকে। এই কবিতায় সেই অলৌকিক কবি ও সঙ্গীতস্রষ্টার নাম ও বাঁশির প্রসঙ্গ এসেছে।
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান	**সমাধিফলকের স্মৃতি**	'সেখানে তুমি কি গেছো? **একিলিস** গেছে?' ট্রয় যুদ্ধের কিংবদন্তি চরিত্র একিলিস গ্রিক পুরাণ তথা হোমারের *ইলিয়াড*-এর সুপ্রাচীন কাহিনীবৃত্ত থেকে পাঠককে চমকিত করে উঠে এসেছে কবির সমকালে।

কাব্যগ্রন্থ	কবিতার নাম	প্রসঙ্গ
পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি	**চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ**	**'বিষণ্ণ সময় নোয়া, গলুই-এ শ্যাওলার চিহ্ন দেখ'।** এ [illegible] নোয়া সততা ও [illegible] প্রতীক-চরিত্র। পৃথিবীকে পাপমুক্ত করতে ঈশ্বর যে জলোচ্ছ্বাস পাঠিয়েছিলেন নোয়ার নৌকা সেই প্লাবনকে অতিক্রম করে নতুন প্রাণের সৃষ্টি করেছিল। এখানে 'গলুই' শব্দটি নোয়ার 'আর্ক'-কে মনে করিয়ে দেবে।
চর্তুদশপদী [illegible]	**৫৬ সংখ্যক**	**'অ্যাপোলোর মন্দিরের উজ্জ্বলতা** স্বগত মার্বেলে!' দেবরাজ জিউসের পুত্র অ্যাপোলো গ্রীক সূর্যদেবতা। উজ্জ্বলতা তাই অ্যাপোলোর সহজাত। ডেলফির মন্দিরে ছিল অ্যাপোলোর অধিষ্ঠান।
সুখে আছি	**এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে**	**'চাঁদ বেনে** উড়ে যায় কোঙ্কন সিংহল।' মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর নামক বণিক চরিত্রটি কবির অতীতচারী দূরকল্পনায় প্রতিভাত হয়েছে। এই চাঁদ বেনের আবারও উল্লেখ পাই *মানুষ বড়ো কাঁদছে* কাব্যগ্রন্থের **মালা নেই** কবিতাটিতে।

এসব ছাড়াও শক্তি তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যের দুই অগ্রণী দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ও রাসেলের নাম-প্রসঙ্গ ; এসেছে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কেনেডি ও ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাম ; সাঁওতাল বীর-গাথার শীর্ষ ব্যক্তিত্ব বীরসা মুণ্ডা ও দুষ্কৃতিদের হাতে নিহত নাট্যকার ও অভিনেতা সফদর হাসমির প্রসঙ্গ ; রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন তো ছড়িয়ে আছে বহু কবিতায়। সাহিত্যপাঠ ও জীবনযাপনের নানা স্মৃতি-অনুষঙ্গ -অভিজ্ঞতার উল্লেখ শক্তির কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য প্রকরণ-পন্থা।

রবীন্দ্র পংক্তি/অনুষঙ্গ : 'এবং তোমার গানে আমি নিই সহজ নিশ্বাস'

রবীন্দ্রনাথের গান ভালোবাসতেন ও দরাজ গলায় গাইতেন শক্তি। তাঁর ভালোলাগা রবীন্দ্রগীতির কলি প্রায়শই নিজের কবিতায় ব্যবহার করেছেন শক্তি এক অন্তর্লীন মনস্কতায়। জীবনানন্দকে বাদ দিলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথই তাঁর এক নিশ্চিত আশ্রয় যাঁর গান ও কবিতা অহরহ আপ্লুত করেছে শক্তির কবিতার সৃজনশৈলী :

(১) **ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী** (কবিতার শিরোনাম—*ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো*)

(২) **যাত্রী তুমি,** পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে (**যেতে যেতে,** *সোনার মাছি খুন করেছি*)

(৩) **দূরদেশী ও রাখাল-ছেলে,** কই ধেনু উচ্ছন্ন গোষ্ঠ (**এই বসন্তে বৃষ্টি হবে,** *ঐ*)

(৪) **নীল দিগন্তে ফুলের আগুন**— সেই আগুন পোড়াচ্ছে কবে? (*ঐ*)

(৫) এ-বয়স খেলনার নয়, **হেলাফেলা সারাবেলার** নয় (**স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি,** *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*)

(৬) **আমার যেদিন ভেসে গেছে........ (২৭ সংখ্যক,** *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)

(৭) **এমনি দিনেই শুধু বলা যায়...... (৬৫ সংখ্যক,** *ঐ*)

(৮) **না চাহিলে যারে পাওয়া যায়......** (সেই রাক্ষসী, *পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*)

(৯) **যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে (অতিদূর দেবদারুবীথি,** *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)

(১০) **এ পরবাসে রবে কে, কে রবে সংশয়ে (তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না,** *এই আমি যে পাথরে*)

(১১) **চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায় (একদিন, শৈশবে, সমুদ্র, ঐ)**

(১২) **স্বস্তিতে আজ থাকতে দে না আপনমনে (আপন মনে,** *পরশুরামের কুঠার*)

(১৩) ডাকবাংলো থেকে কেউ উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে বলে—/**দিন যায় রে বিষাদে.... (দাগ,** *আমাকে জাগাও*)

(১৪) তিনটি দেয়ালগিরি, ভূমধ্যে কার্পেট,/কণ্ঠে, তার **যেদিন ভেসে গেছে আর/পিপাসা নাই মিটিল...... (বিজয়া দশমী বড় শারীরিক,** *ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে*)

(১৫) শুনায়ো আমারে ফিরে সেই গান, সেই অন্ধকারে/ **যেখানে ঝড়ের রাতে আবার তোমারই অভিসার (যে গান শোনায়েছিলে/** *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*)

(১৬) **আমার সকল দুখের প্রদীপ** জ্বলে (**আমার সকল দুখের প্রদীপ, ঐ**)

উদ্ধৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক কলির কিছু পরিবর্তন করে শক্তি তাঁর কবিতার মেজাজ ও ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন আর অন্যত্র রবীন্দ্রগীতির প্রথম চরণ অপরিবর্তিত রূপে কবিতায় প্রবিষ্ট হয়েছে অনুষঙ্গ বা উল্লেখ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের গানের পদ বা পদাংশের এই ব্যবহারকে শক্তির অন্যতম প্রকরণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা কেবলমাত্র তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রীতিতেই নিহিত ছিলো এমন নয়। শক্তি তাঁর একাধিক রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের বিষয়টি নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। সত্তর দশকের জটিল ও ভঙ্গুর সময়ে দাঁড়িয়ে শক্তি *সুখে আছি* কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় রবীন্দ্রপংক্তির বিপন্ন অনুভবের কথা লিখেছিলেন—'আমি প্রাণপণ এক শিরোনাম নিয়ে নির্যাতন/ পেতে থাকি রক্তে ওই আধভাঙা রবীন্দ্রনাথের/উচ্চারণ **অন্ধ আমি (হায় অন্ধ) অন্তরে-বাহিরে! (অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে)**। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকপট ঋণস্বীকার দেখি *ঈশ্বর থাকেন জলে* কাব্যের **তুমি তারই পূজা নেবে** কবিতায়—'অথচ তোমার দয়া সুখেদুঃখে সম্পদে-বিপদে/আমায় করেছে ঋণী, শুধুমাত্র করতলগত/**এবং তোমার গানে আমি নিই সহজ নিশ্বাস**/মুহ্যমান প্রাণ পায় গান তার শ্রবণে পৌঁছালে।' যে শান্তিনিকেতনে শক্তি বারবার গিয়েছেন এবং যেখানে তাঁর অকাল প্রয়াণ, রবীন্দ্রনাথের সেই শান্তিনিকেতন শক্তির বহু কবিতায় এক ঈপ্সিত কল্পভূমি, প্রকৃতি ও শিল্পের সৃজনরহস্যে চিহ্নিত— 'তবু অচঞ্চল/ হাওয়ার

নিভৃত শান্তি এনে দেয় শান্তিনিকেতনে' (**এই চঞ্চলতা**, *ভালবেসে ধুলোয় নেমেছি*) অথবা 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে বৃষ্টি পাই রোজ/আকাশমণির বনে শুধু বৃষ্টি পড়ে/... খোয়াই, মেঘের রেখা নিষ্পন্ন আকাশে' (**সেগুন মঞ্জরী থেকে শুধু বৃষ্টি পড়ে**, *এই তো মর্মরমূর্তি*) অথবা 'কতো ছবি, কতো গান, উদাস হাওয়ায়/আকাশমণির চারা কানালের পাশে,/কিংকরের দীর্ঘগান যদি ভেসে আসে।/শান্তি পাই, তছনছ—শান্তিনিকেতনে!' (**জঙ্গল বিষাদ আছে**, *ঐ*) স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও গীতিময়তা শক্তির কবিতার নির্ভুল লক্ষণ এবং রবীন্দ্রগীতির বহু ছিন্ন পংক্তি রামকিংকরের দীর্ঘ গানের মতোই *ভেসে এসেছে* শক্তির কবিতায় অন্তর্লীন আবগের টানে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র ঠিক পরেই লেখা **কবিতার কাছে সমর্পিত** শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তি কলাকৈবল্যবাদী মোহে কবিতাকে 'ঘোরতর অসামাজিক' নিদান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক নেতিমূলক মন্তব্য করেছিলেন—'আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যে-পরিমাণ সুরবোধ পেয়েছিলাম সে-পরিমাণ কবিত্ব পাই নাই।'[৫২] অথচ প্রায় এই সময় থেকেই—*ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো* থেকে শুরু করে—শক্তির বহু কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে, বহু কবিতার অবয়বে রবীন্দ্রনাথের পংক্তি ও অনুষঙ্গের ব্যবহারে, শান্তিনিকেতন তথা বীরভূমের রাঙামাটির প্রকৃতির বহুল উল্লেখে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বারবার প্রমাণিত হয়েছে। মনে হয় রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের আপাত- বিরোধিতায় তিরিশের যে-সব অগ্রণী কবি বাংলা কবিতার পাদপীঠে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের হাত ঘুরে যে প্রতিষ্ঠান-বৈরী মনোভঙ্গি শক্তি ও তাঁর প্রজন্মের কবিদের চিহ্নিত করেছিলো, ক্রমে তা থেকে সরে গিয়ে শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি আমাদের কাছে জল-হাওয়া-আকাশের মতই অনিবার্য। আমাদের নিঃশ্বাসে, আমাদের রক্তে এক হয়ে মিশে আছে।'[৫৩] শক্তির কবিতায় রবীন্দ্রগীতির চরণ যেভাবে এসেছে তাতে বোঝা যায় যে বাউলের সহজিয়া আবেগময়তায় শক্তি গানের পংক্তিকে কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন— 'যখনি আকাশে থাকো **ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার**' (**পুনর্বিবেচনা**, *সোনার মাছি খুন করেছি*)। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বিষ্ণু দে-র কবিতায় রবীন্দ্র-পংক্তি যেমন বিরোধাভাস তৈরি করে তেমন বৌদ্ধিক সচেতনতার জটিলতা শক্তির ক্ষেত্রে দেখি না। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের রসায়নে তাঁর কবিতার 'হয়ে ওঠা'র[৫৪] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি বা অনুষঙ্গ যেভাবে মিশে গেছে তা শক্তির নন্দনভাবনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যৌবনের ঐতিহ্যবিরোধিতার কারণে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষমূলক মন্তব্য করেছিলেন শক্তি, সেই রবীন্দ্রনাথের গানের পর গান যেভাবে শক্তির ভাব ও ভাষার বলয়ে স্বচ্ছন্দে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তাতে করে স্বীকার করতেই হয় যে শুধু রবীন্দ্রগীতির সুরই নয়, তার কথাও শক্তির হাতে নিশ্চিত স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

সূত্র নির্দেশ :

১. Jonathan Culler, *Structuralist Poetics*, London, 1975, p. 56. উদ্ধৃতিভুক্ত 'highly patterned language' অংশটি কালার নিয়েছেন অপর এক ভাষাবিজ্ঞানী রোমান ইয়াকবসনের কাছ থেকে।

২. Thomas Carlyle, 'The Hero as Poet', *On Heroes and Hero Worship*, (London, 1968, p. 118)—এঁর এই মন্তব্যটি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : '......body and soul, word and idea go strangely together here as everywhere.'
৩. দ্রষ্টব্য : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (কবিতার ভাষা)।
৪. কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষ একে বলেছেন, 'শব্দের নতুন সৃষ্টি' ; দ্রষ্টব্য : শঙ্খ ঘোষ, *নিঃশব্দের তর্জনী*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩।
৫. চেক ভাষাবিজ্ঞানী হাভ্রানেক ও মুকারোভ্স্কি উল্লেখিত 'aktualisace' শব্দটিকে পল গারভিন ইংরেজিতে তর্জমা করেন 'foregrounding' রূপে। 'পশ্চাদভূমি' বা 'background'-এর বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে 'পুরোভূমি' বা 'foreground', আর তা থেকেই 'foregrounding', মুকারোভ্স্কি যাকে ব্যাখ্যা করেছেন 'The aesthetically intentional distortion of the linguistic components' বলে (দ্র: Paul Garvin. *The Prague School of Linguistics* in A. Hill [ed.], *Linguistics To-day*, New York, 1969, p. 236)।
৬. Noam Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, 1965, pp. 16-18.
৭. Roman Jakobson, *Closing Statement : Linguistics and Poetics in Modern Criticism and Theory* ed. David Lodge, London, 1988, p. 39.
৮. Bernard Groom, *A Short History of English Words*, London, 1957, p. 86.
৯. William Empson, *Seven Types of Ambiguity*, London, 1953, p. 1.
১০. দ্রষ্টব্য : The Times Literary Supplement, May 1, 1924-এ প্রকাশিত একটি সমালোচনা-নিবন্ধ যেটি সঙ্কলিত হয়েছে G.F.J. Cumberlege সম্পাদিত *Several Essays* গ্রন্থে (London, 1952, p. 139).
১১. দ্রষ্টব্য : Cecil Day Lewis, *The Poetic Image*, London, 1947, Chs. 1/2.
১২. সমরজিৎ ও ইনা সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) *শক্তির কাছাকাছি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রু: '৯৬, পৃ. ৭৪।
১৩. *কবিতীর্থ*, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ১৯।
১৪. *অন্যমনে*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ; পুনর্মুদ্রিত, *কবিতীর্থ*, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৬৩-৬৪।
১৫. *কা কবিতা? অক্ষযুগ* ১৩৮০, ১ম সঙ্কলন ; পুনর্মুদ্রিত *কবিতীর্থ*, ঐ, পৃ. ৬৯
১৬. *সাহিত্যসেতু*, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, জুলাই '৯৫, পৃ. ১১৯।
১৭. শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৭৮-৭৯।
১৮. *অন্বীক্ষণ*, দশম সঙ্কলন, ১৩৭৫।
১৯. সমীর সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*, প্রতিক্ষণ, ১৯৯০, পৃ. ৩৮-১০৭।
২০. দ্রষ্টব্য : শামশের আনোয়ার, *শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, জানু : '৯৬, পৃ. ১
২১. (৪) নং সূত্রনির্দেশ দ্রষ্টব্য।
২২. শঙ্খ ঘোষ, 'এই শহরের রাখাল', দেশ, ২০মে ১৯৯৫, পৃ. ৩০।
২৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *গদ্যসংগ্রহ* ১ম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬২।
২৪. ভূমিকা, *কৃত্তিবাস সঙ্কলন* এক, প্যাপিরাস, ১৯৮৪।
২৫. দ্রষ্টব্য : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যসমগ্র* ৪-এর 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ, পৃ. ২২৯
২৬. দ্রষ্টব্য : সুমিতা চক্রবর্তী, 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : মানুষের মুখ', বিনোদন বিচিত্রা, ৫ মে '৯৫।
২৭. শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য*, পৃ. ৩৮।
২৮. Aristotle, *On the Art of Poetry*, trans. Ingram Bywater, O.U.P., 1967. p. 78.

২৯. Cecil Day Lewis, *The Poetic Image*, 9th Impression. 1958, p. 23.
৩০. Ibid, p. 18.
৩১. Ibid, p. 18.
৩২. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ* (১ম খণ্ড) পৃ. ৬৪।
৩৩. শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য*, পৃ. ৩৯।
৩৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পদ্যসমগ্র (৩), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭১
৩৫. দেবারতি মিত্র, 'জীবনানন্দের কবিতায় মহিলা, প্রেমিকা, অপ্রেমিকা এবং কন্যা', *এই সময় ও জীবনানন্দ*, শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪।
৩৬. 'সাহিত্যসেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার : সাক্ষাৎকারেব তারিখ ৩১ অক্টোবর, '৯৪ ; সূত্র : দেবতোষ বসু (সম্পা.) *এই কাব্য এই হাতছানি*, দে'জ পাবলিশিং, নভে : '৯৭, পৃ. ৯৭।
৩৭. সিদ্ধার্থ, আশ্বিন, ১৯৭৮, *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ১১৯।
৩৮. শঙ্খ ঘোষ, *ছন্দের বারান্দা*, অরুণা প্রকাশনী, ১৩৯৮ সংস্করণ, পৃ. ৪৭।
৩৯. তদেব, পৃ. ৪৬,
৪০. *পদ্যসমগ্র* (১), আনন্দ, কলকাতা, ২য় সং, এপ্রিল '৯৬, পৃ ২৯৫।
৪১. দ্রষ্টব্য, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র প্রথম সংস্করণের কবিকৃত ভূমিকা, *পদ্যসমগ্র* (১), পৃ. ২৯৪।
৪২. 'সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার' (কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬) গ্রন্থের জ্যাকেটের ভেতরের অংশ দ্রষ্টব্য।
৪৩. প্রদীপ ভট্টাচার্য (সম্পা.) *শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা*, রক্তকরবী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮।
৪৪. *কবির কথা কবিতার কথা*, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. ৯২।
৪৫. *পদ্যসমগ্র* (১), পৃ. ৬৫।
৪৬. তদেব, পৃ. ২৮১।
৪৭. তদেব, পৃ. ২৯১-৯৩।
৪৮. সূত্র : কবিপত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, *শারদীয় আজকাল*, ১৪০২, এবং কবির *নীলরতন হাসপাতালের ডায়েরি*, *স্মৃতিস্মারক*, নভেম্বর, '৯৫।
৪৯. সমীর রায়চৌধুরী, 'শক্তি : চাইবাসাপর্ব', *শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা*, পৃ. ১৭।
৫০. দ্রষ্টব্য, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের 'দক্ষিণ পরদেশি' ও পিনাকী ঘোষের 'তুমি কবিগান বেঁধে দোরে-দোরে অমন ঘুরো না' প্রবন্ধ দুটি ; প্রদীপ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা।*
৫১. সমরজিৎ কর ও ইনা সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *শক্তির কাছাকাছি*, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩।
৫২. *এই কাব্য, এই হাতছানি*, পৃ. ১১২।
৫৩. তদেব, পৃ. ৩৫।
৫৪. কবিতার এই 'হয়ে ওঠা'র কথা বলেছিলেন শক্তির সমকালীনদের অন্যতম কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'বাংলা কবিতা, আধুনিকতা' প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য, *স্থির বিষয়ের দিকে, কলকাতা*, ১৯৭৬, পৃ. ২৯।

চতুর্থ অধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নন্দনভাবনা : একটি রূপরেখা

একজন কবির কবিকৃতির সামগ্রিক মূল্যায়নে কবিতার নির্মাণশিল্প তথা নন্দন বিষয়ে তাঁর ভাবনার একটি রূপরেখা সন্ধান বিশেষ জরুরি বলে মনে হয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনায়, অর্থের ওপর অর্থের অবিরাম খেলায় কবিতার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই নন্দনতাত্ত্বিক এবং সে অর্থে কবির নন্দনভাবনা নিহিত থাকে কবিতারই অনন্য রূপনির্মাণে। আবার কবি কবিতাশিল্প বিষয়ক নানা আলোচনা-মন্তব্য-বিবৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কবিতার প্রকরণ তথা নির্মাণ সম্পর্কে রেখে যেতে পারেন নানা সূত্র। কিভাবে স্থান, কাল, সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে কবিসত্তার বহুমাত্রিক টানাপোড়েন ও মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত হয় কবিতার জগৎ, কিভাবে 'চিহ্নক' (Signifier) ও 'চিহ্নিত' (Signified) -র অন্তর্গূঢ় সম্পর্কের বিদ্যুৎঝলকে 'শব্দের নতুন সৃষ্টি' সম্ভব হয়ে ওঠে, তার যথার্থ অনুসন্ধানে কবির নন্দনভাবনার আন্দাজ পাওয়া প্রয়োজন।

স্বভাবে বেপরোয়া ও ভবঘুরে, কবিতা রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ও অতিপ্রজ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অজস্র কবিতায় ছড়িয়ে থাকা নানা উল্লেখ ও উপাদান অবলম্বনে এবং বিভিন্ন টুকরো গদ্য, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে পাওয়া নানা মন্তব্য পর্যালোচনা করে শক্তির নন্দনভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কন সম্ভব। ভাষা, ছন্দ, রূপবন্ধ সচেতন একজন কবির শিল্পমনস্কতা, দেশ-কাল-প্রকরণের গ্রন্থনা, সবই বুঝতে সাহায্য করবে নন্দন-নিবিষ্টতার এই অনুসন্ধান।

বিভিন্ন সময়ে তাঁর বহু সাক্ষাৎকার ও আলোচনায়, আত্মকথনধর্মী বহু প্রকীর্ণ গদ্যরচনায় শক্তি কবিতার বিষয় ও প্রকরণ, কবিতা নির্মাণের নানা উপকরণ, আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, অক্লান্তভাবে কথা বলে গেছেন পূর্বসুরি ও সমকালীন কবিদের রচনা সম্পর্কে। কবিতা নিয়ে তাঁর এইসব ভাবনার কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আমরা আলোচ্য বিষয়টিতে প্রবিষ্ট হতে পারি :

(১) সকলপ্রকার কবিতাই নিরীক্ষামূলক, প্রধান কবিতা বলে কিছু নাই, কবিতার কোনো ছাঁচ নাই, মেশিনঘর নাই, দপ্তরী নাই। যাত্রীর যেমন যাত্রার প্রতি অনুরক্তি আছে, কবির তেমনি কবিতার প্রতি, কবিতা ইর‍্যাশনাল.........এথিকস কবিতা-বহির্ভূত.........পুরুষ যেমন মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কবি তেমনই পৃথিবীর প্রতি।......প্রকৃতি যেভাবে শুকনো ঘাসের কাছে যায়, কবিরা তেমনই শব্দের কাছে.....।.......কবিতার কোনো বাস্তবিক উদ্দেশ্য নাই। কবিতা কবিগণের কাছে একপ্রকারের নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার।
[কবিতার কাছে সমর্পিত (১৯৬২)][১]

(২) আমি, অনেকে জানেন, অপরিমেয় ইতর ও গ্রাম্যভাষাকে সরাসরি সমাজে ব্যবহারে আগ্রহী। কিন্তু কেন?....মনে হয়, ঐরূপ ভাষা, স্পন্দন-সমেত, সাহিত্যভাষায় প্রবেশ করানোর এক লিখিত সনদে স্বীকৃত হয়েছিলাম আমি, আমরা বাল্যবয়সেই। ওরকমভাবে কপাট বন্ধ করে রাখার কারণও আমার কাছে পরিষ্কার নয় যে। [ঐ][২]

(৩) কা কবিতা? তা, আমিও জানি না। কিংবা, কোনো সময় থেকে জানতে জানতে আমি পদ্য লেখা শুরু করিনি। এবং বোধ করি কেউই তা করে না।....অন্তর্গত পদ্যভাব প্রায় সকলের আছে। চাষাভূষোরও আছে, আশা করি।........ কবিতা কি, আলঙ্কারিকদের মুখে—যারা আমরা পদ্যচর্চা করি, তারা কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারব না।.... কবিতা আমার প্রাণের আরাম, আমার আত্মার শান্তি, আমার হৃদয়ের দুঃখ-সুখের সমুদ্র—আমার অবলম্বন। কবিতা আমার দুপুর রোদের ছায়া—যা বাইরে পড়ে না, পড়ে ভেতরে—আমার সঙ্গে পৃথক সে কখনোই নয়। **[কা কবিতা, অন্ধযুগ (১৯৭৩)]**[৩]

(৪) পদ্য আমি আকাশ বাতাস জল হাওয়া থেকে কুড়িয়ে পাইনি কোনোদিন। অনেকের যেমন পংক্তির পর পংক্তি অনায়াসে চলে আসে, আমার অভ্যাস তেমন নয়। লিখতে বসলে তবেই লেখা। তার আগে আমি অকবি। যখন লিখতে বসতাম, তখন জলের মতো অনর্গল পদ্য—এমন কি একটি বসায় পঁচিশ-তিরিশ পদ্য লিখে চিৎপাত হয়েছি। পদ্য লেখার পর আমার আর কোনো কায়িক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ....যখন পদ্য লিখি, মনে হয় আমি পাঁক জলে ডুবি। তখন আমার চেহারা, মনে হয়, বদলে যায়। **[পদ্যাপদ্য সম্পর্কে দু এক কথা, বেলা-অবেলা (১৯৭৭), পরশুরামের কুঠার কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা (১৯৭৮)]**[৪]

(৫) আমি বিশ্বাস করি সারাজীবন ধরে যে কোন কবি একটিই কবিতা লিখে যান। শুধু টুকরো করে বিভিন্ন নামে সেই একটি কবিতাকেই.......লিখে যেতে হয়।.....পদ্য টুকরো হলেও যন্ত্রাংশ নয়। পদ্য লেখাটা শুধুমাত্র কারিগরি নয়। এর আবেদন নির্ভর করে পাঠকের imaginative faculty, subconscious বা অন্তর্চেতনার ওপর।.......গদ্য ও পদ্য-র মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। গদ্যকার হ'ল মজুর, কবি হ'ল শিল্পী। তবে মজুরও কখনো শিল্পী হয়ে ওঠে। .....তবে গদ্যশিল্পী হয়ে ওঠাটা একটা বড় পরিশ্রম সাপেক্ষ।.....পদ্য লিখতে কী শ্রম নেই? নিশ্চয় আছে।......আধুনিক কবিকে যথেষ্ট শ্রম করতে হয়—মানসিক শ্রম। একটি সার্থক পদ্য লিখতে গিয়ে তাকে তচনচ হয়ে যেতে হয়। এটা সবচেয়ে বড় কথা, তার সেই মানসিক ওলটপালট অবস্থাকে মাত্র কিছু কিছু শব্দের মধ্য দিয়ে পদ্যে গড়ে তুলতে হয়। **[স্বগত সংলাপ, পদ্যবন্ধ (১৯৮১)]**[৫]

(৬) বুকে বালিশ চেপে লেখা আমার অভ্যেস। নিজেকে উপুড় করে কলসী-কুঁজোর মতো। উপুড় করলে ওদের থেকে যেমন জল পড়ে মেঝেয় ছড়ায়, তেমনিই আমার কলম থেকে কাগজের ওপর কালো-নীল অক্ষর। **[গদ্যের গার্হস্থ্যে, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩]**[৬]

(৭) প্রকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব ভেবে-চিন্তে দিই না তবে যে-লেখা লিখতে চাই, সেই লেখাই প্রকরণকে সঙ্গে নিয়ে আসে। লিখবার 'ইন্সপিরেশন' হয় কিনা ঠিক বুঝতে পারি না, তবে একটা ঘোর আসে।........'ক্রাইসিস' থেকে কবিতার প্রেরণা আসে বৈকি—তবে রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি ততোটা আন্দোলিত করে না। **[সাক্ষাৎকার, অন্যমনে, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]**[৭]

(৮) আমার লেখায় প্রত্যক্ষ কিছুর প্রায় নিমন্ত্রণ নেই বললেই চলে।.......পরোক্ষ কিছু টান-টোনের মাধ্যমে আমি প্রত্যক্ষ ত্যাগ করতেই ভালোবাসি। তেমনি, রাজনীতি স্পষ্ট ও সোচ্চার নয় আমার লেখায় ; আমি অমন উচ্চারণময় উচ্চকণ্ঠ লেখা মনে মনে এড়িয়ে যেতে ভালোবাসি। **[সাক্ষাৎকার, কবিতা পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৯৭০]**[৮]

(৯) কবিতা লিখব বলে কবিতা আসে না। ট্রামে-বাসে যেতে-যেতে হাঁটতে-হাঁটতে কখনো কবিতার লাইন পাই নি। যখন লিখতে বসি তখন আসে। হয়তো কোন পদ্য লিখতে বসেছি, তখন একটা অবস্থা তৈরী হতে থাকে।.....বসার পটভূমি কিন্তু সবসময় আছে। আমার জীবন-যাপন, আমার চলা-ফেরা, তার মধ্যেই পদ্যের পটভূমি রয়ে গেছে।
[সাক্ষাৎকার, পদ্যবন্ধ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০][৯]

(১০) কবিতা মাত্রেই আত্মজৈবনিক। আমার ক্ষেত্রে সেটা আরো বেশি। তার কারণ কী আমি জানি না। কিন্তু জীবন ও জীবনের চতুষ্পার্শ ছাড়া আমি কখনও কবিতা লিখতে পারি না। **[সাক্ষাৎকার, সাহিত্যসেতু, জুলাই, ১৯৯৫]**[১০]

একথা অনস্বীকার্য যে একজন প্রধান কবির ভাবনায় কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক, দেশ, কাল ও মানুষের বিবিধ প্রসঙ্গ, সমকাল ও চিরকালের কবিতার প্রতিফলন, স্মৃতিরেখা, অনুষঙ্গ ইত্যাদি থাকবেই। 'কৃত্তিবাস' ও 'হাংরি জেনারেশন'-এর উত্তালতা থেকে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় উঠে এসেছিলেন কবিতার রঙ্গভূমিতে, আমৃত্যু যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এলোমেলা, শৃঙ্খলাভঙ্গ কারী, তাঁর বহু গদ্যরচনায় ও সাক্ষাৎকারে এভাবেই ছড়িয়ে আছে কবিতার নন্দন বিষয়ক নানা মূল্যবান মন্তব্য। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে কবিতাশিল্পের নান্দনিক ভাবনা বিশেষ ছিল না, একথা অপ্রমাণ করার একটা সুযোগ শক্তি আমাদের করে দেন।

কবিতা বিষয়ক তাঁর একেবারে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা **কবিতার কাছে সমর্পিত** থেকে উদ্ধৃত গদ্যাংশটি শক্তিকে এক কলাকৈবল্যবাদী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিলেও, তাঁর উত্তরপর্বের নানা অভিমত পর্যালোচনা করলে শক্তিকে নিছক কলাসর্বস্বতার জীবনবিমুখ পদকর্তা বলে ভাবাটা সরলীকৃত বলে মনে হয়। এ প্রবন্ধে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতাকে বলেছিলেন 'ইররাশনাল' এবং বাস্তবিক উদ্দেশ্যবিহীন, কবিতাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ঘোরতর অসামাজিক' বলে, সেই শক্তিই কবিতার প্রকরণে মাটি ও মানুষের টানে 'অপরিমেয় ইতর গ্রাম্যভাষাকে' সরাসরি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যক্ষ ও সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক অর্থে সামাজিকতার যে দায়, শক্তি সম্ভবত তাকেই ঈষৎ ব্যঙ্গভরে নিজেকে 'অসামাজিক' বলার পরিহাসটুকু উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। শক্তি যখন লেখেন যে 'অন্তর্গত পদ্যভাব প্রায় সকলের আছে। চাষাভূষোরও আছে, আশা করি', তখন মনে হয় তিনি ইংরেজ রোমান্টিক কবি কোল্‌রিজের 'primary imagination'-এর কথাই বোঝাতে চাইছেন। যে অর্থে কেউ কেউ নয়, সকলেই কবি।

সারাদিন বসে একটানা একটি সুদীর্ঘ কবিতা অথবা অনেকগুলি কবিতা লিখতে পারতেন শক্তি এবং তাতে মনে হতে পারে কোনো এক আশ্চর্য ও অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ততায় অবিরাম সৃজনের জাদু-দক্ষতা তাঁর করায়ত্ত ছিল। কিন্তু শক্তির জবানবন্দীতে (**উদ্ধৃতি ৪, ৫, ৬, ও ৭**) জানতে পারি কিভাবে কোনো একটি সময়ে কোনো একটি বহিঃপ্রেরণায় এক ধরনের ঘোর লেগে যেত মনে, খুলে যেত অনুভবের কপাট, বোধের সমাচ্ছন্নতায়। কবিতারচনার এই রহস্যঘোর কলসী উপুড় করলে গড়িয়ে পড়া জলের মত অনর্গল উজাড় করে দিত 'কাগজের ওপর কালো-নীল অক্ষর'। বহু-প্রাচীন 'প্রেরণা' বা 'ইন্সপিরেশন'-তত্ত্ব কিম্বা রোমান্টিকদের 'spontaneous overflow of powerful feelings' জাতীয় সূত্রের সঙ্গে শক্তির সৃজনভাবনার সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর রহস্যময়তার মূলে রয়েছে এমন এক অবচেতনার জগৎ যেখান থেকে কবির স্বপ্ন ও বাসনাগুলি উঠে এসে ভাষা ও ছন্দের আকৃতিতে ধরা দেয়। শক্তি

নিজেই যে কারণে বলেন—'যখন পদ্য লিখি তখন মনে হয় আমি পাঁক জলে ডুবি' (উদ্ধৃতি ৪) কিম্বা 'লেখা ব্যাপারটাই আমার মনে হয়—আমি যেন একটি পুকুরের মধ্যে ডুব দিলাম, উঠলাম না, যতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ততক্ষণ যা দেখলাম, জানলাম তাই লিখে ফেলা'।[১১] আর এই অবচেতনার এমন এক সংশ্লেষণী শক্তি আছে যে বহু বিচিত্র ও বিরোধী প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ মিলে যায় কবিতার শরীরে। মগ্নচৈতন্যের গূঢ় স্তর থেকে এভাবে যখন কবিতার জন্ম হয় তখন কবি শরীরে ও মনে নিঃশেষিত, দীর্ঘ কায়িক ও মানসিক শ্রম ও সংগ্রামের পর যেমন বোধ করেন জননী জন্মদাত্রী—'পদ্য লেখার পর আমার আর কোনো কায়িক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তখন আমি শক্তির মড়া' (উদ্ধৃতি ৪)। কবিতা রচনা যে যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ এবং একজন আধুনিক কবিকে এ কাজে কিভাবে 'তচনচ হয়ে যেতে হয়' সে কথাও শক্তি অকপটে স্বীকার করেছেন (উদ্ধৃতি ৫)। শুদ্ধ প্রেরণা কিম্বা রোমান্টিক কবিদের স্বতঃস্ফূর্ততার নন্দনসূত্রে শক্তির কবিতা ও কবিতা-সংক্রান্ত ভাবনাকে যথাযথভাবে বোঝা যাবে না। শক্তির কবিতারচনার প্রক্রিয়ায় রহস্যময়তার এক অতীন্দ্রিয় স্পর্শের স্বীকারোক্তি আছে—'আমার যা কিছু লেখা সে সব তো সচেতনভাবে লিখি না—কে যেন লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ-হঠাৎ একটা সময় আসে, এমন একটা গূঢ় অবস্থার মধ্যে চলে যাই। তখন লেখা হয়।'[১২]

এই সূত্র ধরে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নন্দনভাবনায় বিশ শতকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্প-আন্দোলন 'পরাবাস্তবতা' বা 'Surrealism'-এর ধারণার সম্ভাব্য উপস্থিতি বিষয়ে দু-চার কথা বলতে পারি। আঁদ্রে ব্রেঁত প্রস্তাবিত 'সুররিয়ালিজ্‌ম্'-এর শিল্পতত্ত্বে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো 'মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়তা' বা 'psychological automatism'-এর ওপর ; তথ্য ও যুক্তির পথ পরিহার করে, কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্তারে, চিত্রকল্পের উদ্ভট চমৎকারিত্বে শিল্পসৃষ্টির কথা বলেছিলেন পরাবাস্তববাদী কবি-শিল্পীরা ; অবচেতনার মধ্যে দিয়েই সত্যের উপলব্ধির, যুক্তিক্রম বহির্ভূত উদ্দামতার পক্ষে ছিলেন সুররিয়ালিস্টরা। 'পরাবাস্তবতা' বিষয়ে শক্তির যদি কোনো অ্যাকাডেমিক ধারণা নাও থেকে থাকে, তথাপি সুররিয়ালিস্টরা যে কবিকে তাঁদের প্রথম কবি বলে স্বীকার করতেন সেই বোদ্‌লেয়ার শক্তির কবিতারও প্রধান ও আদি প্রেরণাস্বরূপ। কল্পনার উদ্দামতা ও উদ্ভটত্ব, বাক্ প্রতিমার চমৎকৃতি, সমাজস্বীকৃত নৈতিকতা ও রুচিকে আঘাত, স্বাভাবিক যুক্তিক্রম লঙঘন, বাস্তব পরিবেশ অগ্রাহ্য করে অবচেতন ও আবিষ্টতার ওপর নির্ভরতা—এইসব যদি 'সুররিয়ালিজ্‌ম্'-এর প্রতিবাদী নন্দনভাবনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয় তবে শক্তির কবিতায় 'পরাবাস্তবতা'র ধারণা অনুপস্থিত ছিলো বলা যাবে না। বাংলাভাষার যে অগ্রজ কবির প্রতি শক্তি নানা ভাবে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন সেই জীবনানন্দও সুররিয়ালিস্ট ভাবনালোকের বেশ কাছের মানুষ। শক্তির বহু লেখা থেকে আমরা জেনেছি তাঁর আবিষ্ট হয়ে অনর্গল কবিতা রচনার কথা ; পরিমার্জনাও বড় একটা করতেন না ; মাঝে মধ্যে বাস্তব পরিবেশ ছাড়িয়ে অবচেতনার গভীর থেকে উৎসারিত হয়েছে উদ্ভট কল্পদৃশ্য, যুক্তিক্রম লঙঘনকারী শব্দের আবছায়া। দু-একটি নমুনা উদ্ধার করলে আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতা পাবে :

(১) আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন/তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ/অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না

(জরাসন্ধ, *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*)

(২) হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও/ যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে-দূরে/
আরো বহু দূরে কুয়োতলা কালো জল—/হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে-ঘুরে।

(ছায়ামারীচের বনে, *হে প্রেম*......)

(৩) মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে, নিবন্ত ডুমের পাশে তারার আলো/মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির........../মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা—পরপারে/বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ (**সে বড়ো সুখের সময় নয়...,** *সোনার মাছি খুন করেছি*

(৪) মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে/চিরকালীন ভালবাসার বাঘ বেরুলো বনে

(বাঘ, *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই*)

(৫) না নড়ে না চড়ে হিম গর্তের ভিতরে/একা একা,/হরিৎ ডালপালাহীন গাছের জঙ্গলে/কথা বলে মাছ। (**বাহিরের বড়ো,** *হেমন্ত যেখানে থাকে*)

একথা ঠিক যে শক্তির কয়েক হাজার কবিতার মধ্যে এ-জাতীয় রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাছাড়া চিত্রকল্পের উদ্ভটত্ব ও বিস্ময়, যুক্তিক্রম লঙঘনের প্রবণতা, অবচেতনার রহস্যঘোর ইত্যাদি থাকলেও ছন্দ ও মিলের গড়ন তথা বিন্যাসের একটি পরিকল্পনা প্রায় সবক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। তবু 'পরাবাস্তবতা'র শিল্পভাবনা কোথাও কোথাও শক্তির কবিতায় উঁকি মেরে গেছে এমন মনে করাটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। 'সাহিত্যসেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত ৩১ অক্টোবর, ১৯৯৪-এ প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে শক্তি 'সুররিয়ালিজ্‌ম্'-এর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।[১৩]

শব্দ, চিত্রকল্প, ছন্দ ও রূপরীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা শক্তির আপাত-অনায়াস ভাষা ও আঙ্গিকের আড়ালে এক প্রকরণমনস্ক কবিকে চিনিয়ে দেয়। তবু কিন্তু শক্তি মনে করেন 'পদ্য লেখাটা শুধুমাত্র কারিগরি নয়' (**উদ্ধৃতি ৫**)। তার আবেদন নির্ভর করে পাঠকের কল্পনা প্রবণতা ও অন্তর্চেতনার ওপর। তাঁর কাছে কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভব হল প্রকরণের পূর্বশর্ত। প্রকরণকে তিনি আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবেন না, কারণ একটি কবিতা তার 'প্রকরণকে সঙ্গে নিয়ে আসে' (**উদ্ধৃতি ৭**)। যখন হঠাৎই কবিতারচনার আবহাওয়াটি তৈরি হয়ে যায় তখন একবারেই লেখা হয়ে যায় একটি কবিতা, কোনো পরিমার্জনা, কাটাকুটি থাকে না।[১৪] *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যের ভূমিকায় শক্তি নিজেই জানিয়েছেন—'আমি পারতপক্ষে পরিমার্জনা স্বীকার করি না—যেমনভাবে চিত্র ও সঙ্গীতময় পংক্তি আসে, ঠিক তেমনভাবেই কাগজের ওপর বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।' এ জাতীয় স্বীকারোক্তির বিচারে শক্তির কবিতা ব্যক্তিগত ও তাৎক্ষণিক অনুভূতি নির্ভর ; সচেতন ও সতর্ক অনুশীলন তথা বুদ্ধির ভূমিকা তাঁর কবিতার নন্দনে মুখ্য নয় ; তাঁর কবিতার বার্তাটি সংবাহিত হয় অনুভূতি-স্পষ্ট শব্দের (felt words) মাধ্যমে। মেধা ও মননের জাগ্রত শাসনে সৃষ্ট প্রাকরণিক দুরূহতা কদাচিৎ তাঁর অনুভূতির ধারাবাহিক প্রাচুর্যকে ব্যাহত করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়', আর শক্তি নিজের কবিতাকে মনে করলেন 'চিত্র ও সঙ্গীতময়'। অর্থাৎ শুধু চোখে দেখার ছবি নয়, কানে শোনার গানও। যেন এই ছবি ও গানের মধ্য দিয়ে তিনি চলে যেতে চান 'প্রাকৃতিক' পৃথিবীতে যেখানে শিল্পের কোনও 'কৃত্রিম' দাবী নেই। 'প্রাকৃতিক' ও 'কৃত্রিম', এই দুয়ের বৈপরীত্য প্রথমাবধি শক্তির কবিতার অন্যতম প্রসঙ্গ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র **নিয়তি** শীর্ষক কবিতায় লক্ষ্য করা গিয়েছিলো প্রাকৃতিকের দিকে শক্তির ঝোঁক—

'তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে/শিল্পের প্রস্রাব রসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ'। যা কিছু শিল্পিত তাই 'কৃত্রিম' আর তাই তিনি তা বর্জন করতে চান। *সোনার মাছি খুন করেছি*-র **হাওয়া বদল** কবিতাতেও দেখি অনুরূপ প্রবণতা—'হাওয়ার বদল আমি টের পাচ্ছি। নিঃসঙ্গ প্রকৃতি/কাছে এসে খেলা করে, আমিও খেলায় ব্যস্ত হই/কৃত্রিমে শিল্পের জন্ম ভোগ করে এখন বিস্তৃতি/চাই আমি....'। জীবনানন্দের 'চিত্ররূপময়' কাব্যে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়ে থাকে। আলো-রঙ-অবয়বের খেলায় অনুরূপ শৈলীর কাছাকাছি পৌঁছে যান শক্তিও, অস্থির সময়ের রূপকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে। *সোনার মাছি*...র সেই বহুশ্রুত কবিতা **সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়** সেই অবলোকনের দৃষ্টান্ত।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে (*হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*) যে নির্জনতা ও আত্মমগ্নতার সঙ্কেত ছিল, **কবিতার কাছে সমর্পিত** শীর্ষক প্রথম কবিতা-বিষয়ক গদ্যে শিল্পসর্বস্বতার যে সুরটি বেজেছিলো, পরবর্তীকালে শক্তির কবিতা ও কবিতা-সংক্রান্ত নানা পর্যবেক্ষণে তা নানাভাবে পরিমার্জিত হয়েছে। 'জীবন ও জীবনের চতুষ্পার্শ' যে তাঁর কবিতাসমূহের স্থায়ী পটভূমি হয়ে থেকে গেছে সে কথা স্বীকার করেছেন শক্তি। প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় রাজনীতি বর্জন করলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নকশালবাড়ির আন্দোলন, সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক প্রণোদনায় পীড়িত মানুষের কথা তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে। বিশেষ কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সোচ্চার প্রকাশ তাঁর কবিতায় না থাকলেও শক্তির কবিতায় জীবনযাপন ও সমসময়ের প্রশ্নার্ত উপলব্ধি কদাচিৎ উপেক্ষিত হয়েছে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কথায়, 'নিজের রক্তার্জিত অনুশীলনের স্বরলিপিই ছিল শিক্ষানবীশদের সমীপে তাঁর শিক্ষকতার ভিত্তি।'[১৫] 'কবিতা-পরিচয়'-এ ১৯৭০-এ দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে (**উদ্ধৃতি ৮**) প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যধর্মী রচনার ব্যাপারে অনীহার কথা ব্যক্ত করেছেন, 'পরোক্ষ কিছু টান-টোনের মাধ্যমে' সোচ্চার প্রতিপাদ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সে কারণেই সম্ভবত সক্রিয় বাম রাজনীতি ও হাংরি আন্দোলনের দুই প্রতিস্পর্ধী অথচ প্রচারমুখর শিবির ছেড়ে সন্ধান করেছেন, অলোকরঞ্জনের শব্দচয়নে, 'অত্যন্ত গহন গোপন একলব্যতা'।[১৬] কিন্তু তবু আত্মপ্রক্ষেপময়, অনুচ্চকণ্ঠ, রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রত্যক্ষতা থেকে মুখ ফেরানো কবিতাতেও সময় ও সমাজের কোনো কোনো চিহ্ন, মানুষের বেদনার বহু অকপট মুদ্রা ফুটে উঠেছে—'মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ' 'কলকাতার গলি থেকে' আল মাহমুদের বিদায়, মনুমেন্টের নিচে 'রাজনৈতিক মানুষ'-এর মিথ্যা গর্জন, ভালোবাসা শূন্য হয়ে যাওয়া মানুষের কান্না ও দহন ইত্যাদি। কবিতাকে শিল্পের বহিঃস্থ কোনো অভিপ্রায়ে ব্যবহারে শক্তির অনীহার মধ্যে কবিতাশিল্পের অন্তর্গত স্বাভিমান, কবিস্বভাবের নির্জনতাপ্রীতি অবশ্যই কাজ করেছিলো। তবু ফণীশ্বরনাথ রেণু কিম্বা ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা নিয়ে যে কবি সার্থক কবিতা রচনা করতে পারেন তাঁকে নিছকই নির্জনতাপ্রিয় ও কলাকৈবল্যবাদী বলা সম্ভব হবে না। 'এবং এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে শক্তির একটি মন্তব্য থেকে আলোচ্য বিষয়টির মীমাংসা-সূত্র পাওয়া যেতে পারে—'......একেবারে রাজনীতি বাদ দিয়ে আমি লিখেছি সেটা ঠিক কথা নয়। তবে স্বভাবতই আমার ধারণা কবিতাটাই আসল, কবিতাটাই লিখে ফেলতে হবে। তার মধ্যে আভাসিত হয়ে থাকবে কোন রাজনৈতিক ছবি, কোন রাজনৈতিক ঘটনা। আর সেটা মূল হলে

কবিতা আর কবিতা থাকে না, শ্লোগানে পরিণত হয়।[১৭] রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে কবিতার নন্দনশিল্পকে ব্যাহত বা খর্ব করার অভিরুচি তাঁর ছিলো না। প্রত্যক্ষের স্পষ্টতার চেয়ে পরোক্ষের কিছু আভাস-ইঙ্গিত, রহস্যভেদের চাইতে রহস্যসৃজন, জনজোয়ারের মন্দ্রিত অঙ্গীকারের বদলে নিভৃত স্বগতকথন ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার নির্মাণভূমি। শুদ্ধ শিল্পসর্বস্বতা ও সোচ্চার প্রচারধর্মিতা, এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো বিন্দুতে শক্তিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই মধ্যবর্তী অবস্থান কার্যত পাশ্চাত্যের প্রতীকবাদী কাব্যান্দোলনের উত্তরাধিকার থেকে ক্রমে আধুনিকতাবাদীদের বিষয় ও প্রকরণের কাছাকাছি চলে আসা। শক্তির এই ভাবনায় অভিনবত্ব কিছু না থাকলেও একজন অতিপ্রজ কবির কবিতার শিল্পপ্রকৃতি ও নির্মাণ বিষয়ক ধারণাগুলির সূত্রায়ণে আমরা তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের এক সামগ্রিক আন্দাজ পেয়ে যাই।

আযৌবন স্বভাবে উচ্চণ্ড ও বেপরোয়া শক্তির ব্যক্তিগত জীবন-আচরণ যেন তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বেরই উল্টো পিঠ। শ্রম ও স্বতঃস্ফূর্ততা, মেধা ও আবেগ, নৈরাজ্য ও শৃঙ্খলার বৈপরীত্যে মণ্ডিত অজস্র বর্ণমালার প্রায় চারদশক ব্যাপী পরিক্রমায় শক্তি যেভাবে অকপটে তাঁর আত্ম-জীবন ছড়িয়ে দিয়েছেন, বাংলা কবিতায় তেমন বিশদ ও বিপুল আত্মপ্রক্ষেপ বিরল। 'কবিতা মাত্রেই আত্মজৈবনিক। আমার ক্ষেত্রে সেটা আরো বেশি'—তাঁর এ উক্তি (**উদ্ধৃতি ১০**) নিঃসংশয় সত্যভাষণ। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রথম সংস্করণের নিবেদন অংশে কবিতাকে বলেছিলেন 'নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ এক'। স্বীকার করেছিলেন যে 'জলজ' শব্দটি ভেবেচিন্তেই বসিয়েছেন। জলের ওপর কিছু কম্পন, কিছু তরঙ্গ যখনই প্রতিবিম্বগুলিকে ভেঙে-চুরে তৈরি করেছে রূপ ও ভঙ্গির জটিল নক্‌শা তখনই দর্পণে আভাসিত হয়েছে বাস্তবতার অতীত, চৈতন্যের অন্তর্লীন রহস্যের চমকপ্রদ সব ছবি। অবাধ আড্ডা, মদ্যপান, এলোমেলো ঘোরাফেরা শহরের অলি-গলি, জঙ্গল-পাহাড়ে—এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি ও বাস্তবের শৃঙ্খলা যেভাবে লঙঘন করেছেন শক্তি, তাঁর কবিতাতেও তেম্‌নি অজস্র বিষয়-প্রসঙ্গের অহরহ তুমুল অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বাস্তব জগতের বহু বিচিত্র অনুষঙ্গ বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে কবির আত্মগত দৃষ্টির গূঢ়তায়। 'জীবন ও তার চতুষ্পার্শ' থেকে যে অবিরত অনুপ্রবেশ ধৃত হয় আমাদের অবচেতনায়, সেইসব অজস্র অগোছালো বিষয়কে তাঁর কবিতার পর কবিতায় শক্তি অনায়াসে শিল্পসম্মত করে তোলেন। কবির আত্মদৃষ্টির এই উৎসরণ প্রসঙ্গে শ্রী অরুণ মিত্রর মিতভাষ্য বিশেষ স্মর্তব্য : 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসৃষ্টিকে আমার নিগূঢ়ভাবে অন্তর্মুখী মনে হয়। তার কবিতায় জাগতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিস্রুত হয়ে এক আত্মিক ভূমিতে অবস্থান করে। সেখানে আমরা যাকে বাস্তব বলে জানি তা আর ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে না। যদিও বাস্তব অনুষঙ্গের উল্লেখ থাকে প্রচুর, বস্তুপ্রাণীময় জগৎ, জীবন ও মৃত্যু সমস্তেরই তাৎপর্য তার ব্যক্তি মানসের রঙে।'[১৮] কবিতা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিজের ভাবনার কথা বলতে গিয়ে শক্তি একটি সাক্ষাৎকারে অনুরূপ ইঙ্গিত করেছিলেন—'কবিতা হয়ে ওঠার অর্থ হলো, এক ধরনের রহস্য তৈরি হয়ে গেল। রহস্য তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কবিতা তৈরি হলো না'।[১৯] অন্তর্মুখী, আত্মপ্রক্ষেপময়, স্বীকারোক্তিমূলক, আবেগার্ত কবিতার রচয়িতারূপে শক্তি জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতায় রোমান্টিকতার এক আধুনিক লিপিকার।

জীবনযাপনের সব কিছু কবিতায় বলে দেবার অভ্যাস শক্তির কাব্য-নন্দনের কেন্দ্রগত। অসঙ্কোচে সর্বস্ব ঘোষণার এই অভ্যাসের কারণেই তাঁর কবিতায় কখনো কখনো অতিকথনের ভার মায়াময়, রহস্যময় অন্তর্বয়নের অন্ধি-সন্ধিগুলি খুঁজে বার করার খেলা থেকে বঞ্চিত করেছে পাঠককে। পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, সান্নিধ্য ইত্যাদির যাবতীয় অনুপুঙ্খ এতখানি অনাবৃত ও অতি-সম্প্রসারিত হয়েছে, বলতে বলতে এতটাই বেশি বলা হয়ে গেছে, যে সেই নিরাবরণ অতিকথন পাঠকের কাছে কোনও গূঢ় ব্যঞ্জনা বহন করে আনে না। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ *ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে* ও *জঙ্গল বিষাদে আছে* দুটিতেই অন্তর্ভুক্ত **বিজয়াদশমী বড়ো শারীরিক** নামের ১২০ পংক্তির কবিতাটি এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পাারে **আমি তো পাথর—তুমি জানো** শিরোনামযুক্ত দীর্ঘ কবিতাটি।

তাঁর সমকালীনদের মধ্যে যে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাকে শক্তি 'সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' মনে করেছিলেন, সেই অলোকরঞ্জন তাঁর সময়ের কবিতায় 'অ-তাত্ত্বিক' কবিতার প্রাধান্য স্বীকার করে লিখেছিলেন, "এই কবিরাই আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিগাসে প্রথম 'কবিতা বাৎলে দেবে না মানে, সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে' (আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ) এই ধারণার কাছাকাছি থেকেই কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন।"[২০] পঞ্চাশের কবিতার এই প্রধান প্রবণতা শক্তির বেলাতেও অলক্ষ্য নয়। শক্তির বন্ধু এবং তাঁর *পদ্যসমগ্র* ও অগ্রন্থিত রচনাবলীর সম্পাদক সমীর সেনগুপ্তও মত প্রকাশ করেছেন যে 'বিষয়হীনতা' শক্তির কবিতার 'প্রথম ও প্রধান লক্ষণ', বলেছেন, 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে। ...তাঁর কবিতার কোনো সারমর্ম করা যায় না,...তাঁর সব কবিতাই যেন পার্থিব ও অপার্থিবের সীমারেখার ওপর রচিত।'[২১] কিন্তু অলোকরঞ্জনের কথামতো 'হয়ে উঠতে থাকা' এইসব কবিতা কি প্রকৃতই নির্ভার ও নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে? দেশ ও কালের প্রভাবে কি কবিতার ভাষা ও অবয়বে ধরা পড়ে না দোলাচল (ambivalence) ও আততি (tension)? অন্য একটি বিষয়ে অলোকরঞ্জনের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি যে শক্তি ছিলেন একজন 'স্বশিক্ষিত' (autodidact) রচয়িতা, জীবন-যাপনের মত কবিতা রচনাতেও যিনি অনুশাসন ও শৃঙ্খলার শিক্ষণসীমা লঙ্ঘনে বেপরোয়া। দ্বিপ্রতীপতা, স্ববিরোধে হারিয়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ-উদ্ভাসের মতো অনুভূতির রহস্যজটিল শ্রুতিলিখন তাঁর মত 'অটোডিডাক্ট' রচয়িতাকেই মানায়। *সুন্দর এখানে একা নয়* কাব্যের একটি কবিতায় এই দ্বিপ্রতীপতা বা দোলাচলের স্বীকৃত উচ্চারণ চোখে পড়ে— 'আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম/তুমি আমায় করলে কঠিন' (**সহজ**)। এই সহজ ও কঠিন, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, শিল্প-নির্ভার ও শিল্প-নির্ভরতার টানাপোড়েন শক্তির ভাষা ও নির্মাণের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র উৎসর্গলিপিরূপে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি ('প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার') শক্তি সংগ্রহ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর বোদ্‌লেয়ারের তর্জমা থেকে। অগ্রজ কবি বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর বোদ্‌লেয়ারের অনুবাদ শক্তির আত্মপ্রকাশ পর্বের কাব্যনন্দনে গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকরূপে সক্রিয় ছিলো। এ প্রসঙ্গে শক্তির *পদ্যসমগ্র*-র সম্পাদক শ্রীসমীর সেনগুপ্তর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।[২২] নাগরিক চেতনার অনুশীলন ও প্রতীকবাদ-প্রভাবিত চিত্রকল্পপ্রধান আধুনিক ভাষারূপ নির্মাণে **হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য**-র কবি বুদ্ধদেব বসুর মধ্যবর্তিতায় বোদ্‌লেয়ার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বহু উপকরণ। বোদ্‌লেয়ার

যাকে বলেছেন 'the pleasure of writing a pcem',[২৩] সেই আনন্দই ব্যক্ত হয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গাঢ় উচ্চারণে, আদিম-প্রবল চিত্রকল্পে। বোদ্‌লেয়ার ও অন্যান্য প্রতীকবাদী কবিদের প্রসঙ্গ শক্তির কবিতায় এই নান্দনিক অভিভবের সূত্রটি চিহ্নিত করেছে—'নয়ান উন্মুক্ত বুদ্ধ, বুকে লগ্ন অত্যাচারী যীশু/নাভির অমর পিণ্ড দাঁতে চেপে উদাস বোদ্‌লেয়ার/র‍্যাঁবোর উৎক্ষিপ্ত অণ্ড গ্রাস করে কলঙ্কী ভেরলেইন/ললাটে অসীম বৃদ্ধ তৃণের মূলের মত জয়ী' (**স্বকৃত আলেখ্য**)। বোদ্‌লেয়ারের কবিতার নাগরিক জীবন-বিতৃষ্ণা, প্রতীকচেতনা ও কলাকৈবল্য শক্তির প্রারম্ভিক পর্বের কবিতায় তথা কবিতা-বিষয়ক ভাবনায় লক্ষণীয় ছাপ রেখেছিলো। তবু শক্তির এই বোদ্‌লেয়ারীয় প্রতীকবাদী উত্তরাধিকার কোথাও কোথাও অতিক্রান্ত হয়েছে আধুনিকতার দোলাচলে, শিল্প-নির্ভরতার নন্দন বিষয়ক সংশয় বা শ্লেষে। পূর্ব উল্লেখিত **নিয়তি** শীর্ষক কবিতার শেষ স্তবকে সংযোজিত অনিশ্চয়তার মাত্রাটি এই দ্বিপ্রতীপতার সূচক— 'তারে দাও কোলে করি অনভিজ্ঞ প্রাসাদ আমার/বালকের মৃতদেহ, নিষ্পলক ব্যাধি, ভীত প্রেম।/তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে/শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ।' এই কবিতার প্রথম স্তবকে ('বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দুজনে...' ইত্যাদি) জনৈক প্রেমিকের বয়ানে 'বাগানে'র ঈষদচ্ছ একটি আবহ নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পে শক্তির প্রতীকবাদী উত্তরাধিকার আরো স্পষ্টতা পেয়েছে—'নাতিউষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর/ভ'রো না কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা'। কিন্তু বুদ্ধদেবের মধ্যবর্তিতায় বোদলেয়ারীয় অভিভব অর্জনের সীমানা লঙঘন করে শেষ স্তবকে 'প্রাকৃতিক' ও 'কৃত্রিমে'র দ্বিপ্রতীপতা ও 'পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ'-এর তীব্র শ্লেষে শক্তি তাঁর আধুনিক কবিসত্তার প্রতিষ্ঠা করে যান।

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য-র **সদর স্ট্রীট** কবিতাটি ঈষৎ সংশোধিত রূপে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র উৎসর্গ কবিতা হিসেবে মধুসূদনের উদ্দেশে—'যে শিল্প ঐকিক নয়, তারে করো দান শূদ্রানীরে/চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে, যদি কারো/সাধ্য থাকে...।' কবি মধুসূদনের কবিতাশিল্পের নির্মাণপ্রবল রূপকর্মের প্রতি আনুগত্যে শক্তি 'ঐকিক' শিল্পের প্রতি তাঁর পক্ষপাত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। এইসময়ে শক্তি তথা বাংলার কবিকুলের বিতর্কিত সুহৃদ অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ প্রণীত 'কাডিশ'-এ ছিল নির্মাণপ্রাবল্যের তীব্র চাপ যাকে হার্ভে শ্যাপিরো বলেছিলেন, 'original impulse'[২৪]। যার ছাপ শক্তির শিল্প-নির্ভরতার নন্দনে অলক্ষ্য ছিল না। বোদ্‌লেয়ারের কলাকৈবল্য বুদ্ধদেব বসুর মধ্যবর্তিতায় উচ্চারিত হয়েছিলো *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-তে 'শুভ্রতাই শুধু জানি পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত' (২৯ সংখ্যক)। এই নান্দনিক অভিভব আরও তীব্র হলো—'এ কি আলিঙ্গন? এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে/আশিরগোড়ালি নখ! এ কি আলিঙ্গন মানুষের/ঘোরতর, ব্যবধান গ্রাসচ্ছলার অন্তরালে/অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের/কাঙিক্ষত শিল্পের কাছে? শিল্প কি বিমূঢ় অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন, সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে?' (৬৮ সংখ্যক) শিল্প ও বাস্তব জীবনের এই দ্বিপ্রতীপতা নির্মাণ করতে গিয়ে শক্তি এক প্রগাঢ় সহ-যৌনতার কথা বলেন। তাঁর আবেগার্ত উচ্চারণে শিল্পী ও শিল্পবস্তুর সম্পর্কের আততি ও শিল্পের উৎকর্ষের ধারণা ব্যক্ত হয়।

শিল্প-নির্ভর নন্দনের প্রতি শক্তির আসক্তির ইঙ্গিত ছিল *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য*-র **চিত্রশিল্প অনন্তকাল** কবিতাটির অন্তিম পর্বে 'কেলাসিত আনন্দিত গান'-এর চিত্রকল্পে। কোনো এক

বালিকাকে কবি অনেক কাল আগে সাধ্যমত এঁকে দিয়েছিলেন ছবি, শুনিয়েছিলেন গান ; তার সঙ্গে ফিরে দেখা আকস্মিকভাবে ; সে এখন চাইবে পুরোনো খাতাখানি। এই আত্মজৈবনিক স্মৃতিমেদুর নাট্যময়তা শিল্পনির্ভরতার নন্দনের অভিমুখে চালিত হয় 'কেলাসিত' শব্দটির ঘনত্বকে আশ্রয় করে। তবু কিন্তু কবিতার শেষ পংক্তিতে ফুটে ওঠে এমন এক বেদনাঘন জিজ্ঞাসা ('সমস্ত কি ভুলেই গেলাম স্রোতাবর্তে প্রেমিক মুখচ্ছবি') যা শিল্প ও বাস্তবতার মধ্যবর্তী অবকাশ (space)-টির আর্তি চিহ্নিত করে। রাজনীতি-সমাজনীতির প্রত্যক্ষ ভাবনা কবিতার মাধ্যমে সম্প্রচারের দায় সচেতনভাবে বর্জন করলেও শক্তি শুদ্ধ নন্দনবাদী শিল্পসর্বস্বতার অনুগামী ছিলেন না। *মানুষ বড়ো কাঁদছে* সঙ্কলনের **অর্থাৎ আবার বৃষ্টি** কবিতার প্রথম স্তবকটিতে বাস্তবনিরপেক্ষ শিল্প ও উপযোগিতার দ্বান্দ্বিকতা শক্তির দোলাচল চিহ্নিত করে— 'আমারই প্রত্যক্ষ দোষ, মাটি খুঁড়ে করেছে বাহির/মৃন্ময়ী প্রাচীন কীর্তি ; যেন কাঠকয়লায় দ্যোতিত/মানুষের কাজে আসে, শিল্প হয় সংশ্রবে বধির—/তার কাজ? কয়লা থেকে অস্পষ্ট, আড়ালে থাকা রীতি।' 'সংশ্রবে বধির' শিল্প এবং রূপান্তরিত কাঠকয়লা দুই বিপরীত অবস্থান—বাস্তব-নিরপেক্ষতা ও বাস্তব-নির্ভরতা—সূচিত করে। 'কয়লা থেকে অস্পষ্ট, আড়ালে থাকা' যে শিল্পের রীতি সেই শিল্পও যাপনে জড়িত হয়। শক্তির কবিতায় সমকালীন বাস্তবতার পরিসরটি বিস্তৃত নয় বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন অথবা যাঁদের কাছে শক্তির কবিতায় বোদ্‌লেয়ার-প্রভাবিত রহস্যমদিরতা তথা ভাষা ও শৈলীর স্বেচ্ছাশাসন নান্দনিক স্বৈরাচারের মতো মনে হয় তাঁদের জন্য *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র এইসব পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে :

(১) চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা। সমসাময়িক
নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায় (৩৩ সংখ্যক)

(২) লণ্ঠনরহস্য থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবো বলে
এসেছি সদর স্ট্রিট-এ গাড়ি বারান্দার নিচে নীল
সাঁতারু মাছের মধ্যে খেলা করে অবাধ কিশোর (৯৭ সংখ্যক)

(৩) কবিতার সত্যে আমি এক ঝলক মিথ্যের বাতাস
লাগাই, কী পাল্টে যায় কবিতার সত্য একদিনে?....
সত্যকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাই গঙ্গার বাতাসে
গা জুড়োতে, তার পর কষে মারি দুগালে থাপ্পড়....
তৎক্ষণাৎ মিথ্যে হয়ে আসে—
বিপুল, অমিততেজা, জাঁহাবাজ সত্যের ভ্রূকুটি...
আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি। (৯৯ সংখ্যক)

শঙ্খ ঘোষের ভাষ্যে 'পাহাড়চুড়ো থেকে নেমে আসা সমতলের মধ্যে বয়ে যাওয়া সেই জলধারার মতই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা।'[২৫] দেশ ও কালের মধ্যে দিয়ে, জীবনের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুমোহনার দিকে, অসম্ভব ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে আর্ত ও উন্মাদক ভালবাসার দিকে, আসক্তি ও বৈরাগ্যের যুগপৎ টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে স্বীকারোক্তির সারল্যময় সাহসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা স্বেচ্ছাচার ও শৃঙ্খলার এক বিস্ময়কর যুগলবন্দী রচনা করে গেছে। শিল্পসর্বস্বতা অথবা শিল্পীর দায়বদ্ধতার কোনো প্রথাগত নিরিখেই শক্তির কবিতায় 'কালবাহিত দেশের ব্যাপ্ত সমতল'টির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। প্রতীকবাদ, চিত্রকল্পবাদ, পরাবাস্তবতা,

হাংরি জেনারেশন ইত্যাদি আধুনিকতার সব পন্থা-প্রকরণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগের পরেও শক্তির কবিতা বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে তত্ত্ব বা দর্শনের নির্দিষ্ট সীমা ভেঙে। কিছু স্মরণীয় পংক্তিমালা এই সূত্রে উদ্ধার করা যেতে পারে :

(১) বদলে যায় বদলে যায়—বদলে যেতে-যেতে
একটি মানুষ থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে।

(বদলে যায় বদলে যায়, ***হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*****)**

(২) ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে
মানুষ ছিল নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো। **(ছেলেটা,** *ভাত নেই, পাথর রয়েছে*)

(৩) বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।.........
কেন এই নিদারুণ হত্যা? কেন মায়াহীন ক্রোধ.....
কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে?
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী! **(রক্তের দাগ,** *সুন্দর এখানে একা নয়*)

(৪) আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি........
অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি
অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের..........
অনেকদিন আবোল-তাবোল শিশু দেখিনি আমরা
আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে

(হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, ঐ)

(৫) মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও.........
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও। **(দাঁড়াও,** *মানুষ বড়ো কাঁদছে*)

(৬) বারবার নষ্ট হয়ে যাই/প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র/করো, যাতে লোকে খাঁচাটাই/ কেনে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই। **(প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই, ঐ)**

উদ্ধৃতির এই তালিকাকে দীর্ঘ না করেও বলা যায় যে সমাজনীতি, রাজনীতি, বিদ্রোহের স্থূল চিহ্নগুলি শক্তির কবিতায় তেমন সোচ্চার নয়। ঘরে ও ঘরের বাইরে, মহানগরীর পথে ও জঙ্গল-পাহাড়ের নির্জনতায়, প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এক আত্মজিজ্ঞাসার মত শক্তির কবিতা দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা এক আশ্চর্য দ্যুতিময় সঙ্কেত।

শব্দ কবিতাশিল্পের এক ও অদ্বিতীয় উপকরণ। কবির শব্দাগ্রহ ও সত্যাগ্রহ অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাস এবং শব্দচিত্রের নানা চমৎকৃতিতে শক্তি তাঁর সমকালীনদের মধ্যে বিশিষ্ট। এছাড়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শক্তি তাঁর বহু কবিতায় শব্দ ও শব্দের সাহায্যে গড়ে ওঠা কবিতার নির্মাণরহস্য বিষয়ে অজস্র মন্তব্য করেছেন। কবিতার মৌল উপকরণ ও সৃজনপ্রক্রিয়াই হয়ে উঠেছে তাঁর কিছু কবিতার বিষয়। কবিতার শিল্পরূপ তথা নন্দন ছিল আপাত-শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারী কবির স্থায়ী ধারাবাহিক প্রত্যয়। *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* গ্রন্থের একটি কবিতায় শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর অমিতব্যয়ী প্রবণতার কথা পাঠকদের জানিয়েছিলেন শক্তি—'শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি' **(পেতে শুয়েছি শব্দ)**। একটি কবিতার নির্মাণ যে আসলে অগুনতি শব্দের সঙ্গে

কবির এক আশ্চর্য দ্বৈরথ সে কথাই ব্যক্ত করেছিলেন আলোচ্য রচনাটির শেষাংশে—'শব্দ নাকি মোহর? ফাঁকি? শব্দ নাকি জানী?/শব্দ শতরঞ্চ এবং শব্দ কাঁথাকানি/তা যদি হয় শব্দ তাকে করেছি মহাজব্দ/এবং পেতে শুয়েছি শব্দ— ক'রো মরণে টানাটানি।' এই সঙ্কলনের অনেকগুলি কবিতায় শক্তি তাঁর গভীর শব্দ-বোধের পরিচয় রেখেছেন; শব্দের জন্ম-মৃত্যু, তাৎপর্য ও রহস্য এইসব কবিতা মানবজীবন ও কবিতাশিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রগুলি চিহ্নিত করেছে। *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র ৯৫ সংখ্যক সনেটটি এখানে **যেভাবে শব্দকে জানি** শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—'শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে/আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা মায়াভরা পাড়/সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে—/.....শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে হিসি করে বুকে/খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ,/তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, নুঙ্কু নতমুখ—/এভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে!' সহজ গার্হস্থ্যজীবনপটে শব্দকে দেখেছেন শক্তি ; এখানে তিনি শব্দের সাংসারিক ধর্মে বিশ্বাসী ; কোনো উচ্চাকাঙক্ষা নেই তাঁর ; বরং এক স্বাভাবিক মৃত্যুবোধ তাঁর শব্দবোধেও সংক্রামিত। শব্দের উদ্ভব ও অবসান, ভাঙা-গড়া নিয়ে ভেবেছেন শক্তি ; কিভাবে ব্যবহারে জীর্ণ হতে হতে শব্দেরা অক্ষম, অবসন্ন হয়ে পড়ে, কবির কাছে এসে মার্জনা চায়—'শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শব্দের সমুদ্রে/যেখানে শব্দের চেয়ে রঙ বড়ো/রঙের চেয়ে বড়ো মাধুর্য/সেখানে মূল শব্দ উঠে আসে/উপকূলের বালুতে রাখে বুকের দাগ/মুখ লালায় দেয় ভরিয়ে/কাঁধে মাথা রেখে বলে : /ক্ষমা করো—আর বাজতে পারি না' (**ক্ষমা করো**, *সোনার মাছি খুন করেছি*)। শিষ্ট-অশিষ্ট, দেশী-বিদেশী নানা রীতি ও মাপের অজস্র শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন শক্তি এবং এ ব্যাপারে তিনি স্বেচ্ছাচারী, শুচিবায়ুমুক্ত। শব্দ-নির্বাচন ও বিন্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়ে ঘাটতি ছিল না—'পদ্য শব্দ-নির্ভর অবশ্যই। পদ্যের মধ্যে শব্দের সংগঠনটা বড় কথা।'[২৭] শব্দ সম্পর্কে এমন এক প্রবল ও আন্তরিক আগ্রহ ছিলো শক্তির যে *কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে* কাব্যগ্রন্থের **চলো দেখে আসি** কবিতায় পাঠককে তিনি আমন্ত্রণ জানান—'শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে।/বর্ণমালা ঘরদুয়ার, কিছু কিছু নিয়ে বনভূমি...../হিং টিং ছট নয়, বালি ও পাথর নয় শুধু,/অর্বাচীন এ-শহরে ক্ষণজন্মা প্রাণ করে ধূ ধূ।/ অমরত্ব চাই বলে অধিকাংশ শব্দ তোলে দাবি,/অঘোষিত শব্দ চোখ মুছে থাকে পাতার আড়ালে।/অক্ষর কোথাও দীঘি, খানাখন্দ, পাঁকের পুকুর।/....শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে—/ দেখে আসি'। ক্রীড়ারত মানবশিশুদের মতো শব্দদের দেখেছেন শক্তি, অন্ন-শস্যের স্তূপে 'শব্দের বিষণ্ণ গন্ধ' পেয়েছেন, কান পেতেছেন দূরস্থিত কোনো এক শব্দকল্পলোকে— 'আছে আছে শব্দ আছে প্রাসাদ-জানালা হয়ে দূরে/কৃত্রিম শব্দের বনে বাজে কার বিষণ্ণ নূপুরে/গান, ধ্বনি, বর্ণময়, রূপবান, স্বতন্ত্র ঈশ্বর' (**রূপবান**, *এই আমি যে পাথরে*)। কাব্যনন্দনের মৌল উপকরণ 'শব্দ' নিয়ে এমন অন্তরঙ্গ, আবিষ্ট অবস্থা আমরা শক্তির সমকালের আর কোনো কবির ক্ষেত্রে দেখি না। কবিতার তত্ত্বভাবনা শক্তির ছিলো এবং তা তিনি প্রকাশ করেছেন রসোত্তীর্ণ কবিতায়—'অসংখ্য শব্দের প্রাণ আমি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছি/ যেমন প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মেধার মন্দির/মিস্ত্রি এসে, হাতে তার থাকে দীর্ঘতম এক ইট/অন্যহাতে কর্নিকের ধারালো ও সংযত হিংসার/প্রতিচ্ছবি, মনে মনে মহালের বিশুদ্ধ প্রতিমা—/এইভাবে শব্দ নিয়ে আমি এক প্রাসাদ গড়েছি' (**অমল প্রাসাদের জন্য**, *জ্বলন্ত রুমাল*)।

শক্তি সচেতন ও ধারাবাহিকভাবে কবিতাকে বলেছেন 'পদ্য'। একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'এইটি সম্পূর্ণ বিনয় করে বলি। এত লোক কবিতা লেখেন, আমি তাই কবিতা বলতে সাহস পাই না। মরে গেলে হয়তো অন্যে বলবে কবিতা লিখতেন।'[২৮] মনে হয় শক্তির এই ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। কবিতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'পদ্য' বলার পেছনে আরো কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। শক্তির ব্যক্তিগত জীবনযাপন ও কবিতার নির্মাণভাবনার সঙ্গে 'পদ্য' নামটির ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের কিছু সম্পর্ক কি ছিল না? জীবনচর্যায় যে শক্তি প্রথানুগত্যকে সর্বদাই লঙঘন করতে চেয়েছেন তাঁর কাছে 'কবিতা' না বলে 'পদ্য' বলা মূলত প্রচলিত রীতিনিয়মের ব্যতিক্রম। সফল সামাজিকের কাব্য-কবিতা বিষয়ে প্রথাগত শোভন আগ্রহকে খানিক আক্রমণ করতেই যেন সেকেলে 'পদ্য' নামটি বেছে নেওয়া। এছাড়া শক্তির ছিল প্রখর ছন্দজ্ঞান ও ছন্দ সম্পর্কে দারুণ দুর্বলতা, শব্দ ব্যবহার ও বিন্যাসে এক প্রবাহিত সঙ্গীতময়তা ; সহজ লৌকিক শব্দ/বাগ্‌ধারার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সেই সুর ও ছন্দের লাবণ্যকে এক সহজিয়া মাত্রা দিত। সহজ বাউলভঙ্গিমায় গান গাইতে ভালবাসতেন শক্তি ; শহরে ও গ্রামে কবিতার মজলিশে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে **অবনী বাড়ি আছো** কিম্বা **আমি স্বেচ্ছাচারী**-র মতো অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা পড়ে শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে ভালোবাসতেন। শোনানোর পক্ষে সহজগ্রাহ্য কবিতার প্রতি শক্তির ঝোঁক ছিল। এইসব সূত্র ধরে বিচার করলে 'পদ্য' শব্দটিকে আমরা শক্তির জীবনভাবনা ও কবিতার নন্দনভাবনার সঙ্গে অনেকাংশেই সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করতে পারি। ছন্দের প্রতি, ছন্দোবদ্ধ পদের প্রতি, বক্তব্যের চেয়ে পদবন্ধের শারীরিক গঠনের প্রতি আসক্তি শক্তির ধারাবাহিক ও সচেতনভাবে ব্যবহৃত 'পদ্য' শব্দে সূচিত হয়েছে। নানা লৌকিক শব্দের অকুণ্ঠ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতির দলবৃত্ত ছন্দের চাল শক্তির অজস্র কবিতাকে দিয়েছে এক সহজিয়া জীবনযাত্রার দোলা। বোঝা যায় 'পদ্য' শব্দটি শক্তি বেশ ভেবেচিন্তেই প্রয়োগ করেছেন। অরণ্য-পাহাড়ের পরিব্যাপ্ত ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাপনের সামগ্রিকতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে চরাচরের রহস্যময় বিস্তারের অংশীদার থাকার অভিপ্রায় শক্তির কবিতায় শেষাবধি থেকেছে এক 'কসমোসেন্ট্রিক' দৃষ্টিকোণরূপে। 'কবিতা'র পরিবর্তে 'পদ্য' শব্দটির ব্যবহার সেই প্রবণতার সহজাত। বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীর পর্যবেক্ষণে শক্তির এই প্রবণতার উল্লেখ আছে—'জীবনের চিরবিস্ময়ের দিকটি ছিল শক্তির কবিতার অনুষঙ্গ, অর্থাৎ দর্শন, জ্ঞান, শিক্ষা, বিবেচনা ও লোগোসেন্ট্রিক এলাকাটি পরিহার করে, ভর করতেন কসমোসেন্ট্রিক এলাকাটিতে'।[২৯]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় চার দশকব্যাপী কাব্যচর্চার অতিপ্রজ, সম্মোহক ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে কবিতা ও তার নির্মাণ বিষয়ে শক্তির ভাবনা তথা প্রবণতাগুলির কিছু আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। বর্তমান আলোচনার সমাপ্তিপর্বে সেগুলির নথিবদ্ধকরণ আলোচ্য বিষয়টিকে এই সীমিত পরিসরেও কিছু স্পষ্টতা দেবে :

১। অবিরাম ও অনায়াস সৃজনের কথা বারবার বললেও শক্তি ঠিক স্বভাবকবিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কবিতারচনার শ্রম, প্রকরণমনস্কতা ইত্যাদি অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করেন নি।

২। 'অনুপ্রেরণা' বা 'ইন্‌স্‌পিরেশন'-এর তত্ত্বে সরাসরি সায় না দিলেও, কবিতারচনাকালে এক ধরনের 'ঘোর' লাগার কথা বলেছিলেন। অথচ শব্দব্যবহারের সচেতন অভিনবত্বে, চিত্রকল্পের কারুকৃতিতে, ছন্দোবদ্ধ গঠনরূপের ঋজুতায় শক্তি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মাণ-শৃঙ্খলার চমকপ্রদ স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে কোনো সংশয় নেই।

৩। কবিতাকে তিনি কোনো তত্ত্বের বাহন হিসেবে দেখতে চাননি। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো মতাদর্শ/কর্মসূচী থেকে যে উচ্চকণ্ঠ তথা উদ্দেশ্যমূলক কবিতার উদ্ভব ও সার্থকতা, শক্তি তার প্রতি আকৃষ্ট হননি।

৪। বিষয়ের গুরুত্ব বা মহত্ত্ব শক্তির কবিতায় উল্লেখযোগ্য নয়। বরং প্রায়শই বিষয়হীনতা তাঁর কবিতার অন্যতম লক্ষণ। অথবা বলা যায় যে আপাত-বিষয়হীনতাই তাঁর বিষয়।

৫। শক্তির কবিতা আত্মজৈবনিক, স্মৃতিনির্ভর, অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকারোক্তিমূলক। তাত্ত্বিকতা, বক্তব্যধর্মিতা, কোনো সামূহিক আবেগ-মোচন তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ্য। দুরূহ আত্মখনন, 'নিজেরই অন্তরতিমিরে ডুব দেবার চেষ্টা' শক্তির কবিতায় আধুনিকতার দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে।

৬। জীবন-মৃত্যু, ঘর-বাহির, আসক্তি-বৈরাগ্য ইত্যাদি বৈপরীত্যের নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শক্তির কবিতার জগৎ। দেশকাল ও ভাষার পারস্পরিক আততি ও তার সঙ্গে যাপিত জীবনের সংশ্লেষ ও বিচ্ছেদ এমন এক গূঢ়তা সৃষ্টি করে যে শুদ্ধ শিল্পনির্ভরতার নন্দন থেকে তিনি সরে যান।

৭। কবিতা রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী'র বিশেষ কাব্যরূপটির প্রতি শক্তির পক্ষপাত থেকে বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত 'তুমুল ও ঘটনাবহুল' জীবনযাপনের 'এত সব উত্তাল তরঙ্গের নির্ভৃত অন্তরে'[৩০] কাব্যের নির্মাণপ্রবল, সংহত রূপকর্মের প্রতি শক্তি কতখানি আকর্ষণ বোধ করতেন।

৮। শব্দব্যবহারে শক্তির শুচিবায়ুহীনতা তাঁর ভাষার নন্দনের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। তৎসম ও ধ্বনিময় অভিজাত শব্দাবলীর সঙ্গে একই পংক্তিতে শক্তি নির্বিবাদে বসিয়ে দেন অকাব্যিক দেশজ, কথ্য, কখনো বা অশালীন বহু শব্দ। প্রায়শই মিশিয়ে দেন সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের রীতি। শব্দ প্রকরণের এই উত্তরাধিকার অনেকখানিই জীবনানন্দের কাছ থেকে পঞ্চাশের কবিদের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

৯। অন্ত্যমিল, অন্তর্মিল ও অন্তর্লীন অনুপ্রাসের নিপুণতায় শক্তি তাঁর অধিকাংশ কবিতায় এমন এক ছন্দোময়তা সঞ্চার করেন যে স্মৃতিমেদুর ও ইন্দ্রিয়ময় পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় সাযুজ্য অনুভূত হয়।

১০। নাগরিকতার সচেতন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শক্তি *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* গ্রন্থে প্রতীকবাদী আধুনিকতার যে ভাষারূপ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন, দেশ ও কালের চাপে তাতে নানা বদল ঘটেছে। নাগরিক চিত্রকল্পের জটিলতা ও স্পৃশ্যতা ক্রমে শিথিল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দূরলগ্ন, উদাসীন উচ্চারণের বিস্তৃততর পরিসরে। ভাষা অর্জন করেছে যুগপৎ প্রাকৃতিক ব্যাপ্তি এবং নাগরিক বোধের তীক্ষ্ণতা।

সূত্রনির্দেশ :

১। দেবতোষ বসু (সম্পাদিত), *এই কাব্য এই হাতছানি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর '৯৭, পৃ : ১১১-১২।

২। তদেব, পৃ : ১১৩।

৩। তদেব, পৃ : ১১৩-১৪।
৪। তদেব, পৃ : ১১৪-১৬।
৫। তদেব, পৃ. ১২০-২৪।
৬। 'কবিতীর্থ', শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ. ৭১।
৭। *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ২০
৮। তদেব, পৃ. ২৩।
৯। তদেব, পৃ. ৩২-৩৩।
১০। তদেব, পৃ. ৯৭।
১১। স্বগত সংলাপ, 'পদ্যবন্ধ' (১৯৮১), *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ১২৩।
১২। আমার প্রিয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'পদ্যবন্ধ' (১৯৮৬), *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ১২৮।
১৩। তদেব, পৃ. ৯৯।
১৪। সূত্র : সাক্ষাৎকার, সংবাদ সোনার বাংলা, ৩ ডিসেম্বর, '৯৪, *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ৯০-৯১। এরও অনেক আগে 'প্রসঙ্গ : ফুটবল' শীর্ষক নিবন্ধে (কালপুরুষ, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, ১৯৭৭) অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন কবি।
১৫। মুখবন্ধ, *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ৭।
১৬। তদেব, পৃ. ৫।
১৭। তদেব, পৃ. ৫১-৫২।
১৮। সমরজিৎ কর ও ইনা সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *শক্তির কাছাকাছি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, '৯৬, পৃ. ১৮।
১৯। উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, জুলাই-সেপ্টেম্বর '৯৪, *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ৮৭।
২০। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, *স্থির বিষয়ের দিকে*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৯।
২১। ভূমিকা, *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৪।
২২। '*পদ্যসমগ্র* (১)'-এর 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে সম্পাদকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৮৫-৮৬।
২৩। Baudelaire Charles, The Didactic Heresy, *The Modern Tradition*, R. Ellmann and C. Feidelson [Ed.], Oxford University Press, 1965, p. 101.
২৪। Shapiro Harvey, 'Exalted Lament' in Lewis Hyde (Ed.), *On the Poetry of Allen Ginsberg*, University of Michigan Press, 1984, p. 87.
২৫। দেশ, ২০মে ১৯৯৫, পৃ. ২৭।
২৬। তদেব, পৃ. ২৮।
২৭। স্বগত সংলাপ, *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ১২১।
২৮। 'পদ্যবন্ধ', সেপ্টেম্বর ১৯৮০, *এই কাব্য এই হাতছানি*, পৃ. ৩৫।
২৯। সমীর রায়চৌধুরী, কবিতার আলো অন্ধকার, কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা, '৯৬, পৃ. ৬০।
৩০। *পদ্যসমগ্র* (১)-এর 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ, পৃ. ২৯৫।

পঞ্চম অধ্যায়

অ্যাসক্লেপিয়াসের নিয়তি

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাবনা ও নির্মিতির এই পরিক্রমার সমাপ্তিপর্বে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনার সূত্রে উপনীত পর্যবেক্ষণসমূহ একটি সামগ্রিক তালিকার আকারে সাজিয়ে নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি যদি এইসব উপলখণ্ডগুলি বিন্যস্ত করে একটি নকশা ফুটে ওঠে :

(১) শক্তির কবিতা সর্বতোভাবেই আত্মজীবননির্ভর, স্বগতকথনধর্মী, স্বীকারোক্তিমূলক। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় এমন দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় আর কোনো কবি তাঁর কবিতায় এভাবে আত্মজীবন ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। বহু বর্ণময় ও বহু বিতর্কিত জীবনযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ গোপনীয়তার সুলুকসন্ধান ছড়িয়ে আছে শক্তির কবিতার পর কবিতায়। স্থান, কাল ও পাত্রের অজস্র খুঁটিনাটি, অস্থির জীবনবৃত্তান্তের নানা সংসর্গ, স্বেচ্ছাচারিতা, আসক্তি ও বিপর্যয়ের কথা শক্তি বলে গেছেন যাবতীয় সঙ্কোচ ও শুচিবায়ুতা আগ্রাহ্য করে। শক্তির জীবনবৃত্তান্ত যেমন তাঁর কবিতার বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি পাঠকের কাছে আরো স্বচ্ছভাবে মেলে ধরে, তেমনি তাঁর কবিতার ভেতর থেকেই খুঁজে নেওয়া যায় কবির জীবনকথা। শক্তির ক্ষেত্রে জীবন ও কবিতা মিলে মিশে যায়।

(২) তাঁর আত্মপ্রকাশ পর্বেই শক্তি কবিতারচনাকে এক প্রকার নিভৃত নির্জন যৌনাচারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেই ষাট দশকের গোড়া থেকে নব্বই দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত শক্তি প্রধানত আত্মকথনের মেজাজে তাঁর যাবতীয় আবেগ-সংবেগ, শারীরিক-মানসিক বিপর্যয়, উৎকেন্দ্রিকতা ও যৌনবাসনা, মদ্যপান ও তজ্জনিত নৈরাজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখে গেছেন অজস্র কবিতা। সে-কারণে তাঁকে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের আমেরিকান স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার (Confessional Poetry) লেখকদের গোত্রভুক্ত বলে ভাবা যেতে পারে। এইসব কবিদের মধ্যে—যথা রবার্ট লাওয়েল, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ, জন বেরিম্যান, সিলভিয়া প্ল্যাথ—গিন্‌স্‌বার্গের সঙ্গে শক্তি ও তাঁর 'কৃত্তিবাসী' বন্ধুদের সখ্য তো ছিলো কিংবদন্তি। ঐসব কবিদের মতোই এক ধরনের 'ম্যালিগন্যান্সি' শক্তির জীবন ও কবিতার উপাদান। মন ও মননের শ্লাঘনীয় সুস্থিরতাকে স্বেচ্ছাচারীর তুমুল খেয়ালে ধ্বংস করে সেইসব ধ্বংসকাণ্ডের অবশেষ তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতার শরীরে। খণ্ড-বিক্ষিপ্ত, বিসদৃশ ও বিপরীত চিত্রাঙ্কনে ধরা পড়েছে সময়ের নানা অস্থিরতা।

(৩) সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, দর্শনভাবনা শক্তিকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করে নি। কবিতাকে তিনি সোচ্চার সামাজিক, রাজনৈতিক বা বৌদ্ধিক অভিপ্রায়ে ব্যবহার করতে চান নি ; কিম্বা বলা যায় যে স্পষ্ট, উদ্দেশ্যসর্বস্ব কবিতা লেখার মেজাজ, ভঙ্গি ও অনুশীলন কোনোটিই তাঁর ছিলো না।[১] রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় সংসর্গ যেমন ত্যাগ করেছিলেন, কবিতাতেও

তেমন স্থূল দায়বদ্ধতার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। আবেগ-অনুভবের মগ্নতা ও তীব্রতা শক্তির কবিতার মূল সুর। রহস্যভেদের চেয়ে রহস্যনির্মাণেই তাঁর প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশি। সে-কারণে শক্তির কবিতা প্রধানত 'কসমোসেন্ট্রিক', 'লোগোসেন্ট্রিক' নয়।

(৪) প্রত্যক্ষ রাজনীতি তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যনির্ভর কবিতা সম্পর্কে শক্তির বিশেষ অনীহা থাকলেও তাঁর সমকাল বিষয়ে তিনি নিরুচ্চার থেকেছেন এমন কথা বলা যাবে না প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী-সমস্যা, খাদ্য-আন্দোলন, নকশালবাড়ির বিপ্লবী সন্ত্রাস ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এবং সর্বোপরি মানুষের অসহায়তা ও বেদনার বহু খণ্ডচিত্র তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে।

(৫) জীবনযাপনে ঘোর শৃঙ্খলাহীনতা, মদ্যপান এবং বহু বিচিত্র ও বিতর্কিত সংসর্গের কারণে ষাট দশক থেকে একেবারে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শক্তি ছিলেন এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। তবু তাঁর কবিতায় ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের এক প্রকরণ-শৃঙ্খলা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শক্তি যে উচ্চণ্ড বোহেমিয়ানা ও যাবতীয় বিধিলঙ্ঘনের ধারাবাহিক নজির রেখে গেছেন, অধিকাংশ কবিতায় শব্দ, ছন্দ, রূপরীতির পারিপাট্যে আমরা পাই তা থেকে ভিন্ন গোত্রের শক্তিকে।[২]

(৬) রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ, এই দুই পূর্বসুরির কাছে শক্তির ঋণ প্রশ্নাতীত। এঁদের রচনার অজস্র পংক্তি ও নানা প্রসঙ্গ শক্তির বহু কবিতায় ছড়ানো। এঁরা দুজনেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কবিতার আত্মিক শক্তিকে। শক্তির কবিতা কিন্তু মূলত শরীর প্রধান, দেহভিত্তিক। তাঁর আত্মজৈবনিক আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমের মতোই শক্তি দেহপরবশ।

(৭) প্রেম, প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু, পর্যটন, মানুষ—এগুলিই শক্তি দীর্ঘ, অতিপ্রজ কবিজীবনের পুনরাবৃত্ত বিষয়। জীবন ও জীবিকার সূত্রে কলকাতা মহানগরীর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রকৃতি ও অরণ্যের প্রতি এমন প্রবল টান এবং কবিতায় ভূ-নিসর্গদৃশ্যের এমন সমৃদ্ধ আয়োজন রবীন্দ্রোত্তর নাগরিক কবিদের আর কারো রচনায় নজরে পড়ে না।

(৮) একদিকে মদ্যপান ও আদিম আরণ্যক জীবনের প্রতি স্বভাবজাত উন্মাদনা, অন্যদিকে ক্রমেই গার্হস্থ্যের প্রীতিময় সান্নিধ্যের আকর্ষণ—এই দোটানা, ঘর ও বাহির, জীবনবাসনা ও মৃত্যুবোধ, আসক্তি ও বৈরাগ্য—এইসব বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব, বিরোধাভাসে ঋদ্ধ চরিতমানস শক্তির কবিতাকে এক আশ্চর্য মানবিক আবেগে করুণ ও প্রোজ্জ্বল করে তোলে।

(৯) শব্দ ব্যবহারে শক্তির আগ্রহ ও দক্ষতা তাঁর কবিতার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য অনুযায়ী তৎসম তথা অলঙ্কারমণ্ডিত শব্দসমূহের প্রতি শক্তির অসম্ভব ভালোবাসা ও প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। এর মূলে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো শক্তির পারিবারিক সংস্কৃত শিক্ষা ও টোলের ঐতিহ্য। আবার এর পাশাপাশি দেশজ, গ্রাম্য, অশিষ্ট তথা নানা শ্রেণীর অনভিজাত শব্দও শক্তি আগাগোড়া ব্যবহার করেছেন নিতান্ত অসঙ্কোচে। প্রচুর ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দও স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে মসৃণতা, শালীনতা ও প্রথানুগত্যের নিয়ম ভেঙে, চারপাশের সজীব ভাষাজগৎ থেকে নির্দ্বিধায় শব্দ সংগ্রহ করে শক্তি শুচিবায়ুহীনতার এক চূড়ান্ত নজির তৈরি করেছেন।

(১০) শক্তির অনেক রচনাতেই এক জাতীয় বিষয়হীনতা দেখতে পাই। মনে হয় যেন কোনো বিশেষ ভাববস্তু নয়, কিছু শব্দের কারুকাজ, ছন্দের কিছু খেয়ালিপনা নিয়ে গড়ে ওঠে একটি কবিতার নমনীয় দেহ, বিষয় বা বক্তব্যের উচ্চকিত ঘোষণায় যে নমনীয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(১১) নিরূপিত ছন্দের বৈচিত্র্যে শক্তির ঈর্ষণীয় ও সহজাত দক্ষতার পাশাপাশি চলিত গদ্যের মুক্তছন্দেও তাঁর সাবলীল সিদ্ধি। কবিতায় শ্রুতিসুখের প্রবল উদ্গাতা শক্তি ছন্দমনস্কতা ও ছন্দভাঙার অভিনব ঈপ্সায় তাঁর প্রজন্মের বিশিষ্টতম কবি।

(১২) কবিতার নন্দন তথা নির্মাণশিল্প বিষয়ে শক্তির কবিতাসমূহ তথা কবিতা-সংক্রান্ত নানা মন্তব্য ও ভাষ্যে বহু ভাবনা ও জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে রয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্ব-বিরোধের আবরণের গভীরে শব্দ-ছন্দ-রূপরীতির এক লক্ষণীয় পরিশীলন।

এই আত্মজৈবনিকতা, স্বীকারোক্তিমূলক স্বগতকথনের অভিপ্রায় ও ভাষাভঙ্গি, আবেগময় আর্তি, সোচ্চার সমাজমুখিনতার পরিবর্তে অন্তর্মুখী আত্মময়তা, জীবন-যাপনের শৃঙ্খলাহীনতা ও বোহেমিয়ানার সঙ্গে কবিতাকে বিজড়িত করে কাব্যভাষা ও কবিতাব ভাবনায় কিছু আলোড়ন সৃষ্টি, রোমান্টিক গীতলতার অন্তরালে যন্ত্রণার আর্তস্বর, বিষয় থেকে প্রায়শই সরে যাওয়া বিষয়হীনতায়, কবিতার প্রকরণে শুচিবায়ুহীনতা ও নিরীক্ষাধর্মিতা ইত্যাদি যেসব বৈশিষ্ট্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিস্বভাবের শণাক্তকরণে আমাদের সাহায্য করে সেগুলি আবার সাধারণভাবে পঞ্চাশের কবিকুলের এবং বিশেষভাবে 'কৃত্তিবাসী' কবিসঙ্ঘের সামান্যলক্ষণ। একথা ঠিক যে একজন কবিকে কোনো একটি দশকের নির্দিষ্ট গ্রন্থিতে বেঁধে রাখা চলে না। কারণ বিস্তৃত প্রবহমানতাই কবিতার যথাযথ ইতিহাস। তবু একজন কবির আবির্ভাবলগ্নটিকে একটি দশকের সময়গ্রন্থিতে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে তাঁর সৃজনের ক্রমবিবর্তন অবশ্যই কিছু স্পষ্টতা পায় এবং তার ব্যবহারিক সুবিধাটুকু অনস্বীকার্য। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সেই অর্থেই পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবিরূপে স্বীকার করে তাঁর সমকাল ও প্রজন্মের অপরাপর কবিদের পাশাপাশি বিচার করে আমরা তাঁর কবি-অস্তিত্ব নিরূপণের একটি সীমিত প্রয়াসে প্রবৃত্ত হতে পারি।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শের যে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা তথা উদ্দীপ্ত গণ-সংবেদিতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, পঞ্চাশের কবিতায় তেমন সোচ্চার সমাজমনস্কতার পরিচয় ছিলো না। অনেকটাই ব্যক্তিগত, আত্মমগ্ন, নির্মাণসচেতন কবিতার বিশ্বাস ও অনুশীলন পঞ্চাশের কবিতাকে যেন এক আপাতগ্রাহ্য ভিন্নতা দিয়েছিল। পাশ্চাত্যের কবিতা ও কাব্যাদর্শের প্রতি টান, মেধা ও মননের আধিপত্য, অতিরিক্ত সমাজভাবনা, যা পূর্ববর্তী দুই দশকের কবিতাকে যথেষ্ট উদ্দীপনা যোগান দিয়েছিলো, পঞ্চাশের কবিতায় সেই উদ্দেশ্যমূলক সমাজবীক্ষণের সোচ্চার স্বরগ্রামটি, মগজপ্রাবল্যের আভিজাত্য তথা তাত্ত্বিকতার অভিপ্রায়টি অপসৃত হয়ে যায়। তবে তিরিশ ও চল্লিশের কবিতায় বহির্মুখী ও সমাজমনস্ক এই মূল ধারার পাশাপাশি নির্জন ও আত্মময় লিরিকের একটি প্রবাহ ছিলো মূলত বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। পঞ্চাশের কবিতায় এই অন্তর্মুখী প্রবাহটির বিস্তার ও বৃদ্ধি ছিলো লক্ষণীয়। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই বিস্তারের বহুবর্ণময় কাণ্ডারী।

আত্মসন্ধান ও আত্মসমীক্ষণের আন্তরিক প্রয়াসে, কবিতার ভাষা ও ভঙ্গির প্রথাবদ্ধ শাসনানুশাসনের বিরোধিতায় পঞ্চাশের যে কবিপ্রজন্ম যাত্রা শুরু করেছিল তার সামনে যেমন

উদ্ভাসিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের বহুধাবিস্তৃত এক কবিতাভুবন, তেমনই তার সদ্য-অতীত অভিজ্ঞতায় ছিলো স্বাধীনতার নামে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, মন্বন্তর ইত্যাদি। স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশে স্বপ্নভঙ্গ, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতাশা পঞ্চাশের কবিদের যেন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল। জীবনকে রাজনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অনীহায় এই কবিরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে প্রশ্রয় দিয়ে গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছিলেন এক সচেতন আত্মানুভবী কাব্যভাষা। জীবনানন্দের বহুস্তরিত সংবেদনা, সুধীন্দ্রনাথের শাব্দিকতা কিম্বা বিষ্ণু দে-র মননির্ভর নৈর্ব্যক্তিকতার চেয়ে বুদ্ধদেব বসুর লিরিক-লালিত্য, আত্মমগ্নতা ও আবেগময়তা ছিলো পঞ্চাশের তরুণ কবিদের কাছে অনেক বেশি অনুসরণযোগ্য। শক্তি চট্টোপাধ্যায়-সহ পঞ্চাশের কবিরা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবের অভিভাবকত্ব ও তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী ছিলেন।

গোষ্ঠীবদ্ধতা পঞ্চাশের কবি ও কবিতার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুটি কবিতা-পত্রিকা 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' সেই গোষ্ঠীতান্ত্রিকতাকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিলো। এ দুটি পত্রিকার পাতাতেই আত্মপ্রকাশিত হয়েছিলেন পঞ্চাশের কবিরা—শক্তি ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক সরকার, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া ছিলো 'উত্তরসুরী', 'সীমান্ত', 'কবিপত্র', 'নতুন সাহিত্য' এবং অবশ্যই বুদ্ধদেবের 'কবিতা', বামমার্গী 'পরিচয়' ইত্যাদি আরো অনেক পত্র-পত্রিকা, পঞ্চাশের বহুবিচিত্র সর্বগ্রাহিতার বাহক ছিলো যারা। ১৯৫১-তে মুখ্যত পঞ্চাশের কবিদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো আলোক সরকার ও দীপঙ্কর দাশগুপ্তর 'শতভিষা', যদিও তিরিশ ও চল্লিশের প্রবীণ কবিরা সেখানে সসম্মানে স্থান পেয়েছিলেন। মুখ্যত অন্তর্মুখী, শুদ্ধ কবিতার আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করলেও 'শতভিষা' পঞ্চাশের সর্বগ্রাহিতাকে যথার্থই তুলে ধরেছিলো। তুলনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) ছিলো কিছু এলোমেলো। তরুণ কবিদের 'জীবনযাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত' কবিতার বাহক, সোচ্চার এবং অনেকাংশেই শরীর-সন্ধানী। এই 'কৃত্তিবাস'-এর ষষ্ঠ সঙ্কলনে ১৯৫৫ সালে প্রথম শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো—'সুবর্ণরেখার জন্ম'।

বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস', এ দুটি কবিতাপত্রে পঞ্চাশের কবিরূপে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ তাঁর সমকালীনদের মধ্যে অনেকেই একালের বাংলা কবিতার মানচিত্রে স্মরণীয় নাম—আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ। একই সময়পর্বে জীবন ও অস্তিত্বের নানা দ্বন্দ্ব জটিলতায়, কবিতাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিচিত্র আড্ডার বিচিত্রতর টানাপোড়েনে এঁরা প্রত্যেকেই সন্ধান করেছেন বিষয়, আঙ্গিক ও ভাষাভঙ্গিমার নিজ নিজ দিক্‌চিহ্ন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পাঠ ও মূল্যায়নে তাই পাশাপাশি এঁদের কবিতা রচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। হয়তো তাতে শক্তির কবি-অবস্থানটিও স্পষ্টতর হবে।

কবিরূপে আত্মপ্রকাশে 'শতভিষা'র সম্পাদক আলোক সরকার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী, অগ্রজপ্রতিম। তাঁর *উতল নির্জন* (১৯৫০) পঞ্চাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অন্তর্মুখী নির্জনতা,

আবেগের উচ্ছ্বাস ও সামাজিক অভিঘাত বর্জন করে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম চৈতন্যময়তা, সচেতন নির্মাণের অভীপ্সা ছিলো, *উতল নির্জন*-এর কবির স্থির অভিপ্রায়। ইন্দ্রিয়-সংবেদী আবেগ কিম্বা উপলব্ধির স্বতোৎসার, সামাজিক দায় কিংবা বিষয়ের সর্বগ্রাহিতা আলোক সরকারের কবিতায় ছিলো অনুপস্থিত। আত্মমগ্নতা, শব্দ ও চিত্রকল্পের গূঢ় নান্দনিক শিল্পাচার, মালার্মের মতো নিঃসঙ্গ অন্তর্বেদী সৌন্দর্যের ধ্যান আলোক সরকারের কবিতাকে খুব বেশী পাঠকের কাছে সঞ্চারিত হতে দেয় নি। *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র কবি রূপে আত্মপ্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আত্মময়তা, শব্দ ও চিত্রকল্পের নির্মাণসচেতনতা, প্রেম ও প্রকৃতির বিষয়-প্রসঙ্গ থাকলেও আলোক সরকারের মতো প্রতীকবাদী নন্দনসর্বস্ব শুদ্ধাচারে শক্তির রুচি ছিলো না। নৈঃশব্দ্য ও নিভৃতি কখনো শক্তিকে এতখানি স্থিতধী করেনি যে তিনি ঘোষণা করবেন—'শিল্পীর সাধনা......মিথ্যার সাধনা, অলৌকিকের সাধনা'।[৩]

মূলত নারী, নিসর্গ ও নাগরিক জীবন দিয়ে আত্মভাবনানির্ভর উপলব্ধি ও স্বীকারোক্তিমূলক উচ্চারণ ছিলো 'কৃত্তিবাস'-এর সম্পাদক ও সতীর্থ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় 'কৃত্তিবাসের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার'[৪] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার কুললক্ষণ। তাঁর আত্মপ্রকাশপর্বে *একা এবং কয়েকজন* থেকে *আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি*-তে সুনীল যেভাবে বিবর্তিত হয়েছিলেন ব্যক্তিজীবনের তাপ ও তীব্রতায়, যেভাবে একদিকে প্রেম ও যৌবনের যন্ত্রণা ও উত্তাপ এবং অন্যদিকে 'নীরা' নাম্নী এক দিব্যনারীর প্রতি পবিত্রতার অনুধ্যানে লিখেছিলেন পাঠকদের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য স্থাপনের ভাষায়, তা আলোক সরকারের শুদ্ধবাদী নন্দনরহস্যের প্রতিমুখী পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান দিক্‌চিহ্ন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও কবিতাচর্চায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই আত্মজৈবনিক, স্বীকারোক্তিমূলক, যৌবন ও শারীরিকতার তাপে উষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ততার সহযাত্রী। প্রেম ও যৌনতা, শৈশব ও প্রকৃতি, পাপ ও পুণ্য সুনীলের মতো শক্তিকেও প্রথমাবধি অস্থির ও উদ্বেল করেছিলো। তাঁর নিজস্ব উন্মাদনা ও আবেগময়তা, অচেনা শব্দ ও চিত্রকল্পের শুচিবায়ুহীন প্রাবল্যে, রহস্যসৃজনের বহুবিচিত্র তাড়নায় অবশ্য শক্তি চট্টোপাধ্যায় আধুনিকতার ভেতরে এক আশ্চর্য জনচিত্তজয়ী সহজিয়া সম্মোহন সঞ্চার করেছিলেন যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ 'কৃত্তিবাস' তথা পঞ্চাশের অপরাপর কবিদের থেকে তাঁকে এক নিশ্চিত স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলো।

যৌবন বাউল (১৯৫৯)-এর কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পঞ্চাশের বহুমুখী সমাবেশে এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর। স্থিরতা-সন্ধানী ও মুখ্যত ব্যক্তিগত নিভৃত উচ্চারণে প্রয়াসী অলোকরঞ্জন কিছুটা আলোক সরকারের কাছাকাছি মনে হলেও শুদ্ধ শিল্পাচারের তাগিদে পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অমনোযোগী নন। মেধা ও মননের পরিশীলনে, চিত্রকল্পের চাতুর্যে ও ছন্দমিলের চমকে অলোকরঞ্জন বিষয় ও প্রকরণের মধ্যে এক দুর্লভ সমাহার ঘটাতে পেরেছিলেন। শক্তি-সুনীল তথা 'কৃত্তিবাস'-এর পরিচিত অস্থিরতা অলোকরঞ্জনের কবিতায় ছিলো না। বরং 'শতভিষা'র ঐতিহ্য অনুযায়ী, আধুনিকতার তকমা পাবার উৎসাহে, কখনোই শাশ্বতকে বিসর্জন দিতে চাননি। আবেগ ও বৈদগ্ধ্য, প্রাণ ও প্রজ্ঞার অসামান্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ইতিহাস ও পুরাণের ব্যবহারে তিনি যতখানি অপ্রচলতা-সন্ধানী, ততখানিই সহজ স্বাভাবিক। এছাড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী অলোকরঞ্জন পঞ্চাশের প্রধান কবিদের সমাবেশে বিশেষ ব্যতিক্রমী। তবে চিত্রকল্পের কারুকৃতি, ছন্দমিলের পুনরুজ্জীবন, গ্রামীণ নিসর্গপটের চিত্রণ এবং সহজ গীতিময়তায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

অলোকরঞ্জনের কিছু সখ্য কি ছিলো না? শক্তি তাঁর অনেক কবিতায় ও কবিতাবিষয়ক ভাষ্যে কোনো এক ঈশ্বরের কথা বলেছিলেন।[৫]

শক্তি-সুনীল ও কৃত্তিবাসী কবিকুলের আত্মজৈবনিক তথা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার অস্থিরতা এবং আলোক সরকার ও 'শতভিষা'র শুদ্ধবাদী নন্দন, উভয়কেই প্রায় সমদূরত্বে স্থাপন করে ঐতিহ্য ও সমকালীনতার মাঝখানটিতে দাঁড়িয়েছিলেন পঞ্চাশের আর এক বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তিত্ব শঙ্খ ঘোষ। যৌনতার আর্ত সংরাগ, অসঙ্কোচ স্বেচ্ছাচার, যাবতীয় উত্তরাধিকার নস্যাৎ করার ঔদ্ধত্য ইত্যাদি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ছিলো না। একদিকে কবিতাশিল্পের শর্তপালন এবং অন্যদিকে সমকালীন সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, এই উভটানে শঙ্খ লিখেছিলেন তাঁর *দিনগুলি রাতগুলি* (১৯৫৬)-র কবিতা। মিছিল, শ্লোগান, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের বাহ্য বাস্তবতার আবেগমথিত চিত্রণ নয়, শঙ্খ তাঁর কবিতায় সময়ের আকুল পরিচিতিকেই ফুটিয়ে তুলতে চান নিরীক্ষার মেধাবী আয়োজনে, শিল্প শাসনে শৈথিল্যের পথরোধ করে। এক আতিশয্যবর্জিত, সঙ্কেতময় ও বহুকৌণিক ভাষা-ভঙ্গিতে শঙ্খ *নিহিত পাতালছায়া, মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়* থেকে *বাবরের প্রার্থনা, প্রহরজোড়া ত্রিতাল* পেরিয়ে এসে পৌছান *পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ* কিম্বা *গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ*-তে। সমাজ ও দেশকালের বিপন্নতা ও কবির ব্যক্তিসত্তার সঙ্কট পরস্পর বিপরীতমুখী টানাপোড়েনে যেখানে লগ্ন। শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দের সতর্ক দক্ষতায় কবিতার শিল্পরূপকে অক্ষুণ্ন রেখে বিপন্ন ও পীড়িত দেশকাল ও ব্যক্তিবিবেকের প্রাতিস্বিকতা যেভাবে অভিব্যক্ত করেছেন শঙ্খ, তার সঙ্গে মেজাজ ও ভঙ্গিতে পঞ্চাশের অন্য কোনো কবির মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শক্তির কবিতায় সাধারণভাবে মেধা ও মননের এ ধরনের প্রস্তুতি, দেশকাল তথা সময়-প্রসৃতির গভীর প্রবহমানতাকে সর্বদা ছুঁয়ে থাকার লক্ষণ নজরে পড়ে না। জীবন-মৃত্যুর দোটানায়, বৈরাগ্য ও আসক্তির দ্বন্দ্বে, প্রেমময়, শৈশব স্মৃতিময়, নিরন্তর আত্মপ্রক্ষেপে আবেগমথিত স্বগত ভাষ্যে শক্তি এক স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাভুবনের সবকটি জানালা-দরজা খুলে দিতে চান জীবনরহস্যের অতলতার অ-লজ্জ সন্ধানে।

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারেন, এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন শক্তি। কবিরূপে তাঁর আবির্ভাব লগ্ন থেকে যেমন মৃত্যুবোধ টেনেছে তাঁকে, তেমনি মৃত্যুর সীমান্তরেখা পেরিয়ে, জীবনের ওপারে যে অন্যতর জীবন, তার প্রতিও অনুভব করেছেন এক আশ্চর্য আন্তরিক আকর্ষণ। শক্তির প্রয়াণের পর এখনো পুরো পাঁচটি বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। রেকর্ড সংখ্যক কবিতাগ্রন্থের জনক এই কবির *পদ্যসমগ্র*-র একের পর এক খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বেরিয়েছে *সকলে প্রত্যেকে একা* শীর্ষক একটি কবিতাসঙ্কলন। হয়তো সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে আরো অনেক 'পদ্য', গদ্যরচনা, অনুবাদকর্ম। হয়তো সময়ের আরো কিছুটা ব্যবধান, দেখার জন্যে প্রয়োজনীয় আরো খানিক দূরত্ব তৈরি হলে আমরা এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারবো।

ইত্যবসরে কবির অভিপ্রায়ের প্রতি সম্মানার্থে হয়তো আমরা সেই দূরস্থিত গন্তব্যের দিকে সতর্ক যাত্রার সূচনা করতে পারি। তাঁর শারীরিক মৃত্যুর পরে কেন ও কিভাবে কবি হেঁটে যাবেন সময়-ঘড়ির চলিত শাসনকে উপেক্ষা করে তার কিছু সমীক্ষা হয়তো এখনই শুরু করা সম্ভব। হয়তো শুরু হয়েই গেছে সেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী দুরূহ যাত্রা, যেভাবে আরো অনেকের মতো কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষ শুরু করেছেন তাঁর 'এই শহরের রাখাল' ও 'নিজেকে নিয়ে শক্তি'

শিরোনামাঙ্কিত দুটি গদ্যে[৬]। 'কৃত্তিবাস'-এর পাতায় পঞ্চাশের মধ্যযামে 'সুবর্ণরেখার জন্ম' শীর্ষক এক আশ্চর্য গদ্যকবিতায় পাঠকের ওপর এক আততায়ীসুলভ ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তরুণ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শব্দের এক উদ্ভট পরম্পরা ও প্রতিমা প্রয়োগের নমনীয় জটিলতায় ভাষার চালু ভঙ্গিটিকে আঘাত করে। গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় চলে আসা এই যুবক সেই থেকে প্রায় চল্লিশ বছর অবিরল কবিতা লিখেছেন, যাপন করেছেন কবিতাচর্চা নির্ভর এক অনন্য, বেপরোয়া জীবন। শক্তির জীবন ও কবিতার অন্দরমহলে অম্লান থেকে গেছে তাঁর বাল্যস্মৃতি, গ্রামজীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, এক দেহপরবশ বালকের সত্তা। মহানগরের মুখর জটিল আধুনিক অস্তিত্বের শ্বাসরোধকারী বাস্তবতার প্রেম ও যৌবনের তীব্র আবেগে শক্তি চেয়েছিলেন অপ্রেম, ভণিতা, ক্ষয় ও মৃত্যুর সর্বগ্রাসী বিনষ্টিকে প্রতিহত করতে। অবিরত লিখে গেছেন শক্তি এক উদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ততায়, বিষয় ও আঙ্গিকের এক অভূতপূর্ব স্বেচ্ছাচারে—'শহুরে আর গ্রাম্য, গুরুভার তৎসম আর হালকা দেশজ, সুচারু আর অশ্লীল, উদ্ধত আর নমিত—সবরকমের শব্দ তাঁর কবিতায় দৃঢ় অথচ লাবণ্যময় এক সর্পিলতা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে ঝাপটের পর ঝাপটে, বাংলা কবিতায় এ-রকম এক শ্বাসরোধী অভিজ্ঞতা প্রায় যেন ঘটেনি কখনো আর।'[৭]

গান ভালোবাসতেন শক্তি ; তাঁর গলাতেও ছিলো সুর ; আর সেই সুরের টান ছড়িয়ে যেতো তাঁর কবিতার অন্তঃপুরে। অজস্র কবিতায় একটি দুটি শব্দ/শব্দগুচ্ছ, পংক্তি কিম্বা কখনো গোটা স্তবক লিরিক ধুয়ার মতো পুনরাবৃত্ত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ে রোমান্টিক নিভৃতি বা বিষণ্ণতার চোরা স্রোতের মতো। রবীন্দ্রনাথের গানের কলি ও অনুষঙ্গ, বাউল আর লোকগানের স্মৃতি শক্তির বহু রচনায় পরাণভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে। নাগরিক কবির আধুনিকতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে সহজ, লোকায়ত, অনাধুনিক প্রাণস্পন্দন। একই কথা বলা যায় শক্তির শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে ; বহু গ্রাম্য, অনভিজাত, আঞ্চলিক, এমনকি ইতর ও অশিষ্ট শব্দ এক আশ্চর্য পংক্তিভোজনে স্থান পায় কুলীন ও গুরুভার তৎসম শব্দাবলীর সঙ্গে। শব্দ-প্রকরণে এই সংস্কারবর্জন ও কবিতার ব্যাকরণে গুরুচণ্ডালির শৃঙ্খলাভঙ্গ পঞ্চাশের ঘোষিত কার্যক্রম ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। তবু শক্তি সেই নিয়মভঙ্গের দুঃসাহসকে যতদূর ও যতখানি অনায়াসে তাঁর কবিতাচর্চার অঙ্গীভূত করেছেন তার নজির পঞ্চাশ ও পরবর্তী প্রজন্মের কবিতায় লক্ষ্যগোচর হয় না।

নাগরিক জটিলতা, আধুনিকতার নানা দুরূহ আঙ্গিকের চাপে, মেধা ও মননের শীলিত উপচারে, সত্যদর্শনের গূঢ়তায় যখন কবিতার পাঠকসংখ্যা সীমিত হয়ে পড়ছিলো, যখন সুবোধ্যতা ও জনপ্রিয়তা আধুনিক কবির অভীষ্ট বলেই আর গণ্য হচ্ছিল না, তখনই শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছন্দমিলের চাতুর্যে ও শ্রুতিবাহিত নান্দনিকতায় জয় করেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার ভূ-খণ্ড। পাঠক সাধারণকে দিয়েছিলেন সুবোধ্য ও সুশ্রাব্য কবিতার স্বাদ, মেধা ও মগজের আধুনিকতা থেকে রেহাই দিয়ে। কফি হাউস ও অন্যত্র কবিতার আড্ডায় এবং অগুণতি কবিতাপাঠের আসরে শক্তির মন্দ্রকণ্ঠ উচ্চারণ যেন শ্রুতি-কবিতার পর্বে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো একালের কবিতা ও পাঠকবর্গকে। আধুনিকতার ভেতরে এও এক অনাধুনিকের অন্তর্ঘাত যেন। এর সমর্থন মিলবে নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যে—'আধুনিকতার মধ্যে অনাধুনিকতা, এও এক ধরনের আধুনিকতা, এরও মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ আছে।'[৮] চিরাচরিত 'কবিতা' শব্দটিকে স্বেচ্ছায় পরিহার করে শক্তি যে তাঁর রচনাকে বলতেন 'পদ্য' তাও তাঁর কবি-স্বভাবের ইঙ্গিতবহ। 'পদ্য' যেন

অনেকটা সাবলীল, সহজিয়া, পাঠক সাধারণ্যে দ্রুত পৌছোবার পন্থা। 'কবিতার' চেয়ে যেন খানিক অনভিজাত, যেন তাতে নবজীবিত হয়ে উঠতে পারে লোকপ্রিয় ছড়ার ছন্দের চাল, যেন অনেক সহজে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে দৈনন্দিন জীবনের চলমানতার সঙ্গে। এই পদ্যের প্রণোদনার পাশাপাশি আমরা আরো স্মরণ করতে পারি সাধু-চলিতের মিশ্রণ। আধুনিক কাব্য ভাষা ও শৈলীর বহিরঙ্গে এ ছিলো আর এক আঘাতের প্রয়াস এবং মুখ্যত পূর্বসুরি জীবনানন্দের হাত ধরে।

পঞ্চাশের কবিরা অনেকেই স্বীকারোক্তিমূলক স্বগতকথনের কবি। তবু শক্তির মতো দীর্ঘ চারদশকব্যাপী ব্রতযাত্রায় তাঁর কোনও সতীর্থ আত্মজীবনকে এভাবে এতো অসঙ্কোচে মেলে ধরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর নানা সুখ-দুঃখ-অভিজ্ঞতা, পরিবার, পরিজন, বন্ধু ও সহকর্মীদের অজস্র স্মৃতি, উন্মত্ত জীবন ও পর্যটনের অসংখ্য তথ্য যেভাবে ছড়িয়ে আছে শক্তির কবিতায় যে তা থেকেই গড়ে তোলা যায় তাঁর জীবনপঞ্জী। যেন নিজেকে সর্বতোভাবে উন্মোচিত করা ছাড়া, অকপট আত্মসমীক্ষণ ছাড়া কবির অন্য কোনও গুরুতর দায় সম্পর্কে শক্তি তেমন অবহিত ছিলেন না। শক্তির কবিতায় তাই বক্তব্যের প্রত্যক্ষ ভার লক্ষিত হয় না। দেশকাল, সমাজ ও রাজনীতির প্রতিচ্ছবি নিয়ে সংশয় ব্যক্ত হয়। সময় ও সমকালের উত্তেজনাকে কখনো কখনো ছুঁয়ে গেলেও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সোচ্চার বীক্ষায় তাঁকে উদ্দীপ্ত হতে দেখা যায় না, এমন অভিযোগের তর্জনী তোলেন কেউ কেউ। শঙ্খ ঘোষের পর্যবেক্ষণে 'পাহাড়চুড়ো থেকে নেমে আসা সমতলের মধ্যে বয়ে যাওয়া সেই জলধারার মতোই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। .... এই যে সমতল, এ যেন এক কালবাহিত দেশের ব্যাপ্ত সমতল। দেশের মধ্য দিয়ে কালের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া এই প্রবাহটিকে লক্ষ করতে না পারলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে ভুল বুঝবার একটা ভয় থেকে যায়'[৯]। পাঠকের অভিজ্ঞতায় কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁর অনেক সমকালীন কবিবন্ধুর তুলনায় (যেমন সুনীল কিম্বা অলোকরঞ্জন) শক্তি মানুষ ও তার যন্ত্রণা-বেদনা তথা সামাজিক পরিবেশ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অনেক বেশি।

মৃত্যুতে জীবনের ছেদ ও মানুষের অসম্মান মনে করে যে কবি মৃত্যু-উত্তর জীবনে হেঁটে যাবার কথা বলেছিলেন, তাঁর কবিতা রচনার শেষ পনেরো বছরে অর্থাৎ আশির গোড়ায় 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'র সময় থেকে বড়ো বেশি করে বেজেছে বিদায়ের সুরটি। উত্তর চল্লিশে বড়ো তাড়াতাড়ি তিনি লিখে ফেলছিলেন তাঁর 'এপিটাফ' ; বয়েস বাড়ার কথা, দ্রুত অবসিত হয়ে আসবার প্রসঙ্গটি যেন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছিলো। 'একাকী যাবো না অসময়ে' এমন অঙ্গীকার উচ্চারিত হলেও 'আমাকে জাগাও' কাব্যগ্রন্থের 'দিনরাত' কবিতাটিতে যেন মৃত্যুদেবতার তাড়নায় বিপরীত অঙ্গীকার করতে হয়েছে—'দেখা তো হয়েছে ক্রূর যমের সহিত,/তাকে বলা গেছে, আমি একাকীই যাবো।/গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে নিভে যাবে আলো,/আমি যাবো, সঙ্গে নিয়ে যাবো না কারুকে...'। তবে কি বলা যায় যে শক্তি তাঁর জীবনের তথা সৃজনের শেষ বছরগুলিতে যাপন করেছেন এক মৃত্যুত্তর অস্তিত্ব? তবে কি কবির অভিপ্রায় এক অর্থে পূর্ণই হয়েছে? কবিরূপে আত্মপ্রকাশের লগ্ন থেকে তাঁর এই 'মৃত্যুময় বেঁচে থাকা', জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তির গভীরে তাঁর মৃত্যুবোধ, বার্ধক্য ও অবসানের পূর্বানুমান এবং মৃত্যুদেবতার পরোয়ানা নিয়ে মৃত্যুত্তর জীবনযাপন, এসব কিছু কি শক্তিকে একালের কবিতায় একটি স্থায়ী অবস্থান দেবে না?

মৃত্যুর চার দিন আগে শান্তিনিকেতনে তাঁর জীবনের শেষ কবিতাপাঠের আসরে আরো অনেক কবিতার মধ্যে শক্তি পড়েছিলেন 'আমাকে জাগাও'—বিষ ঘুমের আচ্ছন্নতা থেকে জাগরণের আর্ত প্রার্থনায় : 'যেভাবেই হোক তুমি আমাকে জাগাও/...জীয়ন মরণ কাঠি দুই হাতে আছে/জীয়ন ছুঁইয়ে তুমি আমাকে জাগাও ....আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে/শুধু জাগরণ চাই বারেক জীবন!' মৃত্যুর পরেও মানুষের মতো, চিরজীবিতের মতো হেঁটে যাওয়ার অভিপ্রায়ে, বিষঘুম থেকে জেগে ওঠার করুণ আর্তিতে শক্তি সঞ্চার করেন কবিতার অব্যর্থ মহৎ শিহরণ।

গ্রিক পুরাণে আছে কোরোনিসের গর্ভে জাত অ্যাপোলো-পুত্র অ্যাসক্লেপিয়াসের আশ্চর্য বৃত্তান্ত। আর্টেমিসের হাতে নিহত কোরোনিসের দেহ যখন ঢেকে দিচ্ছিলো চিতার আগুন, সেইসময়ই মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলো অ্যাসক্লেপিয়াস। মৃতা মা'র গর্ভজাত অ্যাসক্লেপিয়াস ছিলো গ্রিকদের নিরাময়ের দেবতা। মৃতকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। নিতান্ত বালক বয়সে মৃত্যু ও চিতাগ্নি দেখেছিলেন শক্তি। তাঁর কবিতাতেও আগাগোড়া ছড়িয়ে ছিলো মৃত্যু আর 'চির প্রণম্য অগ্নি'র প্রসঙ্গ। অ্যাসক্লেপিয়াসের মতো মরণের হিমনিদ্রা থেকে পুনর্জাগরণের উচ্চারণ স্পন্দিত হয়েছিলো শক্তির কবিতায়, তাঁর চিরযাত্রার প্রাক্কালেও। যন্ত্রণার নিরাময় ও মৃত্যুকে পরাস্ত করা প্রাণের উদ্দীপনায়—অ্যাসক্লেপিয়াসের মতো এ কাজ তো কবিরই। মৃতদেহ জাগিয়ে তুলছেন অ্যাসক্লেপিয়াস, এই দেখে মৃত্যুর দেবতা হেডিস শরণাপন্ন হয়েছিলেন দেবরাজ জিউসের। জিউসের বজ্রে মৃত্যু হলো অ্যাসক্লেপিয়াসের। অনেকটা সেভাবেই আকস্মিক হৃদরোগের আক্রমণে চলে গিয়েছিলেন শক্তি। অ্যাপোলোর অনুরোধে জিউস নিরাময় ও প্রাণের প্রতীক অ্যাসক্লেপিয়াসকে স্থান দিয়েছিলেন নক্ষত্রলোকে। গ্রীস ও রোমে পূজিত হয়েছিলেন অ্যাসক্লেপিয়াস। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী, হয়তো বা সব কবির কাহিনীই, চিতাগ্নির আলোয় জাত, মরণ নিয়ে খেলায় পটু, মৃত্যুত্তর জীবনের দৃপ্ত অভিলাষী অ্যাসক্লেপিয়াসের কাহিনী।[১০]

সূত্রনির্দেশ :

১. প্রায় অনুরূপ অভিমত ছিলো শক্তির সহযাত্রী পঞ্চাশের বিশিষ্ট কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর। 'দেশ' পত্রিকার ১৯৭২-এর সাহিত্য সংখ্যায় অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন—"আমরাই বোধহয় 'কৃত্তিবাস' ও 'শতভিষা' কবিপত্রের লক্ষ্মীছাড়ার দল—শুরু করে দিয়েছিলাম অ-তাত্ত্বিক (Non-ideational) কবিতা লিখতে"। একই কথা বলেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—'শক্তির কবিতার আর এক আশ্চর্য গুণ হল বক্তব্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে শক্তি কাব্য-সুষমা নির্মাণের ব্যাপারেই বেশি নিমগ্ন' (সূত্র : 'কবিতীর্থ', পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃ · ২০)।

২. এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় টি. এস. এলিয়টের মন্তব্য— 'Organisation is necessary as well as inspiration' (The Use of Poetry and the Use of Criticism : *Studies in the Relation of Criticism to Poetry in England*, London, 1933 ; reprint, 1975, p. 146.)

৩. সূত্র : 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৭ ; দ্রষ্টব্য, পিনাকেশ সরকার, 'পঞ্চাশের কবি ও কবিতা: একটি পুনঃসমীক্ষণ', 'কোরক', শারদ ১৯৯৬, পৃ. ৬২।

৪. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ', সঙ্কলন ২৫, ১৯৬৮ ; কৃত্তিবাস সঙ্কলন ২, প্যাপিরাস, ১৩৯৩, পৃ. ২৯৫।

৫. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় শক্তির *ঈশ্বর থাকেন জলে* কাব্যগ্রন্থের 'কার জন্য এসেছেন?' ('অদ্ভুত ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন মৃন্ময় উঠোনে') এবং 'আমাদের সম্পর্ক' (ঈশ্বর থাকেন জলে/তাঁর জন্য বাগানে পুকুর/আমাকে একদিন কাটতে হবে') কবিতাদুটি। এছাড়া দ্রষ্টব্য একটি সাক্ষাৎকার ('দেয়া', তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৯৭৪) ও 'পদ্যাপদ্য সম্পর্কে দু'এক কথা' শীর্ষক নিবন্ধটি ('স্বকাল' জুন, ১৯৮০)।

৬. দ্রষ্টব্য, শঙ্খ ঘোষ, এই শহরের রাখাল, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০০।

৭. তদেব, পৃ. ১০৯।

৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, ভারত বুক এজেন্সি, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি '৯৯, পৃ. ১৮২।

৯. শঙ্খ ঘোষ, 'এই শহরের রাখাল', পৃ : ১০২-০৩।

১০. সূত্র : Arthur Cotterell. *A Dictionary of World Mythology*, Oxford University Press, 1986, p. 146 বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি ঋণী শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে (সচিত্র সংবাদ কাগজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা)।

পরিশিষ্ট : ১

অবনী বাড়ি আছো? : সেমিওটিক অনুসন্ধান

'সেমিওটিক্‌স্' বা 'চিহ্নবিজ্ঞান' একালের তত্ত্ববিশ্বে এক অত্যন্ত মূল্যবান আধুনিক প্রণালী ; কবিতার বাচনিক বয়নশিল্পের সূক্ষ্ম ও জটিল প্রক্রিয়ার তাৎপর্যসন্ধানে এ প্রণালী তুলে ধরেছে এমন এক নিবিড় পাঠের কৃৎকৌশল যার সাহায্যে কথার আড়ালে অন্য কথা, রূপের আড়ালে অন্য রূপ, বিবিধ উচ্চারণের আততিতে গড়ে ওঠা ভাষার আড়ালে পরাভাষার সমান্তরাল অপর অস্তিত্ব আবিষ্কারের অবিরাম আগ্রহ শাব্দিক সংযোগের সৃজনী অনন্যতা সম্পর্কে সন্ধানী পাঠককে সজাগ করে তোলে।

আধুনিক সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *কোর্স ইন জেনারেল লিংগুইসটিক্‌স্*-এ নিহিত ছিল 'চিহ্নবিজ্ঞানের' চিন্তাবীজ। সামূহিক বাচন বা 'Langue' এবং একক বাচন বা 'Parole', এ দুয়ের মধ্যে যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক চিহ্নিত করেছিলেন স্যসুর তা হয়ে উঠেছিলো 'স্ট্রাকচারালিজ্‌ম্' বা 'আকরণবাদ'-এর অন্যতম তত্ত্বভিত্তি। স্যসুর শব্দকে বলেছিলেন 'চিহ্ন' বা 'Sign' এবং ভাষাকে অনুধাবন করা হলো চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়া তথা 'System of Signs'-এর অনুধাবন। চিহ্নের একটি দিক 'চিহ্নায়ক' বা 'Signifier' এবং অন্যটি 'চিহ্নায়িত' বা 'Signified'. একটি বার্তা হলো নানাবিধ চিহ্নায়কের নির্মিতি, যেগুলির উপযোগিতা ও পরম্পরা সার্থক করে তোলে চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়াকে। আর সেই বার্তাকে গ্রহণ ও অনুধাবন করতে গেলে আবিষ্কার করতে হবে 'চিহ্নায়ক' ও 'চিহ্নায়িতে'র সেতুবন্ধ। কবিতার ভাষাবয়নে লুকিয়ে থাকে বহুমাত্রিক চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার নানা গূঢ়তা ও রহস্যদ্যোতনা। সচেতন পাঠক কবিতার পাঠবস্তু বিনির্মাণ করার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করেন সেই বহুমাত্রিকতা। শব্দসজ্জার আপাত রূপের অন্তরালে অনেকার্থদ্যোতনার পরাভাষা-প্রতীতি পাঠককে দেয় অনুভবের হীরকদ্যুতি।

এই 'চিহ্নবিজ্ঞান'-এর তত্ত্বপ্রণালীর আলোকে আমরা শক্তির বহুপঠিত কবিতা **অবনী বাড়ি আছো?**-র নিবিড় পাঠে প্রবৃত্ত হতে পারি। তিন স্তবকে গঠিত এ কাবিতাটি ১৯৬৫-তে প্রকাশিত কবির *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা অনুসারে (**জীবন ঘসে আগুন জীবন ঘসে কবিতা', বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৫**) কবিতাটি রচিত হয়েছিল হিজলিতে শক্তির দীর্ঘ তিন মাস থাকার সময়। মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ে এক ঘোর-লাগা অবস্থায় কবিতাটি রচিত হয়েছিলো এমন কথা শক্তি জানিয়েছিলেন। সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত শক্তির ***পদ্যসমগ্র***-র **১ম খণ্ডে** কবিতাটির শিরোনামে জিজ্ঞাসাসূচক (?) চিহ্নটি সংযোজিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে ছিল না। কবিতার প্রতিটি স্তবকের শেষ ধ্রুবপদটিতে যে জিজ্ঞাসুভাব আছে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পাদক এই চিহ্ন ব্যবহার

করেছেন বলে মনে হয়। পাঠবস্তুর সমীক্ষায় প্রবৃত্ত হবার আগে কবিতাটি একবার পড়ে নেওয়া যাক :

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো'?
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্‌মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন—হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

প্রথম পাঠেই প্রতীয়মান হয় যে এ কবিতায় শব্দনির্বাচন ও যোজনার মধ্য দিয়ে আত্মসঙ্কট, স্বপ্নময়তা ও নাটকীয়তার টানাপোড়েনে যে ভাবমণ্ডলটি আভাসিত হচ্ছে তাতে যুক্তিপরম্পরা ও শব্দার্থের তেমন নির্দিষ্ট সূচিমুখ কিছু নেই। অবনী নামের কোনো এক ব্যক্তি ও তার রুদ্ধদ্বার গৃহের বাইরে সন্ধানী কণ্ঠস্বর, এ সবের কোনো তথ্যগত ভিত্তি এ কবিতার প্রকৃত ভরকেন্দ্র নয়। বরং শাব্দিক তথ্য অবান্তর হয়ে যাচ্ছে চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় গড়ে ওঠা রহস্যদ্যোতনার পরাবাস্তবতায়। নিশিরাতে ঘুমিয়ে থাকা জনবসতির ছবি, অবিরাম কড়ানাড়ার শব্দ এবং অবনী নামে কোনো এক বন্ধুর বাড়ির খোঁজে ঘুরে ফেরা কোনো এক অনুসন্ধানকারী—কেবলমাত্র এটুকু বৃত্তান্তই কবিতাটির আকর এমন মনে হয় না। এক অবচেতন আত্মনাট্যের এগুলি ন্যূনতম তথ্যসূত্র। এইসব তথ্যচিহ্নের আড়ালে থাকে এক গভীরতর মানবিক সঙ্কেত, এক অনিকেত সত্তার আর্ত আশ্রয় সন্ধান ; বিশেষত 'অবনী' নামক নামবাচক বিশেষ্যর আড়ালে থাকে 'পৃথিবী' বা 'ধরণী'র অর্থব্যঞ্জনা।

কবিতার শুরুতেই বিশেষ লক্ষণীয় 'দুয়ার এঁটে' শব্দদুটি। 'দ্বার' বা 'দরজা' না বলে কবি লিখলেন 'দুয়ার' এবং 'আটকে' না লিখে ব্যবহার করলেন নিতান্ত কথ্যরীতির আটপৌরে শব্দ 'এঁটে'। দুটি শব্দই পশ্চিমবঙ্গীয় মানুষদের দৈনন্দিন ব্যবহারের গার্হস্থ্যময়তাযুক্ত শব্দ এবং প্রচলিতভাবে দেখলে আদৌ কাব্যিক শব্দ নয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে যে 'রাতের কড়ানাড়া'র কথা রয়েছে তাতেও চিহ্নায়কের রহস্যময়তা স্পষ্ট। এখানে কি বোঝানো হচ্ছে যে রাতই কড়া নাড়ছে অবনীর খোঁজে? 'রাতের কড়ানাড়া' বলতে তো রাত্রিকালীন কড়ানাড়ার কথাও বোঝাতে পারে। আর এমনও কি হতে পারে না যে রাতের দরজাতেই কড়া নাড়ছে কোনো এক অচেনা আশ্রয়প্রার্থী। তাহলে তো এ কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ারের বিখ্যাত কবিতা *The Listeners*-এর। এভাবে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সন্ধানে ঘুরে ফিরলে কাব্যভাষার

বহুমাত্রিকতা ও আপাতগ্রাহ্য ভাষার আড়ালে পরাভাষার এক স্বতন্ত্র পরিসরের খোঁজ কি মেলে না?

কে এই কবিতার অবনী? সে কি কবিরই দ্বিতীয় সত্তা (alter ego)? মধ্যরাতে এই অবনীর প্রতি যে উচ্চকণ্ঠ আর্ত প্রশ্ন কড়ানাড়ার আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিশিনির্জনতাকে ভেঙে দেয় তারই বিপ্রতীপ আবহ তৈরি করে দ্বিতীয় স্তবকের শান্ত, সজল প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ। এই স্তবকের প্রথম চার পংক্তিতে আমরা পাই পরাবাস্তবতা ও স্বপ্নের এক আশ্চর্য কল্পজগৎ। 'বৃষ্টি' ও 'মেঘ' এই জগতের দুটি চিহ্ন এবং 'পরাঙ্‌মুখ সবুজ নালিঘাস' বাক্যাংশের 'পরাঙ্‌মুখ' বিশেষণটি 'সবুজ নালিঘাস'-এর সঙ্গে এক গভীর ও রহস্যময় সম্পর্কে যুক্ত। গাভীর মতো ভঙ্গিতে সঞ্চরণে যে অপ্রত্যাশিত উপমা এবং সবুজ নালিঘাসের গররাজি হয়ে দুয়ার চেপে ধরার ভঙ্গিতে যে সমাসোক্তি ব্যবহার করেছেন শক্তি তাতে শব্দার্থকে অতিক্রম করে তথ্যাতিগ চিহ্নায়নের প্রয়াস পাওয়া যায়। বৃষ্টি, মেঘ ও নালিঘাস কেবলমাত্র নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ বলে বিবেচিত হয় না।

শুরু থেকেই এ কবিতায় আত্ম-সঙ্কট ও আত্ম-নাট্যের যে ইঙ্গিত রয়েছে তা আরও অন্তর্মুখী উচ্চারণে জটিল ও বিষাদময় হয়ে ওঠে তৃতীয় স্তবকে। এই স্তবকের প্রথম দুটি পংক্তিতে 'আধেকলীন' ও 'দূরগামী' শব্দদুটির ভাবময় ব্যঞ্জনা এবং বিশেষণরূপে তাদের অবস্থান কাব্যভাষার অন্তর্লীন তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে। 'আধেকলীন' কি কেবল 'হৃদয়'-এর বিশেষণ? সেক্ষেত্রে দুটি শব্দের মধ্যে ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার কি যুক্তিযুক্ত? 'দূরগামী' শব্দটি কি ব্যথার দূরে যাওয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে? রুদ্ধদ্বার ঘরে 'আধেকলীন' কবিসত্তা এবং দূরবিস্তারী ব্যথার মাঝে কবির ঘুমিয়ে পড়া, এ সবের শাব্দিক ও তথ্যগত আবরণের আড়ালে উঁকি মারে অবচেতন রহস্য। প্রথম স্তবকের মতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের শেষে যখন অবনীর প্রতি উচ্চারিত আর্ত প্রশ্নটি পুনরাবৃত্ত হয় তখন চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের অন্তর্বয়ন আরও স্পষ্টতা পায়। এর সমর্থন মিলবে জনৈক ভাষ্যকারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে—'আধুনিককালের পথভ্রান্ত সত্তার অমোঘ কণ্ঠস্বর যেন নীড়ে ফেরার ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করছে—এমন মনে হয়। এ যেন ভ্রাম্যমাণ সত্তার তাৎপর্য-সন্ধানের সন্দর্ভ হিসেবে কবিতার অন্তঃশায়ী চিহ্নায়িতকে আরও গভীরতর তাৎপর্যে যুক্ত করেছে। তাৎপর্যের এই তাৎপর্য-সন্ধান শক্তির কাব্যভাষাকে অভূতপূর্ব দ্যোতনায় ঋদ্ধ করেছে। ভুবন-পরিক্রমা শেষে বাচন ফিরে এসেছে পরাভাষার নীড়ে'।[১]

সূত্রনির্দেশ :

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'চিহ্নবিজ্ঞান, কথনবিশ্ব ও পাঠকের নির্মিতি', আকাদেমি পত্রিকা, দশম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৯০

পরিশিষ্ট : ২

আনন্দ ভৈরবী : একটি আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণ

অবয়ববাদী বা আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণ একালের মননবিশ্বের এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি যার মূল কথা হলো একটি শিল্পকর্মের সংগঠক উপাদানসমূহের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার বদলে তার বিভিন্ন অংশের সম্পর্কসূত্র পর্যালোচনা এবং খণ্ডের মধ্যে থেকে একটি অখণ্ড অবয়ব তথা 'Organic Wholeness'-এর সন্ধান। একজন কবি যখন কবিতা রচনা করেন তাঁর মনের মধ্যে থাকে একটি 'উদ্দেশ্য' যা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি ব্যবহার করেন শব্দ/শব্দগুচ্ছ যেগুলি তাঁর 'উপাদান'। এই 'উদ্দেশ্য' ও 'উপাদান' মিলে গড়ে ওঠে 'অবয়ব'। অবয়ববাদী বিচারে কবিতায় শব্দেরা হলো ইঙ্গিত, 'অবয়ব' হলো সেইসব ইঙ্গিতের শৃঙ্খলা ; কবিতার 'অবয়ব' বিশ্লেষণ তাই কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ নয়।

অবয়ববাদী/আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণের সূচনা আমাদের সময়কালের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ যথা নোআম চম্‌স্কি ও লেভি-স্ত্রোস-এর ভাবনায়। অধুনা এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, পুরাণ, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যাশৃঙ্খলায়। এই বিচারপদ্ধতির পরিকাঠামোটি একান্তই গাণিতিক যার মূল কথা হলো বিচার্য বিষয়ের অন্তর্লীন বিভিন্ন 'বিপ্রতীপ প্রবণতা' বা 'binary opposites' গুলি চিহ্নিত করে বিভিন্ন বর্গের প্রবণতার ভর বা সংখ্যা নিরূপণ করা। বিভিন্ন বিপ্রতীপ প্রবণতার একক বেছে নিয়ে তাদের আনুপাতিক ভর/সংখ্যার তুলনামূলক বিচার করলে তা থেকে বিচার্য শিল্পকর্মটির ভাববস্তুর সন্ধান মিলবে। এখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ জনপ্রিয় কবিতা **আনন্দ ভৈরবী**-র একটি অবয়ববাদী/আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণ উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত হলো :

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ ভৈরবী

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহন-বাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে-মেঘেব ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে

সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি
সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বাম মুঠি

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ-হৃদয়পুর
সে কি জানিত না, আমি তারে যত জানি
আনখ-সমুদ্দুর

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।।

পাঠবস্তুর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ :

(১) এ কবিতায় চার পংক্তির পাঁচটি স্তবক ; প্রতি স্তবকের প্রথম তিনটি পংক্তি সমদৈর্ঘ্যসম্পন্ন (১৪ মাত্রা) ও চতুর্থ পংক্তিটি হ্রস্ব (৬ মাত্রা)। সমগ্রের একটি কাঠামোগত সৌষম্য রয়েছে।

(২) কবিতাটির প্রথম স্তবকটি অপরিবর্তিতভাবে ফিরে এসেছে পঞ্চম ও শেষ স্তবকরূপে। এই চার পংক্তি এ কবিতার ধুয়া, মূল ভাববস্তুর ধারক। 'আনন্দ-ভৈরবী' শব্দটিকে একটি হ্রস্ব পংক্তির আকারে আলাদা করে কবি এই চাবি-শব্দকে বিশেষভাবে পাঠকের গোচরে আনতে চেয়েছেন।

বিশ্লেষণ :

এই কবিতার মূল অনুভবটি বোঝার জন্যে আমরা 'বর্তমান' ও 'অতীত' এই দুই বিপ্রতীপের সূচকগুলি সন্ধান করতে পারি :

বর্তমান	অতীত
১। **আজ** সেই ঘরে এলায়ে **পড়েছে** ছবি	১। এমন **ছিলো না আষাঢ়-শেষের** বেলা
২। **আজ** সেই গোঠে **আসে না** রাখাল ছেলে	২। উদ্যানে **ছিলো** বরষা-পীড়িত ফুল
৩। **কাঁদে না** মোহন বাঁশিতে বটের মূল	৩। সে কি **জানিত না** এমনি দুঃসময়...
৪। **এখনো** বরষা কোদালে-মেঘের ফাঁকে	৪। সে কি **জানিত না** হৃদয়ের অপচয়
৫। **আজ** সেই ঘরে এলায়ে **পড়েছে** ছবি	৫। সে কি **জানিত না** যত বড়ো রাজধানী
	৬। সে কি **জানিত না** আমি তারে যত জানি
	৭। এমন **ছিলো না** আষাঢ়-শেষের বেলা
	৮। উদ্যানে **ছিলো** বরষা-পীড়িত ফুল
মোট = ৫	মোট = ৮

এই সারণী থেকে আমরা কবিতার কেন্দ্রীয় প্রেমিক পুরুষটির ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আর্ত স্মৃতিমেদুরতার ইঙ্গিত পাচ্ছি। সূচকের সংখ্যায় 'অতীত' ছাপিয়ে উঠেছে 'বর্তমান'কে। 'বর্তমান'

ও 'অতীত' এই প্রতিমুখী বর্গের পরিমাপকে আশ্রয় করে বর্তমানে না থাকা ও অতীতে থাকার বিপ্রতীপ সূচকগুলি সন্ধান করতে পারি :

অতীতে থাকা/হাঁ বাচক (+)	বর্তমানে না থাকা/না বাচক (–)
১। 'আষাঢ়-শেষের বেলা'য় 'উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল'।	১। এখন সেই ফুল নেই।
২। ছবি আগে যথাস্থানে ছিলো।	২। ছবি এখন স্থানচ্যুত ('এলায়ে পড়েছে')।
৩। একদা গোঠে রাখাল বালক আসতো।	৩। এখন সেখানে 'রাখাল ছেলে' আসে না।
৪। রাখালিয়া বাঁশির সুরে আলোড়িত হোতো প্রবীণ বৃক্ষের প্রাণের উৎস।	৪। এখন আর বাঁশি বাজে না ; 'বটের মূলে' কোনো সাড়াও জাগে না।
৫। আগে আষাঢ় শেষে বৃষ্টির প্রাচুর্য ছিলো।	৫। এখন শুধু মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎরেখা ; বৃষ্টি ফুরিয়ে গেছে।
৬। বৃষ্টি, বৃষ্টি-লাঞ্ছিত ফুল, রাখাল বালকের মোহনবাঁশি, এসব থেকে বোঝা যায় যে, আগে এক সহজ সুসময় ছিলো।	৬। এখন এক আগ্রাসী দুঃসময়—'লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি'।
৭। আগে ছিলো হৃদয়ের বিনিময়।	৭। এখন 'হৃদয়ের অপচয়'।
৮। আগে প্রণয়ীযুগল ছিলো হৃদয়পুরের বাসিন্দা।	৮। এখন রাজধানীর খ্যাতি ও প্রশস্ততায় হৃদয়পুর হারিয়ে গেছে।
৯। আগে প্রেমিকপুরুষটি জানতো তার প্রেমিকাকে।	৯। সে জানা এখন শেষ।
১০। অতীতে 'আনন্দ-ভৈরবী' ছিলো।	১০। এখন সে 'আনন্দ-ভৈরবী' নেই।

কুড়ি পংক্তির কবিতায় অতীতে থাকা ও বর্তমানে না থাকার দশটি করে সূচক পাওয়া যাচ্ছে। স্মৃতিভারে বিধুর প্রেমিকের বিরহ ও বিষণ্ণতার তীব্রতা ও মানসিক দোলাচলের সঙ্কেত স্পষ্ট বিপ্রতীপ বর্গের সমসংখ্যক সূচক থেকে।

বিপ্রতীপ প্রবণতার সূচকের সন্ধান এইভাবে আমাদের কবিতার অবয়বের উপাদান ও তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে, কবিতার মূল ভাব তথা সুরটিকে চিনতে সাহায্য করে। নীচের সারণীতে আরও কিছু বিপ্রতীপ বর্গের হদিশ মিলবে :

(১) 'ঘর' (পংক্তি ১) ⇆ 'উদ্যান' (পংক্তি ৩)

['ঘর' বদ্ধ তথা সীমিত ক্ষেত্রের প্রতীক] ['উদ্যান' উন্মুক্ত ও বৃহৎপরিসর]

(২) 'গোঠ', 'বটের মূল' (পংক্তি ৫, ৬) ⇆ 'কোদালে-মেঘের ফাকে বিদ্যুৎরেখা' (পংক্তি ৭-৮)

[তৃণভূমি, বৃক্ষ ও শিকড়ের ব্যঞ্জনায় ভূ-প্রকৃতির জীবনদৃশ্য] [মেঘ ও বিদ্যুতের লুকোচুরিতে আকাশের প্রাণ সঙ্কেত]

(৩) 'কৃপণের বামমুঠি' (পংক্তি ১২) ⇆ 'আনখ-সমুদ্দুর' (পংক্তি ১৬)
[স্বল্পতা ও সঙ্কীর্ণতা] [প্রাচুর্য ও ব্যাপ্তি]

(৪) 'রাজধানী' (পংক্তি ১৩) ⇆ 'হৃদয়পুর' (পংক্তি ১৪)
[বৃহৎ ও জমকালো, কৃত্রিম] [নিভৃত ও গভীর, সহজিয়া]

হৃদয়পুরের নিভৃত বিনিময় এখন জনবহুল রাজধানীর জাঁক-জমক ও বিশালতায় অবসিত। এখন তাই ঘরে বিমর্ষতা ও শূন্যতা। ঘরের বাইরে উদ্যানে, গোঠে, বৃক্ষের শিকড়ে ও আকাশে তারই প্রতিচ্ছবি।

গ্রন্থপঞ্জী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা

কাব্যগ্রন্থ

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, গ্রন্থজগৎ, মার্চ, ১৯৬১।

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, অক্টোবর, ১৯৬৫।

তিন তরঙ্গ (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর সঙ্গে), সাহিত্য, ডিসেম্বর, ১৯৬৫।

অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে, গ্রন্থজগৎ, জুলাই, ১৯৬৬।

পুরোনো সিঁড়ি, প্রকাশক দেবকুমার বসু, আনুমানিক ১৯৬৭।

সোনার মাছি খুন করেছি, ভারবি, জুলাই ১৯৬৭।

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, অরুণা প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৬৯।

সোহরাব-রুস্তম (মিনিবুক), প্রকাশক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ডিসেম্বর ১৯৬৯।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী, কবয়ঃ, মে, ১৯৭০।

এখন রাখাল বানীপ্রিয়র জন্য শাশ্বত স্বীকারোক্তি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল পুরকায়স্থ এবং অভিজিৎ ঘোষের সঙ্গে), বিশ্বজ্ঞান, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৭১।

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট, ১৯৭২।

যুগলবন্দী, (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে), বেঙ্গল পাবলিশার্স, আগস্ট, ১৯৭২।

শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, মার্চ ১৯৭৩।

প্রেমের কবিতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, এপ্রিল, ১৯৭৪।

সুখে আছি, অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস, এপ্রিল ১৯৭৪।

ঈশ্বর থাকেন জলে, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মে, ১৯৭৫।

জ্বলন্ত রুমাল, প্রথম সংস্করণের সন্ধান নেই, মে, ১৯৭৫, প্রথম দে'জ সংস্করণ, মার্চ, ১৯৮৮।

অস্ত্রের গৌরবহীন একা, পুস্তক প্রকাশনী, মে, ১৯৭৫।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ১৯৭৫।

কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৭৬।

সুন্দর এখানে একা নয়, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, জুন, ১৯৭৬।

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

কবিতার তুলো ওড়ে, দে'জ পাবলিশিং, মার্চ ১৯৭৭।

হেমন্ত যেখানে থাকে, অনন্য প্রকাশন, এপ্রিল, ১৯৭৭
পাতাল থেকে ডাকছি, তাম্রলিপি, মে ১৯৭৭
এই আমি যে পাথরে, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, আগস্ট, ১৯৭৭।
উড়ন্ত সিংহাসন, অরুণা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।
পরশুরামের কুঠার, স্বরলিপি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।
কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মে, ১৯৭৮।
মানুষ বড়ো কাঁদছে, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট, ১৯৭৮
ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ১৯৭৮।
কুড়ি বছরের কুড়িটি, জেরোপ্রিন্ট, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।
ভাত নেই, পাথর রয়েছে, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই, ১৯৭৯।
আমাকে দাও কোল, জার্নাল শহর, মার্চ, ১৯৮০।
আমি চলে যেতে পারি, সমকাল প্রকাশনী, এপ্রিল, ১৯৮০।
মন্ত্রের মতন আছি স্থির, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মে, ১৯৮০।
অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই, ১৯৮০।
সুন্দর রহস্যময় (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে), আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।
আমি একা বড়ো একা, বিশ্ববানী প্রকাশনী, মে, ১৯৮৯।
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ, নাভানা, জানুয়ারি, ১৯৮২।
পুণ্যিপুকুর পুষ্করিণী, মিঠু প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৮২।
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো, আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ, ১৯৮২।
কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে, আনন্দ পাবলিশার্স, বইমেলা, ১৯৮৩।
একপাত্র সুধা, বিদ্যামন্দির, বইমেলা, ১৯৮৪।
কক্সবাজারে সন্ধ্যা, আনন্দ পাবলিশার্স, বইমেলা, ১৯৮৪।
সে তার প্রতিচ্ছবি, বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪।
ও চিরপ্রণম্য অগ্নি, আনন্দ পাবলিশার্স, বইমেলা, ১৯৮৫।
মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫।
সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট, ১৯৮৬।
এই তো মর্মরমূর্তি, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ১৯৮৭।
বিষের মধ্যে সমস্ত শোক, মিরান্দা বুক্‌স, মে, ১৯৮৭।
আমাকে জাগাও, আনন্দ পাবলিশার্স, বইমেলা, ১৯৮৯।
পদ্যসমগ্র (১), আনন্দ পাবলিশার্স, জুলাই, ১৯৮৯।
অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, বইমেলা, ১৯৯০।
ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ১৯৯১।
পাতালে টেনেছে আজ, ক্যাম্প, জুলাই, ১৯৯১।
নির্বাচিত প্রেমের কবিতা, বিকাশ গ্রন্থভবন, বইমেলা, ১৯৯২।

এলেজি সংগ্রহ, কবয়ঃ, জানুয়ারি, ১৯৯৩।
পদ্যসমগ্র (২), আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, '৯৩।
জঙ্গল বিষাদে আছে, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ১৯৯৪।
পদ্যসমগ্র (৩), আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ১৯৯৫।
পদ্যসমগ্র (৪), আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ১৯৯৫।
পদ্যসমগ্র (৫), আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ১৯৯৭।
সকলে প্রত্যেকে একা, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ১৯৯৯।

উপন্যাস

কুয়োতলা, সৃজনী, ১৯৬১।
লুসি আর্মানীর হৃদয় রহস্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, জুন, ১৯৬৬ (রূপচাঁদ পক্ষী ছদ্মনামে লেখা)
হাই সোসাইটি, মণ্ডল বুক হাউস, অক্টোবর, ১৯৬৮।
অবনী বাড়ি আছো, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট, ১৯৭৩।
দুজন একাকী, পূর্ণ প্রকাশন, আগস্ট, ১৯৭৪।
হৃদয়পুর, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, আগস্ট, ১৯৭৪।
আমি চলে যাচ্ছি, শৈব্যা পুস্তকালয়, আগস্ট, ১৯৭৬।
কিন্নর কিন্নরী, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মে, ১৯৭৭।
দাঁড়াবার জায়গা, আনন্দ পাবলিশার্স, মে, ১৯৮৬।
বিবি-কাহিনী, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, আগস্ট, ১৯৮৬।

বিবিধ গদ্যগ্রন্থ

রূপকথার কলকাতা (রূপচাঁদ পক্ষী ছদ্মনামে লেখা প্রবন্ধসংগ্রহ), নতুন প্রকাশক, আগস্ট, ১৯৬৫।
উইক এন্ড টুরিস্ট গাইড, গ্রন্থ প্রকাশ, মে, ১৯৭২।
খৈরী, আমার খৈরী, আশা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।
চলো বেড়িয়ে আসি (১ম পর্ব), মনোমোহন প্রকাশনী, মে, ১৯৭৭।
চলো তিতির সঙ্গে, অনন্য প্রকাশন, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।
চলো বেড়িয়ে আসি (২য় পর্ব), শরৎ পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর, ১৯৮০।
জঙ্গলে পাহাড়ে, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, অক্টোবর, ১৯৮৫।
হাতি ধরিয়ে নায়ার, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ১৯৮৬।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *গদ্যসংগ্রহ* (১ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা, ১৯৯৬।
ঐ (২য় খণ্ড), দে'জ, বইমেলা, ১৯৯৭।

অনুবাদ গ্রন্থ

ওমর খৈয়ামের রুবাই, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, এপ্রিল, ১৯৬৯।
কালিদাসের মেঘদূত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ১৯৭২।
গালিবের কবিতা (আয়ান রশীদের সঙ্গে), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৭৫।
পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ১৯৭৬।
কুমারসম্ভব কাব্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মে, ১৯৭৬।
হাইনের প্রেমের কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন, ১৯৭৯।
লোরকার কবিতা, (অমিতাভ দাশগুপ্তর সঙ্গে), দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর, ১৯৭৯।
১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা (মুকুল গুহর সঙ্গে), দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর, ১৯৮০।
কহলীল জিব্রানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (মুকুল গুহর সঙ্গে), করুণা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।
প্রীতীশ নন্দীর কবিতা, (২৮টি কবিতা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ), আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ১৯৮১।
মায়াকোভস্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা, (সিদ্ধেশ্বর সেন ও মুকুল গুহর সঙ্গে), দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর, '৮১।
ডুইনো এলেজি (মুকুল গুহর সঙ্গে), দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৮২।
পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৮৮।
আমেরিকান ইন্ডিয়ান শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৯২।

আলোচনা/সমালোচনা/বিবিধ

বাংলা গ্রন্থ

অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক,* অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৮১।
অরুণ সেন, *কবিতা/এই সময়ের পাঠ,* প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৯৯।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, *স্থির বিষয়ের দিকে,* আশা প্রকাশনী, ১৯৭৬।
অশ্রুকুমার সিকদার, *কবির কথা কবিতার কথা,* অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৪।
উত্তম দাশ, *বাংলা কাব্যনাট্য,* মহাদিগন্ত, ১৯৮৯।
ঐ, *বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি,* মহাদিগন্ত, ১৯৯২।
কমলকুমার ব্রহ্ম, *কবিতা : উপভোগ ও মূল্যায়ন,* নবার্ক, ১৯৮৬।
জহর সেন মজুমদার, *বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ,* পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।
জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা,* সিগনেট, ১৯৫৫।
জীবেন্দ্র সিংহরায়, *আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

ঐ, *বাংলা ছন্দ,* জিজ্ঞাসা, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৩।

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা,* পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ১৯৯৪।

তাপস রায় (সম্পাদিত), *কবিতার ভাষা : চার দশক,* অন্যস্বর, বইমেলা, ১৯৯৪।

দেবকুমার বসু, *বাংলা দীর্ঘকবিতা,* বিশ্বজ্ঞান, ১৯৮০।

দেবতোষ বসু (সম্পাদিত), এই কাব্য এই হাতছানি, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

নারায়ণ ইন্দ্র, *শিকড়ে শব্দের ঘ্রাণ,* ১৯৮৭।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *কবিতার ক্লাস,* ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২।

পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), *আরুণি :* অধ্যাপক অরুণকুমার বসু সংবর্ধনা-গ্রন্থ, অরুণকুমার বসু সংবর্ধনা-সমিতি, ১৯৯৯।

পরিমল চক্রবর্তী, *তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার দিকচিহ্ন,* প্রতিভাস, ১৯৮৮।

প্রদীপ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা,* রক্তকরবী, ১৯৯৬।

বারীন্দ্র বসু, *বোদ্‌লেয়ার থেকে এলিয়ট্‌,* কার্ষ্ণি-রাধেয়, ১৯৯২।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯।

বুদ্ধদেব বসু (অনুদিত ও সম্পাদিত), *বোদ্‌লেয়ার, তাঁর কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১।

শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য,* প্যাপিরাস, ১৯৮২।

ঐ, *নিঃশব্দের তর্জনী,* প্যাপিরাস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৪।

ঐ, *ছন্দের বারান্দা,* অরুণা প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৮।

ঐ, *এই শহরের রাখাল,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।

শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদিত), *এই সময় ও জীবনানন্দ,* সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬।

শামশের আনোয়ার, *শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা,* সুবর্ণরেখা, ১৯৯৬।

শৈলেশ্বর ঘোষ, *হাংরি জেনারেশন আন্দোলন,* ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ১৯৯৫।

সমরজিৎ কর ও ইনা সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *শক্তির কাছাকাছি,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

সমীর রায়চৌধুরী, *কবিতার আলো অন্ধকার,* কবিতা পাক্ষিক, ১৯৯৬।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতার কালান্তর,* সান্যাল প্রকাশন, ১৯৭৬।

সুজিত সরকার, *কবিতা কেন কবিতা,* কবিতা পাক্ষিক, ১৯৯৬।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *(সম্পাদিত), কৃত্তিবাস সঙ্কলন* ১, প্যাপিরাস ১৯৮৪।

ঐ, কৃত্তিবাস সঙ্কলন ২, প্যাপিরাস, বৈশাখ ১৩৯৩।

সুভাষ ভট্টাচার্য, *ভাষা সাহিত্য শৈলী,* প্রমা, ১৯৯৭।

সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক কবিতার চালচিত্র,* সাহিত্যলোক, ১৯৯৬।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য পরিক্রমা,* শিবরানী প্রকাশনী, ১৯৮৯।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬৬।

হিমানীশ গোস্বামী, *শক্তির সঙ্গে ঝোলাঝুলি,* আনন্দধারা, ১৯৯৩।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

ইংরাজি গ্রন্থ

Abu Sayeed Ayyub, *Poetry and Truth,* Jadavpur University, 1970.

Aristotle, *On the Art of Poetry,* trans. Ingram Bywater, O.U.P., 1967.

Arthur Cotterell, *A Dictionary of World, O.U.P. 1986.*

A. Hill (Ed.), *Linguistics To-day, New York,* 1969.

Bernard Groom, *A Short History of English Words,* London, 1957.

Caroline Spurgeon, *Shakespeare's Imagery and What It Tells us,* Cambridge University Press, 1993.

Cecil Day-Lewis, *The Poetic Image,* Jonathan Cape Ltd. 9th Impression, 1958.

Chris Baldick, *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms,* O. U. P. 1990.

David Lodge (Ed.), *Modern Criticism and Theory,* London, 1988.

Dennis Walder (Ed.), *Literatre in the Modern World,* O. U. P. 1990.

Frank Kermode (Ed.), Selected Prose of T. S. Eliot, Faber and Faber, 1975.

G. F. J. Cumberlege (Ed.), *Several Essays,* O. U. P., 1952.

G. N. Leech, *A Linguistic Guide to English Poetry,* Longman, 1969.

Jonathan Culler, *Structuralist Poetics,* Routledge and Kegan Paul, 1975.

Jonathan Culler, *The Pursuit of Signs,* Routledge, 1992.

Lewis Hyde (Ed.), *On the Poetry of Allen Ginsberg,* University of Michigan Press, 1984.

M. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms,* Macmillan India Ltd. 1984.

Michael Riffaterre, *Semiotics of Poetry,* Methuen, 1980.

Noam Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax,* Cambridge, 1965.

Richard Bradford, *Stylistics, Routledge,* 1997.

R. Ellmann and C. Feidelson (Ed.), *The Modern Tradition,* O.U.P. 1965.

Sushil Kumar De, *Problems of Sanskrit Poeties,* Firma K. L. Mukhopadhyay, 1959.

T. S. Eliot, *The Use of Poetry and the Use of Criticism,* London, 1975.

Umberto Eco, *A Theory of Semiotics,* Indiana University Press, Bloomington, 1976.

William Empson, *Seven Types of Ambiguity,* London, 1953.

Winifred Nowottny, *The Language Poets Use,* Athlone Press, London, 1965.

পত্র-পত্রিকা

অন্তরীপ, অক্টোবর, ১৯৯৫
অন্বীক্ষণ, শারদ সংখ্যা, ১৩৭৫
অন্যমনে, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
অপরাজিত, শারদীয়, ১৯৯১
অপর্ণা, শরৎ, ১৪০১
অমৃতলোক, জানুয়ারী-জুন, ১৯৯৩
আকাদেমি পত্রিকা ৮, জুলাই, ১৯৯৫
আজকাল, রবিবাসর, ২৬ মার্চ, ১৯৯৫
আজকাল, ৯ এপ্রিল, ১৯৯৫
আজকাল, শারদীয়, ১৪০২
আজকাল, রবিবাসর, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৫
উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, অক্টোবর, ১৯৯৫
একান্তর, নভেম্বর, ১৯৯৫
এবং এই সময়, মে, ১৯৮৬
কবিতীর্থ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২
কবিপত্র, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯৩
কৃত্তিবাস, ২৫ সঙ্কলন, ১৯৬৮
কোরক, শারদ, ১৯৯৬
কৌরব, জুন, ১৯৮৫
কৌরব, জুলাই, ১৯৮৮
চতুরঙ্গ, মাঘ, ১৩৬৭
চতুরঙ্গ, মে, ১৯৯৫
জলার্ক, বইমেলা, ১৯৯৮
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭
দেশ, ২০ মে, ১৯৯৫
দেশ, ২৯ জুলাই, ১৯৯৫
দেশ, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
নিষাদ, মার্চ, ১৯৬৩
পদ্যবন্ধ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০
পদ্যবন্ধ, মে-জুন, ১৯৮৪
পরিচয়, এপ্রিল, ১৪০২
প্রতিক্ষণ, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৮৪
প্রতিক্ষণ, মে, ১৯৯৫
প্রাবৃতি, শারদ সংখ্যা, ১৪০২
বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৫
বিনোদন বিচিত্রা, ৫ মে, ১৯৯৫
বিভাব, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৮
ময়ূখ, জুলাই, ১৯৯৫
যুবমানস, এপ্রিল-মে, ১৯৯৫
সচিত্র সংবাদ কাগজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, ২৯ চৈত্র ১৪০১
সানন্দা, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৫
শতভিষা ৩৩, ফাল্গুন ১৩৭২
সাহিত্যসেতু, ১৬ জুলাই, ১৯৯৫
সীমান্ত সাহিত্য, বৈশাখ, ১৪০৩
স্বকাল, জুন, ১৯৮০
স্মৃতিস্মারক, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৫
হাওয়া ৪৯, শারদ, ১৪০২